Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা

(The Role of Bengali Diplomats in the Liberation War of Bangladesh)

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোশারফ হোসেন
পিএইচডি গবেষক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৪১/২০১৬-২০১৭

মে ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা

(The Role of Bengali Diplomats in the Liberation War of Bangladesh)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা

(The Role of Bengali Diplomats in the Liberation War of Bangladesh)

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোশারফ হোসেন
পিএইচডি গবেষক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৪১/২০১৬-২০১৭

মে ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি মোশারফ হোসেন, পিএইচডি গবেষক, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৪১/২০১৬-২০১৭, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমার পিএইচডি ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ অথবা এর কোনো অংশবিশেষ কোনো ডিগ্রি অথবা প্রকাশনার জন্য অন্য কোথাও দাখিল করিনি।

গবেষক

(মোশারফ হোসেন)
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৪১/২০১৬-২০১৭
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

মোশারফ হোসেন, (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৪১/২০১৬-২০১৭) ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পিএইচডি ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি যে, আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোনো অংশবিশেষ কোনো ডিগ্রি অথবা প্রকাশনার জন্য অন্য কোথাও দাখিল করা হয়নি। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের উদ্দেশ্যে জমা দেওয়ার জন্য অনুমোদন করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

(ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন)
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার পিএইচডি গবেষণার অভিসন্দর্ভ 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা'। আমার এ অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন ও ইতিহাস বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন। তাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতায় অভিসন্দর্ভটি বর্তমান রূপ পেয়েছে। আমার তত্ত্বাবধায়কের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, যিনি প্রতিনিয়ত তাগিদ না দিলে হয়তো অভিসন্দর্ভটি নির্ধারিত সময়ে শেষ করা সম্ভব হতো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা এবং সুচিন্তিত পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইপত্র, আমার গবেষণা সংক্রান্ত তৎকালীন সময়ের কিছু পত্রিকার কাটিং ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছেন। ফলে আমি আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ইতিহাস বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের প্রতি। আমার গবেষণাকর্মের প্রয়োজনে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞ চিত্তে আরো স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক আহমেদ কামাল, অধ্যাপক আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল, বিভাগের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক নুরুল হুদা আবুল মনসুর, অধ্যাপক আশা ইসলাম নাঈম, এম এ কাউসার, ড. মিল্টন কুমার দেব, এস এম রেজাউল করিম এর কথা। যারা সকল সময় আমার গবেষণা কর্মের খোঁজ নিয়েছেন, বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। আরো স্মরণ করছি বিভাগের প্রয়াত শিক্ষক মোহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন সাকী, যিনি প্রাথমিকভাবে আমার গবেষণার রূপকল্পটি দেখে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন আশা করা যায় একটি ভালো গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল কাশেম এর কথা। যিনি সকল সময় আমার গবেষণা কর্মের খোঁজ খবর নিয়েছেন, দ্রুত কাজটি শেষ করার পরামর্শ দিতেন। আরো কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়ার প্রতি, যিনি জ্যোতিঃপাল মহাথের রচিত বইটি ফটোকপি করে চট্টগ্রাম থেকে আমার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলা একাডেমির উপ পরিচালক ড. আমিনুর রহমান সুলতান এর প্রতিও।

এছাড়াও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার বিভাগের কয়েকজন শ্রদ্ধেয় অগ্রজ ও শুভাকাঙ্ক্ষী ড. হাবিবুল্লাহ বাহার, এ টি এম যায়েদ হোসেন, আজিজুল রাসেল, বাংলা একাডেমির গবেষক মামুন সিদ্দিকী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তপন পালিত, বিভাগের এম.ফিল গবেষক বড় বোন তুল্য মনোয়ারা আক্তার তামান্না, কানাডা প্রবাসী সুহৃদ ইমতিয়াজ আহমেদ এর কথা। যারা সকল সময় আমার গবেষণা কর্মটি দ্রুত শেষ করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

স্মরণ করছি আমার বন্ধু আবু সুফিয়ান রিজু, তরিফুল ইসলাম শামীম, মোহাম্মদ মাহতাব হোসেন মাসুম, সুমাইয়া আফরিন ইকু, মো. শামীম হোসেন, রিপন চন্দ্র দাস, মাহবুবুল হক ধ্রুব, কাজী হারুনুর রশীদ পিন্টু, এস. এম. তানভীর আহমদ,

Dhaka University Institutional Repository

রাবেয়া সুলতানা পপি, সাবিনা ইয়াসমিন সুমা, আফরিন আফরোজ অভি, ফারিহা চৌধুরী পান্না, জাকিয়া সুলতানা শান্তা, ড. আহম্মেদ শরীফ (রনি), খন্দকার জামিলুর রহমান, নাহিদুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, শাহেদ মাহমুদ ও মো. আকতার হোসেনের কথা। যারা সকল সময় গবেষণা কর্মের খোঁজ নিতেন ও কাজের অগ্রগতি জানতে চাইতেন। এখানে যার কথা না বললেই নয় সে আমার আমেরিকা প্রবাসী বন্ধু নূর ই আলম শাহেদ। আমি পিএইচডি গবেষণা করছি শুনে আমার জন্য একটি ল্যাপটপ উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেয়। তাঁর এই উপহারের কারণে আমার গবেষণা কর্মটি বিক্ষিপ্তভাবে না করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করে কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। আরো একজনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি বন্ধু আসমা বেগম। ইতিহাস চর্চা ও আমার গবেষণা কাজের প্রতি তাঁর নিবিড় আগ্রহের কারণে অনেক প্রয়োজনীয় বইয়ের চাহিদা পূরণ করেছেন। পাশাপাশি নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করার জন্য সবসময় অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি অনুজ মিজান হাসান ও মিরাজ হাসান, ভগ্নিপতি রাহাগীর আশরাফী ও জাকির হোসেন, বড় বোন কামরুন নাহার, খালেদা আক্তার ও লুৎফুন নাহার, ছোট বোন শাহেলা জাহান সোনিয়া ও সালমা আক্তার এর প্রতি। কৃতজ্ঞ আমার ভাগ্নে-ভাগ্নী রিদওয়ানা আশরাফী ঋতু, ইকরামুল কবির, হাবিবুল্লাহ শুভ, আমানুল্লাহ শাওন, ভাতুস্পুত্র ফরহাদ হাসান জিসান ও জারিফ হাসান রিয়ান এর প্রতি। বিশেষ করে শুভ ও শাওন দুই ভাই আমার গবেষণা কর্মের জন্য নেওয়া সাক্ষাৎকারগুলো স্বউদ্যোগী হয়ে শ্রুতিলেখনে সহায়তা করেছে।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি যার নিকট অনেক বেশি ঋণী তিনি আমার সহধর্মিণী রেহানা পারভীন। যিনি আমার গবেষণাকর্মের প্রয়োজনে অনেক বই সংগ্রহ করে দিয়েছেন, প্রয়োজনে ফটোকপি কিংবা ছবি তুলে নিয়ে এসেছেন। এমনকি গবেষণাকর্মের বিভিন্ন অংশ পাঠ করে সুচিন্তিত পরামর্শ ও মতামত দিয়েছেন। একই সঙ্গে কূটনীতিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রেও আমার সহযোগী হিসেবে নিরলসভাবে সহযোগিতা করেছেন। নিজে একা সংসারের কাজ সামলে নিয়ে গবেষণাকর্মটি তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য সবসময় অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

গবেষণা কাজে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। এগুলো হলো বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভাস ও গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, ভাষা শহিদ আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা, বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমি গ্রন্থাগার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্রন্থাগার, দৈনিক প্রথম আলোর গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ প্রভৃতি। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজনে আমি ২০১৯ সালের ৩০ জুন থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত ভারতের কলকাতার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কাজ করেছি। এগুলোর মধ্যে ছিল কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের তারকনাথ দাস রিসার্চ সেন্টার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সাউথ এ্যান্ড সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ। এসব গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। যারা আমাকে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অবাধ সুযোগ করে দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী বাঙালি কূটনীতিকদের প্রতি, যারা আমাকে তাঁদের জীবনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সম্পর্কে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁদের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে আমার গবেষণা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁরা সবাই আশা করেছেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চায় একটি নতুন বিষয় হিসেবে আমার এ গবেষণাকর্ম সংযোজন হবে। যারা আমাকে সাক্ষাৎকার দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন- এ এম এ মুহিত, মহিউদ্দিন আহমদ, মহিউদ্দিন আহমেদ জায়গীরদার, কমর রহীম, আকবর লূৎফুল মতিন, ওয়ালিউর রহমান, আমজাদুল হক, বিমান মল্লিক, আবুল কাশেম চৌধুরী, রাজিউল হাসান রঞ্জু প্রমুখ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর অর্থায়নে প্রবর্তিত 'বঙ্গবন্ধু পিএইচডি ছাত্র বৃত্তি' প্রদানের জন্য আমাকে মনোনীত করায় বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বঙ্গবন্ধু পিএইচডি ছাত্র বৃত্তি সংক্রান্ত ট্রাস্টি বোর্ডের আহবায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, রেজিস্ট্রার মো. এনামুজ্জামান ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর পরিচালক (কল্যাণ) এর প্রতি। আমার গবেষণা কাজের জন্য আর্থিকভাবে সহযোগিতা করায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিসন্দর্ভ রচনা সম্পন্ন করতে পেরেছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃপক্ষকে যারা আমার গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য একটি থোক বরাদ্দ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

পিএইচডি সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজে সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ, ইতিহাস বিভাগ, পিএইচডি সেকশন ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার বাবা মরহুম মো. হাছান আলী ও মা মিসেস পিয়ারা বেগম এবং শ্বশুর-শাশুড়ি বেলায়েত হোসেন ও বুলবুল বেগমের প্রতি। বিশেষ করে আমার মা সবসময় জানতে চাইতেন আমার পিএইচডি গবেষণা কবে শেষ হবে। বাবা-মা ও শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের ঋণ অপরিশোধযোগ্য।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও কূটনীতিক ইতিহাস চর্চায় যৎসামান্যও যদি সহায়তা করে তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। যতদূর সম্ভব অভিসন্দর্ভটি ত্রুটিহীনভাবে উপস্থাপন করার সবসময় চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি, মুদ্রণ জনিত ভুল থাকে তার ব্যর্থতার দায় একান্তই আমার।

মোশারফ হোসেন
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মে ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় বিন্যাস

অধ্যায় শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায় এক: ভূমিকা	**১০**
অধ্যায় দুই: মুজিবনগর সরকার গঠন ও কূটনীতিক তৎপরতা	**৩২**
অধ্যায় তিন: মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও পাকিস্তান দূতাবাসে নিযুক্ত বাঙালি কূটনীতিকদের অংশগ্রহণ	**৯৯**
অধ্যায় চার: মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বাঙালি কূটনীতিকদের কর্মতৎপরতা	**২৪৭**
অধ্যায় পাঁচ: মুজিবনগর সরকার থেকে বহির্বিশ্বে প্রেরিত বাঙালি কূটনীতিক প্রতিনিধিদের কর্মতৎপরতা	**৩৪৫**
অধ্যায় ছয়: উপসংহার	**৪১২**
পরিশিষ্ট	**৪১৮**
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	**৪৭৪**

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় এক
ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি জনযুদ্ধ। স্বাভাবিকভাবেই এই যুদ্ধে রাষ্ট্র-সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অবদান থাকবে। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম একটি ক্ষেত্র কূটনৈতিক জগত। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কূটনৈতিক জগতের আওতা এবং গভীরতা ব্যাপক। যুদ্ধ এবং শান্তিকালীন কূটনীতিক তৎপরতার মাধ্যমে নানান সমস্যা ও তার সমাধানের পথ সন্ধান করা সম্ভব। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার এ দিকটি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুজিবনগর সরকার সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক তৎপরতার একটি বিশেষ দিক ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাকিস্তান দূতাবাসে সেসব বাঙালি কূটনীতিক ছিলেন তাদের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত করা। অর্থাৎ তারা যেন পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে এ মর্মে মুজিবনগর সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অপরদিকে পাকিস্তানি দূতাবাসগুলোতে কর্মরত এসব বাঙালিদের অনেকেই পূর্ব থেকেই ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ। ফলে তারাও পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উপায় অনুসন্ধান করছিল। এ দ্বিবিধ অবস্থার মাঝে বড় বাধা ছিল তাদের অবস্থানকারী রাষ্ট্র। একটি ভিন্ন রাষ্ট্রে বসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা হলে এসব কূটনীতিকগণ তাদের পরিবারসহ আর্থ-সামাজিক এবং নিরাপত্তা জনিত সমস্যায় পতিত হবেন। এ সবকিছু জানার পরেও বাঙালি কূটনীতিকরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যোগদান করেন।

বাঙালি কূটনীতিকগণ উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা ও সমস্যাসমূহ অতিক্রম করতে মুজিবনগর সরকারের নিকট থেকে কিছুটা সহায়তা লাভ করেছিল। বলা বাহুল্য যে, মুজিবনগর সরকার একটি প্রবাসী সরকার এবং নানারকম আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত ছিল। ফলে তার পক্ষে কূটনীতিকদের সার্বিক সহায়তা দেওয়া সম্ভব ছিল না।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পূর্ব বাংলায় শুরু হয় বাঙালি নিধনযজ্ঞ। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রাম। অতীতের প্রতিটি আন্দোলনের ন্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ অংশ নেয়। তবে মুক্তিযুদ্ধে একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই প্রথম দেশের বাইরে অবস্থানরত প্রবাসী বাঙালিরাও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এসব প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে অনেকে কর্মসূত্রে সেখানে বসবাস করতেন। আবার কেউ শিক্ষা ও অন্যান্য কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। কর্মসূত্রে যেসব বাঙালি দেশের বাইরে ছিলেন তাদের একটি অংশ ছিলেন বিদেশে পাকিস্তানের দূতাবাসে নিযুক্ত কূটনীতিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী। তাদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য পোষণ করেছেন। সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এমন একটি সময়ে যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। সত্তর দশকের সূচনায় দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিগত প্রায় আড়াই দশকের স্নায়ুযুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পাচ্ছিল। অপরদিকে বিশ্ব রাজনীতির আরো বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, দুই সমাজতান্ত্রিক শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও

Dhaka University Institutional Repository

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্বের পরিণতিতে পারস্পরিক সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ও বিশ্বের তৃতীয় শক্তি হিসেবে চীনের আত্মপ্রকাশ। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এমনি প্রেক্ষাপটে ২৬ মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। বিশ্বের বড় ও ছোট বেশ কিছু দেশ এই যুদ্ধের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে পড়ে। এসব দেশের নীতি ও কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রবাহকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। সাধারণত দু'ধরনের প্রেক্ষাপটে বাইরের শক্তি বিশ্বের কোনো এক অঞ্চলের সমস্যা বা সংকটের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। প্রথমত, বাইরের শক্তির কাছে অঞ্চলটির ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়। দ্বিতীয়ত, এমনি তাৎপর্যের পাশাপাশি যদি সংকটকালে সেই বিশেষ অঞ্চলের দেশ বা দেশসমূহ বাইরের শক্তিকে সমস্যা বা সংকট সমাধানের জন্যে বা কোনো এক পক্ষে অংশগ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ জানায়।[১] বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় মধ্যপ্রাচ্য বা দূরপ্রাচ্যের মতো না হলেও অন্তত স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তার অন্যতম প্রমাণ মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে বিভিন্ন শক্তির প্রতিক্রিয়া ও নীতি। অবশ্য কোনো শক্তিই নিছক আদর্শগত বা মানবিক প্রণোদনার কারণে মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেনি বা বিরোধিতা করেনি। সব কিছুর মূলে ছিল প্রত্যেক শক্তির নিজস্ব স্বার্থসংশ্লিষ্ট চিন্তা-চেতনা।

সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তৎকালীন বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কেননা মুক্তিযুদ্ধ এমন এক সময়ে শুরু হয়েছিল যখন আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও তৎকালীন দুটি পরাশক্তির মধ্যে বিদ্যমান স্নায়ুযুদ্ধের একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন আসন্ন হয়ে ওঠেছিল। যার কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অনেকাংশেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু বাঙালি জাতির পাকিস্তানি শাসনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়ার এ প্রচেষ্টাকে স্বাধীনতা যুদ্ধ নাকি মুক্তিযুদ্ধ বলা হবে তা নিয়ে বিতর্কের অবতারণা করা হয়। এক্ষেত্রে সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের মন্তব্য ছিল- 'তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণে আমাদের একাত্তরের যুদ্ধটি ছিল সামগ্রিক অর্থে মুক্তির, যার অংশমাত্র ছিল স্বাধীনতা। স্বাধীনতা একটি মাইক্রো কনসেপ্ট; বিপরীতে মুক্তি ম্যাক্রো কনসেপ্ট। শত্রুমুক্ত দেশ স্বাধীন হলেও সার্বিক অর্থে শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত হবার প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ। একাত্তরে আমরা তাৎক্ষণিক স্বাধীনতা ও সুদূরপ্রসারী মুক্তির লক্ষ্যেই যুদ্ধ করেছিলাম। সুতরাং যুদ্ধটিকে শুধু স্বাধীনতা বললে এর প্রণোদনা চেতনাকে খাটো করে দেখা হয়, যা অনুচিত।'[২] তাই সংকীর্ণ অর্থে যদি ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে ১৯৭১ সালের যুদ্ধটি ছিল পাকিস্তানি শাসন থেকে স্বাধীন হওয়া। কিন্তু ব্যাপক অর্থে বোঝা যায় ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকে বাঙালি জাতির ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার যে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম তা পরিপূর্ণতা পেয়েছে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এ কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালের যুদ্ধটি ছিল বাঙালি জাতির জন্য মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের একদিকে দেশের অভ্যন্তরে রণাঙ্গনে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। অপরদিকে বিশ্বব্যাপী প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার লড়াই করতে হয়েছে। তাই বলা যায়

[১] সালাহ্উদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭। পৃ. ৩৮৩

[২] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎশক্তিবর্গের ভূমিকা*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৬। পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের দুটি বৃহৎ ক্ষেত্র ছিল, একটি দেশের অভ্যন্তরে রণাঙ্গনে যেখানে যুদ্ধ করেছে মুক্তিযোদ্ধারা। তারা গেরিলা যুদ্ধ ও সম্মুখ যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীকে মোকাবিলা করেছে। অন্য একটি পক্ষ যুদ্ধ করেছে দেশের বাইরে। যারা বাঙালি কিন্তু পেশাগত কারণে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। তাদের মধ্যে যেমন ছিলেন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি তেমনি ছিলেন বহির্বিশ্বে পাকিস্তান দূতাবাসে নিযুক্ত কূটনীতিকগণ। তাদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সংবাদ জানা মাত্রই পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বহির্বিশ্বে কাজ করেন। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগকারী এসব বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা। এখানে আরেকটি বিষয় সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। কোন কূটনীতিকদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে যে সকল কূটনীতিকগণ বাঙালি হিসেবে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন তাদের ভূমিকা আলোচনায় এসেছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনার উদ্দেশ্য

মার্চের শুরু থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকেই পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ এসব ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে শুরু করেন। ভারতের পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণার ক্ষেত্রে ভারতের সম্পৃক্ততা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনের ৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ডেপুটি হাইকমিশনার এম. হোসেন আলী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের একদিন পরেই ডেপুটি হাইকমিশন ভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। পুরো একাত্তর জুড়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে কর্মরত তিনজন রাষ্ট্রদূত সহ ১১৫ জন বাঙালি কূটনীতিক কর্মকর্তা-কর্মচারী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। কূটনীতিকদের বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বনের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগকারী কূটনীতিকদের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা, বিভিন্ন বিষয়ে ভারত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করে। এই কূটনীতিকদের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ও হংকং এ কূটনীতিক তৎপরতা চালায়। কূটনীতিকদের কূটনীতিক কর্মতৎপরতা চালানোর লক্ষ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা। যাতে বিদেশি রাষ্ট্রনায়করা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে এগিয়ে আসে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার আন্দোলনকে সমর্থন করায় নিক্সন প্রশাসন ইসলামাবাদকে সাহায্যের জন্য চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ব্যস্ত ছিল যাতে মস্কোকে কোনঠাসা করা যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশে যে গণহত্যা চলছিল সে বিষয়ে মার্কিন প্রশাসন সম্পূর্ণ অবহেলা প্রদর্শন করে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকলেও মার্কিন সরকারের সরাসরি বিরোধিতার কারণে তারা বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিতে পারেনি। আরব বিশ্ব সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের ভাঙনের ব্যাপারটি মানতে চায়নি। চীনের মতো পরাশক্তিও পাকিস্তানকে সমর্থন করে। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার ভারত ও ভূটান ছাড়া বাকি রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশকে সমর্থন

দেয়নি। নব্য স্বাধীন এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোর ধারণা ছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ফসল হচ্ছে দ্বিপক্ষীয় এই যুদ্ধ। এছাড়া অনেকের দৃঢ় সন্দেহ ছিল বায়াফ্রা যুদ্ধের মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামও ব্যর্থ হবে। বাংলাদেশ নিয়ে সহানুভূতিশীল দেশগুলোর মধ্যে নানা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল। কূটনীতিকদের প্রধান কাজ ছিল ঐসব দেশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দ্বিধা ও সংশয়ের অবসান ঘটানো। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ জুড়ে যে গণহত্যা চলছিল, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছিল তা তুলে ধরা এবং পাকিস্তানের সকল সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করা। তৃতীয়ত, যে সকল সহানুভূতিশীল দেশ ছিল তাদের সমর্থন বজায় রাখা ও স্বীকৃতি দিতে উৎসাহিত করা। চতুর্থত, পাকিস্তানর কারাগারে বন্দি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি আদায়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের রয়েছে নানামাত্রিক ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে অদ্যাবধি বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি সুবৃহৎ পরিসর যার বিপুল অংশ এখনও অনুদঘাটিত। বিশ্ব পরিমন্ডলে কূটনীতিকদের কর্মপরিধি ব্যাপকভাবে গবেষণার দাবি রাখে। তারা রণক্ষেত্রের বাইরে বিদেশের মাটিতে বসে দেশের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। নিজের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও নিজ মাতৃভূমির জন্য, লোভনীয় চাকরির মায়া ত্যাগ করে বিদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে দায়িত্বরত বাঙালি কূটনীতিকগণ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছেন। বাংলাদেশের সরকার ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। তারা শুধু আনুগত্য প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ করেননি, দেশের প্রকৃত অবস্থা বিশ্বের কাছে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন ও নিজেরা সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। এসব বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা কর্মের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। যা হয়েছে তা ছিটেফোঁটা। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এখন পর্যন্ত দেশে-বিদেশে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব গ্রন্থের বেশ কয়েকটিতে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের কর্মকাণ্ড নিয়ে যৎসামান্য তথ্য রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এসব গ্রন্থগুলোতে যেভাবে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন ছিল বাস্তবিক অর্থে তা হয়নি। এসব বাঙালি কূটনীতিকরা কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, কোন প্রেক্ষিতে নিজের জীবন ও পরিবারের সকল সদস্যের জীবন বিপন্ন করে, কেউবা পালিয়ে যাওয়ার সময় আহত হয়েও দেশের প্রতি ভালবাসার কারণে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাই এ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা প্রয়োজন রয়েছে। আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা’।

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো:

১. মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের কর্মতৎপরতা মূল্যায়ন করা;
২. যে সকল বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছেন তাদের অবস্থান তুলে ধরা;
৩. মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে বাঙালি কূটনীতিকদের সম্পর্ক ও কার্যক্রম মূল্যায়ন করা;
৪. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বাঙালি কূটনীতিকগণ বিদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যে সম্পর্ক তৈরি করেছে এবং কর্মতৎপরতা চালিয়েছে সেসব মূল্যায়ন করা;

৫. পেশায় কূটনীতিক না হয়েও যোগ্য ও দক্ষ কূটনীতিকের দায়িত্ব পালনকারী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা মূল্যায়ন করা;
৬. সর্বোপরি অসহযোগ আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত ঘটনা, মুজিবনগর সরকার গঠন, মুক্তিযুদ্ধকে গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে যে সকল অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

ভূমিকা অধ্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা শীর্ষক এখন পর্যন্ত যে সকল গবেষণা কর্ম হয়েছে সেগুলো মূল্যায়ন করা হয়েছে। এসব গবেষণা কর্মের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, সীমাবদ্ধতা, অভিসন্দর্ভ রচনার উৎসেরও মূল্যায়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে তুলে করা হয়েছে কেন এই বিষয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করা হলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মুজিবনগর সরকার গঠন ও কূটনীতিক তৎপরতা। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। মুজিবনগর সরকারের মোট ১২টি মন্ত্রণালয় ছিল। মুজিবনগর সরকার শপথ নেওয়ার পর শুরু থেকেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন দেশে কূটনীতিক তৎপরতা চালানো হয়। মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালির প্রতি বিশ্বব্যাপী যে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছিল বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক তৎপরতার ফল। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মিশন স্থাপন, কূটনীতিক তৎপরতা, প্রতিনিধি প্রেরণ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন লাভের চেষ্টা, বিদেশে তহবিল সংগ্রহ ইত্যাদি ছিল বহির্বিশ্বে তৎপরতার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কী ঘটছে তা তুলে ধরার ক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকার থেকে প্রেরিত কূটনীতিকরা জোরালো ভূমিকা পালন করেছেন। তারা বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করতে পেরেছেন যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যা ঘটছে তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়। এমনকি সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধুর বিচারের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে জনমত গড়ে ওঠেছিল সে জনমতের চাপে পাকিস্তানের সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রেও মুজিবনগর সরকারের প্রেরিত কূটনীতিকবৃন্দ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এ অধ্যায়ে মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রেক্ষাপট, মুজিবনগর সরকার গঠন ও প্রধানমন্ত্রীত্ব নিয়ে বিতর্ক, মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ ও সরকার কাঠামো, মুজিবনগর সরকারের নামকরণের ব্যাখ্যা, মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক তৎপরতা ও কর্মপরিকল্পনা, মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক তৎপরতার সাফল্য এবং মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক উদ্যোগের গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও পাকিস্তান দূতাবাসে নিযুক্ত বাঙালি কূটনীতিকদের অংশগ্রহণ। যে কোনো সরকারি প্রশাসনিক স্তরে সবচেয়ে লোভনীয় চাকরি হচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকরি। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যে হারে বাঙালিদের চাকরি পাওয়ার কথা ছিল সে হারে তারা নিয়োগ পায়নি। এক্ষেত্রে বাঙালিরা বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে। তারপরও বাঙালি কূটনীতিকগণ নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার মাধ্যমে পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিজেদের

অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পর থেকে তারা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে তা কূটনীতিক অঙ্গনে বসে তারাও প্রত্যক্ষ করেছেন। তাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে এবং এর ভিত্তিতেই বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন দেশের জন্ম হবে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকরিতে নিযুক্ত থাকলেও প্রতি মুহূর্তে তারা সজাগ ছিলেন পূর্ব বাংলার রাজনীতির প্রতি। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয়দফা কে কেন্দ্র করে পরবর্তী আন্দোলনগুলোর ব্যাপারে তারা বেশি আগ্রহী ছিলেন। বাঙালি হওয়ায় এসব আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ততার তাগিদ অনুভব করতেন। কিন্তু বিদেশ বিভূঁইয়ে দেশে তা সম্ভব ছিল না। দেশের জন্য নিজেরা কিছু করবেন এ প্রয়োজন থেকে গোপনে তৎপরতা শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে তাদের এ কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল কর্মরত দূতাবাসের বাঙালি সহকর্মী এবং অবস্থানরত দেশের বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে। প্রত্যেক কূটনীতিক দেশপ্রেমে এতটাই উজ্জীবিত ছিলেন যে, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তারা অংশ নেওয়ার জন্য নিজেদের মর্যাদাশীল চাকরি ত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। কেউ দ্রুত তাদের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ঘটায়। আবার কেউ পারিপার্শ্বিক নানা কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করেন। তারপরও মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে ৩৮ জন বাঙালি কূটনীতিকের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যা বিশ্বের কূটনীতিক ইতিহাসেও নজিরবিহীন। তারা মুজিবনগর সরকারের আহ্বানে বাংলাদেশের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং সক্রিয়ভাবে বিশ্বের নানা প্রান্তে কাজ শুরু করেন। আলোচ্য অধ্যায়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার বৈষম্য, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ সূচনা ও পাকিস্তান দূতাবাসে বাঙালি কূটনীতিকদের অবস্থান, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তান দূতাবাসগুলোর অভ্যন্তরীণ চিত্র, মুজিবনগর সরকার কর্তৃক বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তানের আনুগত্য পরিবর্তনের আহ্বান, বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ ও তাদের প্রতিক্রিয়া, পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ পরবর্তী বাঙালি কূটনীতিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বাঙালি কূটনীতিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর পাকিস্তানিদের অত্যাচার-নির্যাতন এবং বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগে বিশ্ব গণমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া তথ্য-উপাত্ত সহ আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বাঙালি কূটনীতিকদের কর্মতৎপরতা। মুজিবনগর সরকার গঠন করার পর বিদেশে পাকিস্তানের বিভিন্ন দূতাবাসে নিযুক্ত বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার আহ্বান জানানো হয়। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এপ্রিল মাস থেকে পাকিস্তান দূতাবাসের অনেক বাঙালি পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন। ৬ এপ্রিল দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব কে এম শিহাবুদ্দিন পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করে প্রথম বিদ্রোহ করেন। ১৮ এপ্রিল কলকাতাস্থ পাকিস্তান মিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার এম. হোসেন আলীসহ তাঁর ৬৫ জন সহকর্মী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। বিদেশে কলকাতায় প্রথম বাংলাদেশের দূতাবাস স্থাপন করা হয়। ৩০ জুন ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের ইকনমিক কাউন্সিলর আবুল মাল আবদুল মুহিত, ৪ আগস্ট নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের উপ স্থায়ী প্রতিনিধি এস. আনোয়ারুল করিম, ওয়াশিংটনের মিনিস্টার এনায়েত করিম, কাউন্সিলর শাহ এ এস এম কিবরিয়াসহ ওয়াশিংটনে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাস ও নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের দপ্তরে পাকিস্তান মিশনের মোট ১৫ জন বাঙালি কূটনীতিক

একযোগে পদত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ৫ আগস্ট বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের ডিরেক্টর অব অডিট ও একাউন্টস আকবর লুৎফুল মতিন, ম্যানিলায় নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নীসহ ১৪ জন কূটনীতিক, ১৯ আগস্ট ইরাকের রাষ্ট্রদূত এ এফ এম আবুল ফতেহ, নাইজেরিয়ায় নিয়োজিত কূটনীতিক মহিউদ্দিন আহমেদ জায়গীরদার ১৩ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেন। ৪ অক্টোবর নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী প্রকাশ্যে বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগদান করেন। লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের প্রথম সচিব রেজাউল করিম, আর্জেন্টিনায় পাকিস্তান দূতাবাসের নিয়োজিত বাঙালি রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমিন ১১ অক্টোবর, সুইজারল্যান্ডের পাকিস্তানি দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব ওয়ালিউর রহমান পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেন। এভাবে মুক্তিযুদ্ধকালে প্রায় ৩৮ জন উচ্চপদস্থ বাঙালি কর্মকর্তা পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। এর বাইরেও দূতাবাসে নিযুক্ত অনেক দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীও পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছেন। সকলেই নিজ অবস্থান থেকে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেছেন। পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং বাংলাদেশ মিশনে যোগদান বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়িয়ে দেয়। এসব বাঙালি কূটনীতিকরা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে নিশ্চুপ হয়ে থাকেননি। তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় দুটি আলোচিত বিষয় গণহত্যা ও শরণার্থী সমস্যা এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রচেষ্টায় উদ্যোগ গ্রহণে বিশ্বের বিভিন্ন সরকার প্রধান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন, বিশ্বের বিভিন্ন পার্লামেন্টে তুলে ধরার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সঠিক চিত্র ও পাকিস্তানের অবস্থান তুলে ধরেছেন। এই অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী বাঙালি কূটনীতিকদের সামগ্রিক কর্মতৎপরতা বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বব্যাপী জনমত প্রচার, পাকিস্তানের অপপ্রচার রোধ, সভা-সমাবেশ আয়োজন ও বিভিন্ন সভা-সংগঠনে বক্তৃতা দান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে প্রচেষ্টা গ্রহণসহ তহবিল সংগ্রহ থেকে শুরু করে মুজিবনগর সরকারের মুখপাত্র হিসেবে যেসব কাজ করেছেন তার বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম মুজিবনগর সরকার থেকে বহির্বিশ্বে প্রেরিত বাঙালি কূটনীতিক প্রতিনিধিদের কর্মতৎপরতা। এ অধ্যায়ে মুজিবনগর সরকার থেকে প্রেরিত বাঙালি প্রতিনিধি দলের বিভিন্ন কর্মতৎপরতা বিশেষ করে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কূটনীতিক কর্ম, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনে তাঁর তৎপরতা, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করা হয়েছে। মুজিবনগর সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্বে বিশেষ দূত নিয়োগ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বহির্বিশ্বের সমর্থন ও জনমত আদায়ের জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের নাগরিক এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইডেন, জাপান ও অন্যান্য কতিপয় প্রভাবশালী দেশের সমর্থন লাভে ঐকান্তিক প্রচেষ্টার উদ্যোগ

নেওয়া হয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য বাংলাদেশের সরকার ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুজিবনগর সরকারের ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ৪৭টি দেশের প্রতিনিধি বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। মে মাসের প্রথম দিকে শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অধ্যাপক রেহমান সোবহান সরকারের নির্দেশে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রতিনিধি। দ্বিতীয় দফায় তিনি সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেন। তাঁর তৎপরতার ফলে জুন মাসে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেন। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে দাতাগোষ্ঠী পাকিস্তানকে নতুন সাহায্যদানে বিরত থাকে। এভাবে মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকার থেকে প্রেরিত কূটনীতিক ও প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেছেন। এসব প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক, আবদুস সামাদ আজাদ, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, মঈদুল হাসান, ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, জ্যোতিঃপাল মহাথের, মোল্লা জালালউদ্দিন, ফণীভূষণ মজুমদার, খায়রুল ইসলাম যশোরী, এ্যাডভোকেট নূরুল কাদির, বেগম নুরজাহান মুরশিদ প্রমুখ। তাদের সকলের কর্মতৎপরতা তথ্য-উপাত্ত সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি মুজিবনগর সরকার ও লন্ডনের এ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে প্রেরিত বাঙালি শ্রমিক ও ছাত্র প্রতিনিধিদের কর্মতৎপরতাও আলোকপাত করা হয়েছে। মুজিবনগর সরকার প্রেরিত এসব প্রতিনিধিদের দাবি ছিল বাংলাদেশের প্রতি যে আচরণ করা হচ্ছে তার যথার্থ সমাধান বের করা। এসব আচরণের প্রত্যুত্তর তারা কোনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসার মাধ্যমে চায়নি। বরং যা গ্রহণযোগ্য ও সঠিক তাই তাদের দাবি ছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে নয় মাস ব্যাপী। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকার সমস্ত রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করেছে। কিন্তু এই ১১টি সেক্টরের বাইরে একটি সেক্টর হিসেবে কাজ করেছে প্রবাসীরা। বহির্বিশ্বে নিযুক্ত পাকিস্তান দূতাবাসের নিযুক্ত বাঙালি কূটনীতিকরা ২৫ মার্চের পর থেকেই বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। এসব বাঙালি কূটনীতিকরা প্রাথমিকভাবে দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে বহির্বিশ্বে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রথমটি হলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরিচালিত গণহত্যা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নেওয়া প্রায় এক কোটি শরণার্থী। পাশাপাশি তারা প্রবাসে যে সকল বাঙালি ছিল তাদেরকে সংগঠিত করতেও ভূমিকা পালন করেছেন। যার ফলে একদিকে বাঙালি কূটনীতিক এবং অন্যদিকে প্রবাসী বাঙালিরা একত্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন। এভাবে প্রবাসে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ একাত্ম হয়েছেন নিজের দেশকে পাকিস্তানি শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য। পুরো নয় মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভের উপসংহারেও এসব বিষয়ের ওপর বিচার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সঙ্গে বাঙালি কূটনীতিকদের মুক্তিযুদ্ধে কেমন ভূমিকা ছিল তা নিজস্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অভিসন্দর্ভের উপসংহার অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা পদ্ধতি

বর্তমান পিএইচডি গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা। এ গবেষণাকর্ম রচনা করতে গিয়ে দুই ধরনের উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। যথা প্রাথমিক উৎস ও দ্বৈতীয়িক উৎস।

গবেষণার প্রাথমিক উৎসের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে-

ক. পাকিস্তান গেজেট;

খ. বাংলাদেশ গেজেট;

গ. বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সরকারি দলিলপত্র;

ঘ. পাকিস্তান সরকারের সংসদীয় বিতর্ক;

ঙ. তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৈনিক ও পাক্ষিক সংবাদপত্র এবং সাময়িকী;

চ. মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করা বাঙালি কূটনীতিকদের সাক্ষাৎকার এবং

চ. বাঙালি কূটনীতিকদের লেখা স্মৃতিকথা, প্রকাশিত পুস্তিকা, লিফলেট, দূতাবাসের চিঠিপত্র।

অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য প্রাথমিক উৎসের পাশাপাশি দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে পাকিস্তান সময়কালীন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধসমূহ।

গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনায় তথ্যের সীমাবদ্ধতা

বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতার কথা আলোচনা না করলেই নয়। বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনায় তথ্য অনুসন্ধানে বাঙালি কূটনীতিকদের মুক্তিযুদ্ধে নানাবিধ অপরিহার্য অবদানের তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু কাজটি মোটেই সহজসাধ্য হয়নি। গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনায় তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখে কাজটিকে এগিয়ে নিতে হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের ক্ষেত্রে একটি প্রসঙ্গ এখানে আলোচনার দাবি রাখে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার জন্য অন্যতম উৎস সরকারিভাবে ১৫ খণ্ডে প্রকাশিত স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র। এই ১৫ খণ্ডের দলিলপত্রে মুক্তিযুদ্ধের নানা তথ্য রয়েছে। কিন্তু দেশের বাইরে প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থান করে যে সকল বাঙালি কূটনীতিকগণ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন তা আলোচনার বাইরে রয়ে গিয়েছে। ১ম-১৪তম খণ্ডে কলকাতা, দিল্লি, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিক কূটনীতিকদের কিছু তথ্য থাকলেও তারা আদৌতে কী কাজ করেছেন সে সম্পর্কে তথ্য অনুপস্থিত। বিশেষ করে বলা যায় যে, দলিলপত্রের ১৫তম খণ্ডটি রচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সংগঠকদের সাক্ষাৎকার ভিত্তিতে। কিন্তু এখানে কোথাও বাঙালি কূটনীতিকদের অর্থাৎ যে ৩৮ জন বাঙালি কূটনীতিক মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস সময়কালে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছেন তাদের কারো কোনো সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়নি। এসব সীমাবদ্ধতা সামনে রেখেই গবেষণা কাজটি এগিয়ে নিতে হয়েছে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য এজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বারস্থ হতে হয়েছে পক্ষ ত্যগকারী যে সকল বাঙালি কূটনীতিক এখনো বেঁচে আছেন তাদের সাক্ষাৎকারের ওপর। তবে এদের মধ্যে

অনেকেই নিজেরাই আগ্রহী হয়ে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তারপরও দুটি সমস্যার কথা না বললেই নয়।

প্রথমত- যে সকল বাঙালি কূটনীতিকগণ মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন তাদের বেশিরভাগের বয়স ছিল ৩০-৪০ এর মধ্যে। অনেকেই ছিলেন বিবাহিত আবার কেউ অবিবাহিত। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম এখন পঞ্চাশ বছর। সে হিসাব অনুযায়ী তাদের অনেকেই বয়সের ভারে ন্যুজ হয়ে পড়েছেন। স্বাভাবিকভাবে তাদের শারীরিক অসুস্থতা, স্মৃতি বিভ্রাট ইত্যাদি ঘটেছে। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে আবার দ্বৈতীয়িক উৎসের আলোকে যাচাই বাছাই করে নেওয়া হয়েছে। আবার এদের অনেকে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবার নিয়ে স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছেন। যার কারণে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করাও সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয়ত- বাঙালি কূটনীতিকদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তথ্য দিতে অনাগ্রহী মনোভাব দেখিয়েছেন। তাদের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করেও ব্যর্থ হয়েছি। এক্ষেত্রে তাদের মনোভাব জানার চেষ্টা করে বোঝা যায় যে, তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু দেশ স্বাধীনের পর তাদের কাঙ্ক্ষিত অনেক কিছুই পূর্ণ হয়নি। তাই তাদের জীবনের গৌরবোজ্জ্বল এ অধ্যায় সম্পর্কে তথ্য প্রদানে তাদের মধ্যে উদাসীনতা দেখা যায়। শুধু যে বাঙালি কূটনীতিকরা করেছেন তা কিন্তু নয়। পাশাপাশি মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন কিংবা মুজিবনগর সরকারের প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এমন অনেক ব্যক্তিও তথ্য প্রদানে আগ্রহ দেখাননি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে এই দুটি সীমাবদ্ধতা ধতর্ব্যের মধ্যে নিয়ে অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ এগিয়ে নিতে হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎসের সহায়ক হিসেবে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে বাঙালি কূটনীতিকদের রচিত স্মৃতিকথাসমূহ থেকে। স্মৃতিকথা গুলো থেকে বাঙালি কূটনীতিকদের কর্মতৎপরতার পাশাপাশি পাকিস্তান দূতাবাসগুলোর অনেক চিত্রও জানা যায়। এরূপ নানাবিধ কারণ এই গবেষণার প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দেয়। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত মুক্তিযুদ্ধের এ ক্ষেত্রটি সম্পর্কে বহু চমকপ্রদ তথ্য উপস্থাপন করে। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অনালোকিত একটি দিকের অবতারণা হয়েছে বর্তমান অভিসন্দর্ভে একথা বলা যায়।

কূটনীতিক এর সংজ্ঞা, পরিচিতি ও ব্যাখ্যা

আলোচ্য অভিসন্দর্ভের বিষয় মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের কর্মতৎপরতা হওয়ায় এখানে স্বল্পপরিসরে কূটনীতিক এর সংজ্ঞা, পরিচিতি ও ব্যাখ্যা আলোচনা করা যেতে পারে। কূটনীতিক কে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, যে সৎ লোকটিকে তার দেশের সরকার মিথ্যা বলার জন্য বিদেশে পাঠান তিনিই কূটনীতিক। আবার অনেকে বলেন, কূটনীতিক মানে মোটা মাইনের গুপ্তচর। দুইটিই অতিশয়োক্তি, কিন্তু দুয়ের মধ্যেই কিছু সত্য আছে। কূটনীতিকের কর্তব্যই হলো- যে দেশে তিনি আছেন সে দেশ সম্পর্কে নিজের সরকারকে ওয়াকিবহাল রাখা এবং পাশাপাশি সে দেশের সরকারকে নিজের দেশের প্রকৃত

অবস্থা জানানো। তিনি একাধারে সংবাদ পরিবেশক ও সংগ্রাহক।[৩] দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ প্রতিনিধি মারফত যে সম্পর্ক রক্ষা করা বা আলোচনা চালানো হয়, তাকেই বলে কূটনীতি বা Diplomacy। এই বিশেষ প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রদূত বা রাষ্ট্রপ্রতিনিধি বলা হয় এবং ক্ষমতানুযায়ী তাদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। এ ছাড়াও কোনো দেশের সরকার নিজ দেশের স্বার্থে অন্য দেশের সরকারের সঙ্গে যেসব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামরিক ও বিবিধ তৎপরতা চালায়, সেগুলোও কূটনীতির অন্তর্ভুক্ত। যেমন, ডলার কূটনীতি, পিংপং কূটনীতি ইত্যাদি। জোট গঠন ও জোটের স্বার্থে পরিচালিত তৎপরতাও কূটনীতির আওতাভুক্ত।[৪]

আভিধানিক অর্থে কূটনীতি হলো অত্যন্ত নিপুণতা ও দক্ষতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা করা। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কোনো রাষ্ট্রই সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। রাষ্ট্রসমুহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের আলাপ-আলোচনাকে কূটনীতিক বলা হয়ে থাকে। স্যার আর্নেস্ট স্যাটো বলেছেন যে, স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সরকারি সম্পর্ক পরিচালনার জন্য যে পদ্ধতি ও কৌশল প্রযুক্ত হয় তা হচ্ছে কূটনীতি।[৫] বিদেশনীতি নির্ধারণে নানারকম সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে। যেমন- প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, আইনসভা ও জনমত। সকলের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা থাকে। কিন্তু নির্ধারিত নীতিকে কার্যকর করার জন্য একজন অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিপুণ ব্যক্তি অপরিহার্য। এই অপরিহার্য দায়িত্ব যিনি পালন করেন তিনিই হলেন কূটনীতিক।[৬] Cambrige English Dictionary অনুযায়ী কূটনীতি হচ্ছে the management of relationships between countries. অপরদিকে কূটনীতিক হচ্ছে involving diplomats or the management of relationships between countries. অথবা an official whose job is to represent one country in another, and who usually works in an embassy.[৭]

কূটনীতি বলতে বৈদেশিক নীতির সার্বিক দিককে বোঝায়। তবে একজন কূটনীতিককে চারটি স্তরে কাজ সম্পন্ন করতে হয়। যেমন-

ক. কূটনীতিক ক্ষমতার আলোকে লক্ষ্য নির্ধারণ;

খ. কূটনীতিক অন্য জাতির ক্ষমতা ও উদ্দেশ্যকে বিচার বিশ্লেষণ;

গ. বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে একে অপরের সঙ্গে কতটুকু তুলনাযোগ্য তা নির্ধারণ;

ঘ. কূটনীতির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যথোপযুক্ত উপায় প্রয়োগ।[৮]

---

[৩] শংকর ঘোষ, ‘কূটনীতিকের কাজে যত চাকচিক্য, তত দায়িত্ব’ শিরোনামে উপসম্পাদকীয়। দৈনিক আনন্দবাজার (কলকাতা), ১৪ আগস্ট ১৯৭১

[৪] হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩। পৃ. ১৩১

[৫] প্রাণ গোবিন্দ দাস, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, কলকাতা: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, নতুন সংস্করণ ১৯৮৯। পৃ. ২১৪

[৬] প্রাণ গোবিন্দ দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬

[৭] https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/diplomat

[৮] Hans, J. Morgenthau, *Political Among Nations*, Revised by Kenneth W. Thomson, New Delhi: Kalyani Publication, 1991. p. 563

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা অনেকগুলো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত। এই রাষ্ট্রগুলোর পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক বিদ্যমান। নিজের স্বার্থেই একটি রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নানাবিধ সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। এই সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যেই প্রতিটি রাষ্ট্র নিজস্ব বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে। এসব নীতি নির্ধারণকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য অর্থাৎ কার্যকর করার জন্য একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। যার মধ্যে রাজনৈতিক যে পদ্ধতিটি বর্তমান তাকে কূটনীতি বা Diplomacy বলে।[৯] বর্তমান বিশ্ব রাষ্ট্রব্যবস্থায় কূটনীতি একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। কূটনীতি ধারণাটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়। এর মূল উদ্দেশ্য দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে সফল করে তোলা। পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা, আলোচনা ও মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে কূটনীতির কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এজন্য জি. আর. ব্যারিজ কূটনীতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন-

> Diplomacy is an essentially political acitivity. Well resourced and skilful, a major ingredient of power. Its chief purpose is to enable states to secure the objectives of their foreign policies without resort to force, propaganda or law.[১০]

কূটনীতি হলো অত্যন্ত নিপুণতা ও দক্ষতার সঙ্গে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ককে পরিচালনা করা। আর যে প্রতিনিধি বা দূত এ সম্পর্ককে পরিচালনা করেন তিনি হচ্ছেন কূটনীতিক। কূটনীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে শান্তিপূর্ণভাবে পররাষ্ট্রনীতি গড়ে তোলা। প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং অন্যান্য প্রয়োজন বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক অবস্থা এবং জাতীয় সম্পদ ও শক্তির প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করে। এই পররাষ্ট্রনীতিকে সার্থক করে তোলা হচ্ছে একজন কূটনীতিকের কাজ।

কূটনীতি শব্দটি যদিও পররাষ্ট্রনীতির সমার্থক নয়, শুধুমাত্র অন্যতম প্রয়োগ পদ্ধতি। সাধারণভাবে এই দুই কার্যকলাপকে পরিপূরক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। আবার রাষ্ট্র যে সকল পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে তার দ্বারা শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা করা যায়। তার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠীরও সুযোগ-সুবিধা অর্জিত হয়। কূটনীতিকে business of communicating between governments হিসেবে বিবেচনা করলে যোগাযোগের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ অনুধাবন করা যায় না। আধুনিক যুগের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আদান-প্রদানের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাতে কূটনীতির প্রয়োগও হচ্ছে। কূটনীতির প্রধান প্রয়োগ দেখা যায় রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ-নিষ্পত্তির সমাধানের সূত্র সন্ধানে এবং দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারণ। এজন্য কূটনীতিকে art of negotiation বা বোঝাপড়ার শিল্প বলা হয়ে থাকে। কূটনীতির মূল লক্ষ্য হলো পরস্পর বিরোধী প্রশ্নগুলো মীমাংসার জন্য বোঝাপড়ার উপযুক্ত একটি অবস্থার সৃষ্টি করা। যিনি এই কাজগুলো সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন তিনি হচ্ছেন কূটনীতিক। কূটনীতিক সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করেন এবং সেগুলো অবলম্বন করে বিরোধ মিটিয়ে

---

[৯] সুলতান মাহমুদ, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি*, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৯। পৃ. ৪৯

[১০] G. R. Berride, *Diplomacy*, London: Palgrave, 2005. p. 1

বা কমিয়ে আনার মনোভাব তৈরি করেন। কূটনীতিক শুধুমাত্র মধ্যস্থতার ভূমিকায় নয়, কিছুটা দরকষাকষির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।[১১]

বিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গিতে কূটনীতি, কূটনীতিক ও কূটনীতিকের কাজ এবং কূটনীতি কেন ব্যর্থ হচ্ছে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জে. ডব্লিউ. বারটন (J. W. Burton) বলেছেন-

> The evolving international system, and the communications aspect of it, is well exemplified by twentieth century changes in diplomacy. In the traditional view, and one expounded by Morgenthau, the objectives of diplomacy are defined in terms of national interest, and are supported by power. The area of discretion is limited to the possibilities of sacrifice of worthless rights for real advantage. Negotiation from strength was the aim. A 'good', that is, successful, diplomat was one who was aware of the view-point of others, not so as to accommodate them, but so as to frustrate them. Diplomatic victory was the achievement of a goal by skillful bargaining supported by power, or alternatively, the skillful employment of the threat of power. Diplomacy was rather narrowly defined as symbolic, legal or political representation of one state at the courts of another.
>
> It is acknowleged that this form of diplomacy has now largely vanished, and the reasons given for 'the decline in diplomacy' is the introduction of new forms of communication, and greater case of travel which decreases the value of local representation and increases the importance of diplomacy at a high political level and at centres such as the United Nation.[১২]

কূটনীতির তিনটি আধুনিক সংজ্ঞা পাওয়া যায় কামাল সিদ্দিকীর গ্রন্থে। তাঁর গ্রন্থের সূত্র অনুযায়ী ভিয়োট্টি ও কুপি (Viotti and Kaupi) এর মতে- Diplomacy as management of international relations by communications to include negotiations, leading to burgain or agreement.

নিকোলসন (Nicholson) এর মতে- Diplomacy is the 'business or art of the diplomat', also highlights diplomacy as the management of international relations by negotiation, i.e, the method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys.

হুইট (White) এর মতে- Diplomacy as a process of communication and negotiation between states and other international actors.[১৩]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে ওয়াকার ও গ্রান্ট একজন কূটনীতিকের পাঁচটি দক্ষতা থাকার কথা উল্লেখ করেছেন[১৪]-

ক. কুটনীতিবিদ হতে হলে শুধু দোষারোপ করলেই হবে না, বহিরাগতদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে হবে,

খ. লক্ষ্যকৃত বা নির্দিষ্ট সরকার বা প্রতিষ্ঠানকে কার্যকরভাবে সামলানোর দক্ষতা থাকতে হবে,

---

[১১] সুলতান মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

[১২] J. W. Burton, *International Relations A General Theory*, Cambrige: University Press, 1967. p. 250

[১৩] Kamal Siddiqui, *Diplomacy and Statecraft*, Dhaka: Academic Press and Publishers Library, Third Edition 2014. pp. 3-4

[১৪] *ibid*. p. 12

গ. আলোচকদের আস্থা অর্জন করা যাতে করে একটা বিশ্বস্ততার সম্পর্ক তৈরি করা যায়,

ঘ. নিজের দেশকে কার্যকর ভাবে উপস্থাপন করা,

ঙ. একজন দক্ষ বহুবিদ্যাবিশারদ হওয়া যেহেতু একজন কূটনীতিবিদকে যে কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য দক্ষ হতে হয়।

আজকের বিশ্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে কূটনীতিকদের কার্যাবলী ও দায়িত্বের ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। তেমনি ব্যাপক পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। কূটনীতিকরা রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি পুরোনো এ ধারণা আজ আর কেউ পোষণ করেন না। রাষ্ট্রনায়কগণ প্রায়ই মিলিত হচ্ছেন, আলোচনা করেছেন এবং রাষ্ট্রসমূহের বিরোধ নিষ্পত্তির পন্থা বের করেছেন। এ ধরনের কূটনীতিকে Personal Diplomacy বলা হয়। আবার রাজধানীতে বসেও রাষ্ট্রনায়কগণ টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধানে চেষ্টা চালাচ্ছেন। ১৯৬২ সালের কিউবা মিসাইল সংকটের সময় ১৯৬৩ সালে মস্কো-ওয়াশিংটনের মধ্যে সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষে সকল সময় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সকল কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনীতিক বিনিময়। এসব কূটনীতিকগণ বিদেশের রাজধানীতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করে থাকেন। তাদের কাজের পরিধি, পদ্ধতি এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় অবশ্য পরিচালিত হয়ে থাকে নিজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে। কাজেই বর্তমান সময়ের এবং পূর্বের মতো নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কূটনীতিকরা কিছু করতে পারেন না। কূটনীতিকদের কাজের সঙ্গে দেশ ও জাতির স্বার্থ জড়িত এবং সে লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করাই কূটনীতিকের দায়িত্ব।

১৯৬১ সালে ভিয়েনায় জাতিসংঘ কূটনৈতিক সম্মেলনের প্রয়োজনীয় ধারার ৩ নং ধারায় কূটনীতিকের কার্যাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে-

the functions of a diplomatic mission consist interalia in:

a. representing the sending state in the receiving states,

b. protecting in the receiving state the interest of the sending state and of its nationals, within the limits permitted by international law,

c. negotiating with the government of the receiving state,

d. ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving state, and reporting thereon to to Government of the sending state,

e. promoting friendly relations between the sending state and the receiving state, and developing their economic, cultural and scientific relations.[১৫]

জন উড এবং জিন সেরেস তাদের বইতে চারটি বিষয়কে কূটনীতিকের কাজের তালিকায় উল্লেখ করেন।[১৬] যথা-

---

[১৫] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ রমজুল হক, কূটনীতিকদের কার্যাবলী ও দায়িত্ব, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি*, *সহায়ক সিরিজ* ১, জুন ১৯৮৫। পৃ. ১০২-১০৯

ক. প্রতিনিধিত্ব (Representation)

খ. সংবাদ জ্ঞাপন (Information)

গ. আলোচনা (Nogociation)

ঘ. স্বার্থ সংরক্ষণ (Protection)

হেন্ডারসন তার বইতে দুটো বিষয়কে কূটনীতিকের কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন- The first commandment of a diplomatist in faithfully to interpret the views of his own Government to the Government to which he is accredited; and the second is like unto it; namely, to explain no less accurately the views and standpoint of the Government of the country in which he is stationed to the Government of his country.[১৭]

রবার্ট হারসন তার বইতে কূটনীতিকের চারটি কাজের কথা উল্লেখ করেছেন-

ক. বিদেশে নিজ দেশকে প্রতিনিধিত্ব করা,

খ. আলোচনা চালিয়ে যাওয়া,

গ. নিজ ও বিদেশি সরকারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন,

ঘ. গণসংযোগের মাধ্যমে বিদেশে নিজ দেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরা।

এছাড়া মনট্রিলের কনকোর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির প্রফেসর পেরিস অর্নোপোলাস মনে করেন যে, পরামর্শ কূটনীতিকের একটি অন্যতম কাজ। তার মতে- Consultation is a well known activity to every diplomat. It is a normal pursuit of officials who wish to wine freiends and influence people. In diplomatic language, consultation means a common examination of an issue by an exchange of opinions, as a result of which the various parties may decide to adopt a more enlightened and accommodating policy towards each other.[১৮]

প্রকাশনা পর্যালোচনা

বর্তমান অভিসন্দর্ভের শিরোনাম সংশ্লিষ্ট কোনো গবেষণাকর্ম বা গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশ হয়নি। তাই অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনেক গ্রন্থ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে যেসব গ্রন্থে এ সংক্রান্ত তথ্য বেশি পাওয়া গিয়েছে বা আলোচনা করা হয়েছে সেসব গ্রন্থগুলোর একটি গ্রন্থতাত্ত্বিক মূল্যায়ন বা প্রকাশনা পর্যালোচনা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

বি বি বিশ্বাস রচিত *একাত্তরে মুজিবনগর* বইটি ১৯৯৪ সালে আগামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ বইয়ে লেখকের স্বদেশ ছেড়ে মুজিবনগর পৌছানোর আদ্যোপান্ত বর্ণনা রয়েছে। এর পাশাপাশি মুজিবনগর সরকারে পৌছানোর পর তাঁর

---

[১৬] মুহাম্মদ রমজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২-১০৯

[১৭] *ওই*

[১৮] *ওই*

কর্মকাণ্ড বিশেষ করে তিনি মুজিবনগর সরকারের কেবিনেট সচিবালয়ে কাজ করতেন। তাই খুব কাছ থেকে মুজিবনগর সরকারের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছেন। তবে এ বইয়ের ৩৩ থেকে ৩৪ পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন ভারতের কলকাতায় পাকিস্তানি দূতাবাসের উপ হাইকমিশনার এম. হোসেন আলী কীভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন তার বর্ণনা। প্রাসঙ্গিকভাবে হোসেন আলী পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর পাকিস্তান সরকার মেহেদী মাসুদ কে কলকাতার পাকিস্তান দূতাবাসের হাইকমিশনার হিসেবে পাঠায়। এক্ষেত্রে লেখক মেহেদী মাসুদের কর্মকাণ্ড ও তার আবেদনে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান দূতাবাসের প্রাক্তন বাঙালি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সওয়াল জবাব অনুষ্ঠানের কথাও উল্লেখ করেছেন। ৬৪ পৃষ্ঠায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার কথা উল্লেখ আছে। এর বাইরে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

শেখ আবদুল মান্নান রচিত *মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান* শিরোনামের বইটি জ্যোৎস্না পাবলিশার্স থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক যুক্তরাজ্যের একজন প্রবাসী বাঙালি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় লন্ডনে যে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল তার একজন সদস্য ছিলেন তিনি। সে হিসেবে তিনি লন্ডনে তথা যুক্তরাজ্যের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে যে ধরনের কর্মকাণ্ড হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রসূত ফল আলোচ্য এ গ্রন্থটি। তাঁর এ গ্রন্থে তিনজন কূটনীতিবিদ শিরোনামে চার পৃষ্ঠার একটি বিবরণ রয়েছে। এ বিবরণে তিনি উল্লেখ করেছেন তিনজন বাঙালি কূটনীতিবিদদের কথা। যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের নিশ্চিত জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য পোষণ করেছেন। এরা হচ্ছেন মহিউদ্দিন আহমদ। মহিউদ্দিন আহমদ ছিলেন লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব। তিনি ১ আগস্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারের জনসভায় যোগ দিয়ে প্রকাশ্যে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করার কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কূটনীতিক ছিলেন ইরাকের রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ। তিনি ইরাক থেকে লন্ডনে এসে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তৃতীয় বাঙালি কূটনীতিবিদ ছিলেন লন্ডনস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের রাজনৈতিক কাউন্সিলর রেজাউল করিম। তিনিও অক্টোবর মাসে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তাদের তিনজনের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের পশ্চাতে ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে এ অধ্যায়ে। এছাড়া পুরো গ্রন্থটিতে ১৮টি অধ্যায় রয়েছে। যার প্রতিটি বিষয় মুক্তিযুদ্ধ।

আবু মো. দেলোয়ার হোসেন রচিত *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুসলিম বিশ্ব* শিরোনামের গ্রন্থটি ২০১৪ সালে সাহিত্য প্রকাশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলো শুরু থেকেই বিরোধিতা করে আসছিল। তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় ও ভারতের অযাচিত হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করে। আটটি অধ্যায়ে এই গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুসলিম বিশ্বের মনোভাব ও নীতি আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের কর্মতৎপরতার কথাও ওঠে এসেছে।

এ এফ সালাহউদ্দীন আহমদ, সুকুমার বিশ্বাস, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ও আবু মো. দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত গ্রন্থ *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নানা প্রসঙ্গ* সাহিত্য প্রকাশ থেকে ২০১৮ সালে পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র আয়োজিত

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধগুলোর সংকলন এ গ্রন্থ। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান দূতাবাস থেকে পদত্যাগকারী দু'জন বাঙালি কূটনীতিক এ এম এ মুহিত ও শাহ এ এম এস কিবরিয়ার রচিত মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিরোনাম প্রবন্ধে সেখানকার বাঙালি কূটনীতিকদের কর্মতৎপরতা ও মুক্তিযুদ্ধ ঘিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি আলোচনায় স্থান পেয়েছে। সালাহউদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত অন্য একটি গ্রন্থ *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১* আগামী প্রকাশনী থেকে ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থে দশটি অধ্যায় রয়েছে। তন্মধ্যে আবদুল মতিন রচিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা, আবুল মাল আবদুল মুহিত রচিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও যুক্তরাষ্ট্র এবং সৈয়দ আনোয়ার হোসেন রচিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বহির্বিশ্বের ভূমিকা শিরোনামের তিনটি অধ্যায়ে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষ করে বাঙালি কূটনীতিকদের কথাও আলোচনা করা হয়েছে। কূটনীতিকদের মধ্যে কে কবে কোন প্রেক্ষিতে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছেন এবং ইউরোপ আমেরিকায় কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে বহির্বিশ্বের রাজনীতির গতিপথ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা-ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের রচনায় স্থান পেয়েছে।

শামসুল হুদা চৌধুরী রচিত *একাত্তরের রণাঙ্গন* গ্রন্থটি ১৯৮৮ সালে আহমদ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তেরোটি পরিচ্ছদে এ গ্রন্থের আলোচনা। তবে তৃতীয় পরিচ্ছদে মুজিবনগর সরকার প্রশাসন কাঠামো, কলকাতা ও দিল্লি মিশন, নিউইয়র্ক মিশন এবং প্রবাসী বাঙালিদের অবদান বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

এ এস এম সামছুল আরেফিন রচিত *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান* শীর্ষক গ্রন্থটি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে প্রথম পর্বে ৩৪-৪৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুজিবনগর সরকার এবং তৃতীয় পর্বে ৩৭৯-৩৮৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তাদের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

আবুল মাল আবদুল মুহিত রচিত *বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব* শিরোনামের গ্রন্থটি ২০০০ সালে সাহিত্য প্রকাশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে প্রবাসে বাংলাদেশ সরকার এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উদ্যোগ এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শিরোনামে তিনটি অধ্যায়ে মুজিবনগর সরকার গঠন ও প্রশাসনিক কাঠামো, মুজিবনগর সরকারের গৃহীত কূটনীতিক উদ্যোগ আলোচনা করা হয়েছে।

আবু সাইয়িদ রচিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা: কূটনৈতিক যুদ্ধ* শিরোনামের গ্রন্থটি লেখকের পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। এটি ২০১৪ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিকা ও উপসংহার সহ আটটি অধ্যায়ে গ্রন্থের আলোচনা করা হয়েছে। মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক কার্যক্রম, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা, বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে বিশ্ব কূটনীতি, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের কূটনৈতিক ভূমিকা, মুক্তিযুদ্ধে মুসলিম দেশগুলোর কূটনৈতিক তৎপরতা, জাতিসংঘে বাংলাদেশ সম্পর্কিত কূটনৈতিক তৎপরতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা: চতুর্ভুজ কূটনীতি শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার প্রসঙ্গক্রমে নানা প্রান্তের বাঙালি কূটনীতিকদের নাম ও পরিচয় এসেছে কিন্তু তাদের

কর্মতৎপরতার বর্ণনা অনুপস্থিত। অন্যদিক থেকে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে বিশ্বের যে কূটনৈতিক উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তা তুলে ধরা হয়েছে।

আবুল মাল আবদুল মুহিত এর স্মৃতিকথা *স্মৃতি অম্লান* **১৯৭১** গ্রন্থটি আগামী প্রকাশনী থেকে **১৯৯৬** সালে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের ৭০ পৃষ্ঠা থেকে **১৬৫** পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমেরিকায় লেখকের বিভিন্ন কর্মের স্মৃতির বর্ণনা রয়েছে। আবুল মাল আবদুল মুহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাসের একজন বাঙালি কূটনীতিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি এর পক্ষে কাজ করার তাগিদ অনুভব করেন। এ তাগিদ থেকে জুলাই মাসে পাকিস্তান সরকারের চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর এ স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের বিবরণের পাশাপাশি তাদের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বর্ণনা রয়েছে। অধ্যাপক এ আর মল্লিক রচিত স্মৃতিকথা *আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম* আগামী প্রকাশনী থেকে **১৯৯৫** সালে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের ৬২-**১১৭** পৃষ্ঠায় রয়েছে লেখকের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির বর্ণনায় লেখক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলকাতায় মুজিবনগর সরকার, দিল্লি, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। নিজের কাজের পাশাপাশি আলোচনায় বর্ণনা করেছেন বাঙালি কূটনীতিক, মুজিবনগর সরকারের অন্যান্য কূটনীতিক প্রতিনিধি ও ব্যক্তিবর্গের কথা। হায়দার আলী খান রচিত স্মৃতিকথা *মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি প্রবাসে আলোর গান* প্রথমা প্রকাশন থেকে ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের নিউইয়র্কের রাজপথে বাংলাদেশের যুদ্ধ শিরোনাম অধ্যায়ে নিউইয়র্কের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঘটনা বিশেষ করে বাঙালি কূটনীতিক এ এইচ মাহমুদ আলী, আবুল মাল আবদুল মুহিত এর কার্যক্রমের বর্ণনা রয়েছে। আনিসুজ্জামানের *আমার একাত্তর* গ্রন্থটি সাহিত্য প্রকাশ থেকে **১৯৯৭** সালে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর এ স্মৃতিকথায় কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলাদেশের কূটনীতিক কার্যক্রম বিশেষ করে হোসেন আলীর কথা ওঠে এসেছে। মাহমুদ শাহ কোরেশী রচিত স্মৃতিকথা *মুক্তিযুদ্ধের মিশন আমার জীবন* গ্রন্থটি সূচয়নী পাবলিশার্স থেকে ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কূটনীতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে। সিরিয়া ও লেবাননে যে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মাহমুদ শাহ কোরেশী। এ গ্রন্থে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তারা কী ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আবু সাঈদ চৌধুরী রচিত স্মৃতিকথা *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে **১৯৯০** সালে প্রকাশিত হয়েছে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছিলেন তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করেন। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর তাঁকে ইউরোপ ও আমেরিকায় বাংলাদেশে সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি মূলত ইংল্যান্ডে অবস্থান করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণার কাজে গিয়েছেন। এমনকি

জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের দলনেতা হিসেবেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর এ স্মৃতিকথায় যেমন মুক্তিযুদ্ধকালীন নিজের বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা এসেছে, তেমনি ইউরোপ আমেরিকার বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ ও বাংলাদেশের সমর্থনে গৃহীত তাদের নানাবিধ কর্মতৎপরতার বর্ণনা এসেছে। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা রচনায় যা একটি অন্যতম সহায়ক উৎস হিসেবে বিবেচিত। আবুল ফজল শামসুজ্জামান রচিত স্মৃতিকথা *জাকার্তায় একাত্তরের ঢেউ* গ্রন্থটি ১৯৮৪ সালে ত্রিভুজ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আবুল ফজল শামসুজ্জামান মুক্তিযুদ্ধকালীন ইন্দোনেশিয়ার রাজধানীতে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। তাঁর এ স্মৃতিকথায় ইন্দোনেশিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে গৃহীত নানা কার্যক্রমের বর্ণনা রয়েছে। পাশাপাশি তিনি বর্ণনা করেছেন কেন ইন্দোনেশিয়ার বাঙালি কূটনীতিকরা মুজিবনগর সরকারের আহ্বান সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে পারেননি।

মঈদুল হাসান রচিত *মূলধারা '৭১* গ্রন্থটি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অপর গ্রন্থ *উপধারা একাত্তর মার্চ-এপ্রিল* প্রথমা প্রকাশন থেকে ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে। মঈদুল হাসান মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দুটি গ্রন্থের বর্ণনায় মুজিবনগর সরকার গঠন প্রক্রিয়া, মুজিবনগর সরকার গঠন নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ তুলে ধরেছেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম রচিত স্মৃতিকথা *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি* ১৯৯১ সালে কাগজ প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আমীর-উল ইসলাম মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর এ স্মৃতিকথায় রয়েছে মুজিবনগর সরকার গঠন সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য, কলকাতাস্থ বাঙালি কূটনীতিক এম হোসেন আলীকে বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসার তথ্য ও প্রধানমন্ত্রীর দূত হিসেবে দিল্লিতে তাঁর কর্মতৎপরতা। আবদুল হক রচিত *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশ* ১৯৫৩-'৯৩ গ্রন্থটি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এটি যেহেতু লেখকের রোজনামচা তাই মুক্তিযুদ্ধকালীন তারিখ উল্লেখ করে বিশ্বের কোথায় কী ঘটেছে তা উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে বাঙালি কূটনীতিকরা যে তারিখগুলোতে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছেন সেসব তারিখে তাদের সম্পর্কে তথ্য উল্লেখ করেছেন। ফারুক আজিজ খান রচিত *বসন্ত* ১৯৭১ গ্রন্থটি প্রথমা প্রকাশন থেকে ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক মুজিবনগর সরকারের কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাই তিনি মুক্তিযুদ্ধকে মুজিবনগর সরকারের কেন্দ্র থেকে দেখেছেন। তাঁর এ বর্ণনায় ওঠে এসেছে মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম, কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলাদেশ সরকারের কূটনীতিক তৎপরতা। সা'দত হুসাইন রচিত স্মৃতিকথা *মুক্তিযুদ্ধের দিন-দিনান্ত* গ্রন্থটি মাওলা ব্রাদার্স থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের বর্ণনায় মুজিবনগর সরকার বিশেষ করে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিক আনোয়ারুল করিম চৌধুরীর কথা উল্লেখ রয়েছে। শাহ এ এম এস কিবরিয়া রচিত স্মৃতিকথা *পেছন ফিরে দেখা* গ্রন্থটি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। ৯০-১০৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখকের বাঙালি কূটনীতিক হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন স্মৃতির বর্ণনা রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাঙালি কূটনীতিক হিসেবে তাদের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা। আসমা কিবরিয়ার স্মৃতিকথা *শুধুই*

স্মৃতি নয় গ্রন্থটি পারিজাত প্রকাশনী থেকে ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের ৫৯-৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিশেষ করে তাঁর স্বামী শাহ এ এম এস কিবরিয়া ও অন্যান্য বাঙালি কূটনীতিকদের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের বর্ণনা রয়েছে। নুরুল ইসলাম রচিত *বাংলাদেশ জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা* গ্রন্থটি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে অধ্যাপক নুরুল ইসলামের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ইস্যুতে গৃহীত পাকিস্তান সরকারের নীতিমালার প্রশ্নে বাঙালিদের গড়ে তোলা প্রতিরোধ সংগ্রামের একটি গভীর বিশ্লেষণ রয়েছে। তিনি তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন এই অর্থনৈতিক ইস্যুই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের অন্যতম কারণ। রেহমান সোবহান রচিত গ্রন্থ *বাংলাদেশের অভ্যুদয় একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য* ভোরের কাগজ প্রকাশনী থেকে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ দেশে বিদেশে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। আবার ২০০৭ সালে সিপিডি থেকে প্রকাশিত *আমার সমালোচক আমার বন্ধু* গ্রন্থে পূর্বোক্ত গ্রন্থের অধ্যায়টি যুক্ত করা হয়েছে। আবার ২০১৮ সালে ভারতের সেইজ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত *উতল রোমন্থন পূর্ণতার সেই বছরগুলো* গ্রন্থে ২৮৩ থেকে ৩৯৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মকথা বর্ণনা করেছেন। রেহমান সোবহান মুজিবনগর সরকারের বিশেষ কূটনীতিক প্রতিনিধি হিসেবে ইউরোপ আমেরিকা সফর করেন। তাঁর এ সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে পাকিস্তানের সাহায্য প্রাপ্তি বন্ধে লবি করা এবং ইউরোপ ও আমেরিকা জুড়ে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা। দুটি কাজ তিনি সফলতার সঙ্গে করেছেন। তাঁর তিনটি গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন কার্যক্রমের যেমন বর্ণনা রয়েছে তেমনি প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় স্থান পেয়েছে বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও তাদের গৃহীত নানাবিধ কর্মযজ্ঞের কথা।

তাজুল মোহাম্মদ রচিত *মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ* গ্রন্থটি সাহিত্য প্রকাশ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে প্রবাসী বাঙালি সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, গৃহীত পদক্ষেপ এমনকি ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের কথা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছেন। ফারুক আহমদ রচিত *সাপ্তাহিক জনমত মুক্তিযুদ্ধের অনন্য দলিল* গ্রন্থটি ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ থেকে ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। সাপ্তাহিক *জনমত* ইংল্যান্ডের প্রবাসী বাঙালিদের হাতে গড়ে তোলা একটি বাংলা পত্রিকা। মুক্তিযুদ্ধকালীন এই পত্রিকার রয়েছে অনন্য ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি ঘটনাকে এই সাপ্তাহিক পত্রিকায় তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী বাঙালি কূটনীতিকদের পক্ষ ত্যাগের সংবাদও এই পত্রিকায় গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান রচিত *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* গ্রন্থটি বাংলা একাডেমি থেকে ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে। মুজিবনগর সরকার এর প্রশাসনিক কাঠামো আলোচনা প্রসঙ্গে দেশ-বিদেশে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের কথাও যৎসামান্য আলোচনা করা হয়েছে। আফসান চৌধুরী রচিত চার খণ্ডে *মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১* শীর্ষক গ্রন্থটি মাওলা ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ সুবিশাল গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধকালীন

নানা প্রান্তে বাঙালি কূটনীতিকদের কথাও এসেছে। বিশেষ করে ভারতীয় কূটনীতিকরা কীভাবে বাঙালি কূটনীতিকদের সহযোগিতা করেছিলেন সেসব কথা বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে।

বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন রচিত *There and Back Again (A Diplomat's Tale)* গ্রন্থ ২০০৬ সালে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এটি মূলত একটি স্মৃতিকথা। গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি আলোচনা করা হয়েছে। কে এম শিহাবুদ্দিন হচ্ছেন প্রথম বাঙালি কূটনীতিক যিনি মুজিবনগর সরকার গঠনের পূর্বেই পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করেন। তারপর তিনি ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তাঁর এই স্মৃতিগ্রন্থে তিনি কেন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেন, এজন্য কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন, মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক, নানাবিধ কূটনীতিক কর্মকাণ্ড ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে বিশ্ব রাজনীতির কূটনীতিক চিত্র তুলে ধরেছেন। যা মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা রচনায় অন্যতম একটি সহায়ক উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের কূটনীতিক ইতিহাস নিয়ে এ পর্যন্ত দুটি উচ্চতর গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়েছে। প্রথমটি অধ্যাপক আবু সাইয়িদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন। যার শিরোনাম *বাংলাদেশের স্বাধীনতা: কূটনৈতিক যুদ্ধ*। ইতিমধ্যে এটি গ্রন্থাকারে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় গবেষণাটি করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম বিভাগের অধ্যাপক ড. ফাজরীন হুদা। ২০১৪ সালে তিনি ইংল্যান্ডের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে Public Diplomacy: Emergence of Bangladesh শিরোনামে পিএইচডি করেছেন। এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে ধারণাগত অথবা বাস্তবক্ষেত্রে একটি জাতির অভ্যুদয়ে অপেশাদার কূটনীতি বা পাবলিক ডিপ্লোমেসি কতটা কার্যকর উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে তা অনুসন্ধান। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে পেশাদার কূটনীতিকদের পাশাপাশি অপেশাদার কূটনীতিকদের নিয়োগ করা হয়েছিল। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে বিশ্বজনমতকে প্রভাবিত করার জন্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে সাহায্য করে। বিশ শতকের শেষ ভাগে জাতীয় ভাবমূর্তি নিয়ন্ত্রণে অপেশাদার কূটনীতি ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করে। অপেশাদার কূটনীতিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে 'কোনো দেশের জাতীয় স্বার্থকে তুলে ধরতে দেশটি সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষকে জানাতে ও যুক্ত করতে হবে'। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অপেশাদার কূটনীতিক জ্ঞান নির্দিষ্ট বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য পূরণেও প্রয়োগ করা হচ্ছে। যাদের মূল লক্ষ্য একাধারে জাতীয় সংকটকালীন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সহায়তা অর্জন এবং জাতীয় জরুরি অবস্থায় বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করা। ড. ফাজরীন হুদার অভিসন্দর্ভে এই অপেশাদার কূটনীতির ধারণার কার্যকারিতা এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এর ভূমিকা অনুসন্ধান করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অপেশাদার কূটনীতির চর্চা এবং তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রকাশনা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এ যাবত রচিত গ্রন্থগুলোতে নানা ঘটনা আলোচিত হয়েছে। এসব ঘটনার প্রসঙ্গক্রমে বাঙালি কূটনীতিকদের কথা এসেছে। আবার কখনো শীর্ষ পর্যায়ের যেসকল কূটনীতিক ছিলেন তাদের নাম, পরিচয় ও তাদের গৃহীত কর্মকাণ্ডের কথা স্থান পেয়েছে। কিন্তু এসব বাঙালি কূটনীতিকদের মুক্তিযুদ্ধে যে ভূমিকা ও

অবদান ছিল তা কোনো গ্রন্থে আলাদাভাবে অধ্যায় আকারে স্থান পায়নি। আবার স্মৃতিকথাসমূহেও দেখা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে স্মৃতিকার কখনো কখনো বাঙালি কূটনীতিকদের কথা বলেছেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের নাম ও তারা কোন দেশের কর্মরত থাকাকালীন পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করেছেন তা-ই শুধু বলা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি জনযুদ্ধ সেদিক থেকে বিচার করলে মুক্তিযুদ্ধে এই শ্রেণির মানুষের কেমন ভূমিকা ছিল বা তারা আদৌও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় কোনো ভূমিকা পালন করেছেন কিনা তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়নি। কূটনীতিকের দক্ষতা দ্বারা তারা যে আন্তর্জাতিক রণাঙ্গনে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিয়ে লড়াই করেছেন তা বেশিরভাগ গ্রন্থেই অনুপস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শুধু দেশের অভ্যন্তরে সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ নয়। এর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে যা দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সংঘটিত হয়েছে। এসব বিষয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে খুব কম স্থান পেয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের কূটনীতিক যুদ্ধ ও পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি শিরোনামে দুটি উচ্চতর গবেষণাকর্মেও বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা অনুপস্থিত। এসব দিক বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি শ্রেণি হিসেবে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা নিয়ে এটি প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ গবেষণা।

অধ্যায় দুই
মুজিবনগর সরকার গঠন ও কূটনীতিক তৎপরতা

ভূমিকা
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একদিনে হঠাৎ করে শুরু হয়নি। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ প্রেক্ষাপট। পাকিস্তানের তেইশ বছরের শাসন শোষণ, নির্যাতন নিপীড়ন, বৈষম্যের ফলে এদেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয় তার প্রতিফলন দেখা যায় সত্তর সালের সাধারণ নির্বাচনে। বাংলাদেশের জনগণ প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এদেশের গণমানুষের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করে। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতার পট পরিবর্তন হওয়ার কথা। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী এ নিয়ে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করে। তাদের ষড়যন্ত্রের নীল নকশা 'অপারেশন সার্চলাইট'। কিন্তু এর পূর্বেই ৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি পূর্ব বাংলার জনগণকে প্রয়োজনে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতারের পূর্বেই তাঁর একান্ত নেতৃবৃন্দদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে যান। কোথায় যেতে হবে, কী করতে হবে, শাসকগোষ্ঠীকে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে। অপারেশন সার্চলাইট এর নামে সারা দেশে গণহত্যা শুরু হওয়ার পর ২৭ মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ কেউ জানতে পারেনি বঙ্গবন্ধু কী অবস্থায় আছেন। তারা সবাই অপেক্ষা করছিলেন বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী নির্দেশনার জন্য। ইতিমধ্যে ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ভেসে আসে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা। যেখানে বঙ্গবন্ধু শত্রুবাহিনীকে মোকাবিলা করতে বলেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ তাদের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বুঝতে পারেন। প্রথম পর্যায়ে আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের অনেক নেতৃবৃন্দ ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জের একটি গ্রামে সমবেত হন। সেখানে তারা পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করে সবাই ভারতের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন। আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ সকলেই একে একে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে কলকাতায় উপস্থিত হন। তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা পরবর্তী করণীয় বলে স্থির করেন। তাজউদ্দীন আহমদ জানতেন, দেখা হলে ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করবেন, তিনি কেন এসেছেন তা-ও জানতে চাইবেন। তাঁর সকল বক্তব্য যেন যৌক্তিক ও বিশ্বাসযোগ্য হয় সেজন্য তিনি প্রজ্ঞার সঙ্গে নিজেকে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেওয়ার কথা চিন্তা করেন। বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসেন। আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও নির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএ'দের সভা আহ্বান করে একটি প্রবাসী সরকার গঠনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। সে মোতাবেক মুজিবনগর সরকার গঠন হয় এবং তাজউদ্দীন আহমদ নিজে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদকে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস অতিবাহিত করতে হয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশে শক্ত হাতে মুজিবনগর সরকার, মুক্তিবাহিনী এমনকি সমগ্র জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

আলোচ্য অধ্যায়ে মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রেক্ষাপট, মুজিবনগর সরকার গঠন ও প্রধানমন্ত্রীত্ব নিয়ে বিতর্ক, মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ ও সরকার কাঠামো, মুজিবনগর সরকারের নামকরণের ব্যাখ্যা, মুজিবনগর সরকারের বৈদেশিক নীতি ও এর বৈশিষ্ট্য, মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক তৎপরতা ও কর্মপরিকল্পনা এবং মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক তৎপরতার সফলতা আলোচনা করা হবে।

২.১ মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রেক্ষাপট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জন্মলগ্ন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হলো এই সরকারের ম্যাগনাকার্টা যা স্বাধীনতার সনদ হিসেবে পরিচিত। এই ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে কেন, কোন ক্ষমতার বলে এবং পরিস্থিতিতে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলো, যে রাষ্ট্রের নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ[১]। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ শব্দটি বাংলা ও দেশ এক সঙ্গে লেখার ব্যাপারে মুজিবনগর সরকারের ২৮ এপ্রিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে বাঙালি কূটনীতিক হোসেন আলী তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন- Following a cabinet decision, we started to spell Bangladesh as one word instead of two (Bangla Desh) as in the past.[২]

যেহেতু এই সরকার মুজিবনগরে প্রধান দপ্তর স্থাপন করেছিল তাই এর ব্যাপক পরিচিতি পায় ‘মুজিবনগর সরকার’ রূপে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রধানত নিরাপত্তা এবং মুক্তিযুদ্ধে নির্বিঘ্নে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজন থেকে এই সরকারের প্রধান কার্যালয় কলকাতায় স্থাপন করা হয়।[৩]

বিশ শতকে প্রবাসী সরকার গঠনের অনেক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। স্থান ও কালভেদে এদের স্বরূপ এবং চরিত্র বিভিন্নরূপে দেখা গিয়েছে। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জেনারেল চার্লস দ্য গলের স্বাধীন ফরাসি সরকার এবং পোল্যান্ডের প্রবাসী সরকার লন্ডনে তাদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেছিল। আবার সাম্প্রতিক সময়ে প্রবাসী সরকার এর উদাহরণ হিসেবে পি.এল.ও সরকারের কথা বলা যায়। দীর্ঘদিন ধরে তারা প্রথমে লেবাননের বৈরুতে, জর্ডানের আম্মান এবং সর্বশেষ তিউনিসিয়ার তিউনিসে সদর দপ্তর স্থাপন করেছিল। পৃথিবীর অনেক দেশ তাদের স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। যদিও তাদের নিজস্ব কর্তৃত্বাধীনে কোনো ভূখণ্ড ছিল না। আফগনিস্তানের মুজাহেদিনদের শুধু স্বীকৃতি নয়, তাদের সকল ধরনের সাহায্য, প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলো। সুদীর্ঘ দশ বছর তাদের সদর দপ্তর ছিল পাকিস্তানের পেশোয়ারে। সেখানে তারা অস্ত্রশস্ত্র থেকে শুরু করে প্রচুর পরিমাণে

---

[১] স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম থেকে মুজিবনগর সরকারের কাগজপত্রে বাংলাদেশ কে ‘বাংলা দেশ’ এভাবে লেখা হতো। লন্ডনে প্রকাশিত ডাকটিকিট ছাড়াও যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক কাগজেরও নাম ছিল সাপ্তাহিক ‘বাংলা দেশ’। ১৯৭১ এর সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসে তাসাদ্দুক আহমদ মুজিবনগর সরকারেরর নিকট থেকে একটি ইংরেজি বুলেটিন পান। এই বুলেটিনের শীর্ষে ইংরেজিতে বাংলাদেশ নামটি ‘বাংলা’ ও ‘দেশ’ আলাদা করে ছাপানো ছিল। তাসাদ্দুক আহমদ তখন চিঠি লিখে মুজিবনগর সরকারকে জানান যে, দয়েচল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের নামের মতো বাংলাদেশের নামটিও এক শব্দ হওয়া উচিত। এই যুক্তি গৃহীত হওয়ার পর তাসাদ্দুক আহমদ লন্ডনের *দ্য টাইমস* পত্রিকায় চিঠি লিখে জানান `Bangla’ ও `Desh’ শব্দ দুটি একসঙ্গে `Bangladesh’ হিসেবে মুজিবনগর সরকারের দলিলপত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ চিঠির সাথে তিনি মুজিবনগর সরকারের লেটারহেড এর ফ্যাক্সিমিলিও পাঠিয়েছিলেন। *দ্য টাইমস* পত্রিকায় তাসাদ্দুক আহমদের চিঠি প্রকাশের পর থেকে যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্রে বাংলাদেশ নামটি একশব্দ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সূত্র: শেখ আবদুল মান্নান, *মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান*, ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ১৯৯৮। পৃ. ১০৫-১০৬

[২] The Diary of Hossain Ali

[৩] এইচ টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার* ১৯৭১, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১২। পৃ. ৩১

আর্থিক সাহায্য পেয়েছে। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রবাসী সরকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যায় কম্বোডিয়ার প্রিন্স নরোদম সিহানুকের সরকার। এদের সদর দপ্তর দীর্ঘদিন চীনের বেইজিং এ অবস্থিত ছিল। কোনো কোনো সময় এরা থাইল্যান্ডেও অবস্থান করতেন। সিহানুকের স্বাধীন কম্বোডিয়া সরকার একদিকে ছিল প্রবাসী অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাদের দখলে ছিল, যেখানে তারা সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।[৪] অবশ্য এদিক থেকে বিচার করলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অন্য দেশের প্রবাসী সরকারের চেয়ে ভিন্নতর ছিল। কেননা বাংলাদেশ সরকারের ছিল স্বাধীন অঞ্চলে নেতৃত্ব, বহির্বিশ্বে ব্যাপক জনসমর্থন ও সহানুভূতি, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, নিজস্ব আয়-ব্যয় সহ প্রশাসনিক কাঠামো, দেশের অভ্যন্তরে সর্বস্তরের জনগণের নজিরবিহীন সমর্থন।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সমগ্র দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। বন্ধ হয়ে যায় অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য। এককথায় বলা চলে প্রশাসন স্থবির হয়ে পড়ে। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ডাক দেন। পঁচিশে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের সমগ্র প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। ১৫ মার্চ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ৩৫টি নির্দেশ জারি করেন। এরপর ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে সকাল বেলা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের এক বৈঠক আহ্বান করেন। এ বৈঠকে বঙ্গবন্ধু সৃষ্ট পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মতামত জানতে চান। বৈঠকে উপস্থিত দু' একজন ব্যতীত অধিকাংশ সদস্য পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীকে সশস্ত্রভাবে মোকাবিলা করার কথা ব্যক্ত করেন। তবে এদিনের এ বৈঠকে আসন্ন পরিস্থিতিতে বিদেশের কাছ থেকে কীভাবে সাহায্য পাওয়া যায় তা নিয়েও আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে আমীর-উল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, বাংলাদেশের আন্দোলন সম্পর্কে বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে তখনও কোনো যোগাযোগ হয়নি। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশের মানুষের প্রতি বিশ্ববাসীর সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের খবরও বহির্বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিদেশের কোনো সরকার বা উচ্চ পর্যায়ের লবির সাথে কোনো যোগাযোগ ইতিমধ্যে গড়ে ওঠেনি। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে তুলনায় বাংলাদেশের বলতে গেলে তেমন কোনো যোগাযোগই ছিল না।[৫]

এ বৈঠকে দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও জনগণের ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। অন্যদিকে দৃশ্যপটে ১১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রহসনের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এসময়

---

[৪] এইচ টি ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

[৫] আমীর-উল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি*, ঢাকা: কাগজ প্রকাশনা, ১৯৯১। পৃ. ৭

থেকেই বঙ্গবন্ধু আঁচ করতে পেরেছিলেন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র। অবশ্য ২৩ মার্চ সকালে ঢাকা থেকে সকল জেলা সদরে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম কমিটির কাছে একটি নির্দেশ পাঠানো হয়। এ নির্দেশে বলা হয়- যে কোনো সময় পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালি জাতির ওপর হামলা চালাতে পারে। তাই পাল্টা আঘাত হানার জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়।[৬] ২৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের নেতৃবৃন্দকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ঢাকার নিকটে কোনো জায়গায় আত্মগোপনে থাকতে বলেন। অবশ্য আবদুস সামাদ আজাদ তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু আত্মগোপনের জন্য সিলেটের চা বাগানকে নির্বাচন করেছিলেন। তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত করছি–

> ১৮ই মার্চ '৭১ বঙ্গবন্ধুর পরামর্শক্রমে আমরা দু'জনে একটা বিকল্প ব্যবস্থা ঠিক করে নিয়েছিলাম। সেটা ছিল প্রয়োজনে আত্মগোপনের জন্য বঙ্গবন্ধুকে সিলেটের চা বাগানে নিয়ে যাবো।. . . আত্মগোপনের জন্য সিলেটের চা বাগান নিরাপদ ছিল। তা'ছাড়া ওখান থেকে প্রয়োজনে ভারত সহ বহির্জগতে সরে যাওয়াও সহজ হতো।[৭]

কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবন থেকে সরে যাননি। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে আত্মগোপনের জন্য চাপ দিলে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ছিল– "আমাকে নিয়ে তোরা কোথায় রাখবি? বাংলাদেশে আত্মগোপন সম্ভব নয়। আমার হয়তো মৃত্যু হবে, কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।"[৮] কিন্তু অন্য একটি সূত্রে বলা হয় যে, ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত শেখ মুজিব তাঁর সহকর্মীদের বিভিন্ন জায়গায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন, আত্মগোপন করার কথা বলেন কিন্তু তিনি নিজে কী করবেন বা কোথায় যাবেন, সে কথা কাউকে বলেননি। তিনি এটাও কাউকে বলে যাননি যে তাঁর অনুপস্থিতিতে কে বা কারা এই সংগ্রামের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করবেন।[৯] আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা সকলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মগোপন করেন। পঁচিশে মার্চ রাতে শুরু হয় অপারেশন সার্চলাইট।[১০] ঢাকা শহর এক রাতের মধ্যে পরিণত হয় নরকপুরীতে। বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই আক্রমণের পেছনে ছিল এক ধরনের প্রতিহিংসাপরায়ণতা। প্রাথমিকভাবে যা ছিল ক্ষমতাসীন সামরিক আমলাতান্ত্রিক এলিটদের বর্ণবাদী ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের মধ্যেকার জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে জনগণকে তাদের অধীনে নিয়ে আসা। তা সম্ভব না হলে জনগণ হিসেবে তাদের ধ্বংস করে দেওয়া যাতে করে দীর্ঘদিন তারা অন্যের ক্রীতদাস হয়ে থাকতে পারে।[১১]

আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ২৭ মার্চ পর্যন্ত ঢাকায় আত্মগোপন করে থাকেন। বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী কোনো নির্দেশ না পেয়ে তাজউদ্দীন আহমদ শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি বঙ্গবন্ধুর পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুযায়ী ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় ও পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করতে বেরিয়ে পড়েন। স্থানীয়

---

[৬] আমীর-উল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

[৭] শামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, ঢাকা: বিজয় প্রকাশনী, ১৯৮৫। পৃ. ৩০০

[৮] আমীর-উল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

[৯] এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মীর্জা, *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০০৯। পৃ. ১৮

[১০] পাকিস্তানের সামরিক জান্তা গণহত্যার পরিকল্পনা করেছিল ১৮ মার্চ। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ পরিকল্পনার মূল দলিল অনুযায়ী এ পরিকল্পনা ছিল– 'উচ্চতর পর্যায়ে রাষ্ট্রপতিকে আলোচনা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। এমনকি শেখ মুজিবকে ধোঁকাও দেওয়া যেতে পারে। ভুট্টো রাজি না হলেও প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করবেন যে ২৫ মার্চ তিনি আওয়ামী লীগের দাবিদাওয়া মেনে নিতে চলেছেন'। বিস্তারিত: মঈদুল হাসান, *উপধারা একাত্তর মার্চ-এপ্রিল*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫। পৃ. ২৬

[১১] মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৩। পৃ. ২১৬

সংগ্রাম কমিটির সহযোগিতায় তাজউদ্দীন আহমদ ফরিদপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা হয়ে ভারতীয় সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন। কেননা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাঁর কাছে মনে হয়েছিল বাংলাদেশের এমন বিপদের দিনে প্রতিবেশী দেশ ভারতের কাছ থেকেই সহযোগিতা পাওয়া যাবে। আর সহযোগিতা পাওয়ার জন্য ভারত সরকার প্রধান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আবার তাজউদ্দীন আহমদ উপলব্ধি করেন যে, পাকিস্তান বাহিনীর এই বর্বরোচিত হামলার সংবাদ যে কোনো ভাবে বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার খবর ভারত বা বিশ্বের কোনো বেতারে প্রচারিত হয়নি। তবে ২৬ মার্চ রাতে অস্ট্রেলিয়ার বেতার প্রথম ঢাকার গণহত্যার সংবাদ প্রচার করে।[১২] তাজউদ্দীন আহমদ বুঝতে পারেন যে, বহির্বিশ্বকে পাকিস্তানি বাহিনীর এ ধ্বসযজ্ঞের সংবাদ জানানো হলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জনসমর্থন আদায় করা ও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সহযোগিতা পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে '৭১ সালের ৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাজউদ্দীন আহমদ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার কে. সি. সেনগুপ্তের সঙ্গে প্রথম দফা এবং ১৭ মার্চ দ্বিতীয় দফা সাক্ষাৎ করেন। এই দুই দফা সাক্ষাতে ভারতীয় হাইকমিশনার ও তাজউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের সম্ভাব্য হামলায় ভারত কীভাবে আওয়ামী লীগকে বা বাঙালিদেরকে সহায়তা করতে পারে সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু মি. সেনগুপ্ত আলোচনাকালে জানান যে, পাকিস্তান বাঙালিদের ওপর বড় ধরনের হামলা করতে পারে এমন কোনো সংবাদ ভারতের কাছে নেই। আর যদি এ ধরনের হামলা হয়, তাহলে ভারতের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করা হবে।[১৩] অবশ্য ভারত সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত আলাপ-আলোচনা হওয়ার কথা ছিল ২৪ মার্চ। কিন্তু সেদিন তাজউদ্দীন আহমদ দলীয় কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকায় এবং বঙ্গবন্ধু কোনো নির্দেশনা না দেওয়ায় সে সাক্ষাৎ আর হয়নি। অন্য একটি সূত্রে জানা যায় যে, কে. সি. সেনগুপ্ত ভারত সরকারকে অবহিত করার জন্য দিল্লি যান এবং ঢাকা ফিরে ১৭ মার্চ তাজউদ্দীন আহমদকে এই আশ্বাস দেন যে, পাকিস্তানিরা সামরিক আঘাত করলে সেই অবস্থায় ভারত যথাসম্ভব সাহায্য করবে। তবে ভারতীয় সাহায্যের রূপরেখা কী হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে ২৪ মার্চ মিলিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এই নির্ধারিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি।[১৪] এজন্য পঁচিশে মার্চের ঘটনার পর তাজউদ্দীন আহমদের ধারণা হয়েছিল যে, বঙ্গবন্ধু হয়তো নিজে ভারতীয় হাইকমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছেন বা অন্য কারো মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন।[১৫]

তাজউদ্দীন আহমদ পঁচিশে মার্চের ঘটনার পর এই আশায় ভারতে পাড়ি জমান যে, ভারত সরকারের প্রতিনিধি কিংবা সরকার প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারলে বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী নির্দেশনা সম্পর্কে জানতে পারবেন। কিন্তু মার্চের ৩০ তারিখে ভারতীয় সীমান্তে উপস্থিত হয়ে তাজউদ্দীন আহমদের মনে হয় যে, ভারতীয় সহযোগিতার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে গ্রহণ করা হয়নি।[১৬] অবশ্য মওদুদ আহমদ উল্লেখ করেছেন যে, তাজউদ্দীন আহমদ ও আমীর-উল ইসলাম ১

---

[১২] আমীর-উল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮
[১৩] মঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৮৬। পৃ. ১০
[১৪] রফিকুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকার*, ঢাকা: ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩। পৃ. ২১
[১৫] মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০
[১৬] *ওই*, পৃ. ১০

এপ্রিল সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের সহায়তায় ভারতীয় গোয়েন্দা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দিল্লিতে পৌঁছেন।[১৭] সেদিন চুয়াডাঙ্গা পুলিশের এস.পি মাহবুব উদ্দিন আহমদ ও মহকুমা প্রশাসক তৌফিক এলাহী চৌধুরীর সহায়তায় তাজউদ্দীন আহমদ ও আমীর-উল ইসলাম সীমান্ত অতিক্রম করেন। ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করতে গিয়েও তাজউদ্দীন আহমদের মনে স্বাধীনচেতা মনোভাব কাজ করেছে। যদিও এ মুহূর্তে তাদের ভারতীয় সহযোগিতা প্রয়োজন তবুও পলায়নপর মনোবৃত্তি নিয়ে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করতে চাননি। স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ্য মর্যাদা নিয়ে ভারতে যাওয়া স্থির করেন। এজন্য মাহবুব উদ্দিন ও তৌফিক ই এলাহীকে আগে বিএসএফ এর ক্যাম্পে সংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠান। আঞ্চলিক বিএসএফ প্রধান গোলক মজুমদার বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে তাদেরকে স্বাগত জানান এবং তাদেরকে কলকাতায় পৌঁছে দিতে সহায়তা করেন। একই দিন বিএসএফ প্রধান রুস্তমজী কলকাতায় আসেন এবং তাজউদ্দীনের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনায় তাজউদ্দীন আহমদ তাঁকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি, পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ, পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য মুক্তিবাহিনী গঠন ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু রুস্তমজী জানান যে, তারা এ ব্যাপারে কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করতে পারবেন না। শুধুমাত্র ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তেই এ ধরনের সাহায্য প্রদান করা সম্ভব।[১৮] এমন অবস্থায় তাজউদ্দীন আহমদের আগ্রহে বিএসএফ প্রধান রুস্তমজী দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এর ব্যবস্থা করেন।[১৯] বাংলাদেশকে সহায়তা করার যে উদ্যোগ ভারতীয় বিএসএফের মধ্যে দেখা যায় তাতে তাজউদ্দীন আহমেদ মনে করলেন বঙ্গবন্ধু হয়তো পূর্বেই ভারত সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা সম্পন্ন করেছেন। তাজউদ্দীন আহমদের এ ধরনের চিন্তা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় আবদুল মতিনের গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন বিভিন্ন দেশের সরকার কিংবা তাদের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে পূর্ব বাংলার আসন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ সাহায্যদানের অনুরোধ জানানোর জন্য বঙ্গবন্ধুর পূর্ব-নির্দেশ অনুযায়ী মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ ১০ থেকে ১২ মার্চের মধ্যে সুলতান শরীফ, মিনহাজউদ্দিন ও মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু লন্ডনে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার মি. আপা পন্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারতীয় হাইকমিশনার তাদের জানান যে, ভারত সরকার কর্তৃক এই ব্যাপারে সকল প্রকার সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লন্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার কর্তৃক প্রবাসী বাঙালিদেরও সকল প্রকার সাহায্য দেওয়ার কথা বলা হয়। এমনকি বিদেশে ভারতের প্রত্যেকটি দূতাবাসকেও প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।[২০]

এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, বাংলাদেশে অবস্থান করে ভারতীয় কূটনীতিকদের কাছে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা চাওয়ার পরিবেশ ছিল না বিধায় বঙ্গবন্ধু দেশের বাইরে এ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছেন। এই বক্তব্যের অন্য একটি ব্যাখ্যা হিসেবে

---

[১৭] মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭

[১৮] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮। পৃ. ১০১

[১৯] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, পঞ্চদশ খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২। পৃ. ১০২

[২০] আবদুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী বাংলাদেশ* ১৯৭১, ঢাকাঃ অনন্যা, ১৯৮৯। পৃ. ১৯

ধরা হয় যে, বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় আরেকটি পন্থায় ভারত সরকারের নিকট থেকে সহযোগিতা পাওয়ার চেষ্টা করেন। এ জন্যই তাজউদ্দীন আহমদের পক্ষে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সহজতর হয় এবং পরবর্তী কর্মকাণ্ডে ভারত সরকার বন্ধু রাষ্ট্রের মতো সহায়তা করে।

তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার জন্য দিল্লি যান। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এর পূর্বে তাজউদ্দীন আহমদকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। যেমন-

ক. একটি সরকার গঠন ও সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন।

খ. সাংগঠনিক পরিকল্পনার আওতায় আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। এজন্য তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের নামের একটি তালিকা বিএসএফ এর নিকট প্রদান করেন যাতে ভারতীয় সীমান্তে তাঁদের খুঁজে বের করা যায়। কারণ তাজউদ্দীন আহমদের আশা ছিল আওয়ামী লীগের সকল কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ হয়তো ইতিমধ্যে ভারতের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হয়েছেন। তাদেরকে দ্রুত কলকাতা বা আগরতলায় সমবেত করার জন্য বিএসএফ এর সদস্যদের অনুরোধ করা হয়।[২১]

গ. পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী বাঙালিদের ওপর যে নির্মম অত্যাচার ও গণহত্যা শুরু করেছে তার বিরুদ্ধে সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং এ লক্ষ্যে বাংলাদেশকে কয়েকটি সামরিক এলাকায় বিভক্তকরণ।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের খোঁজ করা এবং অতি দ্রুত একটি প্রবাসী সরকার গঠনে তাজউদ্দীন আহমদ কতটুকু উৎকণ্ঠিত ছিলেন তার সমর্থনে বক্তব্য পাওয়া যায় অধ্যাপক রেহমান সোবহানের গ্রন্থে। তিনি বলেছেন-

> তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন খুবই উদ্বিগ্ন-কত দ্রুত তিনি সীমান্তে উড়ে যাবেন এবং তার দলীয় সহকর্মীদের সঙ্গে মিলিত হবেন এই নিয়ে। তিনি আরো উদ্বিগ্ন ছিলেন এ নিয়েও-কতক্ষণে তাদের নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন করবেন এবং মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন।[২২]

সালাম আজাদ জানিয়েছেন, তাজউদ্দীন আহমদ যখন ভারতের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন তখন কোনো অগ্রজ নেতার সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পাননি। তারপরও তিনি দুটো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যথা-

ক. পাকিস্তানের সর্বাত্মক আক্রমণ থেকে দেশের মানুষকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় সশস্ত্র প্রতিরোধ,

খ. মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করার প্রথম ও আবশ্যিক পদক্ষেপ হিসেবে ভারত ও অন্যান্য সহানুভূতিশীল রাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা।[২৩]

ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে কী কী বিষয়ে আলোচনা করবেন এর একটি রূপরেখা তাজউদ্দীন আহমদ আগেই ঠিক করেছিলেন। সাক্ষাৎ এর আগের দিন ভারত সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পি.এন হাকসার, কে রুস্তমজী, গোলক

[২১] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২
[২২] রেহমান সোবহান, *আমার সমালোচক আমার বন্ধু*, ঢাকা: সিপিডি, ২০০৭। পৃ. ৭৩
[২৩] সালাম আজাদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান*, ইন্ডিয়া; ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২০১৪। পৃ. ১৩৫-১৩৬

মজুমদারের সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের বৈঠক হয়।[২৪] বৈঠকে তারা জানতে চান আওয়ামী লীগ কোনো সরকার গঠন করেছে কিনা। এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এমন আশঙ্কা তাজউদ্দীন আহমদের মনে ছিল। তাজউদ্দীন আহমদ বুঝতে পারেন, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে কোনো প্রকৃত তথ্য ভারত সরকারের জানা নেই এবং সরকার গঠনের সংবাদে তাদের বিস্মিত বা বিব্রত হওয়ারও কোনো আশঙ্কা নেই। বরং সরকার গঠিত হয়েছে জানতে পারলে পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রামকে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় পার্লামেন্ট ৩১ মার্চ যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তা নির্দিষ্ট ও কার্যকর রূপ লাভ করবে বলে তাজউদ্দীন আহমদের ধারণা হয়।[২৫] তাজউদ্দীন আহমদ কখনো চিন্তা করেননি আক্রান্ত দেশবাসীর জন্য সাহায্য সহযোগিতার আবেদন নিয়ে তাঁকে দিল্লিতে উপস্থিত হতে হবে। তাজউদ্দীন আহমদ এপ্রিল মাসের ৩ তারিখে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। দিল্লিতে তাঁকে কেউ চিনতোও না। ভারতীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রধান উপদেষ্টা ড. অশোক মিত্র দিল্লিতে সে সময় উপস্থিত অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও অধ্যাপক নুরুল ইসলামের কাছে তাজউদ্দীন আহমদ সম্পর্কে জানতে চান। তারাই তাঁকে জানান যে তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লগের সাধারণ সম্পাদক এবং অসহযোগ আন্দোলনের একজন পুরোধা ও সৎ মানুষ।[২৬] কেননা তাজউদ্দীন আহমদ যখন দিল্লিতে আসেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সে সময় বঙ্গবন্ধুর বাইরে বাংলাদেশের আর কোনো নেতাকে চেনা দূরে থাক, নামই শোনেনি। শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই তখন আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেছেন। এ ব্যাপারে পি এন হাকসার অধ্যাপক রেহমান সোবহানের কাছে জানতে চান কারা বঙ্গবন্ধুর মতো উঁচু মাপের নেতার অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে পারবে। তাজউদ্দীন আহমদ সেই সময় দিল্লিতে এসেছেন এটা না জেনেই রেহমান সোবহান বলেছিলেন এই ভূমিকা সম্ভবত তাজউদ্দীন আহমদই পালন করতে পারেন। তাজউদ্দীন আহমদের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বৃত্তান্ত এবং তাঁর ওপর বঙ্গবন্ধুর অগাধ বিশ্বাসের কথা তিনি হাকসারকে জানিয়েছিলেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রধান ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের তথ্যের অভাব লক্ষ করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কার কোথায় অবস্থান এটা হাকসারকে বোঝাতে রেহমান সোবহানের খানিকটা সময় লেগেছিল।[২৭] তবে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে কী রাজনৈতিক পরিচয় দিবেন তা নিয়ে তাজউদ্দীন আহমদ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন। এ ব্যাপারে তাজউদ্দীন আহমদ রেহমান সোবহান ও আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে আগের দিন সন্ধ্যায় বৈঠক করেন। এ বৈঠকে রেহমান সোবহান তাঁকে জানান বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে কে নেতার ভূমিকা পালন করবে সে বিষয়ে হাকসারের উদ্‌বেগের কথা। তারা দু'জন তাজউদ্দীন আহমদকে বোঝাতে সক্ষম হন যে এখন নিজের সম্পর্কে কোনো ধরনের সংশয় রাখা চলবে না। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং মার্চ মাসে বাংলাদেশ প্রশাসন পরিচালনায় ইতিমধ্যে যে ভূমিকা তিনি পালন করেছেন, তাতে করে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার সবচেয়ে ভালো প্রস্তুতি ও যোগ্যতা দৃশ্যত তাঁর আছে। রেহমান সোবহান তাঁকে সতর্ক করে দেন যে মুক্তিযুদ্ধের অর্ন্তবর্তী নেতা হিসেবে তাঁর যোগ্যতা ও কর্তৃত্বের কথা হাকসারকে

[২৪] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭
[২৫] মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
[২৬] এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মীর্জা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
[২৭] রেহমান সোবহান, *উতল রোমন্থন পূর্ণতার সেই বছরগুলো*, ভারত: সেইজ পাবলিকেশন্স, ২০১৮। পৃ. ৩৩২

জানানো হয়েছে। তাই তাদের এমন কিছু করা উচিত হবে না যা ভারতের মনে সংশয়ের জন্ম দেয়।[২৮] অবশ্য অন্য একটি সূত্র মতে, তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে আসার পূর্বে কলকাতায় প্রথমে যেখানে অবস্থান করেন ভারতের ইন্টেলিজেন্স এর ভাষায় তা ছিল ডবল রেড সিগন্যাল এলাকা। তাজউদ্দীন আহমদ কোথায় আছেন তা ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী প্রাথমিক অবস্থায় গোপন রাখে। এর পেছনে দুটি কারণ ছিল– প্রথমত, তাজউদ্দীন আহমদ এর নিরাপত্তা এবং দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতেই যেন কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয়।[২৯] এমন অবস্থায় তাজউদ্দীন আহমদের মনোভাব ছিল, সামরিক বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করলে সেই সরকারের নেতৃস্থানীয় সদস্য হিসেবে তাজউদ্দীনের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে সাহায্য সংগ্রহের জন্য দিল্লিতে আসা এবং সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা করা অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত ও সহজসাধ্য।[৩০]

৩ এপ্রিল ১৯৭১[৩১] তারিখে দিল্লির প্রধানমন্ত্রী ভবনে তাজউদ্দীন আহমদ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এর জন্য একাকী যান। সাক্ষাৎ এর শুরুতেই ইন্দিরা গান্ধী তাজউদ্দীন আহমদকে প্রশ্ন করেন- 'How is Shaikh Mujib? Is he all right?'[৩২] এসময় তাজউদ্দীন আহমদ ইন্দিরা গান্ধীকে জানান যে, পাকিস্তানি আক্রমণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ২৫-২৬ মার্চ বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করে একটি সরকার গঠন করা হয়েছে। শেখ মুজিব সেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং মুজিব-ইয়াহিয়ার বৈঠকে যোগদানকারী সকল প্রবীণ সহকর্মীই মন্ত্রিসভার সদস্য। নিজেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেন।[৩৩] অন্য একটি সূত্রে উল্লেখ আছে যে, তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলেন, 'শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, সরকার গঠন করেছেন। তারপর একটা বিভ্রাটের মধ্যে পড়ে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন।'[৩৪] বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানকারী প্রথম বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন যে, ২১ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালীন প্রথম জানা যায় বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন। শিহাবুদ্দিনকে কলকাতায় তাজউদ্দীন আহমদ আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানিয়ে নিজের কক্ষে নিয়ে যান। কিন্তু তাঁর প্রথম প্রশ্নে শিহাবুদ্দিন আহত হন। কেননা তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন বঙ্গবন্ধু কোথায়?[৩৫] এতে কূটনীতিক শিহাবুদ্দিন বুঝতে পারেন বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন তা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদও জানেন না। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে সকল সংবাদ জানার পর একজন কূটনীতিক হিসেবে কে এম শিহাবুদ্দিনের মনে প্রশ্ন

---

[২৮] রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৪

[২৯] মুহাম্মদ নুরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৭। পৃ. ৫৩

[৩০] মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১২

[৩১] তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কবে দেখা করেছিলেন, এ নিয়ে প্রাপ্ত বইসমূহে দুটি তারিখ পাওয়া যায়। কোনো বইতে ২ এপ্রিল, কোনো বইতে ৩ এপ্রিল তারিখের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে সময়ে তাজউদ্দীন আহমদের সহচর ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের স্মৃতিকথায় ৪ এপ্রিল উল্লেখ আছে। সূত্র: আমীর-উল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি*, ঢাকা: কাগজ প্রকাশনা, ১৯৯১। পৃ. ৩৫

[৩২] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ১০৬

[৩৩] মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

[৩৪] এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মীর্জা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

[৩৫] K M Shehabuddin, *There and Back Again A Diplomat's Tale*, Dhaka: UPL, 2006. p. 99

উদ্রেক হয়- বঙ্গবন্ধু কোথায়? ২৬ মার্চ পর্যন্ত তাঁর ধারণা ছিল বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কোনো নিরাপদ অবস্থানে থেকে। কিন্তু ২৯ মার্চ দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার হাসানের মাধ্যমে সত্যটি জানতে পারেন। একজন পাঠান হয়েও ব্রিগেডিয়ার তাঁর বাঙালি সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতো। সে আচরণে শিহাবুদ্দিনকে একটি গোপন সংবাদ দেয় যা *পাকিস্তান টাইমস* পত্রিকায় উল্লেখ ছিল। পত্রিকায় করাচি বিমানবন্দরে দু'জন নিরাপত্তারক্ষী বেষ্টিত বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি প্রকাশ করা হয়। এ ব্যপারে একজন পাকিস্তানি হিসেবে তাঁর (ব্রিগেডিয়ার হাসান) মন্তব্য ছিল- "Shehab, take it from me, your leader has been taken prisoner. Have no doubt it."[৩৬] প্রসঙ্গত, বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক ৬ এপ্রিল যে সংবাদ সম্মেলন করেন সেখানে কেন তারা পাকিস্তান সরকারের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন তা যেমন ব্যাখ্যা করেছেন তেমনি বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের এখন কী করা উচিত সে সম্পর্কেও ধারণা দেন। সংবাদ সম্মেলনে তারা অবিলম্বে একটি প্রবাসী সরকার গঠন ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত এ বক্তব্য অল ইন্ডিয়া রেডিও, ভারতীয় টেলিভিশন দূরদর্শন ও অন্যান্য স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা এ সম্পর্কে অবগত হন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ জানতেন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কী করতে হবে। ধারণা করা হয় এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সে মোতাবেক তাজউদ্দীন আহমদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ভারতের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন। তাজউদ্দীন আহমদ কে এম শিহাবুদ্দিনের সংবাদ সম্মেলনের বক্তৃতা শোনার পর এও ধারণা করেন যে, বঙ্গবন্ধু হয়তো দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বাইরে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিনকে এ ধরনের কোনো সংকেত দিয়েছিলেন। অথবা শিহাবুদ্দিন অন্য কোনো বিশ্বস্ত সূত্রে হয়তো জানতে পেরেছেন যে, বঙ্গবন্ধু কী করতে চাচ্ছিলেন। এমন অবস্থায় তাজউদ্দীন আহমদের ধারণা হয়েছিল ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণ শুরু হলে বঙ্গবন্ধু হয়তো ভারত সরকারের সহযোগিতার জন্য গোপনে ভারতের রাজধানী গিয়েছেন। অবশ্য এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত মুজিবনগর সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের অনেকেই জানতেন না বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন। এমন অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর চাওয়ার সঙ্গে বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিনের বক্তব্যের সাদৃশ্য থাকায় তাজউদ্দীন আহমদ ধরে নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন তা শিহাবুদ্দিন জানেন। কিন্তু তাজউদ্দীন আহমদ প্রথম শিহাবুদ্দিনের কাছে জানতে পারেন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। যা শিহাবুদ্দিনের স্মৃতিকথায় উল্লেখ রয়েছে। শিহাবুদ্দিনের সঙ্গে কথোপকথনে তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধু কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন তা ব্যক্ত করেছেন-

> "The way the resistance movement is gathering momentum," he continued breathlessly, "he must be directing it personally. It is proceeding exactly according to the plan Bangabandhu and I had worked out together just before the crackdown. Since I am here, the only other person who knows about the plan and can implement it is presumably Bangabandhu himself. Where is he? From

[৩৬] K M Shehabuddin, *ibid,* p. 97

where is he leading the liberation movement? I have not received any message from him through any channel since we parted company in Dhaka. I am getting increasingly worried about his safety and security."[৩৭]

শিহাবুদ্দিনের ভাষ্য তিনি তাজউদ্দীন আহমদকে একটি সংবাদ বিবৃতি দিতে বলেছিলেন। যেখানে উল্লেখ থাকবে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের হাতে বন্দি আছেন। এর পেছনে অবশ্য শিহাবুদ্দিনের যুক্তি ছিল- এতে করে পাকিস্তানিরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করবে যে, তাদের সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছে। ফলে বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। তাছাড়া তিনি জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে বলেছিলেন যে, যদি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে তাহলে সকল দায় মুক্তিবাহিনীর ওপর চাপিয়ে দিবে।[৩৮] পাকিস্তান সরকার যেন এই ধরনের কাজ করতে না পারে সেজন্য সংবাদ বিবৃতি দেওয়ার কথা বলেছিলেন।

অবশ্য কলকাতাস্থ বাঙালি কূটনীতিক এম হোসেন আলী তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, তিনি ২৩ এপ্রিল জানতে পারেন বঙ্গবন্ধুকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। কেননা তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রাখায় তিনি অনশন শুরু করেছেন। এ সংবাদ জানার পর হোসেন আলী মুজিবনগর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু তারা কেউ তাঁর এ সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে কোনো বক্তব্য দিতে পারেননি।[৩৯]

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর সরকার গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে যে বিচলিত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে মওদুদ আহমদ মন্তব্য করেন। তিনি বলেছেন, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎকার পেতে তাজউদ্দীন আহমদকে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। তাজউদ্দীন আহমদ বিগত দুই সপ্তাহের ঘটনা বর্ণনাকালে ইন্দিরা গান্ধী ধৈর্য সহকারে তা শোনেন। অবশ্য তাজউদ্দীন তখনও দেশের অভ্যন্তরে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের সম্পূর্ণ সংবাদ জানতেন না। এমনকি অন্যান্য সহকর্মীদের ভাগ্যেও কী হয়েছিল তা জানা না থাকায় তাজউদ্দীন আহমদ পাকিস্তান বাহিনীর হামলার প্রতিক্রিয়ার বাস্তব চিত্র মিসেস গান্ধীর নিকট তুলে ধরতে পারেননি। এমনকি বঙ্গবন্ধু জীবিত আছেন নাকি মৃত তা-ও তিনি জানতেন না। ইন্দিরা গান্ধী জানতে চান তাজউদ্দীন আহমদ কী চান। তাজউদ্দীন আহমদ তখন কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তুলে ধরতে পারেননি। তাঁর জবাব ছিল অস্পষ্ট। তখনকার পরিস্থিতিতে সেটা ছিল স্বাভাবিক। সবশেষে ইন্দিরা গান্ধী তাজউদ্দীন আহমদকে সাহায্য প্রার্থনা করার উপযুক্ততা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। এর জবাবে কী বলবেন তা স্থির করতে তাজউদ্দীন আহমদ সময় নিলেন। কারণ একটি আইনগত অধিকার সৃষ্টি করা না হলে ভারত সরকার কোন ভিত্তিতে সাহায্য সহযোগিতা করবে এ প্রশ্নটি তাজউদ্দীন আহমদ সহজেই বুঝতে পারেন।[৪০]

---

[৩৭] K M Shehabuddin, *ibid,* p. 99
[৩৮] *Ibid*, p. 99
[৩৯] The Diary of Hossain Ali.
[৪০] মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭

অবশ্য তাজউদ্দীন আহমদের উপস্থিত সিদ্ধান্তের কারণে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সরকারের আবেদন অনুসারে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।[৪১] ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অনুকূল সাড়া দেওয়ার পশ্চাতে তিনটি কারণ ছিল। যথা–

ক. পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের নিরবচ্ছিন্ন বৈরি সম্পর্ক এবং সে কারণে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব;

খ. আদর্শিক কারণ বলা যায় কেননা সংসদীয় গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় কংগ্রেসের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত সাদৃশ্য বিদ্যমান;

গ. বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসলীলার কথা বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগিয়েছিল। ভৌগোলিক দিক থেকে নৈকট্যপূর্ণ দেশ ভারতের কাছে মানবিক কারণটি মূখ্য হয়ে দাঁড়ায়। ভারত সরকারের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করার রাজনৈতিক ও মানবিক কারণ সমভাবে বিদ্যমান ছিল।

তাজউদ্দীন আহমদ নিজে উপলদ্ধি করেন যে, মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিচালনার জন্য প্রধান আবশ্যকীয় শর্ত তিনটি-

ক. জনগণের ব্যাপক সমর্থন,

খ. মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল,

গ. সমরাস্ত্রসহ বিভিন্ন উপকরণের নিয়মিত সরবরাহ।

এই তিনটি শর্তের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ ব্যাপক জনসমর্থন ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের স্বল্প আয়তন এবং দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর ক্ষিপ্র চলাচল ও আক্রমণ ক্ষমতার কারণে বাংলাদেশের কোনো অংশই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিরাপদ ছিল না। উল্লেখ্য যে, সদ্য অবমুক্ত করা মার্কিন নথিপত্রে এটা স্পষ্ট যে, নিক্সন প্রশাসন সযত্নে মুক্তিযোদ্ধা শব্দটি ব্যবহার এড়িয়ে গিয়েছে। প্রথমদিকে গেরিলা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং শেষের দিকে মুক্তি ফৌজ বা মুক্তিবাহিনী হিসেবে তাদের নথিপত্রে উল্লেখ করেছে।[৪২] কাজেই মুক্তিবাহিনীর সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য সীমান্তের ওপাড়ে নিরাপদ ঘাটির প্রয়োজন ছিল। প্রবাসী সরকারের জন্য রাজনৈতিক আশ্রয় ও অবাধ কার্যক্রমের প্রশ্নও ছিল সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর পাশাপাশি ছিল সাধারণ শরণার্থীদের আশ্রয় দানের মানবিক প্রশ্ন। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৪৩]

১. ভারত সীমান্ত উন্মুক্ত করা,

২. বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালানোর অধিকার প্রদান করা।

এর বাইরে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করা হয়। কিন্তু এই সাহায্য সহযোগিতার প্রকার ও পরিমাণ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট ধারণা গঠন করা সে সময় সম্ভব হয়নি। তবে এসময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে

---

[৪১] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ১০৭

[৪২] মিজানুর রহমান খান, *১৯৭১: আমেরিকার গোপন দলিল*, ঢাকা: সময় প্রকাশ, ২০১৬। পৃ. ১৮৪

[৪৩] মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

সহায়তা করার জন্য ভারত অস্ত্র সংগ্রহের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেছিল। সুইজারল্যান্ড ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যবর্তী ছোট দেশ লিচেনস্টেইনে অবস্থিত অস্ত্র তৈরির প্রতিষ্ঠান 'সালগাদ' ইসরায়েলের জন্য অস্ত্র তৈরি ও যোগান দিতো। সালগাদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্লোমো জাবলুডোয়িচের সঙ্গে পি এন হাকসারের ১৯৬৫ সালে লন্ডনে পরিচয় হয়। হাকসারের অনুরোধে জাবলুডোয়িচ ৩ আগস্ট লন্ডনে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার প্রকাশ কাউলের সঙ্গে দেখা করে ভারতে অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন। জাবলুডোয়িচ ইরান ও তুরস্কের জন্য তৈরি অস্ত্রের চালান ভারতে পাঠিয়ে দেন। এছাড়াও ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মজুদ থেকে কিছু অস্ত্র আকাশপথে ভারতে পাঠানো হয়। ইসরায়েলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গোল্ড মেয়ার ইন্দিরা গান্ধীকে এক চিঠিতে জানান, ভারতের বিপদের সময় ইসরায়েল অতীতেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এখনো তা করে যাচ্ছে। চিঠিতে তিনি সাহায্যের প্রতিদান হিসেবে ভারতের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত দেন। অবশ্য ইন্দিরা গান্ধী এই অনুরোধ এড়িয়ে যান।[৪৪] এ সময় ইসরায়েল সরকার ভারতের ডানপন্থি রাজনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা বাংলাদেশের কয়েকজন সাংসদের মাধ্যমে ইসরায়েলের কাছে সাহায্যের প্রস্তাব দেয়। এটি জানতে পেরে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব কামাল সিদ্দিকী সিপিএমের পত্রিকায় তথ্যটি জানিয়ে দেন। সংবাদটি ওই পত্রিকায় ছাপা হয়। এরপর ইসরায়েল লবির তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়।[৪৫]

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলে তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগের সকল নির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএ'দের একটি সভা আহ্বান করার কথা ভাবেন। সভাটির সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ করেন কুষ্টিয়া জেলার সীমান্তে। এ সভার অধিবেশনে বাংলাদেশের পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ তথা স্বীয় মাতৃভূমি রক্ষার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একটি সরকার গঠনের ব্যাপারে আলোচনা করবেন। শেষ পর্যন্ত প্রবাসে সরকার গঠিত হয় তাজউদ্দীন আহমদের বিচক্ষণতা ও একাগ্রতার ফলে। ভারত উত্তরোত্তর অধিকতর রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সমর্থন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নিযুক্ত করে। সবই হয়েছে ধাপে ধাপে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। কেননা নেতৃত্বের দায়িত্ব শেখ মুজিব কাউকে দিয়ে যাননি। তাহলে তাজউদ্দীন কেন? সে সময় সবাই ভেবেছেন, আমিও হতে পারি শাসনক্ষমতার প্রধানতম ব্যক্তি। এই ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্ব মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিন অবধি বিদ্যমান ছিল।[৪৬]

২.২ মুজিনগর সরকার গঠন ও প্রধানমন্ত্রীত্ব নিয়ে বিতর্ক

এপ্রিল মাসের শুরুতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের সাক্ষাৎ এর পর একটি প্রবাসী সরকার গঠন ও যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য নীতি গ্রহণ আবশ্যকতা দেখা দেয়। দিল্লিতে যখন তাজউদ্দীন আহমদ মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক পরিকল্পনা শুরু করেন, সে সময় অর্থাৎ ৪ এপ্রিল সিলেট জেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানে ইস্ট বেঙ্গল

---

[৪৪] মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭। পৃ. ১২৬-১২৭

[৪৫] কামাল সিদ্দিকীর সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ২০৯-২১০

[৪৬] এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মীর্জা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-১৯

রেজিমেন্টের বিদ্রোহী ইউনিটগুলোর কমান্ডারগণ প্রতিরোধ যুদ্ধ ও সম্মিলিত কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আলোচনায় বসেন। এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আতাউল গনি ওসমানী, লে. কর্নেল আবদুল রব, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর শফিউল্লাহ, মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর নুরুল ইসলাম, মেজর মমিন চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন। এই ধরনের বৈঠক সে সময় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর সহায়তায় এই সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে তাজউদ্দীন আহমদ পেয়ে যান।[৪৭] এই বৈঠকে বিদ্রোহী কমান্ডারগণ যে সকল সমস্যা তাদের সম্মুখে উপস্থিত বলে মনে করেন-

ক. তাদের সকলের আঞ্চলিক অবস্থান ও প্রতিরোধের খণ্ড চিত্র দিয়ে বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বোঝা যাচ্ছে না,

খ. দেশের সকল স্থানে পাকিস্তানি বাহিনী দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। অগ্রসর হওয়ার পথে জনপদের পর জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে। তাদের এ অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করা প্রয়োজন,

গ. আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবিলা করা স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে সম্ভব হচ্ছে না,

ঘ. পাকিস্তান বাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ সহ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রয়োজন,

ঙ. পাকিস্তান বাহিনীকে মোকাবিলা ও প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন,

চ. বাইরের বিশ্ব থেকে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা তুলে ধরে একটি স্বাধীন সরকার গঠন প্রয়োজন। কেননা স্বাধীন সরকার ছাড়া অন্য দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনা সম্ভব নয়।

এসকল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বিদ্রোহী কমান্ডারগণ সিদ্ধান্ত নেন, বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনে সম্মিলিত মুক্তিফৌজ গঠন করা এবং কর্নেল ওসমানীকে এ মুক্তিফৌজ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া। তাঁদের এ উদ্যোগের সংবাদ তাজউদ্দীন আহমদ দিল্লিতে থাকাকালীন জানতে পারেন। তাজউদ্দীন নিজেও যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছিলেন এবং তার সমাধানের পথ খুঁজছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদের ভাবনাগুলো মুক্তিফৌজের এ সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হয়। পরবর্তীতে এই চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তাজউদ্দীন আহমদের প্রথম বেতার ভাষণে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দিল্লিতে অবস্থানকালীন তাজউদ্দীন আহমদ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ও রেহমান সোবহানের সহযোগিতায় স্বাধীনতা যুদ্ধের মূলনীতি সম্বলিত একটি বক্তৃতা তৈরি করেন। ১১ এপ্রিল বাংলাদেশের নিজস্ব বেতার কেন্দ্রের অভাবে শিলিগুড়ির এক অনিয়মিত বেতার কেন্দ্র থেকে তা প্রচার করা হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতির উদ্দেশ্যে এটি ছিল তাজউদ্দীন আহমদের প্রথম ভাষণ। তখনও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়নি। তাই এ ব্যাপারে ভারতের সহায়তা প্রয়োজন ছিল।[৪৮] পরবর্তীতে তা আকাশবাণী-র নিয়মিত কেন্দ্রসমূহ থেকে পুনঃপ্রচারিত হয়। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১০ এপ্রিল এক বিবৃতির মাধ্যমে প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছিল যে, নির্বাচিত সংখ্যাগুরু দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এই সরকার গঠিত হয়েছে। কিন্তু দেশ-বিদেশের

---

[৪৭] সালাম আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬

[৪৮] *ওই*, পৃ. ১৩৬

সাংবাদিকরা ছাড়াও ভারতের ধর্মীয় দক্ষিণপন্থি মহল এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে।[৪৯] ইতিমধ্যে তাজউদ্দীন আহমদ দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে এ এইচ এম কামরুজ্জামানের সন্ধান পান। কামরুজ্জামান এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে ও উপস্থিত আওয়ামী লীগ এবং যুব নেতৃবৃন্দকে দিল্লি বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করেন। এ বিষয়টি মঈদুল হাসান উদ্ধৃত করেছেন এভাবে-

> ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনাকালে কোন বিবেচনা থেকে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও সরকার গঠনকে অনির্বতনীয় বিষয় হিসাবে উপস্থিত করেন তাও ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যের ব্যাপারে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করার যৌক্তিকতা অথবা দিল্লী আলোচনার উপযোগিতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলেননি। তারা অধিকাংশই বিতর্ক তোলেন মুখ্যতঃ তাজউদ্দিনের প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের বৈধতা নিয়ে। [৫০]

এ বিতর্ক চরম অবস্থায় পৌঁছলে তাজউদ্দীন আহমদ নিজে ধৈর্য সহকারে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কে বা কারা দিবেন এ বিষয়ে কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত না থাকায় দলের মধ্যে নেতৃত্ব-কলহ ও বিশৃঙ্খলা একরূপ অবধারিত বিষয় ছিল। এ সময় তাজউদ্দীন আহমদের মনে আশঙ্কা ছিল যে, মার্চের অসহযোগ আন্দোলন, ২৬ মার্চ থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, বাঙালি সশস্ত্রবাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ এবং সম্মিলিত জনতার প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে অবয়ব ফুটে উঠতে শুরু করেছে তা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব-কলহ ও বিশৃঙ্খলার কারণে নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত আশ্বাস কার্যকর রূপ পাওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী সরকার গঠনে কোনো বড় পরিবর্তন শেখ মুজিব কর্তৃক সরকার গঠিত হওয়ার দাবি সম্পর্কেই সন্দেহের উদ্রেক ঘটাতে পারে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত ক্ষতি সাধন করতে পারে। কেননা ইতিমধ্যে তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি বিপ্লবী সরকার গঠিত হযেছে। তবে এসকল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও স্বাধীন সরকারের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে তাজউদ্দীন আহমদ শেষ পর্যন্ত অটল ছিলেন।[৫১] আবার ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, তাজউদ্দীন আহমদ একটি সরকার গঠন নিয়ে উদ্‌বিগ্ন ও চিন্তাক্লিষ্ট ছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কাকে নিয়ে সরকার গঠন করা হবে? এতে আমীর-উল ইসলামের স্বাভাবিক উত্তর ছিল- বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করে রেখে গিয়েছেন। তাঁর যুক্তি ছিল, যে পাঁচ জন নিয়ে বঙ্গবন্ধু হাই কমান্ড গঠন করেছিলেন তাদেরকে নিয়েই সরকার গঠন করা হবে। উল্লেখ্য যে, দলীয় প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ও তিনজন সহ সভাপতি নিয়ে এই হাই কমান্ড পূর্বেই গঠিত হয়েছিল। তাজউদ্দীন আহমদ এতে সন্তুষ্ট না হয়ে পরবর্তী প্রশ্ন করেন, প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? এক্ষেত্রে আমীর-উল ইসলাম বিনা দ্বিধায় উত্তর দিয়েছিলেন,

---

[৪৯] এম আর আখতার মুকুল, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৭। পৃ. ৬১
[৫০] মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
[৫১] ওই, পৃ. ১৬-১৭

২৫ মার্চের পর থেকে অদ্যাবধি যিনি প্রধান দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনিই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ের দায়িত্ব পালন করবেন।[৫২]

সরকার গঠন ও তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমন্ত্রীত্ব নিয়ে বিতর্ক জোরালো হয়ে ওঠলে তাজউদ্দীন আহমদ উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, কেন তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এর পশ্চাতে তাজউদ্দীন আহমদ তিনটি যুক্তি তুলে ধরেন–

১. তাজউদ্দীন আহমদ এবং আমীর-উল ইসলাম কী অবস্থার মধ্য দিয়ে কলকাতায় আসেন ও সেখান থেকে দিল্লি গিয়েছেন এবং কোন প্রেক্ষিতে নিজেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচয় তুলে ধরেন। তাজউদ্দীন আহমদ বলেন যে, আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন তা তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বশেষ অবস্থাও তাঁর অজানা ছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে তাঁর এককভাবে সাক্ষাৎ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না।[৫৩]
২. ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কথা বলেছেন। কেননা দলের সভাপতি বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কথা বলার এখতিয়ার তাঁর আছে।
৩. ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে মাত্র। ভবিষ্যতে আরো আলোচনা হবে। তখন দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হবেন।

এসব আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের পর এ এইচ এম কামরুজ্জামান একটি পরিপূর্ণ সরকার গঠনে সহায়তার ব্যাপারে তাজউদ্দীন আহমদকে আশ্বস্ত করেন।[৫৪] এতসব বিতর্কের পরেও তাজউদ্দীন আহমদকে কিন্তু অনেকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। তা এম আর সিদ্দিকীর সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট প্রতীয়মান–

> We expected that Syed Nazrul Islam, being next to Sheikh Mujib as 1st Vice-President, will bead the government as Prime Minister but Mr. Tajuddin said he had already told Mrs. Gandhi that he was the Prime Minister and our credibility will be gone if we change it. Khondoker Mustaque Ahmed did not agree and most MNA's also disagreeed. As a result deadlock arose.[৫৫]

মুজিবনগর সরকার গঠনের পর এমন কথাও প্রচার করা হয় যে, তাজউদ্দীন আহমদই শেখ মুজিবের গ্রেফতারের জন্য দায়ী। তাজউদ্দীন নিজে নেতৃত্ব দখলের জন্য বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারে সহায়তা করেছেন বলে আওয়ামী লীগ কর্মী সমর্থকদের মধ্যে প্রচারণা চালানো হয়।[৫৬] আবার আওয়ামী লীগের মধ্যে তাজউদ্দীন বিরোধীরা এই প্রচারণা চালাচ্ছিল যে, তিনি বামপন্থি রাজনীতিবিদ এবং যতদিন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন ততদিন ভারত বাংলাদেশকে সর্বাত্মক সমর্থন দিবে না।[৫৭]

---

[৫২] আমীর-উল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬
[৫৩] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০
[৫৪] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ১১১
[৫৫] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ১৮৫
[৫৬] এম এ মোহাইমেন, *ঢাকা-আগরতলা-মুজিবনগর*, ঢাকা: পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯। পৃ. ৮৩-৮৪
[৫৭] ফারুক আজিজ খান, *বসন্ত ১৯৭১*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭ তৃতীয় মুদ্রণ। পৃ. ১৪২

তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তিনি বঙ্গবন্ধুকে তাঁর জীবনের একমাত্র নেতা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এসব ভাবতে হচ্ছে বলে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। এমনকি সহকর্মীদের মধ্যে কাউকে খুঁজতেন তাঁর এই ভার লাঘব করতে। কেননা একজন ব্যক্তি হিসেবে মন ও মানসিকতার দিক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজনীতির এই সংকীর্ণ মনোবৃত্তিতে কখনোই অভ্যস্থ ছিলেন না। তাই তাঁকে অনেক কষ্ট ও বেগ পেতে হয়েছে।[৫৮]

এত সব বিতর্কের মধ্যে কেন তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিনের সঙ্গে আলাপচারিতায় ওঠে আসে। তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন- 'I represent the democratic people of Bangladesh and as such it is my duty to translate their will into action – which is of couse the liberation of Bangladesh.'[৫৯]

প্রবাসী সরকার গঠন ও তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব ও সংকট তৈরি হয়েছিল তার সংবাদ ভারত সরকারের অজানা ছিল না। আওয়ামী লীগের কয়েকজন এমএনএ ও এমপিএ ভারত সরকারকে এ ব্যাপারে অবহিত করে। আওয়ামী লীগের এ দ্বান্দ্বিক অবস্থার বর্ণনা একজন কূটনীতিকও প্রত্যক্ষ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন যে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের মধ্যে এ ধরনের পরিস্থিতি নিয়ে কোনো প্রস্তুতি ছিল না। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন উঁচু মাপের ব্যক্তি যাকে বটগাছের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাঁর অনুপস্থিতিতে এমন কোনো ব্যক্তি ছিল না যে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে পারে। তাঁর অনুপস্থিতির ফলে দলের পদমর্যাদার মধ্যে যারা ছিলেন তারা কেউ একসাথে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। এমনকি শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দরাও একমত হতে পারেননি। এটি দুঃখজনক যে, তাদের মধ্যে কোনো কোনো মন্ত্রী একে অপরের সাথে কথাও বলতেন না।[৬০]

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ২০ জুন কলকাতায় ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের যুগ্ম সচিব অশোক রায় দলীয় এমএনএ ও এমপিএ'দের একটি যৌথসভা আহ্বান করার জন্য তাজউদ্দীন আহমদকে অনুরোধ করেন। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ৫-৬ জুলাই শিলিগুড়িতে সম্মেলনের স্থান ও তারিখ নির্ধারিত হয়।[৬১] জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রায় তিন শতাধিক নির্বাচিত বাঙালি প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগ দেয়। প্রবাসী সরকারের প্রয়োজনমত সম্পদ আহরণের ব্যর্থতা ও সরকারি ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে এ সম্মেলনে আলোচনা হয়। সম্মেলনে তাজউদ্দীনের প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণের যোগ্যতা ও বৈধতা নিয়ে অনেকে সোচ্চার হন। ভারত সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ে ব্যর্থতার জন্য অনেকেই তাজউদ্দীন আহমদকে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করতে বলেন। তাজউদ্দীন বিরোধী এ প্রচারণায় নেতৃত্ব দেন খোন্দকার মোশতাক আহমেদ ও মিজানুর রহমান চৌধুরী।[৬২] এ সম্মেলনে কয়েকটি গ্রুপ নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মন্ত্রিসভার ব্যর্থতাকে সকলের সামনে উপস্থাপন করেছিল। যাদের মূল লক্ষ্য ছিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। তাদের

---

[৫৮] আমীর-উল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

[৫৯] K M Shehabuddin, *ibid,* p. 102

[৬০] The Diary of Hossain Ali.

[৬১] ভারত সরকার ২৯ জুন মেঘালয় রাজ্যের তুরায় এই অধিবেশন আয়োজন করার কথা বলেছিল।

[৬২] মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

দাবি ছিল এ দুজনের পদত্যাগ। এমনকি আওয়ামী লীগের ভেতরে একটি গ্রুপের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের যোগ্যতা এবং তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের বৈধতা নিয়ে নানা বিরুদ্ধ প্রচারণাও চলতে থাকে। ভারতের কূটনৈতিক স্বীকৃতি আদায়ে বিলম্ব এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত শেষ পর্যন্ত সমর্থন করবে কিনা তা-ও ছিল তাদের আলোচ্য বিষয়। খোন্দকার মোশতাক আহমেদ ও তাঁর গ্রুপ এসবের পেছনে সুক্ষ্মভাবে প্রচারণা চালাচ্ছিল। এছাড়া মন্ত্রিসভার বাইরে মিজানুর রহমান চৌধুরী গণপরিষদের অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের পদত্যাগ দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রধানমন্ত্রী হলে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তিনি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের পদে বহাল থাকতে পারেন না। এর বাইরে মুক্তিযুদ্ধ তরান্বিত করার ক্ষেত্রে বিষয়গত ও বস্তুগত দুর্বলতার প্রশ্নও এই সম্মেলনে উত্থাপন করা হয়।[৬৩]

মুজিবনগর সরকারের নিকট প্রমাণ ছিল যে- সামরিক বাহিনীর, এমনকি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের কতিপয় সদস্য পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী। এ প্রমাণের সমর্থন রয়েছে বাঙালি কূটনীতিক এম হোসেন আলীর ডায়েরিতে। কনফেডারেশন গঠনের কূটনীতিক তৎপরতা তখনও অব্যাহত ছিল। উল্লেখ্য যে, খোন্দকার মোশতাক আহমেদের কনফেডারেশন গঠনের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর অবস্থা এমন হয় যে, তাঁকে আর বিশ্বাস করা যাচ্ছিল না। পরবর্তীকালে খোন্দকার মোশতাকের ভূমিকা একেবারেই গৌণ হয়ে পড়ে। তিনি মুজিবনগর মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হিসেবে বহাল থাকলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মহলে তাঁর প্রভাব একেবারেই ছিল না। সবার মধ্যে প্রচারিত হয় যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরকারের অনুমতি ব্যতীত যোগাযোগ করেছেন। এ অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার সময় তিনি প্রায় গৃহবন্দি ছিলেন। এমনকি তিনি গঙ্গার তীরে সান্ধ্য ভ্রমণের অনুমতি চেয়েছিলেন কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তা নাকচ করে দেয়।[৬৪] এমতাবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে বাংলাদেশের সরকারকে কার্যকর সামরিক ও রাজনৈতিক সর্বোপরি কূটনীতিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতকে সবদিক নতুন করে যাচাই করে নিতে হয়।[৬৫] এরকম পরিস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধীর আসন্ন বিদেশ সফর, বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের অভ্যন্তরে নাজুক অবস্থা, সেনাবাহিনীর কাঠামোয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক উপনির্বাচন ও শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের পদক্ষেপ এবং আওয়ামী নেতৃত্বের উপদলীয় কোন্দল, কতিপয় বাঙালি সদস্যের পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন ও আত্মসমর্পণ ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করেছিল। এ খবরও ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান হতে ’৭০ এর নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের শূন্য আসনে উপনির্বাচন হতে যাচ্ছে।[৬৬]

জাতীয় পরিষদের ১১০ জন ও প্রাদেশিক পরিষদের আনুমানিক ২০০ জন সদস্য শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত গণপরিষদ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। শপথ নেওয়া হয়, “শত্রুদের জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে চিরদিনের মতো পরাস্ত করে স্বাধীনতা

---

[৬৩] আবু সাইয়িদ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা কূটনৈতিক যুদ্ধ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪। পৃ. ৫৭
[৬৪] কামাল সিদ্দিকীর সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ১৪২
[৬৫] আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
[৬৬] ওই, পৃ. ৫৭

সমুন্নত রাখতে হবে।” প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, “আমরা যদি ভুল করে থাকি তবে দেশ স্বাধীন হলে আপনারা আমাদের বিচার করবেন এবং আপনাদের রায় মাথা পেতে নেব।” “পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়।”[৬৭] অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন-

> মনে রাখবেন বর্তমান মুহূর্তে যুদ্ধের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ঐক্যের। আপনাদেরকে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যদি আমাদের নীতি ও আদর্শ থেকে কোনদিন বিচ্যুতি দেখেন, আপনারা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু বাংলার এই সংকট মুহূর্তে, জাতির স্বাধীনতার এই ক্রান্তিলগ্নে যেখানে শত শহীদের রক্তে ইতিহাস লেখা হয়েছে, আর যেখানে হাজার হাজার সৈনিক বন প্রান্তরে ইতিহাস লিখে চলেছে, সেই মূহূর্তে আর একবার আপনারা আস্থা স্থাপন করুন।. . .
>
> আপনারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ বিশ্বাস করে তাদের দায়িত্ব আপনাদের ওপর অর্পণ করেছিল। আপনারা সবাই বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক বৈ আর কিছু নন। আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ দিনের সহচর হিসাবে তার জীবনব্যাপী আদর্শ আর সংগ্রামের আমরা ধারক ও বাহক।. . . বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছেন। আমরা জানতাম বঙ্গবন্ধু যদি গ্রেপ্তার হন, তবে স্বাধীনতা ঘোষণা তিনি করেই যাবেন। আর এই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে।[৬৮]

সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির বক্তৃতার পর উপস্থিত অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি তাজউদ্দীনের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন। এ সম্মেলনের পর মুজিবনগর সরকারের মধ্যকার বিরোধ কিছুটা প্রশমিত হলেও পুরোপুরি দূরীভূত হয়নি।

মুজিবনগর সরকার গঠনে তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় প্রতিকূলতার মধ্যে যে প্রশ্নটি প্রথম দেখা দেয় তা হচ্ছে তাজউদ্দীন আহমদের উত্তরাধিকার প্রশ্ন। এক্ষেত্রে এইচ টি ইমাম যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন-

> বঙ্গবন্ধু তাকে ২৪ তারিখে অন্যত্র নিরাপদ এবং নির্দিষ্ট স্থানে থাকতে বলেছিলেন, যথাসময়ে নির্দেশ পাঠাবেন এই কথা বলে। ২৫-২৬ মার্চের বিশৃঙ্খল ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি সীমান্ত অতিক্রমের সিদ্ধান্ত নেন ৩০ মার্চ। প্রাথমিক অবস্থায় নেতৃস্থানীয় কেউ তার সাথে ছিল না (একমাত্র ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম ব্যতীত)। অসীম ধৈর্য্যের সাথে তিনি একে একে সকলের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করেন।
>
> সম্মিলিতভাবে তারা সিদ্ধান্ত নেন স্বাধীনতা এবং আইনের প্রয়োগ সম্পর্কিত ঘোষণার। সংগ্রামের সেই গোড়ার দিকেই তাজউদ্দীন আহমদ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ করে বাংলাদেশকে হানাদার মুক্ত করার একমাত্র উপায় সশস্ত্র সংগ্রাম। এই মুক্তিযুদ্ধকে সফল করার যেটি চূড়ান্ত লক্ষ্য- ভারত ও অন্যান্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল (অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক) দেশসমূহের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করা। এই জিনিস অর্জন করতে হলে পূর্বশর্ত একটি সরকার গঠন করা, যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। গ্রহণযোগ্যতা পেতে হলে প্রয়োজন পূর্ববাংলা থেকে নির্বাচিত সকল (অথবা অধিকাংশ) জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমর্থন। কাঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্য্যের সাথে তাকে এটি অর্জন করতে হয় ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগেই।[৬৯]

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দুই দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকগুলো ছিল ভারতের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার প্রথম ধাপ। কিন্তু এপ্রিলে মুজিবনগর সরকার গঠন

---

[৬৭] আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

[৬৮] ওই, পৃ. ৫৮

[৬৯] এইচ টি ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

চূড়ান্ত পর্যায়ে সমস্যা দেখা দেয়। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করার পর থেকেই এ অসন্তোষ প্রত্যক্ষ করা যায়। খোন্দকার মোশতাক আহমেদ শুরু থেকেই তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর দাবি ছিল তিনি আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি। সে হিসেবে বঙ্গবন্ধুর পরেই দলে তাঁর স্থান। এদিক বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রীর দাবিদার তিনি। অপরদিকে কিছু লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ এইচ এম কামরুজ্জামানও দাবি করেন যে, প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবিদার তিনি। কেননা তিনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। এ এইচ এম কামরুজ্জামান শুরুতে দ্বিমত করলেও পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সকল কাজে সহযোগিতা করেন। কিন্তু খোন্দকার মোশতাক আহমেদ প্রথম থেকেই মুজিবনগর সরকারকে অসহযোগিতা করে আসছিলেন। এমনকি এটি সর্বজনবিদিত যে, খোন্দকার মোশতাক[৭০] শুরু থেকেই বৈদেশিক একটি পরাশক্তির মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ করেন। যা পরবর্তীতে ভারত সরকার মুজিবনগর সরকারকে জানিয়ে দেয়। ফাঁস হয়ে যায় খোন্দকার মোশতাক আহমেদের কনফেডারেশন গঠনের ষড়যন্ত্র। গোয়েন্দা রিপোর্টে জানা যায় যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ তাঁর বিশ্বাসভাজন কয়েকজনকে নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে মুজিবনগরে প্রত্যাবর্তন কালে তেহরানে যাত্রাবিরতি করবেন। সম্ভব হলে মুজিবনগর থেকে আরও ক'জন এ সময়ে তেহরানে উপস্থিত হবেন। এই তেহরান নগরীতেই ইরানের শাহেন শাহ'র মধ্যস্থতায় ইসলামাবাদ থেকে আগত উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। অতঃপর বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং যুদ্ধবিরতি ও পাকিস্তান কনফেডারেশন গঠন সম্পর্কিত যৌথ ঘোষণা হবে।[৭১] কিন্তু এ সকল বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মঈদুল হাসান তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমন্ত্রী হওয়া নিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা উল্লেখ করার মতো- 'তাজউদ্দীন ছিলেন, 'দলের সকল মূল কর্মকাণ্ডের নেপথ্য ও আত্মপ্রচার বিমুখ সংগঠক। ৭১ এর মার্চে অসহযোগ আন্দোলনের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মুজিবের পরেই ছিল সম্ভবত তার স্থান।'[৭২]

আবার এইচ টি ইমামও তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন করেন- দুই দশকেরও বেশি সময় তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী ছিলেন। তাঁকে বলা হয় বঙ্গবন্ধুর 'ডান হাত'। ১৯৬৪ সাল থেকে সকল দলীয় নীতি ও কর্মসূচির অন্যতম মূখ্য প্রণেতা ছিলেন তিনি।[৭৩] এসকল দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে একটি প্রবাসী সরকার গঠনে তাজউদ্দীন আহমদের বিকল্প কেউ ছিল না। অনেকে যখন নেতৃত্বের আসীনে সমাসীন হতে দ্বন্দ্বে লিপ্ত তখনও কিন্তু ভেবে দেখেনি মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে পরিচালিত হবে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাবে। সেদিক থেকে তাজউদ্দীন আহমদের চিন্তা ছিল অগ্রগামী।

---

[৭০] খোন্দকার মোশতাক ৩০ মার্চ পর্যন্ত ঢাকায় হক নার্সিং হোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এপ্রিলের প্রথম দিকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে তিনি আগরতলা যান এবং ওমরাহ পালনের জন্য মক্কা গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য প্রদানের সম্মতি ও তাঁকে মন্ত্রিসভায় নিতে তাজউদ্দীন আহমদের আগ্রহের কথা জানতে পেরে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতে চান।

[৭১] এম আর আখতার মুকুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

[৭২] মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

[৭৩] এইচ টি ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

২.৩ মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ ও সরকার কাঠামো

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা তাজউদ্দীন আহমদ অনুভব করেন। কারণ আলোচনায় তিনি নিজেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন এবং ইন্দিরা গান্ধীকে জানিয়েছেন ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সরকার গঠন করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ অনেকটা একক সিদ্ধান্তে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে নতুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন।[৭৪] যদিও এ ঘোষণা পরবর্তী সময়ে কলকাতায় অবস্থানরত আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছিল কিন্তু ওই সময়ে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ও ভারতের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা পাওয়ার জন্য তাজউদ্দীনের সামনে অন্য কোনো বিকল্প পথ খোলা ছিল না। এক্ষেত্রে তাজউদ্দীন আহমদ দিল্লিতে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকেননি। ৯ এপ্রিল সকালে তাজউদ্দীন আহমদ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে সাথে নিয়ে এক পুরোনো ডাকোটা প্লেনে করে প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভার অবশিষ্ট সদস্যদের সন্ধানে বের হন। মালদহ, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি, রূপসা (ধুবড়ীর কাছে) ও শিলচর ঘুরে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, আবদুল মান্নান ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে খুঁজে পান। তাজউদ্দীন আহমদ আগরতলা পৌঁছান ১১ এপ্রিল। খোন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং কর্নেল ওসমানী আগরতলায় অপেক্ষা করছিলেন। এদের সকলের সঙ্গে দু'দিন ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক চলার পর তাজউদ্দীন আহমদ কর্তৃক প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভার গঠন ও আয়তন অক্ষুণ্ন রাখা হয়।[৭৫]

প্রথমে মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণের জন্য ১৪ এপ্রিল তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং শপথ গ্রহণের স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চুয়াডাঙ্গা। কিন্তু ১৩ এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চুয়াডাঙ্গা দখল করে নেয়। তাই অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের তারিখ নির্ধারিত হয়। চুয়াডাঙ্গার পরিবর্তে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার সীমান্তবর্তী গ্রাম বৈদ্যনাথ তলা নির্ধারণ করা হয়।[৭৬] শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিদেশি সাংবাদিকরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যাচাই করে নিচ্ছিলেন আদৌতে গ্রামটা সত্যিই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কিনা।[৭৭] কেন চুয়াডাঙ্গার পরিবর্তে মেহেরপুর মহকুমাকে শপথ গ্রহণের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয় তার পশ্চাতে যেসকল বিষয় বিবেচ্য ছিল-

ক. মেহেরপুর ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে অবস্থিত সুদৃঢ় অঞ্চল,

খ. মেহেরপুরের এসডি তৌফিক ই ইলাহী এ অঞ্চলের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন,

---

[৭৪] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩

[৭৫] মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

[৭৬] তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ভারতে যাবার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, চুয়াডাঙ্গায় প্রবাসী সরকারের রাজধানী স্থাপন করবেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতা ডা. আসহাবুল হক এ সিদ্ধান্ত গোপন রাখতে পারেননি। পরে নিরাপত্তার কারণে মেহেরপুরে রাজধানী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সূত্র: রাজীব আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, ঢাকা: বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনার লি., ১৯৮১। পৃ. ১৪৪

[৭৭] এম আর আখতার মুকুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১

গ. আকাশবাণীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা জানার পর পাকিস্তানিরা আক্রমণ শুরু করার পূর্বে যেন ভারতের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়া যায়,

ঘ. ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী বা বিএসএফ এর পরামর্শে এই স্থানটি শপথ গ্রহণের জন্য নির্ধারণ করা হয়।

শপথ গ্রহণের পর তাজউদ্দীন আহমদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ স্থানের নামকরণ করেন মুজিবনগর এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর সরকার হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। এ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কর্নেল (অব.) আতাউল গনি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৭৮] ১০ এপ্রিলে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পাঠ করে শোনানো হয়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রধান প্রশ্ন ছিল 'সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায়? এর জবাবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জানান, আমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই মন্ত্রিসভা গঠন করেছি। তার সাথে আমাদের চিন্তার যোগাযোগ রয়েছে।'[৭৯] উল্লেখ্য যে, তাজউদ্দীন আহমদের প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ঐক্যমতে পৌঁছার পর মন্ত্রিসভার ক্ষমতার পরিসরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের দিন ঘোষিত স্বাধীনতার আদেশ ঘোষণায় তা প্রতিফলিত হয়। 'স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণা'র প্রধান ও মূল প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে নবগঠিত সরকারের আইনগত ভিত্তি বৈধকরণের প্রশ্ন দেখা দেয়। তাজউদ্দীন আহমদের ১১ এপ্রিলের প্রথম বেতার ভাষণকে বৈধ সরকার গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণার তারিখ ১০ এপ্রিল বলে ঘোষণা করা হয়। ১৭ এপ্রিল নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের পক্ষ থেকে প্রচারিত এই স্বাধীনতা ঘোষণায় শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা, এমনকি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগ, ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ করা হয়। এই আদেশটি ২৬ মার্চ থেকে কার্যকরী বলে উল্লেখ করা হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের হাতে কার্যনির্বাহী ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন তাদের সে প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়।[৮০] ১১ এপ্রিল কলকাতার আকাশবাণীর মাধ্যমে তাজউদ্দীন আহমদ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা অনেকেই শুনতে পেয়েছিলেন। এই ভাষণে তাজউদ্দীন আহমদ কোনো একটি সঙ্গত কারণেই স্বাধীন সরকার গঠন সংক্রান্ত সব সংবাদ গোপন রেখে কেবল প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলো ঘোষণা করেছেন। বাস্তব কোনো অসুবিধার কারণে দলের যৌথ নেতৃত্ব গঠন বা যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সম্ভবত তাঁর ছিল না। এ ধরনের কোনো যৌথ নেতৃত্ব বা মন্ত্রিসভা যে শিগগির গঠিত হবে, সে ইঙ্গিতও অবশ্য তাঁর বক্তৃতায় ছিল না।

মওদুদ আহমদ মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটির চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর বক্তব্যে-

---

[৭৮] এম আর আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি*, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৪। পৃ. ১৯

[৭৯] আমীর-উল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

[৮০] মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

A guard of honor parade was arranged by the local freedom fighters initially known us Mukti Fouz under the guidence of Mahbub Uddin Ahmed, a young police officer and the whole ceremony was witnessed by more than hundred foreign and Indian mediamen.[৮১]

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। একজন তরুণ পুলিশ অফিসার মাহবুব উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে প্রাথমিকভাবে 'মুক্তিফৌজ' হিসেবে পরিচিত স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল মন্ত্রিসভার গার্ড অব অনার কুচকাওয়াজে অংশ নেয়। বৈদ্যনাথতলার আমবাগানের পার্শ্ববর্তী বাড়ি থেকে কিছু চেয়ার, টেবিল নিয়ে অতিথিদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। শপথ গ্রহণকারীদের জন্য এখানে একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়। পুলিশ ও ইপিআর সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে। দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের মুজিবনগর নিয়ে আসার দায়িত্ব পালন করেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, আবদুস সামাদ আজাদ ও ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আবদুল মান্নান এমএনএ। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। নবপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের নাম দেওয়া হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'।[৮২] দেশের নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাজউদ্দীন আহমদ রেহমান সোবহানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। রেহমান সোবহান বরাবরই বামপন্থি দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। তিনি প্রস্তাব করেন, যখন দেশের স্বাধীনতার জন্য জনগণ বিপ্লবী ধারায় আন্দোলন শুরু করেছে, তখন এটার নাম হওয়া উচিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অর্থাৎ People's Republic of Bangladesh।[৮৩] স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠের পর কয়েকজন ছেলে গায় 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।' শপথ গ্রহণ শেষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার সদস্যদের উপস্থিত সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সবশেষে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের জনগণ ও বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ যে বক্তৃতা দেন তা ছিল একটি যুদ্ধকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার বক্তৃতা। এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা যে একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা সেটি সবাইকে জানানো। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কয়েকটি স্থানে তখনও যুদ্ধ চলছিল। এমনকি এ প্রেক্ষাপটে তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর বক্তৃতায় যুদ্ধাঞ্চল নিয়েও কথা বলেন।[৮৪] ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রায় দুই ঘন্টা পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ স্থানটিতে বোমা বর্ষণ করে এবং এ অঞ্চলটি দখল করে নেয়। মুজিবনগর প্রশাসনকে সুবিধাজনক মুক্তাঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সকল কাজকর্ম পরিচালিত হয় মুজিবনগরের নামে।[৮৫] মুজিবনগর সরকার গঠন হওয়ার পর মার্কিন কূটনীতিক আর্চার কে ব্লাড লিখেছেন,

On April 17 the `Mujibnagar' government formally proclaimed independence and Mujib, in

[৮১] Moudud Ahmed, *Constitutional Quest for Autonomy 1950-1971,* Dhaka: UPL, 1979., p. 266

[৮২] গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার শিরোনামে লেটারহেড ছাপানো হয়েছিল। পরে গণপ্রজাতান্ত্রিক শব্দ সংশোধন করে গণপ্রজাতন্ত্রী শব্দ ব্যবহার করা হয়। সূত্র: এইচ টি ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

[৮৩] এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মীর্জা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

[৮৪] আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ '৭১*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭। পৃ. ৫৭৬

[৮৫] শামসুল হুদা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

prison in west Pakistan, as president.[৮৬] মুজিবনগর সরকার এর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন শামসুল হুদা চৌধুরী। তাঁর ভাষায়–

> ঐ দিন বেলা পূর্বাহ্ন ১১টা ১০ মিনিট সময়ে কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথ তলায় আয়োজিত ঐ সভামঞ্চের পশ্চিম দিক থেকে এলেন নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত জনতা মুহূর্মুহূ করতালি দিয়ে নেতৃবৃন্দকে স্বাগতঃ জানালেন। সদ্য গঠিত সশস্ত্র বাহিনীর একটি দল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে আনুষ্ঠানিক ভাবে অভিবাদন জানালেন। এর পর নেতৃবৃন্দ একে একে নির্দ্ধারিত আসনে বসলেন। প্রথমে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তারপর প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, তারপর মন্ত্রী খোন্দকার মোস্তাক আহমদ, ক্যাপটেন মনসুর আলী, জনাব কামরুজ্জামান এবং প্রধান সেনাপতি কর্ণেল আতাউল গনি ওসমানী। স্বেচ্ছা সেবকগণ পুষ্প দিয়ে তাদের অভিবাদন জানালেন।
>
> কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলায় আয়োজিত ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনাব আবদুল মান্নান। শুরুতে পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াত করা হ'ল। নতুন রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ঘোষণা পাঠ করলেন তৎকালীন আওয়ামী লীগের চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী। নবগঠিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাম হলো 'গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'।
>
> চারটি ছেলে প্রাণ ঢেলে গাইল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। তার পর উঠে দাঁড়ালেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধান মন্ত্রী পদে তাজউদ্দিন আহমদ এবং তাঁর পরামর্শে আরো তিনজনের নাম ঘোষণা করলেন তিনি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রধান মন্ত্রী এবং তার তিন সহকর্মীকে। এর পর তিনি নতুন রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে কর্ণেল (পরে জেনারেল) আতাউল গনি ওসমানী এবং সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ পদে কর্ণেল আবদুর রবের নাম ঘোষণা করলেন।[৮৭]

সরকার গঠন নিয়ে যে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার সমাপ্তি ঘটে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে বিশেষ করে মুজিবনগর সরকার গঠন পরবর্তী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কে আসীন হবে তা নিয়ে সংকট তৈরি হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও তাঁর অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভা ছিল এই সংকট থেকে উত্তরণের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। প্রবাসী সরকার গঠনকালে তাজউদ্দীন আহমদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি সাহায্য ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়। নৈতিক ও বস্তুগত উভয় দিকেই তিনি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে বাঙালিদের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য প্রার্থনা করেন।[৮৮] ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণের পর প্রদত্ত ভাষণে তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধিকার আন্দোলনে সহযোগিতা করার জন্য ভারতকে ধন্যবাদ দেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, গণচীন ও ব্রিটেনের সাহায্য কামনা করেন।[৮৯] এসব আবেদনের মধ্য দিয়েই মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার পেছনে পরিকল্পনা ও পূর্বপ্রস্তুতি ছিল এমনটি নয়, তবে উৎসাহ ও সমর্থনের অভাব ছিল না। এই সমর্থন শুধুমাত্র ২৫ মার্চ রাতের পর দেশে ও বিদেশে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে জড়িয়ে পড়েছেন তাদের কাছ থেকেই আসেনি, ভারতের সমর্থন ও সাহায্য ছিল মৌলিক বিষয়। মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকেই ভারত সমর্থন করেছিল কিন্তু বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি যুদ্ধের শেষ সময়ের আগে। এমনকি বাংলাদেশের স্বীকৃতি বহু মানুষের দাবি ছিল এবং অনেক ভারতীয় জনগণ ও রাজনীতিবিদরাও তা

---

[৮৬] Archer K. Blood, *The Cruel Birth of Bangladesh: Memoirs of an American Diplomat*, Dhaka: UPL, 2002. p. 315

[৮৭] শামসুল হুদা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

[৮৮] Abdul Wadud Bhuiyan, *Emergence of Bangladesh and Role of Awami League*, Dhaka: UPL, 1982. p.196

[৮৯] শামসুল হুদা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

চেয়েছিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে ভারত সরকার পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া থেকে বিরত থাকে। অবশ্য ইন্দিরা গান্ধী প্রাথমিক পর্যায়ে এপ্রিল মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাঠানোর কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু দুটি কারণে তিনি পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। প্রথমত, ভারতীয় সেনাবাহিনী সে সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না এবং দ্বিতীয়ত, ওই সময় যুদ্ধ শুরু করলে তা ভারতের জন্য ভুল সিদ্ধান্ত হতো। কেননা তখনও বাংলাদেশ প্রশ্নে আন্তর্জাতিক জনমত গঠিত হয়নি। আন্তর্জাতিক মহল জানতোও না বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কী ঘটেছে।[৯০]

১৯৭১ সালে গঠিত মুজিবনগর সরকারের গঠন কাঠামোর বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ–

মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে ছিল-

১. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
২. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩. অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৪. মন্ত্রিসভা সচিবালয়
৫. সাধারণ প্রশাসন বিভাগ
৬. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৭. তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়
৮. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৯. ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়
১০. সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১১. কৃষি বিভাগ
১২. প্রকৌশল বিভাগ

মন্ত্রণালয় ছাড়া আরো কয়েকটি সংস্থা বা বিভাগ ছিল যারা সরাসরি মন্ত্রিসভার অধীনে কাজ করতো। যেমন-

১. পরিকল্পনা কমিশন
২. শিল্প ও বাণিজ্য বোর্ড
৩. নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, যুব ও অভ্যর্থনা শিবির
৪. ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি
৫. শরণার্থী কল্যাণ বোর্ড

এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক হিসেবে কিছু বেসরকারি সংস্থা, দল, গোষ্ঠী, সমিতি, বাহিনী ইত্যাদি কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- যুব নিয়ন্ত্রণ পরিষদ ও প্রশিক্ষণ বোর্ড, বাংলাদেশ হাসপাতাল, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র,

---

[৯০] আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৪৭

জয় বাংলা পত্রিকা, বাঙলাদেশ বুলেটিন, বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী সংগঠন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল, বঙ্গবন্ধু শিল্পী গোষ্ঠী, বাংলাদেশ তরুণ শিল্পী গোষ্ঠী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী সমিতি, বাংলাদেশ সংগ্রামী বুদ্ধিজীবী পরিষদ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ লীগ, বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি (লন্ডন), লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেন্টসিয়া প্রমুখ।[৯১] মুজিবনগর সরকারের কাঠামোর তালিকা দেখলে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, একটি পূর্ণাঙ্গ সরকারের যেসকল কার্যক্রমে থাকে, তার সব কিছু পালনের একটি প্রচেষ্টা ছিল। যাতে করে প্রকৃত সরকার বলতে যা বোঝায় সেই কাঠামো ধারণ করতে পারে। তবে মুজিবনগর সরকারের প্রধান দায়িত্ব ছিল শরণার্থীবিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা, অধিকৃত বাংলাদেশ থেকে আগত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবিকা, বাসস্থান, আয়-উপার্জনে সহায়তা করা, মুক্তিবাহিনী গঠনে কার্যকরী ভূমিকা রাখা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনমত গঠনে সহায়তা, প্রবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং দখলি এলাকার মানুষের মনোবল সমুন্নত রাখা।[৯২]

তাজউদ্দীন আহমদ ও তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় এত অল্প সময়ে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠিত হওয়া নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় কাজ। প্রবাসী সরকার বা মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর সে সংবাদ দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এ প্রবাসী সরকারকে কেউ সাধুবাদ জানায় আবার কেউ এর নিন্দা জানায়। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রকে এতদিন যারা নিজেদের উপনিবেশ মনে করে শাসন শোষণ চালিয়েছে তারাও বাংলাদেশের নবগঠিত সরকারকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। যার প্রমাণ পাওয়া যায় এইচ টি ইমামের উদ্ধৃতিতে– "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই পাকিস্তান সমর্থক এবং স্বার্থান্বেষী মহল পুরোনো পাকিস্তানি কায়দায় অপপ্রচার এবং মিথ্যাচার শুরু করে দেয়। এদের প্রচার কখনো সূক্ষ্ম, কখনোও স্থূল, কিন্তু মূল বিষয়বস্তু একই। আর তা হলো মুজিবনগর সরকার মানেই ভারত।"[৯৩] কলকাতাস্থ বাঙালি কূটনীতিক এম হোসেন আলীও মুজিবনগর সরকার গঠন হওয়ার পর পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন-

> Pakistan Government claimed that they had collected 'ample & fool-proof evidence to show that he had conspired with India and some other foreign powers for declaring Bangladesh as an independent & sovereign country.'[৯৪]

১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল তারিখে লন্ডনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় কলকাতা প্রতিনিধি মার্টিন উলাকটের প্রেরিত একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সদস্যরা 'বাংলা দেশের কোথাও' রয়েছেন বলে ভারতের সংবাদপত্রগুলোতে যে খবর প্রকাশিত হয়, মার্টিন উলাকট তাকে 'কাল্পনিক' বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাদের সবাই কলকাতায় রয়েছেন, আর তাদের রাখা হয়েছে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে। এই প্রতিনিধি আরও বলেন যে, ১৭ এপ্রিল শুক্রবার তথাকথিত স্বাধীনতা ঘোষণার যে অনুষ্ঠান হলো, তাতে চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র দিয়ে ভারতীয়রা এসব ব্যক্তিদের সাহায্য

---

[৯১] এইচ টি ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৩৬
[৯২] আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭
[৯৩] এইচ টি ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
[৯৪] The Diary of Hossain Ali

করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোক সাদা পোশাকে সেখানে পাহারায় নিযুক্ত ছিল।[৯৫] প্যারিসের *লে মণ্ডি* নামক ফরাসি দৈনিক পত্রিকার ২০ এপ্রিলের সংখ্যায় বলা হয়েছে, অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করা হয়েছে ভারতের সীমান্ত থেকে এক মাইল দূরে একটি গাছের নিচে। আসলে যদিও এই সরকার গঠিত হয়েছিল কলকাতায়, তবুও এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল বিদেশি সাংবাদিকদের দেখানোর জন্য। এই সরকার যে পূর্ব পাকিস্তানি এলাকার মধ্যেই রয়েছে একথা প্রমাণ করাই ছিল এ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।[৯৬]

মুজিবনগর সরকার বা প্রবাসী সরকার গঠন নিয়ে যত সমালোচনা থাকুক না কেন একথা সত্যি যে, ১০ এপ্রিল প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার পরও বঙ্গবন্ধুর অবস্থান সম্পর্কে কেউ কিছুই বলতে পারেনি। সে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। এমনি এক সময়ে পাকিস্তান সরকার ২০ এপ্রিল করাচি বিমানবন্দরে বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর একটি ছবি প্রকাশ করে। এর পেছনে পাকিস্তান সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্যে ছিল প্রবাসী সরকার এবং বাঙালিদের মনোবল ভেঙে দেওয়া। কিন্তু সবাই বুঝতে পারেন যে, বঙ্গবন্ধু এখনও জীবিত এবং এই ছবি প্রকাশের পর তাঁকে আর গোপনে হত্যা করা সম্ভব নয়।[৯৭]

২.৪ মুজিবনগর সরকার নামকরণের ব্যাখ্যা

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের নামে যে সরকার ব্যবস্থা গঠিত হয় তা বিভিন্ন নামে পরিচিত। দেশে-বিদেশে এ সরকার প্রবাসী সরকার, বাংলাদেশ সরকার, অস্থায়ী সরকার আবার মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। কুষ্টিয়া জেলার তৎকালীন মহকুমা মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ গ্রামের আম্রকাননে বাংলাদেশের স্বাধীন সরকার গঠিত হয়। শপথ নেওয়ার সময় পর্যন্ত এটি প্রবাসী সরকার বা বাংলাদেশ সরকার নামে পরিচিত ছিল। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামকরণে এ স্থানটির নামকরণ করেন মুজিবনগর। সে থেকে এ সরকারের নাম হয় মুজিবনগর সরকার। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি যে সকল সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন তারা তাদের সংবাদে এ সরকারকে মুজিবনগর সরকার হিসেবে পরিচিতি তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ সরকার 'মুজিবনগরে' অবস্থিত। মুজিবনগর কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো একটি জায়গায় নয়। বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা যেখানে সমবেত হতো সে স্থানটিই হতো তখনকার মুজিবনগর। এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যাতে পাকিস্তানের বিমানবাহিনী মুজিবনগরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে না দিতে পারে। যতদিন পর্যন্ত না বিমান হামলা প্রতিহত করার ক্ষমতা হয় ততদিন ভ্রাম্যমাণ মুজিবনগরই ছিল সরকারের সদর দপ্তর। এ দপ্তর যেখানেই অবস্থান করতো, সেখানেই অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সব ধরনের সরকারি-বেসরকারি যোগাযোগ সম্পন্ন হতো।[৯৮]

মওদুদ আহমদ মুজিবনগর সরকার এর নামকরণের পশ্চাতে ব্যাখ্যা দিয়েছেন– 'ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সরকারের নামকরণ হয়েছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বৈদ্যনাথ তলার নাম দেওয়া হয়েছিল মুজিবনগর এবং প্রতীকি অর্থে মুজিবনগর

---

[৯৫] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩। পৃ. ৬১
[৯৬] ওই, পৃ. ৬১
[৯৭] এম আর আখতার মুকুল, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, পৃ. ৯১
[৯৮] এইচ টি ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২

ছিল অস্থায়ী রাজধানী, যদিও সরকারের প্রকৃত কার্যালয় কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এই সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামেই পরিচিতি লাভ করে।[৯৯] এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় হোসেন আলীর ডায়েরিতে। তিনি লিখেছেন-

> From now on MUJIBNAGAR was shown to be where the government was, although actually the Government remained in Calcutta under proper security arrangements of the Government of India.[১০০]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রবাসী সরকার বা মুজিবনগর সরকার কতটা গণতান্ত্রিক ছিল তা আলোচনার প্রয়োজন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামকরণেই বোঝা যায় এটা প্রজাতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। যদিও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও গণপরিষদের অধিবেশন বসেনি। কিন্তু জানুয়ারি মাসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচিত সকল এমএনএ ও এমপিএ'দের যে শপথ বাক্য পাঠ করান সেখানে দলের সকল নির্বাচিত সদস্যগণ বঙ্গবন্ধুকে তাদের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। সে অনুযায়ী তাঁর অনুপস্থিতিতে দলনেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ। কেননা তিনিই প্রথম উদ্যোগী হয়ে মুজিবনগরে সরকার গঠন করেছিলেন। এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তিনি নিজেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। মুজিবনগর মন্ত্রিসভায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্থির হয়, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে মুজিবনগর সরকারের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এদিক থেকে সরকার পদ্ধতি কী ধরনের সে হিসেবে বিচার করলে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ছিল রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। এমনকি মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করার পর গণমাধ্যমে এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পাশাপাশি সরকার পদ্ধতি যে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার তা-ও উল্লেখ ছিল। ১৮ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত শিরোনাম ছিল- 'the proclamation of Mujib Nagar yesterday of Bangladesh as a formally constituted state to be run under a presidential form of Government.'[১০১]

সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী যেভাবে রাষ্ট্রের শাসন কাজ পরিচালিত হতো কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে তা হতো না। এসময় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রতিটি মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থিত থেকে সভাপতিত্ব করতেন। অন্যদিকে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরেই সকল কার্যক্রম পরিচালিত হতো। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ, শিক্ষা, স্থানীয় প্রশাসন, শ্রম, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। মুক্তিযুদ্ধকে প্রকৃতপক্ষে একটা জনযুদ্ধে রূপায়িত করার প্রয়াসে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দীন আহমদকে অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ

---

[৯৯] মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৮-২১৯
[১০০] The Diary of Hossain Ali
[১০১] The Diary of Hossain Ali

করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেন। তাজউদ্দীন আহমদের সার্বিক কর্মতৎপরতার কারণেই এ সরকারকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলে মনে হয়। কিন্তু মন্ত্রিসভার বৈঠকগুলোতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিই সভাপতিত্ব করতেন।[১০২] তবে মুজিবনগর সরকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এম আর আখতার মুকুল বলেছেন-

> প্রবাসী সরকার কর্তৃক ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এসব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এটা ছিল প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার। কিন্তু সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দিন আহমদের মধ্যে চমৎকার সমঝোতার ফলশ্রুতিতে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাজউদ্দিন আহমদই সরকারের সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন। কখনও মতবিরোধ হয়নি।[১০৩]

বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন মুজিবনগর সরকার কেন রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কাঠামোর মধ্যে গড়ে ওঠেছিল সে সম্পর্কে বলেছেন-

> They also stated that in the event of “there being no President or the President being unable to enter upon his office or unable to exercise his powers or duties due to any reason whatsoever, the vice-president shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities herein conferred on the President.”[১০৪]

মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করার পর বিদেশি সাংবাদিকগণ এই সরকারের সচিবালয়কে বিপ্লবী সচিবালয় হিসেবে তুলে ধরেন।[১০৫] এজন্য মুজিবনগর সরকারকে বিপ্লবী সরকার বলা যায় কিনা এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ফারুক আজিজ খান বলেছেন- ‘সীমান্ত এলাকায় জঙ্গলের ভেতরে গোপন সরকারের ঘাঁটি স্থাপনের কোনো জুতসই জায়গা ছিল না, যেখান থেকে সরকার পরিচালনা করা যায়। থিয়েটার রোডের কার্যালয়ের নিরাপত্তাও তেমন ছিল না। বস্তুত, আমাদের অনেকেই চেয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের ভেতরে গোপন কোনো স্থান থেকে সরকার পরিচালনা করুন। তবে এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে মুজিবনগর সরকার একটি বিপ্লবী সরকার ছিল।’[১০৬]

মুজিবনগর সরকার যে বিপ্লবী সরকার নয় তার পেছনেও কেউ কেউ বক্তব্য দেন। মুজিবনগর সরকারকে কোনো বিপ্লবী সরকার হিসেবে ভাবার কারণ নেই। বস্তুতঃপক্ষে এই সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা ছিল মুজিবনগর সরকারকে যথাসম্ভব নিয়মতান্ত্রিক, ধারাবাহিক ও আমলাতান্ত্রিক হিসেবে তুলে ধরা। যাতে করে অন্য সকল গতানুগতিক সরকারের সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায় এবং একটি স্বাধীন নিয়মিত সরকার হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এই বিষয়টি সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায় কলকাতায় মুজিবনগর সরকারের সচিবালয় পরিচালনা কর্মকাণ্ড থেকে। এই সচিবালয়ে চেয়ার টেবিল কম থাকলেও সরকারের লোকজন যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন এটিকে ঢাকাস্থ সচিবালয়ের আদলে পরিচালনা করতে।[১০৭]

---

[১০২] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫
[১০৩] এম আর আখতার মুকুল, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, পৃ. ৬১
[১০৪] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 93-94
[১০৫] রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *৭১ এর দশমাস*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭। পৃ. ১৪৬
[১০৬] ফারুক আজিজ খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২
[১০৭] আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯-৩৪০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শুধুমাত্র প্রবাসী ছিল না। সরকারের সদর দপ্তর মুজিবনগর হলেও দেশের অভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ এলাকা যুদ্ধ চলাকালে শত্রুমুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে এমন কিছু অঞ্চল ছিল যা হানাদার বাহিনী কখনো দখল করতে পারেনি। যে কারণে এসব অঞ্চল স্বাভাবিকভাবেই শত্রুমুক্ত ছিল। যা মুক্তাঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হতো। এসব মুক্তাঞ্চলে প্রবাসী সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধারা ও সে অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা সকল কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক রাখতো। এরকম কিছু মুক্তাঞ্চলের মধ্যে ছিল রংপুরের উত্তর পূর্বাঞ্চল, উত্তরে, দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, রৌমারী, চিলমারী, দিনাজপুর, ফেনীর বিলোনিয়া। মুক্তিযুদ্ধকালে যেসব বিদেশি সাংবাদিকরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করতে আসতেন, তারা সবাই কম-বেশি মুক্তাঞ্চলে পরিদর্শনে যেতেন। কখনো তাদেরকে মুজিবনগর সরকার কিংবা ভারতীয় সরকারের সহযোগিতায় মুক্তাঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হতো। তারা সেখানে ঘুরে এসে প্রতিবেদন তৈরি করতেন, যা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।[১০৮]

আবার অনেকে মুজিবনগর সরকারের আইনগত ভিত্তি নিয়েও কথা বলেছেন। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা শুধু রাজনৈতিক বা জাতীয়তাবাদের বিষয় নয়। বরং এর পশ্চাতে রয়েছে আরো অনেক জটিল ও সুক্ষ্ম বিষয়। আইনগত বিষয়টি হচ্ছে এমন একটি দিক। বিশ্বের কোনো জাতি যখন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু করে তখণ তার আইনগত ভিত্তি থাকতে হয়। এমনকি যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন বা সাংগঠনিক প্রক্রিয়া পরিচালনাকারী সরকারের বৈধতা থাকতে হয়। যা ভবিষ্যৎ স্বাধীন রাষ্ট্রটির সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাতে সহায়ক হয়। এমনি একটি বৈধ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্রটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন, স্বীকৃতি ও রাষ্ট্র হিসেবে বৈধতা লাভ করে। বাংলাদেশও তার মুক্তিযুদ্ধকালীন এমনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

১৯৭১ সালে গঠিত সরকার প্রবাসী সরকার হলেও তা ছিল জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং একই সঙ্গে আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত। সরকারকে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠানও বলা যায়। এদিক থেকে প্রবাসী সরকারের আইনগত ভিত্তিকে দু'ভাবে বিচার করা যায়। প্রথমত, আন্তর্জাতিক আইনের প্রেক্ষাপটে প্রবাসী সরকার তথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অবস্থান কী ছিল এবং দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ও আইনি প্রক্রিয়ায় এর অবস্থান কীভাবে স্বীকৃত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি সরকার গঠন করে। এই সরকার বিশেষ কারণে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তবে প্রবাসী সরকারের রাজধানী নির্ধারিত হয়েছিল মুজিবনগর যার অবস্থান বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল এখানে। স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানের এই ধরনের প্রক্রিয়া বিশ্বে নতুন নয়। বিশ্বের অনেক দেশ নিকটবর্তী কোনো দেশে অবস্থান নিয়ে প্রবাসী সরকার তার কাজ পরিচালনা করেছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, প্রবাসী সরকার পদ্ধতিটি একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে মৌন সমর্থন ছিল। কেননা প্রতিটি প্রবাসী সরকার আন্তর্জাতিক আইনের রীতি অনুযায়ী

---

[১০৮] এইচ টি ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭

সরকার পরিচালনা করতো। অন্যদিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একটি প্রবাসী সরকার গঠিত হওয়ার পর তার আইনগত ভিত্তি দু'ভাবে তৈরি হয়।

ক. সরকার গঠনকারী এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছিলেন স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত।

খ. সরকার গঠনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জনগণের ম্যান্ডেটধারী।[১০৯]

মুজিবনগর বা অস্থায়ী বা প্রবাসী সরকার যে নাম-ই হোক না কেন একথা বলা যায় যে, পুরো মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের সুযোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মতৎপরতার কারণে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা যে সফলতা অর্জন করেছে, নিজ মাতৃভূমিকে স্বাধীন দেশের মর্যাদা দিতে পেরেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পরের দিন অর্থাৎ ১৮ এপ্রিল কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালিরা পাকিস্তানিদের বের করে দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য প্রকাশ করে এবং এটি বাংলাদেশ দূতাবাস হিসেবে সকল স্থানে পরিচিত হয়ে ওঠে। ৯ নম্বর সার্কাস অ্যাভিনিউয়ে ছিল হাইকমিশন কার্যালয়। আর বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয় ছিল ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে চৌরঙ্গীর কাছে। দুটোই পার্ক সার্কাসে ও দেড় কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে। প্রচারণার স্বার্থে ও মুক্তিসংগ্রামকে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা দেওয়ার জন্য বলা হতো যে বাংলাদেশের ভেতরে মুজিবনগর থেকেই বাংলাদেশ সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

২.৫ মুজিবনগর সরকারের বৈদেশিক নীতি ও এর বৈশিষ্ট্য

মুজিবনগর সরকারের যে কয়েকটি মন্ত্রণালয় ছিল সেগুলোর মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। খোন্দকার মোশতাক আহমেদকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হলেও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ এর সার্বিক দিক দেখাশোনা করতেন। কেননা তাজউদ্দীন আহমদ মুজিবনগর সরকারের বৈদেশিক নীতির ওপর সর্বাধিক জোর দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কেন হচ্ছে, কোন প্রেক্ষাপটে হচ্ছে, জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে কী করছেন এসব প্রশ্নের বিষয়গুলো বহির্বিশ্বের জনগণের কাছে পরিস্কার করার জন্য একটি সুস্পষ্ট বৈদেশিক নীতি প্রয়োজন ছিল। বহির্বিশ্বের সহানুভূতি আদায় ও সম্ভব হলে স্বীকৃতি আদায় করা ছিল মুজিবনগর সরকারের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য। মুজিবনগর সরকারের প্রচেষ্টার ফলে ইউরোপ, আমেরিকা জুড়ে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন ও জনমত তৈরি হয়েছিল। মুজিবনগর সরকার যে বাংলাদেশের একমাত্র বৈধ সরকার তা বহির্বিশ্বের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এ সরকারের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। এর পেছনে কাজ করেছে মুজিবনগর সরকারের আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি, ইয়াহিয়া খানের প্রণীত নীল নকশার বাস্তবায়িত রূপ গণহত্যা। মুজিবনগর সরকার শুরু থেকেই স্বাধীন ও সার্বভৌম বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর ছিল কলকাতায় এবং ভারতীয়দের সহযোগিতায় এ সরকার গঠিত হয়েছে। এ কারণে পাকিস্তানি শাসকচক্র একথাও প্রচার করে যে, কোনো ধরনের সরকার গঠিত হয়নি যা হয়েছে সেটি ভারতের অধীনে একটি পুতুল সরকার। কিন্তু বাস্তবিক রূপ ছিল বিপরীত। বহির্বিশ্বের জনগণ জানতে পারে যে,

---

[১০৯] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: কাজী জাহেদ ইকবাল, প্রবাসী সরকারের আইনগত ভিত্তি এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সাংবিধানিক প্রক্রিয়া, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৭-২৮, বর্ষ ১৪০৯-১৪১১। পৃ. ১৮০-১৯০

ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য সরকার গঠিত হয়েছে এবং সে সরকারের সুযোগ্য নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৭১ সালের জুন মাসে বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র নীতি তথা বৈদেশিক নীতি ব্যাখ্যা করেন। ১ জুন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এক নীতি নির্ধারণী বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। পাকিস্তানের কাঠামোতে কোন রকম আপোষ-মীমাংসার প্রশ্নই উঠতে পারে না।" বহির্বিশ্বে বিভিন্ন মহলে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কে যেসব কথাবার্তা ওঠেছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাজউদ্দীন আহমদ উপর্যুক্ত ঘোষণা দেন।[১১০] বৈদেশিক নীতি ব্যাখ্যা করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, "আমাদের বৈদেশিক নীতি হবে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয়।" তিনি বাংলাদেশ প্রশ্নে বৃহৎ শক্তির নিশ্চুপ থাকার বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বর্তমান আমাদের সংকটময় সময়ে প্রতিবেশী বা যে কোন রাষ্ট্র যে ভূমিকা পালন করুক না কেন, আমাদের বিদেশ নীতির মূল কথা হল, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয়।" এই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের বিদেশে প্রেরিত প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে কাজ করে যাচ্ছে।[১১১]

বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯৭১ সালের ৬ জুন এক বেতার ভাষণে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি ব্যাখ্যা করে বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আটক সকল গণপ্রতিনিধিদের অবিলম্বে মুক্তিদান, বাংলাদেশের মাটি থেকে সামরিক বাহিনী ফিরিয়ে নেওয়া, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান এবং পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকশ্রেণি কর্তৃক এ যাবত বাংলাদেশ থেকে অপহৃত ধনসম্পদ ও গত আড়াই মাসের লড়াইয়ে হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের যে ক্ষতিসাধন করেছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে তা নির্ণয় করে লুণ্ঠিত ধন প্রত্যার্পণ ও পূর্ণ ক্ষতিপূরণের দ্বারাই কেবল রাজনৈতিক সমাধান আসতে পারে অন্যথা রাজনৈতিক সমাধানের কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না।[১১২]

প্রত্যেকটি দেশ, সরকার এমনকি বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার আলাদা বৈদেশিক নীতি থাকে। এসব নীতিগুলোর কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। যার মাধ্যমে ওই দেশ, সরকার বা সংস্থার চরিত্র বোঝা যায়। বাংলাদেশ প্রায় দুইশত বছর ব্রিটিশ শাসনাধীনে ছিল এবং ১৯৪৭ সাল পরবর্তী সময়ে আরো ২৩ বছর পাকিস্তানের শাসন শোষণ প্রত্যক্ষ করেছে। পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ থেকে শুরু করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ও সামরিক সরকারের পররাষ্ট্র নীতিও প্রত্যক্ষ করেছে। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের নির্বাচনী ইশতাহারে একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির কথা ব্যক্ত করেছিলেন। নির্বাচনী ইশতাহারে পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে বলা হয়-

---

[১১০] *জয় বাংলা*, ২ জুন ১৯৭১

[১১১] *Times of India*, 2 June 1971; *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৪

[১১২] *জয় বাংলা*, ১৮ জুন ১৯৭১; *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৬

> বৈদেশিক নীতিতে দেশের জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে একটি স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা হবে। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের এবং দেনার ভার লাঘবের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে নতুন কৌশল অবলম্বন করা হবে। সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এবং কারো প্রতি বিদ্বেষ নয় এ নীতি অনুসরণ করে ন্যায় ও পরস্পরের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে প্রতিবেশি দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে। মৌলিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণের ন্যায্য সংগ্রামের প্রতি সমর্থন রয়েছে। সিয়াটো, সেন্টো এবং অন্যান্য সামরিক চুক্তি থেকে অবিলম্বে পাকিস্তানকে বের করে আনা হবে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের প্রতি আওয়ামী লীগের সমর্থন রয়েছে।[১১৩]

সে কথা স্মরণ রেখেই মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভা একটি সুস্পষ্ট বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে। মুজিবনগর সরকারের কেন্দ্রীয় চারজন নেতৃবৃন্দের সকলেই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহচর। তারা জানতেন বঙ্গবন্ধু পররাষ্ট্র নীতি বা বৈদেশিক নীতিতে কী চাচ্ছেন। সে লক্ষ্য সামনে রেখেই মুজিবনগর সরকার যে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করে তার কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল। এগুলোর মধ্যে রয়েছে–[১১৪]

১. সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়। বৈদেশিক নীতির ব্যাপক বৈশিষ্ট্য হলো সকল বাস্তব প্রয়োজনে মৌলিক ধারণার ব্যাখ্যা;
২. রাজনৈতিক অবদমন, অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অবসানে বিশ্বাসী;
৩. জোটনিরপেক্ষ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান- এই তিনটি বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিপ্রস্তর;
৪. পৃথিবীব্যাপী ও আঞ্চলিক শান্তি বিনষ্টকারী সকল প্রকার সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করা। সেন্টো ও সিয়াটো চুক্তিকে নিন্দা করা। অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অস্থিতিশীলকারী অথবা কোনো দেশের নিজেদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন সমন্বয়কারী সকল প্রকার সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে বিরোধিতা করা;
৫. বাংলাদেশ নিন্দা জানায় সাম্রাজ্যবাদ এবং নব্য সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ এবং ছোট দেশগুলোর ওপর অন্যান্য সর্বপ্রকার বহিঃশক্তির অশুভ প্রভাব বিস্তার;
৬. বাংলাদেশ পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে এবং সংলাপ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশ বা জাতির মধ্যে বিরাজমান জটিলতার সমস্যা সমাধানে বিশ্বাসী;
৭. বাংলাদেশ মনে করে ক্ষমতাধর বৃহৎ পরাশক্তিগুলো হচ্ছে- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীন। সকল পরাশক্তির সমর্থন ও সে অনুযায়ী সার্বক্ষণিক সহযোগিতা বাংলাদেশ প্রত্যাশা করে। বাংলাদেশ এশিয়ার পুনঃজোটবদ্ধতার বিরোধিতা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের প্রতি সম্মান জানিয়ে বাংলাদেশ বলে, ইসলামাবাদের সামরিক বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এবং ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত জুড়ে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে চাপ সৃষ্টির কারণে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের ভূমিকার নিন্দা

[১১৩] মোশারফ হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন: বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা; দ্যু প্রকাশন, ২০২০। পৃ. ১০৮
[১১৪] এইচ টি ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০-১২১; আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫-৫৬

জানায়। বাংলাদেশ ইস্যুর প্রতি সহযোগিতা ও সহানুভূতির জন্য আমেরিকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতি বাংলাদেশ কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অন্যান্য সংগঠন যেমন কংগ্রেস ও সিনেটের প্রতি কৃতজ্ঞ;

৮. সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া প্রাথমিক পর্যায়েই বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ভিন্নতর কৌশলের কারণে বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করে। ভারত-সোভিয়েতের সাম্প্রতিক ইশতাহার বাংলাদেশের জন্য ফলদায়ক নয়। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার সক্রিয় মদদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতার সঙ্গে প্রয়াস চালাতে হবে;

৯. চীনের ব্যাপারে বাংলাদেশ ইচ্ছাকৃতভাবে নীরবতা রক্ষা করছে এবং তা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে;

১০. সমগ্র আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের কল্যাণের জন্য বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং সেই লক্ষ্যে আফ্রো-এশীয় সংহতির প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে। আফ্রো-এশীয় সকল দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পালন করবে;

১১. আরবদেশ সমূহ বাংলাদেশের বিপক্ষে কাজ করছে কিন্তু বাংলাদেশ এ ব্যাপারে অনানুষ্ঠানিকভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। বাংলাদেশ মনে করে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ব্যাপক প্রচারকারী সরকারসমূহের এটি একটি অন্যতম ব্যর্থতা। বাংলাদেশ বাস্তব সত্যের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করার প্রয়াস চালিয়ে যাবে এবং সে সঙ্গে তারা যে ভুলের মধ্যে অবস্থান করছে তা দূর করার চেষ্টা করবে;

১২. আরব-ইসরায়েলের সম্পর্কের সূত্রে বাংলাদেশ কোনো পক্ষকেই সমর্থন না করে বাংলাদেশ তার অবস্থান ও নীতি অব্যাহত রাখবে যতদিন পর্যন্ত না বাংলাদেশের নীতি পরিবর্তন হয়;

১৩. একমাত্র লন্ডন ব্যতীত সমগ্র ইউরোপ বাংলাদেশের ব্যাপারে কম বেশি নীরব ভূমিকা পালন করছে। তাই পাকিস্তান ওয়াকওভার পেয়ে যাচ্ছে;

১৪. ইউরোপের সকল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এবং বাংলাদেশ সেসব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

মুজিবনগর সরকার জানায় যে, এসব নীতিমালা মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রণীত। এ নীতিমালা শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের জন্য। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিমালা আরো সংক্ষেপ করা হবে। বৈদেশিক নীতিমালা ধারাবাহিকভাবে পুনঃনিরীক্ষা করা হবে এবং যেখানে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন করা প্রয়োজন তা সমন্বয় করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে। বহু প্রতিকূলতার মধ্যে সংগঠিত মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে বিদেশিরা যোগাযোগ করেছে। তারা মুজিবনগর সরকারের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে অবগত হয়ে সে অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেছেন, মুক্তিযুদ্ধে নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন। তন্মধ্যে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারত সরকারের সঙ্গে মুজিবনগর সরকারের সম্পর্ক দু'ভাবে গড়ে ওঠে।

প্রথমত: নীতি-নির্ধারণী বিষয় বা যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে তা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান সেনাপতি করতেন।

দ্বিতীয়ত: দৈনন্দিন বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ হতো। এক্ষেত্রে কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিদের বৈঠক হতো। তবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদের সন্দেহভাজন আচরণের কারণে এসব বৈঠকে তাঁকে রাখা হতো না। ভারত সরকার কূটনীতিক ক্ষেত্রে পুরোপুরি কূটনীতিক শিষ্টাচার বজায় রাখতো।

মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি স্বাধীন দেশের মতো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাণিজ্য বিষয়ে, এমনকি জাতীয় আয়-ব্যয় সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ও যুদ্ধ পরিচালনায় সমানভাবে একটি সুযোগ্য সরকার ব্যবস্থার মতো কাজ পরিচালনা করেছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সমগ্র বিশ্বের বাঙালিদের পাশাপাশি বিদেশিরাও সমর্থন জানিয়েছে, পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে মুজিবনগর সরকারের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেছে ও সমর্থন দিয়েছে। মুজিবনগর সরকারকে সহযোগিতা করেছেন সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে নিজ মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে হবে, বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে এ প্রত্যয় ছিল সকল বাঙালির মনে প্রাণে। প্রতিটি বাঙালির প্রত্যয়দীপ্ত এ শপথ মুজিবনগর সরকারকে সহায়তা করেছে মুক্তিযুদ্ধে কাজ করতে। মুজিবনগর সরকারের প্রতিটি কাজে নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে কাজ করেছেন মুজিবনগর সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মুজিবনগর সরকারে প্রতিটি কাজের পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করে তা মন্ত্রিসভায় উপস্থাপিত হতো। মন্ত্রিসভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত আকারে তা গৃহীত হতো। জরুরি অবস্থায় এমনও হয়েছে যে, দিনে দুই বারও মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়েছে। এভাবে প্রতিটি মুহূর্তে মুজিবনগর সরকার কর্মদক্ষতার সঙ্গে তাদের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

২.৬ মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক তৎপরতা ও কর্মপরিকল্পনা

প্রতিকূল অবস্থার প্রেক্ষিতে মুজিবনগর সরকারকে কূটনীতিক ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক পরিকল্পনা ও নীতিমালা গ্রহণ করতে হয়েছে। মুজিবনগর সরকার কূটনীতিকভাবে নিজেদের ভাবমূর্তি যথাসম্ভব তুলে ধরতে সক্ষম হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও তারা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করার সময় তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে এই সরকারের গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোক রায়ের বর্ণনা মতে-

> "কেনেডি সাহেব একটা গেট দিয়ে রাজভবনে ঢুকলেন। এমন ব্যবস্থা করেছিলাম তাজউদ্দীন সাহেব, খন্দকার মুশতাক আহমেদ সাহেব এলেন এবং দেখা হল। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। যে জিনিসটা হলো কেনেডি ঘরে ঢোকার পর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, উনি হলেন তাজউদ্দীন আহমদ। মি. কেনেডি বললেন, আই এম ভেরি হ্যাপি টু মিট ইউ মি. প্রাইম মিনিস্টার।" এটা নিছক কথা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও কংগ্রেসের ভেতরে আলোচনা হয়েছে। সে যাই হোক উনি কথা বললেন বেশ অন্তরঙ্গভাবে। সব কথা বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।[১১৫]

[১১৫] আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৪৮

মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক তৎপরতা ও কর্মপরিকল্পনাগুলো কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়।

ক. কূটনীতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করার পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়ে একটি কূটনীতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ পরিকল্পনার মধ্যে ছিল[১১৬]-

১. সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে নিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ। কেননা সমন্বিত পরিকল্পনা ব্যতীত যুদ্ধকালীন সরকারের পক্ষে একটি সফল কূটনীতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। কূটনীতি বিষয়টি এত বেশি স্পর্শকাতর যে কোনো ভুল সিদ্ধান্তে বিপরীত ফলাফল হতে পারে। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সে লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় করে কী ধরনের কার্যকরী কূটনীতিক পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে উদ্যোগ নিয়েছেন।

২. মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠনের লক্ষ্যে পাকিস্তানে কর্মরত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিশেষ করে বিদেশি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কূটনীতিকবৃন্দকে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা ও কর্মে যোগদান করতে উৎসাহিত করে। মুজিবনগর সরকারের এটি ছিল সার্থক ও সবচেয়ে কার্যকরী কূটনীতিক পরিকল্পনা। কেননা এসব কূটনীতিকদের পক্ষে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত প্রচার যত সহজ ছিল অন্যদের দ্বারা তা হতো না। পাশাপাশি বাঙালি কূটনীতিকরা পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করে বেরিয়ে আসলে তখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করা হবে। এসব দূতাবাসের কাজ হবে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার, জনমত ও বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ে নানামুখী প্রচেষ্টা চালানো। অবশ্য মুজিবনগর সরকার এও উপলব্ধি করে যে, বহির্বিশ্বে প্রচার প্রচারণা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারপত্র, নিবন্ধ, প্রতিবেদন ও প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করা প্রয়োজন। যাতে এসব প্রচারণা অনুষঙ্গ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে তারা সহজেই বাংলাদেশ পরিস্থিতি বুঝতে সক্ষম হবে। অবশ্য এসব প্রচারণার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ বিরোধী পাকিস্তানের অপপ্রচারের সমুচিত জবাব দেওয়া। কেননা মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে পাকিস্তানি সামরিক সরকার বহির্বিশ্বে প্রচার করে যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহী গ্রুপকে দমনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং পার্শ্ববতী দেশ ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। পাশাপাশি পাকিস্তান প্রচার করে শেখ মুজিবুর রহমান বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং দেশদ্রোহী কার্যকলাপে যুক্ত। বাংলাদেশ সরকারের কূটনীতিক পরিকল্পনার একটি সফল উদ্যোগ ছিল এসব প্রচারণার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করা। অবশ্য এজন্য বাংলাদেশ সরকার দায়িত্ব দেয় দেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিকদের। তাদের সকলের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী যে কোনো চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা। পাশাপাশি মুজিবনগর সরকারের প্রচেষ্টা ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা,

[১১৬] আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

জাপান এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেশ, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক জনমত গঠনে কূটনীতিক তৎপরতা পরিচালনা। যাতে এসব দেশ বাংলাদেশের ব্যাপারে তাদের নিরপেক্ষ নীতি বজায় রাখে।

৩. মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক পরিকল্পনার অন্যতম অংশ ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি আদায়ে সচেষ্ট হওয়া। পাকিস্তান সরকার শুরুতেই বুঝতে পেরেছিল বাঙালিরা শেখ মুজিবের নেতৃত্ব বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়। যার প্রত্যক্ষ চিত্র দেখা যায় অসহযোগ আন্দোলনের সময়। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি নস্যাৎ করা ও বাঙালিদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য এদেশের আপামর মানুষের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে গ্রেফতার করে। কিন্তু গ্রেফতার করার সংবাদ তারা ২০ এপ্রিল পর্যন্ত গোপন করে। পরবর্তীতে পাকিস্তানের একটি দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ ও ছবি দেখে বাঙালি জাতি জানতে পারে তাদের মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী নেতাকে পাকিস্তানিরা গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছে। আপামর বাঙালি জনসাধারণের মতো মুজিবনগর সরকারও শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত ছিল। কেননা পাকিস্তান সরকার পূর্বে বহুবার শেখ মুজিবের জীবন বিপন্ন করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু এদেশের মানুষের গণ আন্দোলনের মুখে তাদের সে চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের অন্যতম প্রচেষ্টা হয়ে পড়ে কীভাবে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রক্রিয়া জোরদার করা যায়। এজন্য মুজিবনগর সরকার ভারত সরকারের সাহায্যে বিশ্ব রাজনীতিতে কূটনীতিক প্রচেষ্টা চালায়। পাশাপাশি মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিশ্ব নেতৃবৃন্দদের কাছে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রচেষ্টায় সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানান।

৪. মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করার লক্ষ্যে সকল ক্ষেত্রে কূটনীতিক তৎপরতা কার্যকরী করতে সচেষ্ট হয়। এজন্য প্রতিবেশী দেশ ভারতকে কূটনীতিকভাবে অধিকতর সক্রিয় করতে উদ্যোগী হয়। কেননা মুজিবনগর সরকারের উদ্যোগ ছিল ভারতের সহযোগিতায় কূটনীতিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। যাতে বহির্বিশ্ব থেকে পাকিস্তান যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কোনো ধরনের সহযোগিতা না পায়। এজন্য মুজিবনগর সরকার ভারতের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টা করে। পাশাপাশি মুজিবনগর সরকার নিজস্ব কূটনীতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যায়। এ দুই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে মুজিবনগর সরকারের আরেকটি মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্য কোনো তৃতীয় দেশ যেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হতে না পারে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে পাকিস্তানকে কোনঠাসা করে মুক্তিযুদ্ধ অল্পসময়ের মধ্যে শেষ করে স্বাধীন দেশ হিসেবে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। মুজিবনগর সরকার বুঝতে পারে যে, একমাত্র ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বলয়ের শক্তির সহযোগিতার মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীকে দুর্বল করা যাবে। এর ফলে ইসলামাবাদের সামরিক জান্তার উপর চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হলে তারা

অবিলম্বে বিশ্ব জনমতের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে। মুজিবনগর সরকার এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে যুদ্ধকালীন ভারতের মাধ্যমে অন্য কোনো পরাশক্তির আগ্রাসন প্রতিহত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তবে সবকিছুর মূল লক্ষ্য ছিল যৌক্তিক শর্তে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সুদৃঢ়করণে ভারতের আন্তরিক ও কার্যকর সমর্থন আদায়।

৫. মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক পরিকল্পনার অন্যতম একটি বিষয় ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা নির্যাহিত হয়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের সম্মানজনকভাবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা। ভারতে শরণার্থী শিবিরগুলোতে তারা যে মানবেতর জীবন যাপন করছে সে ব্যাপারে বিশ্ব বিবেকের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

মুজিবনগর সরকারের পক্ষে কয়েকজন কূটনীতিকের সমর্থন ঘোষণা সরকারের বিভিন্ন পররাষ্ট্রনীতি কার্যক্রম পরিচালনা করতে সহায়ক হয়েছিল। এদিক থেকে বিবেচনা করলে একটি সরকারের আন্তর্জাতিক চেহারা প্রতিষ্ঠায় বাঙালি কূটনীতিকরা সহায়তা করেছিলেন।

খ. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গঠন

মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর যে কয়েকটি মন্ত্রণালয় গঠন করে তার মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছিল অন্যতম। অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ পরিচালনা, মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, তথ্য ও প্রচারসহ সরকারের বিবিধ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সঙ্গত কারণেই সরকারকে বিদেশের সহায়তা নিতে হয়েছে। আবার দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিদেশের সমর্থন ও বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতির বিষয়টিও জরুরি ছিল। ফলে মুজিবনগর সরকারকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে সরকার গঠন প্রক্রিয়ার শুরুতেই। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় খোন্দকার মোশতাক আহমেদকে এবং পররাষ্ট্র সচিব করা হয় মাহবুবুল আলম চাষীকে। মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থাকলেও বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। সকল প্রকার বৈদেশিক নীতি প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে নিজেই ঠিক করে দিতেন। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, সে সময় পৃথিবীর রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির প্রতি প্রধানমন্ত্রী প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলেন। এমনকি তিনি বিশ্ব পরিসরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কার্যকারণ ঘটনাবলী এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে বৈদেশিক প্রচার বিভাগকে পরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।[১১৭] প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সুযোগ্য নেতৃত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বৈদেশিক প্রচার বিভাগ নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় খোন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে মূল সরকারের সঙ্গে কার্যতঃ তেমন সম্পর্ক না রেখেই কাজ করছিল। তার প্রধান কারণ তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের নীতির সঙ্গে খোন্দকার মোশতাকের নীতির বিশেষত পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ক্ষেত্রে গভীর অমিল দৃশ্যমান ছিল। তাজউদ্দীন আহমদ ভারত সহ সমাজতান্ত্রিক দেশ যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল তাদের বন্ধুত্বের ঋণ স্মরণ করতেন। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ব্যাপারে তাজউদ্দীন

---

[১১৭] আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

আহমদ ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের সমর্থক ছিলেন। অপরদিকে মোশতাক আহমেদ ব্যক্তিগতভাবে দক্ষিণপন্থি ও পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করতেন।[১১৮] প্রধানমন্ত্রীত্ব নিয়ে তাজউদ্দীন আহমদ ও মোশতাক আহমেদের এ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আফসান চৌধুরী বলেছেন- 'স্নায়ুযুদ্ধের একটি মুজিবনগরীয় সংস্করণ তৈরি হয় এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে এবং তার সাথে সাথে অন্যরাও নিজেদের শক্তিকেন্দ্রকে সংহত করার চেষ্টা করে।'[১১৯] তারপরও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী স্বল্প সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ঢেলে সাজানো হয়। এ বিভাগের শ্রেণিবিন্যাসটি নিচের গ্রাফচিত্রে উপস্থাপন করা হলো।[১২০]

বৈদেশিক প্রচার বিভাগ

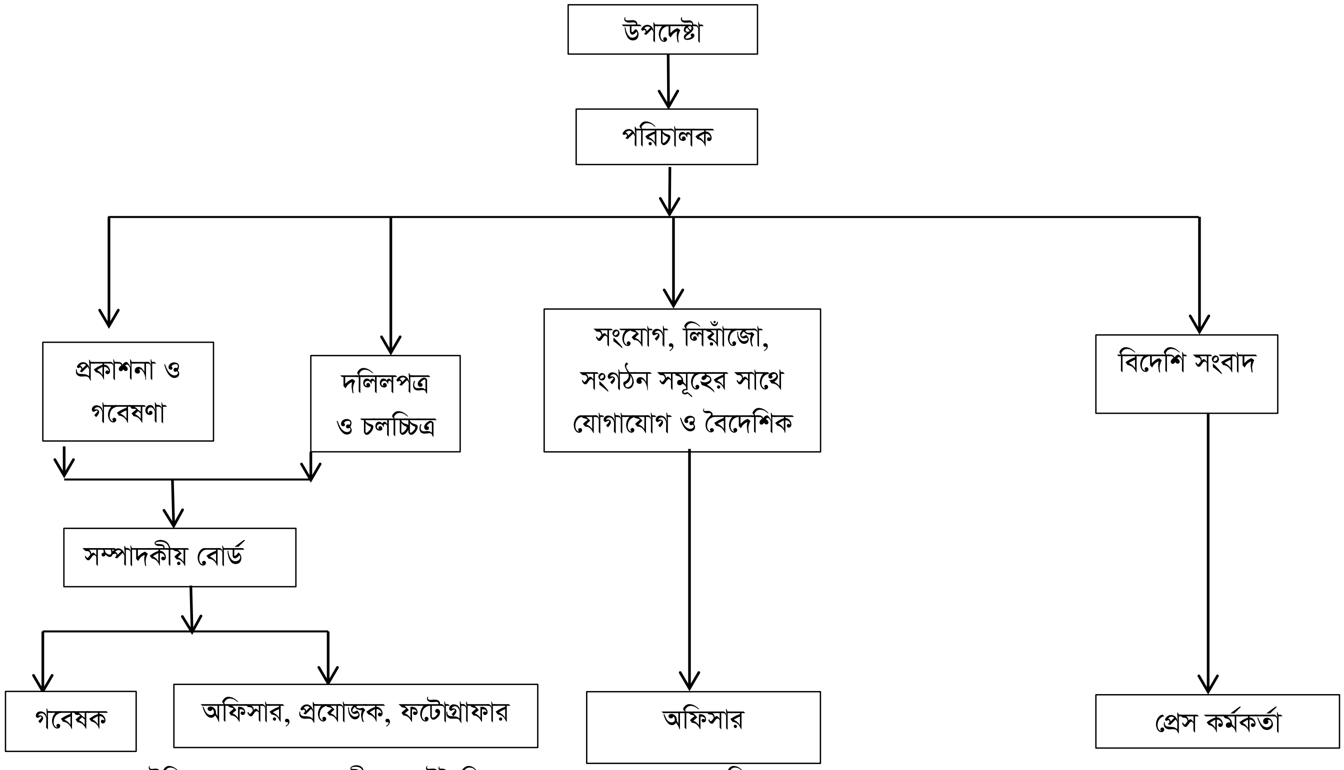

সূত্র: আবু সাইয়িদ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা কূটনৈতিক যুদ্ধ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪। পৃ. ৭০

এছাড়াও মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব তথা কার্য সম্পাদন করতে হতো। এসব কার্যগুলো মুক্তিযুদ্ধের সময় কঠোরভাবে অনুসৃত হতো। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নিজেই এর তত্ত্বাবধান করতেন। মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যেসব কার্যাবলী মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিচালনা করতো সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল–

ক. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের খুবই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগকারী বাঙালি কূটনীতিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরির নিশ্চয়তা এবং তাদের বেতন ভাতার সংস্থান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের

---

[১১৮] জাওয়াদুল করিম, *মুজিব ও সমকালীন রাজনীতি*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১। পৃ. ৮৬

[১১৯] আফসান চৌধুরী, তৃতীয় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২

[১২০] আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত* পৃ. ৭০

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর মুজিবনগরে অবস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত ঘোষণায় বাঙালি কর্মকর্তা, কর্মচারী যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত রয়েছেন তাদের আনুগত্য পরিহার করার কথা বলা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের পর তাদের প্রাপ্য সকল সুযোগ-সুবিধাসহ আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।[১২১] মুজিবনগর সরকারের এই ঘোষণার ফলে খুবই আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়। তখন পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, এত বেশি সংখ্যক কূটনীতিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে যে, তাদেরকে আর্থিক সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করতে মুজিবনগর সরকার প্রথমে অসুবিধার সম্মুখীন হলেও পরবর্তীতে তা ভালোভাবে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য যে, বাঙালি কূটনীতিক হিসেবে যারা বিশ্বব্যাপী পাকিস্তান মিশনে কর্মরত ছিলেন তারা সবাই জানতেন পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করার কারণে তাদের কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু তারপরও তাদের কাউকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দুই বার ভাবতে হয়নি। তারা জানতেন মুজিবনগর সরকার তাদের প্রাপ্য সম্মান ও সুযোগ সুবিধা এখন যুদ্ধকালীন দিতে পারবে না, তারপরও যতটুকু সম্ভব হয়েছে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে এবং তারা তা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে হাসিমুখে গ্রহণ করেছেন, দেশের জন্য কাজ করেছেন।

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী ভারত শুরু থেকেই নানা ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছিল। এসব সাহায্য সহযোগিতা কখনো আর্থিকভাবে, আবার কখনো জনবল দিয়ে আবার কখনো নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পরামর্শ দিয়ে। ভারতের যে সব নীতি নির্ধারকরা মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন তাদের পরামর্শে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশ সরকারের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যক্তিগত নামে একটি হিসাব চালু করা হয়। যে ব্যাংক হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তি, সংগঠন এর পক্ষ থেকে যে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করা হতো তা জমা করা হবে। এছাড়াও প্রবাসের অনেক বাঙালিরা ব্যক্তিগত নামে সরকারের পক্ষে হিসাব চালুর প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকালীন কোনো এক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির কারণে এসব ব্যাংক হিসাব বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে মুজিবনগর সরকার থেকে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যাতে বাংলাদেশের জনগণ এসব হিসাব ব্যবহার করতে পারে। মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব কার্যক্রম পরিচালনা করতো।

গ. যে কোনো সরকার ব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বিবেচনা করা হয়। মুজিবনগর সরকারও শপথ নেওয়ার পর থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যাপারে অধিক মনোযোগী হয়। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ এর সিদ্ধান্তক্রমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সাজানো হয়। এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মতৎপরতা শুরু হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ধ্বংস, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা, লুট, নির্যাতন, ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদির সংবাদ বিশ্বব্যাপী জানাজানি হয় মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুযোগ্য কর্মতৎপরতার কারণে। মুজিবনগর

[১২১] এইচ টি ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮

সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সুসমন্বিত উপায়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করেছে। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ প্রতিটি মুহূর্তে দেশের সার্বিক অবস্থা, যুদ্ধের সফলতা বিফলতা, রণনীতি প্রণয়ন ইত্যাদির প্রতি যেমন প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলেন তেমনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি কাজও তিনি প্রত্যক্ষভাবে নজর রাখতেন। প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতেন। যদিও এ মন্ত্রণালয়ে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ সকল মন্ত্রণালয়ের কাজের খোঁজ নিতেন, এমনকি ব্যক্তিগত ভাবে অন্যান্য মন্ত্রীদের খোঁজ নিতেন। তাই শুরু থেকেই মুজিবনগর সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার বিভাগের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যার কারণে খুব অল্প সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্ববাসী অবগত হতে পারে।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই বহির্বিশ্বে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত কূটনীতিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বাংলাদেশের সরকারের প্রতি প্রকাশ্যে আনুগত্য স্বীকার করে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছে। মুজিবনগর সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হয়ে পড়ে বিদেশে বাংলাদেশের মিশন প্রতিষ্ঠা করে ওইসব দেশে যে সকল বাঙালি কূটনীতিক রয়েছেন তাদেরকে সে মিশনের দায়িত্বে নিয়োজিত করা। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করার পূর্বেই ৬ এপ্রিল দিল্লিতে পাকিস্তান দূতাবাসের দু'জন বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছেন ঠিকই কিন্তু কলকাতাস্থ পাকিস্তান মিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার এম হোসেন আলী সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করার পাশাপাশি কলকাতাস্থ পাকিস্তান মিশন দখল করে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছেন। যা বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মিশন। তবে ইউরোপে প্রথম বাংলাদেশের কূটনীতিক দূতাবাস খোলা হয় যুক্তরাজ্যে।[১২২] প্রাথমিকভাবে কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও স্টকহোমে বাংলাদেশ সরকারের দূতাবাস ও মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব দূতাবাস ও মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের করণীয় কাজ সম্পর্কে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী নিজে এসব দূতাবাস ও মিশনের কাজগুলো প্রত্যক্ষ করতেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতেন। মুজিবনগর সরকার এসব দূতাবাস ও মিশনগুলোর মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন, ধ্বংসলীলা, গণহত্যা, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি, শরণার্থী সমস্যা এসব বিষয়গুলো তুলে ধরে প্রচারণা চালায়। এজন্য মিশন ও দূতাবাসগুলোকে বলা হয় বহির্বিশ্বের সরকার। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবী সংগঠন এসবের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে এবং বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি করতে এসব দূতাবাস কাজ করতো। মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস সময়ে এসব দূতাবাস ও মিশনগুলো বাংলাদেশ এবং মুজিবনগর সরকারের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

ঙ. মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরেকটি অন্যতম কাজের মধ্যে ছিল বিদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করার পর সর্বপ্রথম বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে

[১২২] ২৭ আগস্ট লন্ডনে প্রথম বাংলাদেশ মিশন খোলা হয়।

যোগদান উপলক্ষ্যে ইউরোপে অবস্থান করছিলেন। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, ব্যক্তিবর্গ ও সরকার প্রধানের কাছে প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়। তাদের সকলের মূল কাজ ছিল কেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা তুলে ধরা, পাকিস্তানি বাহিনী ও শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশে কী করছে তার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা। মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকার জাতিসংঘ, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লেবানন, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বার্মা ও অন্যান্য দক্ষিণ পূর্ব দেশগুলোতে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এসব প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ মুজিবনগর সরকারের পক্ষে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুভাবে সম্পাদন করেন। এসব প্রতিনিধি দলের কার্যক্রম সরাসরি মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তত্ত্বাবধান করতো।

চ. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকার তথা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরেকটি সফল তৎপরতার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশ সরকারের অস্তিত্ব সুদৃঢ় করতে ডাক যোগাযোগ স্থাপন করে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় এ লক্ষ্যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনা করা হয়। এ আলাপ-আলোচনা থেকে বাংলাদেশের নামে ডাকটিকিট প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে কলকাতার ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পোস্ট মাস্টার জেনারেল শ্রী এম.আর. কৃষ্ণন পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন।[১২৩] মুজিবনগর সরকারের নামে ডাকটিকেট প্রকাশ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা ছিল অন্যতম একটি কাজের অংশ।

গ. মুজিবনগর সরকারের পক্ষে কূটনীতিক প্রতিনিধি নিয়োগ

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন, সাহায্য, সহযোগিতা আদায় করার লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রথমেই যে পদক্ষেপ নেয় সেটি ছিল সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করার পর বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ এর যুগ্ম স্বাক্ষরে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে[১২৪] বহির্বিশ্বে ও জাতিসংঘে বাংলাদেশে কূটনীতিক মিশনের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।[১২৫] এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুর রহমান, অধ্যাপক এ আর মল্লিক, আবদুস সামাদ আজাদ, আনিসুজ্জামান, মঈদুল হাসান, মাহমুদ শাহ কোরেশী, জ্যোতিঃপাল মহাথের, মোল্লা জালালউদ্দিন, ফকির শাহাবুদ্দিন, মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী, এ্যাডভোকেট নুরুল কাদিরসহ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের অনেক সদস্য। এমনকি বিদেশে পাকিস্তান দূতাবাসের

[১২৩] এইচ টি ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯

[১২৪] বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তৎকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার সংবাদ পেয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এসময় তিনি মানবাধিকার কমিশনের একটি সম্মেলনে যোগদানের জন্য জেনেভা ছিলেন। চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার পর প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। একজন শিক্ষক, বিচারপতি ও মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে ইউরোপের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের কাছে তিনি পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন।

[১২৫] মুহম্মদ নুরুল কাদির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগকারী বাঙালি কূটনীতিকরাও মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বহির্বিশ্বে কাজ করেছেন।

ঘ. বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস প্রতিষ্ঠা

মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিদেশে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি। কিন্তু এ জনমত তৈরিতে যারা কাজ করবেন তাদের একটি স্থায়ী ঠিকানার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সে চিন্তা থেকে এবং কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাস বাংলাদেশের দখলে চলে আসায় মুজিবনগর সরকার সম্যক উপলব্ধি করে যে, যেসব দেশে বাংলাদেশের পক্ষে জনসমর্থন পাওয়া যাচ্ছে সেখানে বাংলাদেশ দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করা। যাতে সেখানকার বাঙালিরা ও বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থনকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বাংলাদেশের দূতাবাসকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালাতে পারে। পাশাপাশি ১৯৭১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বিদেশে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসের অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কূটনীতিক সাফল্যের এক বিরাট অর্জন। মুক্তিযুদ্ধকালীন বিদেশে এক অনিশ্চিত জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে যে সকল বাঙালি কূটনীতিক আনুগত্য পরিবর্তনের ঘোষণা করেছেন তারা বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। এসব বাঙালি কূটনীতিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণার জন্য দূতাবাস স্থাপন জরুরি হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধকে বহির্বিশ্বের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় বিদেশিদের সহযোগিতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এসব দূতাবাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক পালন করেছে। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে বিদেশে বাংলাদেশের মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিবেশিত এই বিজ্ঞপ্তি বিদেশে কর্মরত দূতাবাস বা মিশন প্রধান ও দূতাবাস বা মিশনের ঠিকানা তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থার সকল সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের প্রদান করা হয়।[১২৬] যাতে যে কোনো প্রয়োজনে মুজিবনগর সরকারের সমন্বিত মন্ত্রণালয় কার্যক্রমের মাধ্যমে এসব দূতাবাস বা মিশনগুলোতে যোগাযোগ করে জরুরি নির্দেশ প্রচার করতে পারে।

ঙ. মুজিবনগর সরকারের স্বীকৃতির প্রচেষ্টা

মুজিবনগর সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বের জনগণ ও রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতি আদায় করা। ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন- Pakistan is now dead and buried under a mountain of corpse. . . We now appeal to the nations of the world for recongnition and assistance both material and moral in our struggle for nationhood.[১২৭] নয়মাসব্যাপী কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে মুজিবনগর সরকার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কর্মতৎপর ছিল। বস্তুত, বৈরী পরিবেশে এটি ছিল অন্যরকম যুদ্ধ। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজধানী থেকে শুরু করে নিউইয়র্কের জাতিসংঘ ভবন পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে স্বীকৃতি ও সহানুভূতি আদায়ের সংগ্রাম বিস্তৃত হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে স্বীকৃতি কী তা আলোচনা প্রয়োজন।

---

[১২৬] আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০-৭১

[১২৭] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২

আন্তর্জাতিক সমাজে যখন একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে তখনই স্বীকৃতির প্রশ্ন উঠে। আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃতি একটি ব্যাপক ধারণা। এটি কেবল একটি আইনগত বিষয় নয় বরং এর সাথে রাজনৈতিক প্রশ্ন প্রবলভাবে জড়িয়ে আছে। এর অন্যতম কারণ- A state is a historical and political fact, the creator rather than a creature of law. অধ্যাপক G.J. Starke এর মতে- The subject is one of some difficulty and at the stage of development of international law, can be presented less as a collection of clearly defined rules or principles than as a body of fluid, inconsistent and unsystematic state practice. অধ্যাপক Starke তার পূর্বসুরী আইনবিদ L. Oppenheim এবং ফরাসি আইনবিদ J. Chapentier প্রমুখের মতামত বিশ্লেষণ করে স্বীকৃতি বিষয়টিকে কতগুলো শ্রেণিভুক্ত করেছেন। যেমন-

ক. নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি,

খ. নতুন সরকারের স্বীকৃতি,

গ. জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে স্বীকৃতি,

ঘ. কোনো রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখা ভিত্তিক রাজনীতিকে স্বীকৃতি,

ঙ. যুদ্ধরত অথবা বিদ্রোহী সরকারকে স্বীকৃতি।[১২৮]

আইনে স্বীকৃতি সংক্রান্ত দুটি প্রধান তত্ত্ব রয়েছে। ক. ঘোষণামূলক স্বীকৃতি, খ. গঠনতান্ত্রিক স্বীকৃতি। ঘোষণামূলক স্বীকৃতির অপর নাম কার্যত স্বীকৃতি। কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে যদি কোনো সরকার বা রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে তখন স্বীকৃতির বিষয়ে কেবল একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেই চলে। পক্ষান্তরে গঠনতান্ত্রিক স্বীকৃতির প্রবক্তারা আইনগত বৈধতার উপর বেশি জোর দেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র শুধু স্বীকৃতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করতে পারে। তবে অধিকাংশ সমকালীন লেখক স্বীকৃতির প্রশ্নে ঘোষণামূলক মতবাদের উপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন। অবশ্য তারা এও মনে করেন যে, চূড়ান্ত স্বীকৃতি তখনই দেওয়া যায় যখন কোনো রাষ্ট্র গঠনের পূর্ণ শর্তগুলো পূরণ করে। অর্থাৎ রাষ্ট্র গঠনে ভূখণ্ড, জনবল, সরকার ও সার্বভৌমত্ব এই চারটি উপাদান বর্তমান থাকে।

প্রাথমিকভাবে দেখা যায় যে, বাঙালিরা পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামো থেকে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ উপনিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সে কারণে রাষ্ট্র গঠনের দিক থেকে এটি একটি গৃহযুদ্ধ ছিল। Oppenheim এর মতে The law of Nations does not treat civil war as illegal. এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রথমদিকে মুজিবনগর সরকার একটি যুদ্ধরত সরকার বা বিদ্রোহী সরকার ছিল। এ ধরনের একটি সরকার গঠনের কতগুলো শর্ত রয়েছে-

১. বিদ্রোহীগণ কর্তৃক তাদের অঞ্চলে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সমর্থ হতে হবে,

২. বিদ্রোহীগণ কর্তৃক দখলকৃত এলাকায় অবশ্যই তাদের শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল সরকার গঠন করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে,

---

[১২৮] বিস্তারিত: আশফাক হোসেন, মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘ, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৩-২৪, বর্ষ ১৪০২-০৪। পৃ. ৬৩

৩. কোনো সুনির্দিষ্ট এলাকার উপর পূর্ণ দখল বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে,

৪. অবশ্যই একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হবে,

৫. অধিকৃত এলাকায় বৈধ কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হতে হবে এবং অন্যান্য দেশের সার্বভৌম সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।[১২৯]

উপরোক্ত শর্তাবলীর বেশিরভাগই মুজিবনগর সরকারে বিদ্যমান ছিল। মুজিবনগর সরকার সবসময় কিছু এলাকা শাসন করেছে। যেমন- হিলি, রৌমারি ইত্যাদি। আবার মুজিবনগর সরকার কার্যকরী সরকার ছিল। এই সরকারের একটি প্রশাসন যন্ত্র এবং সচিবালয় ছিল। ২ জুলাই মুজিবনগর সরকার ৯টি প্রশাসনিক জোন প্রতিষ্ঠা করে।[১৩০] মুজিবনগর সরকারের সেনাবাহিনী, বিদেশে কূটনীতিক মিশন ছিল। এমনকি সরকারি কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন দেওয়া হতো। ১৮ জুন মুজিবনগর সরকারের অর্থসচিব কে এ জামান জোনাল প্রশাসকদের কাছে লেখা চিঠিতে মুজিবনগর সরকারের অধীনে চাকরিরত সরকারি বেতন স্কেল অনুযায়ী অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেন।[১৩১] এসকল কিছুর পাশাপাশি মুজিবনগর সরকারের একটি প্রচার যন্ত্র ছিল। যা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে পরিচিত। মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক প্রতিনিধি এ এম এ মুহিতের মতে in every point of view it was an effective govt.[১৩২] আবার অন্য একটি দিক দিয়ে পুরোনো একটি রাষ্ট্রে বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ অথবা অন্য কোনো কারণে নতুন সরকারের অভ্যুদয় হলে কতগুলো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আন্তর্জাতিক আইনবিদ Lauterpacht এ প্রসঙ্গে চারটি শর্তের কথা বলেছেন। প্রথমতঃ ওই রাষ্ট্রের জনগণের স্বাভাবিক আনুগত্য, দ্বিতীয়তঃ সরকারের যুক্তিসঙ্গত স্থায়িত্ব, তৃতীয়তঃ সরকারের কার্যকারিতা এবং চতুর্থতঃ আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা ও নিশ্চয়তা প্রদান।[১৩৩]

এই শর্তগুলোর সবগুলোই মুজিবনগর সরকারে বর্তমান ছিল। মুজিবনগর সরকার শুধু একটি দলীয় সরকার নয় বরং একটি সর্বদলীয় সরকার ছিল। ২০ এপ্রিল ন্যাপের নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ এবং ২ এপ্রিল মওলানা ভাসানী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশ্ববাসীর নিকট আহ্বান জানান। মওলানা ভাসানী বিশ্বের ১২ জন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন। সরকারের যুক্তিসঙ্গত স্থায়িত্ব প্রশ্নে বলা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির আবির্ভাব পর্যন্ত মুজিবনগর সরকারের প্রতিটি সদস্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য ছিল বদ্ধপরিকর। আবার সরকার কার্যকর কিনা এ প্রশ্নে বলা যায় যে, মুজিবনগর সরকার যে সম্পূর্ণ কার্যকরী সরকার ছিল তা এর প্রশাসনিক কাঠামো দেখলেই স্পষ্ট হয়। মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে বিশ্বব্যাংক তাদের একটি রিপোর্টে দখলীকৃত বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ অস্থিতিশীল হিসেবে বর্ণনা করে। এসময়ের আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত রিপোর্টগুলোতে দেখা যায় যে, বড় শহর এবং সেনানিবাসগুলো ব্যতীত দখলীকৃত বাংলাদেশে সামরিক

[১২৯] আশফাক হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
[১৩০] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩
[১৩১] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২
[১৩২] আশফাক হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫
[১৩৩] *ওই*, পৃ. ৬৫

জান্তার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যুদ্ধরত বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ অঞ্চল মুজিবনগর সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এদিক থেকে বিবেচনা করলেও বলা যায় যে, মুজিবনগর সরকার একটি কার্যকর সরকার ছিল। মে মাসে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি আবদুস সামাদ আজাদ বুদাপেস্টে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন। এটি ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক ফোরাম যারা প্রকাশ্যে বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় জুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান ঘেষা নীতি পুরোপুরি অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে নিক্সন ও কিসিঞ্জার ভূ-রাজনীতি দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন।[১৩৪] এ প্রসঙ্গে হেনরী কিসিঞ্জার তাঁর *হোয়াইট হাউস ইয়ারস* এ লিখেছেন, ভূ-রাজনীতি বলতে তিনি বিশ্বরাজনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করা বুঝিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিকরা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অনেক ব্যক্তিদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হলেও ভূ-রাজনীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্র মুজিবনগর সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি।[১৩৫]

চ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব পরাশক্তির সম্পৃক্ততা ও মুজিবনগর সরকারের উদ্‌বেগ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাথমিক অবস্থায় বিশ্বের পরাশক্তিগুলো নীরব ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে তারা মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। মুজিবনগর সরকারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিশ্বের তৃতীয় কোনো শক্তি যেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে না পারে তার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ। কিন্তু বিশ্বপরাশক্তির দেশগুলো এসময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তা মুজিবনগর সরকারের জন্য উদ্‌বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যা মোকাবিলা করা ছিল মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক পরিকল্পনার একটি অংশ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে বিশ্ব পরাশক্তিগুলোর মধ্যেকার কূটনীতিক লড়াই শুরু হয়। তবে এ ব্যাপারে মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক পরিকল্পনা আলোচনার পূর্বে এশিয়া মহাদেশে বিশ্ব পরাশক্তি কীভাবে তাদের হস্তক্ষেপ নীতি বিস্তৃতি করেছিল তার প্রেক্ষাপট আলোচনা করা প্রয়োজন। দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন নীতির মূলে ছিল স্নায়ুযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত পরিস্থিতি। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব খর্ব করা এবং কমিউনিজমের সম্প্রসারণ রোধ করা ছিল এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপমহাদেশের অন্যতম দুটি রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। ১৯৪৯ সালের শেষদিকে চীনের সমাজতান্ত্রিক মনোভাব পুরোমাত্রায় যাত্রা শুরু হলে এ দুটি দেশের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরো বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট প্রভাব থেকে ভারত ও পাকিস্তানের সরকার ও জনগণকে মুক্ত রাখা এ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চাশের দশকে এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এসময় ভারত ও পাকিস্তানের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের স্টালিন সরকার নিস্পৃহ মনোভাব পোষণ করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে সুযোগ তৈরি হয়। প্রাথমিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি। কেননা ওই সময়ে চীনের পর ভারত ছিল আয়তন ও জনসংখ্যার দিক দিয়ে অনেক বড় একটি রাষ্ট্র। অপরদিকে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে মার্কিন সরকার আগ্রহী হয়। কিন্তু মার্কিন

---

[১৩৪] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ২৩৫

[১৩৫] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎশক্তিবর্গের ভূমিকা*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯। পৃ. ৬৩

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি জওহরলাল নেহেরুর অবিশ্বাস এবং নেহেরুর জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক নতুন ভাবে তৈরি হওয়ার পথ সুগম হয়। উল্লেখ্য যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে পাকিস্তান নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল। পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী দেশের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতার কেন্দ্রে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও আর্থিক সহায়তা কামনা করে। এ প্রেক্ষিতে আইসেন হাওয়ার প্রশাসন পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য ও অধিক পরিমাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে সম্মত হয়। ১৯৫৪ সালের মে মাসের পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি নামে একটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরের কিছুদিন পর পাকিস্তান মার্কিন উদ্যোগে স্থাপিত সামরিক জোট সিয়াটো ও বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করে। এর মধ্য দিয়ে মার্কিন প্রভাব শুধুমাত্র পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে নয় অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। অন্যদিকে পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অবশ্য আইসেন হাওয়ারের দ্বিতীয় প্রশাসনের সময়কালীন ভারতকে বিপুল পরিমাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। তারপরও ভারতের রাজনীতি ও বৈদেশিক নীতিতে মার্কিন বিরোধী ধারা অব্যাহত ছিল। এই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে নতুন সোভিয়েত সরকার তৃতীয় বিশ্বের কমিউনিস্ট প্রভাবহীন রাষ্ট্রগুলোর প্রতি বন্ধুত্বের সহযোগিতা নীতি অনুসরণ করে।

ষাট দশকের শুরু থেকে চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত সংঘর্ষ এবং আদর্শিক কোন্দল চরম মাত্রায় পৌঁছে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যেকার যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে এতদিনকার চীন-ভারত সম্পর্কের ভিত্তি বলে কথিত পঞ্চশীল নীতির অবসান ঘটে। এসময় উপমহাদেশীয় কূটনীতিতে একটি বিরাট পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। উপমহাদেশের এমন অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে কাছে টানার চেষ্টা করে। পাকিস্তানের প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির প্রশাসন ভারতে সামরিক সাহায্য প্রেরণ করে। এর ফলে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার এতদিন ধরে জমাট বাধা বরফ গলে যায়। যা পাকিস্তান ও মার্কিন বন্ধুত্বের মধ্যে ফাটল ধরে। উল্লেখ্য যে, এসময় ভারত তার জোট নিরপেক্ষ নীতিতে অটল থাকে। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক আরো প্রসারিত হয়। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পাকিস্তান এসময় চীনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। তবে পাকিস্তান ও চীনের মধ্যেকার যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মূল ভিত্তি ছিল ভারত বিরোধিতা। উপমহদেশের এমন অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষ্ক্রিয় নীতি অনুসরণ করে। এমনকি ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রে অস্ত্র প্রেরণ বন্ধ রাখে। অবশ্য এই সিদ্ধান্তের প্রধান লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান। কারণ ভারত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য উৎস থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করলেও পাকিস্তান মার্কিন অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের মিত্র সম্পর্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দ হয়নি। এসময় জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সমঝোতা পরিলক্ষিত হয়। উভয়ে একযোগে যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা চালায়। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে চীন পাকিস্তানের পক্ষে হস্তাক্ষেপ করতে

পারে এটি ছিল উভয় পরাশক্তির আশঙ্কা। তাদের প্রচেষ্টায় ১৭ দিন যুদ্ধের পর পাকিস্তান ও ভারত যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর পর উপমহাদেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মার্কিন প্রভাব কমতে থাকে।

ষাটের দশকের পরের কয়েক বছর ছিল যুক্তরাষ্ট্রের উপমহাদেশীয় নীতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়। এসময় মার্কিন প্রশাসন ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব থেকে দূরে থেকে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনে বেশি আগ্রহী হয়। এমন অবস্থায় ১৯৬৮ সালের মার্কিন নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী রিচার্ড নিক্সন জয়লাভ করেন। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপমহাদেশীয় নীতিতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কেননা নিক্সন পাকিস্তানের প্রতি সদয় ছিলেন এবং ভারতের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল বিরূপ। পঞ্চাশের দশকে নিক্সন ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা প্রদানের পক্ষে জোরালো পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অপরদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল তিক্ততাপূর্ণ। অবশ্য এ কথা সত্য যে, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যক্তিগত উপাদানের ভূমিকা ছিল নিতান্ত গৌণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা ছিল অন্যতম লক্ষ্য। নিক্সন প্রশাসন এসময় উপমহাদেশীয় নীতিতে পরিবর্তনের তাগিদ অনুভব করেন। তারা বুঝতে পারেন যে, অস্ত্র সরবরাহ হবে এ অঞ্চলে বৃহৎ শক্তির প্রভাব বিস্তারের মূল কৌশল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন ভারত ও পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল। ফলে উপমহাদেশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়নি। এ প্রসঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের গোয়েন্দা ও গবেষণা ব্যুরো অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের সার্বিক ফলাফলের উপর একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন তৈরি করে। যার মূল বক্তব্য ছিল- অস্ত্র সরবরাহের নিষেধাজ্ঞা মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থি। কারণ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অস্ত্রের আরো অনেক উৎস রয়েছে। উপমহাদেশে দীর্ঘদিন এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকার ফলে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের উপর আস্থা হারিয়েছে এবং ভারত জোটনিরপেক্ষ নীতিতে আরো বেশি আস্থাবান হয়েছে। একই সময়ে মার্কিন বৈদেশিক নীতি বিষয়ক কমিটিও ভারত ও পাকিস্তানে কিছু সীমিত পরিমাণে অস্ত্র প্রেরণের সুপারিশ করে। নিক্সন প্রশাসন এ লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানকে ১০০ ট্যাংক বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে অস্ত্র সরবরাহ নীতি শিথিল করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে যুদ্ধবিমান সহ বেশ কিছু ভারী অস্ত্র কেনার সুযোগ করে দেয়। ভারত ও পাকিস্তান যে কোনো একটি রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রভাব বলয় তৈরি করার জন্য এ ধরনের নীতি গ্রহণ করে। এসময় থেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সম্পর্ক তৈরি হয় তা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন আরো বৃদ্ধি পায়। যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান ঘেষা নীতি থেকে প্রতীয়মান।[১৩৬]

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নীরবতা নীতি অনুসরণ করে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে এবং পাকিস্তানকে যুদ্ধকালীন সহায়তা প্রদান করতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে যে সকল যুদ্ধকালীন সহযোগিতা করেছিল-

১. বর্ষাকালে পূর্ব পাকিস্তানে নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য কোস্টার ক্রয়ে ৪ মিলিয়ন ডলার সাহায্য প্রদান করে।

[১৩৬] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মাহমুদুল হক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা: ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ২০-২২ সংখ্যা, বর্ষ ১৩৯৮-১৪০০। পৃ. ১০১-১২৬

২. যুদ্ধের প্রয়োজনে ইয়াহিয়া খানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাহাজ বোঝাই অস্ত্র সরবরাহ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের জন্য ভারী ও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ইরান ও তুরস্কের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরণ করে।
৩. বৃহৎ হেলিকপ্টার বহন করা যায় এমন ১৮টি কোবরা গানশীপ ইরান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সরবরাহ করে।
৪. আগস্ট মাসের প্রথম দিকে লস এঞ্জেলস এর *টাইম* পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশ করা হয়। সংবাদের বিষয়বস্তু ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে সকল অস্ত্র ভিয়েতনামে পাঠানোর কথা ছিল তা পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
৫. ভিয়েতনাম যুদ্ধে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কাউন্টার ইনসার্জেন্সি বিশেষজ্ঞদের ঢাকায় মার্কিন অফিসে পাঠানো হয়।
৬. পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে সাহায্য করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।[১৩৭]

এসব ঘটনাবলি থেকে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশের সংকট সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল এবং ইয়াহিয়া খানকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের সহযোগিতার সংবাদে মুজিবনগর সরকার উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ে। মুজিবনগর সরকার মার্কিন জনমতকে বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য উদ্যোগী হয়। এই কাজটি করা হয় তিনটি সূত্রে।

প্রথমত: মার্কিন জনমত আদায়ে প্রবাসী বাঙালিদের কাজে লাগানো হয়। ২৫ মার্চ গণহত্যার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন, সেক্রেটারি রজার্স, নিরাপত্তা সহকারী কিসিঞ্জার ও সিনেটে বৈদেশিক কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর ফুলব্রাইট এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে ফ্যাক্স বার্তা পাঠানো হয়। ২৯ মার্চ ওয়াশিংটনের এক র‍্যালি হতে আই.এম.এফ., বিশ্বব্যাংক ও মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বাঙালি ছাড়াও ভারতীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরাও এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করলে মার্কিন গণপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ৩০ মার্চ *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকায় সাংবাদিক সাইমন ড্রিংয়ের রিপোর্টে গণহত্যার লোমহর্ষক বিবরণ ছাপা হয়। মার্কিন মানবতাবাদী মানুষ ও সংস্থাগুলো সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ১ এপ্রিল মার্কিন কংগ্রেসে সিনেটর কেনেডি ও সিনেটর হ্যারিস বাংলাদেশে পাকিস্তানি গণহত্যার নিন্দা জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তারা বাংলাদেশের নিরীহ মানুষের ওপর আক্রমণ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মার্কিন সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

দ্বিতীয়ত: মার্কিন জনমতকে প্রভাবিত করতে কাজ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকরা। মুজিবনগর সরকারের নির্দেশের পূর্বেই ৬ এপ্রিল পাকিস্তান দূতাবাসের কাউন্সিলর আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক বাংলাদেশের অতীত বঞ্চনা ও নারকীয় ঘটনা উল্লেখপূর্বক একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন।[১৩৮] যা বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে ওঠতে সহায়ক হয়। নিউইয়র্কে বাংলাদেশের পক্ষে কূটনীতিক আবুল

---
[১৩৭] আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১
[১৩৮] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৩৪৯

হোসেন মাহমুদ আলী (এ এইচ মাহমুদ আলী) ও স্থপতি ফজলুর রহমান খান বাংলাদেশের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। একদিকে কূটনীতিকদের প্রচেষ্টা অন্যদিকে মার্কিন পত্রপত্রিকা ও জনপ্রতিনিধিদের আপত্তি সত্ত্বেও নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখে। যার বিরূপ প্রভাব দেখা যায় মার্কিন জনসমাজে। এতে মার্কিন সরকার সামরিক সাহায্য সাময়িকভাবে বন্ধ করলেও কূটনীতিক তৎপরতার অংশ হিসেবে গোপনে তা চালিয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে মার্কিন জনমতকে প্রভাবিত করা। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে মুজিবনগর সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অধ্যাপক রেহমান সোবহান যুক্তরাষ্ট্র যান। তিনি বিভিন্ন বক্তব্য-বিবৃতির মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসন-শোষণ, বৈষম্য ও বর্বরতার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রচারপত্র মার্কিন সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচার করেন। ২৪ মে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে যুক্তরাষ্ট্রে এসে ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নিউইয়র্কে পাঠানো হয়। এই প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের ওপর অত্যাচারের নির্মম কাহিনি তুলে ধরতে সমর্থ হন। এসময়ে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি ড. এ আর মল্লিক[১৩৯] যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তোলেন।

মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক কর্মপরিকল্পনার কারণে অবশ্য কিছুটা সফলতাও অর্জিত হয়। ২ অক্টোবর দাতাগোষ্ঠীর সভায় কোনো দাতা দেশ পাকিস্তানকে কোনো প্রকারের ঋণ প্রদান করতে সম্মত হয়নি। যা ছিল পাকিস্তানের কূটনীতিক পরাজয় ও বাংলাদেশের কূটনীতিক বিজয়। তবে বাংলাদেশ সংকটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চূড়ান্ত আঘাত হানে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে। ৩ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাশ করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনকারী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন এ ধরনের তিনটি প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখানেও সফল হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অখণ্ড পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে ইয়াহিয়া সরকারকে যে সহযোগিতা করেছিল তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মধ্য দিয়ে।[১৪০]

বাংলাদেশ সংকট নিয়ে পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নও বিশ্ব কূটনীতিক পরিমণ্ডলে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনীতিক ও বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ পাকিস্তানের উভয় অংশে কর্মরত ছিল। স্বাভাবিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে বাংলাদেশ সংকটের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের নজর ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রত্যক্ষ করে যে, বাংলাদেশ সংকট নিয়ে নানা প্রেক্ষিতে সবচেয়ে বেশি জড়িয়ে পড়ছে ভারত। যা অচিরেই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের দিকে মোড় নিবে সেটিও ধারণা করে। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনোভাবেই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চাচ্ছিল না।

---

[১৩৯] অধ্যাপক এ আর মল্লিক মুক্তিযুদ্ধকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জনমত গঠনে কাজ করেন।

[১৪০] আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১-৭২

অবশ্য বিগত দশ বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার বৈদেশিক নীতিতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার নীতি অনুসরণ করেছিল। ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রমশ ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মুজিবনগর সরকার কূটনীতিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন ও সহযোগিতা আশা করছিল। এজন্য মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদককে মস্কোতে প্রেরণ করেছিল।[১৪১] মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর সরকারকে সমর্থন জানিয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। যার মধ্য দিয়ে একদিকে পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে অন্যদিকে মুজিবনগর সরকারের যে কূটনীতিক পরিকল্পনা ছিল তা-ও সফল হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনীতিক প্রচেষ্টাগুলো ছিল-

ক. সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদগর্নি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে একটি পত্র লিখেছিলেন। এ পত্রটিতে কোনো ধরনের হুমকি ছিল না। বরং শান্তিপূর্ণ উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানের সকল সমস্যা সমাধানের অনুরোধ করা হয়েছিল।

খ. মুক্তিযুদ্ধকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের মধ্যে বেশ কিছু পত্র বিনিময় হয়েছে যা বিভিণ্ন গণমাধ্যমের সূত্রে জানা যায়। এসব পত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার পাকিস্তানের সরকারকে বাংলাদেশের সমস্যাকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে সমাধান, বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, বাংলাদেশের জনগণের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি ও পাকিস্তানের দখলদারিত্ব সেনাবাহিনীকে অপসারণের কথা উল্লেখ করে।

গ. মুক্তিযুদ্ধকালীন আগস্ট মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[১৪২] এ চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পরও সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সুষ্ঠুভাবে সমাধানের আহ্বান জানায়। এ আহ্বানে বলা হয়- অবিলম্বে সংকট নিরসনে রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হতে হবে। জন্মগত, আইনগতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং শরণার্থীদের নিরাপদ ও মর্যাদা সহকারে পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার অংশ হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। এসময় বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের মনোভাব পরিবর্তন হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশ সংকট নিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিদ্যমান সমস্যাও সম্যক উপলব্ধি করে। কেননা

[১৪১] আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

[১৪২] ১৯৭১ সালে ভারত ও সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তিতে ‘শান্তিপূর্ণ’ সহাবস্থান ও সহযোগিতার নীতি রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এই চুক্তিতে ভারত ও সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া জাতিসংঘের সনদের নীতি ও উদ্দেশ্যের প্রতি উভয় রাষ্ট্রের অবিচল আস্থা স্থাপন করে ও সকল জাতির সঙ্গে এই নীতিতে মৈত্রী ও সহযোগিতা কাম্য বলে বর্ণনা করে। এই চুক্তির ৮নং ধারায় উভয় রাষ্ট্র অপর পক্ষের বিরুদ্ধে আগ্রাসনে রত কোনো তৃতীয় পক্ষকে সাহায্য করবে না ও অন্য কোনো পক্ষকে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের জন্য তাহাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দিবে না বলে ঘোষণা করেছিল। ৯ নং ধারায় সশস্ত্র সংগ্রামে কোনো তৃতীয় পক্ষ যদি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের কোনো এক পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে সাহায্য করবে না বলে উভয়ে ঐক্যমত হয়েছিল। সূত্রঃ আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫

> সোভিয়েত ইউনিয়ন এসময় পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলে, ভারতে আশ্রয় নিয়েছে প্রায় ৮০ লক্ষ শরণার্থী। তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ, সম্পত্তি দখল ও আশ্রয়হীন করে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। এমন অবস্থায় পাকিস্তান এই যুদ্ধ থেকে তেমন কিছুই অর্জন করতে পারবে না। পরে অন্য একটি ঘোষণায় কোসিগিন বলেছেন যে, পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমবেদনা রয়েছে। কিন্তু বর্বরতা ও জঘন্য মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড সোভিয়েত জনগণের সমর্থন পেতে পারে না।

বাংলাদেশ সংকট নিয়ে বৃহৎ পরাশক্তি চীনও জড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। তাই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই চীন বন্ধুরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সমর্থন জানায়। এমনকি যুদ্ধের প্রয়োজনে পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এবং ইয়াহিয়া খানকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতেও উদ্যোগী হয়। পাকিস্তানের প্রতি চীনের এ সহযোগিতা মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় ধরে অব্যাহত ছিল। পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের এমন সম্পর্কের কথা মুজিবনগর সরকার জানতো। মুজিবনগর সরকার তাদের কূটনীতিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ সম্পর্ক ভাঙার চেষ্টা করে। এজন্য মুজিবনগর সরকার ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতা আশা করছিল। যাতে তাদের মাধ্যমে পাকিস্তানের বন্ধুরাষ্ট্র চীনকে মোকাবিলা করা যায়। বাংলাদেশকে সমর্থন করার জন্য ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার প্রেক্ষিতে চীন তার বন্ধুরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সাহায্য করতে আরো বেশি উদ্যোগী হয়। **১৯৭১** সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন নৌ বহর পাকিস্তানকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। পাশাপাশি চীনও সমর প্রস্তুতি গ্রহণ করে। চীন সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তানের সঙ্গে তারাও ভারতে আক্রমণ করবে। এরকম অবস্থায় বিশ্ব কূটনীতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করায় **১৯৭১** সালের ডিসেম্বরের পূর্বেই চীনের সীমান্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন ৪০ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করে। এতে চীন সরাসরি ভারতকে আক্রমণ করার আত্মঘাতী পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু পাকিস্তানে ব্যাপক সমরাস্ত্র প্রেরণ, এমনকি বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ প্রতিহত করার লক্ষ্যে চীন পাকিস্তানে বিশেষজ্ঞ পাঠায়।[১৪৩] এখানে উল্লেখ যে, ভারত বাংলাদেশের ব্যাপারে এগিয়ে আসায় চীনও বন্ধুরাষ্ট্র পাকিস্তানের সাহায্যে এগিয়ে আসতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু বাংলাদেশ সংকটে ভারত ও চীনের অংশগ্রহণ ছিল দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে পাকিস্তান বিশ্বব্যাপী প্রচার করে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে যা ঘটছে তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। পাকিস্তানের এ কথা অনেক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা বিশ্বাস করলেও ভারত সরকার তা করেনি। কারণ ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করেছে এবং নানাভাবে সহযোগিতা করতে উদ্যোগী হয়। অপরদিকে প্রায় এক কোটি শরণার্থী আশ্রয় নেয় ভারতে। যা ছিল ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে একটি বড় চাপ। এ চাপ মোকাবিলায় জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেন মহাসচিব উথান্টের নিকট একটি পত্র পেশ করেছিলেন। এখানে তিনি লিখেছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মানুষের ওপর যে হারে নির্যাতন শুরু করেছে যা বর্তমানে শোচনীয় অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার মনে করে নিশ্চুপ হয়ে থাকার সময় নেই। আন্তর্জাতিক মহল

---

[১৪৩] আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

কর্তৃক একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে।[১৪৪] দুটি দেশের অংশগ্রহণ ভিন্ন হলেও শেষ পর্যন্ত ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সফল কূটনীতিক প্রচেষ্টার ফলে চীন নীরব ভূমিকা পালন করে। যা ছিল মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ভূমিকা ছিল ভারতের। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক বৈরিতাপূর্ণ। এর পেছনে কাজ করেছে পাকিস্তানের চিরায়ত কূটনীতিক ও নীতিগত ধারণা এবং দুই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান। এমন অবস্থায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী দেশ ভারতের পাশে দাঁড়ানোর মনোভাবে দুই দেশের বৈরি সম্পর্ক আরো এক ধাপ বৃদ্ধি পায়। ভারত এপ্রিল মাস থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে। যা ছিল মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক পরিকল্পনার একটি অংশ। ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকিস্তানি বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে থাকে। এতে পাকিস্তান তার পুরোনো নীতিতে ফিরে যায়। পাকিস্তান প্রচার করে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত হস্তক্ষেপ করছে। তাদের এ প্রচারণায় শুরুতে বিশ্ববাসী দ্বিধান্বিত থাকলেও সময়ের পরিক্রমায় এটি পরিস্কার হয়ে ওঠে যে, পাকিস্তান বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যা করছে তা অগণতান্ত্রিক ও রীতিবিরুদ্ধ। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারে তার প্রমাণ মুজিবনগর সরকার। তাই মুজিবনগর সরকার প্রথম থেকেই ভারতের বিষয়গত, বস্তুগত, নীতিগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে ভারতকে বারবার নানাভাবে অনুরোধ জানিয়েছে।[১৪৫] বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে ভারত নানাভাবে কৌশল গ্রহণ করেছে। প্রথমত: বাংলাদেশ থেকে অগণিত শরণার্থী সমস্যাকে আন্তর্জাতিকীকরণ, দ্বিতীয়ত: শরণার্থী ইস্যুকে সামনে রেখে বাংলাদেশ প্রশ্নে কূটনীতিক তৎপরতা, তৃতীয়ত: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান এবং চতুর্থত: জাতিসংঘে বাংলাদেশ সমস্যাকে উপস্থাপন। গণতন্ত্র, শান্তি, মানবতা এবং আদর্শিক কারণে বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মনোভাব থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভারত সমর্থন করেছে। বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বব্যাপী জনমত সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।[১৪৬]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ইতিবাচক নীতি পরিলক্ষিত কয়েকটি কূটনীতিক প্রচেষ্টায়। প্রধানত ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির পর ভারত বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর মতো শক্তিশালী অবস্থান তৈরি হয়। যা ছিল মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক পরিকল্পনার একটি সফল অংশ। ২৮ জুন ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেনি। কিন্তু

---

[১৪৪] আশীষ কুমার দাস, *বাংলাদশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত*, কলকাতা: লাকী পাবলিশার্স, ২০১৬। পৃ. ১২২

[১৪৫] ১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ফণীভূষণ মজুমদার ও বেগম নুরজাহান মুরশিদ মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে দিল্লি সফর করেন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের অনুরোধ জানান। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বিভিন্ন সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এ বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি ১৯৭১ সালের ১৫ অক্টোবর, ১৫ নভেম্বর ও ২৩ নভেম্বর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে এ প্রসঙ্গে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তিনটি চিঠি লিখেন। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার অনুরোধ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এনে ভারত ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। সূত্র: মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩

[১৪৬] আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪

ইয়াহিয়া খানের ভাষণের পর ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বলেন, ইয়াহিয়া খানের কঠোর পদক্ষেপের ফলে বর্তমানে রাজনৈতিক সমাধানের কোনো সুযোগ নেই। ভারত মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম জোরদার এবং বিশ্ব পরিসরে মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক তৎপরতাকে প্রকাশ্যে সহযোগিতা করে।[১৪৭] ভারতের এ কূটনীতিক সহযোগিতা অব্যাহত ছিল ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন এবং পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির সময় পর্যন্ত।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের পরে যুক্তরাজ্যের সরকার ও জনগণের কাছ থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা ও সমর্থন পেয়েছে। সে সময় লন্ডনে সবচেয়ে বেশি বাঙালি বসবাস করতো। মুজিবনগর সরকার লন্ডনে বসবাসরত বাঙালি ও তাদের বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে কূটনীতিক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্যোগী হয়। এর অংশ হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। অবশ্য পঁচিশে মার্চের ঘটনার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ২৭ মার্চ তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয় বিভাগের প্রধান ইয়ান সাদারল্যান্ড এবং পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বেসরকারি সহযোগিতার সকল প্রকার আশ্বাস লাভ করেন।[১৪৮] মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে বিচারপতি চৌধুরী সরকারের কুটনীতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হন। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ ও অনৈক্য রয়েছে। শুরুতেই তিনি যুক্তরাজ্যে ২৪ এপ্রিল কভেন্ট্রি শহরে বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি[১৪৯] এবং এটি পরিচালনার জন্য একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করেন। কার্যকরী কমিটি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পরামর্শে পরিচালিত হবে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১১ নং গোরিং স্ট্রিটে কার্যকরী কমিটির অফিস স্থাপন করা হয় এবং এখান থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কূটনীতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রবাসী বাঙালিদের কূটনীতিক তৎপরতা ও ব্রিটেনের সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রচারণার ফলে ব্রিটেনের অনেক রাজনীতিবিদ বাঙালিদের গণহত্যার প্রতিবাদ জানায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের জন স্টোনহাউস, ব্রুস ডগলাসম্যান ও পিটার শোর বাংলাদেশের সমর্থনে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেন। এই প্রচেষ্টার ফলে প্রায় ৩০০ জন পার্লামেন্ট সদস্য বাংলাদেশে অবিলম্বে রক্তক্ষয় বন্ধে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি জানায়। ফলে ১৪ মে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশের গণহত্যার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ডানপন্থি নেতা স্যার জেরাল্ড নেবারো ও রেভারেন্ড ইয়ান পেইসলি ও বামপন্থি নেতা ইয়ান মিকার্গো ও এন্ড্রু ফাউলস বাংলাদেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।[১৫০] দক্ষিণপন্থি ও বামপন্থি নেতাদের সমর্থন থাকায় এটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্রিটিশ সরকার যদিও বারবার বলে আসছিল বিষয়টি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার তারপরেও

---

[১৪৭] আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪

[১৪৮] খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮। পৃ. ৩৫

[১৪৯] ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাঙালি ছাত্রদের সর্বদলীয় এক বিরাট সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর ১১ জন সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি ইন গ্রেট ব্রিটেন গঠন করা হয়। এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। মুক্তিযুদ্ধকালীন ইংল্যান্ডের প্রায় ১৫টি শহরে বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি গঠিত হয়েছিল।

[১৫০] তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১। পৃ. ১০৩

মানবিক কারণে তারা যথেষ্ট সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করে। এমনকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যালেক ডগলাস হিউম আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানিদের পক্ষে দূরত্বের কারণে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এটা ছিল মুজিবনগর সরকারের জন্য প্রবাসে প্রাথমিক কূটনীতিক বিজয়।[১৫১]
পাকিস্তান যেন দাতাদের সাহায্য না পায় এর জন্য মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে লন্ডন ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করেন। রেহমান সোবহান যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও বাঙালি কূটনীতিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়ে পাকিস্তানের গণহত্যা, ধর্ষণ ও মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। অধ্যাপক রেহমান সোবহান ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য এমপিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাকিস্তান যেন আর্থিক সাহায্য না পায় তার জোর প্রচেষ্টা চালান। যুক্তরাজ্যে রক্ষণশীল দলের নেতা জেমস রেমসটেন ও চবিজেসেল এবং শ্রমিক দলের আর্থার বটমূলী ও রেজিনাল্ড প্রিন্টিঙ্গ ভারতে অবস্থিত শরণার্থীদের দুর্দশা পর্যবেক্ষণ করে একটি রিপোর্ট প্রদান করেন। তাদের রিপোর্টে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বর্বর চিত্র প্রতিফলিত হয়। লন্ডন থেকে ৭ জুন রেহমান সোবহান প্যারিসে গমন করেন। সেখানে পাকিস্তান এইড কনসোর্টিয়ামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে পাকিস্তানের আর্থিক সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য তাঁর নেতৃত্বে জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট পিটার কারগিল পাকিস্তান সফর করে একটি বাস্তব রিপোর্ট কনসোর্টিয়ামে উপস্থাপন করেন। পাকিস্তানে বিদ্যমান অস্থিতিশীল পরিবেশে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে এই অজুহাতে কনসোর্টিয়াম পাকিস্তানকে প্রতিশ্রুত সাহায্য স্থগিত রাখে। এই বৈঠকের ফলাফল পাকিস্তানের জন্য ছিল একটি বড় ধাক্কা এবং আন্তর্জাতিক জনমতকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সারা বিশ্বেরই প্রাথমিকভাবে একটি সমর্থন আদায় ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কূটনীতিক বিজয়।[১৫২]
পাকিস্তানের দুই প্রবল মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তাদের জাতীয় স্বার্থে বাংলাদেশের অনিবার্য অভ্যুদয়কে বিলম্বিত করতে লিপ্ত ছিল। অন্যদিকে একটি ন্যায়যুদ্ধে লিপ্ত বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে সরকারিভাবে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পক্ষ নেয় এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভারসাম্যমূলক অবস্থান গ্রহণ করে। অবশ্য শরণার্থীদের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য দেশগুলো ব্যাপক সাহায্য প্রদান করেছিল।

ছ. বিভিন্ন দেশে মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক দূত প্রেরণ

মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর পররাষ্ট্র নীতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের ওপর জোর দেয়। তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বিভিন্ন দেশে কূটনীতিক দূত প্রেরণ। মুজিবনগর সরকারের বৈদেশিক নীতির মূল কথা ছিল সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়। এ লক্ষ্য সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকার বহির্বিশ্বের সঙ্গে যে কূটনীতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে তার প্রতিফলন হিসেবে প্রথমত পাকিস্তান মিশনে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করার আহ্বান জানায়। এর পরপরই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক

---

[১৫১] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, ঢাকা: ইউপিএল, ২০০৭। পৃ. ৩১
[১৫২] রেহমান সোবহান, *আমার সমালোচক আমার বন্ধু*, পৃ. ৮১

জোরদার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায় করার জন্য মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কূটনীতিক দূত প্রেরণ করে। এসব কূটনীতিক দূত হিসেবে বহির্বিশ্বে পাকিস্তান মিশনে কর্মরত বাঙালিরা কাজ করেছে আবার অনেক সময় মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন থেকেও কাউকে কূটনীতিক প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হতো। কূটনীতিক প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকার মধ্যপ্রাচ্য, ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে প্রাধান্য দেয়। বাংলাদেশের অবস্থান ছিল দক্ষিণ এশিয়ায়। তাই স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের চাওয়া ছিল দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়। বিশেষ করে ভারত, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কার সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন সময় মুজিবনগর সরকার এক বা একাধিক প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তান ইসলামের দোহাই দিয়ে এতদিন বাংলাদেশকে শাসন করেছে। একটি মুসলমান জাতি হিসেবে বাঙালিরা যে স্বতন্ত্র সে পরিচয় মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশগুলোর কাছে ছিল অজানা। তাই মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে পাকিস্তানের এমন নগ্ন হামলার চিত্র মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে অবহিত করা প্রয়োজন ছিল। পাশাপাশি মুজিবনগর সরকার তাদের সমর্থন আশা করছিল। এসময় মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হয়ে এসব দেশে যারা কাজ করেছেন তারা বাংলাদেশ সংকটকে উপস্থাপন করে সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করেন।

মুজিবনগর সরকার মোল্লা জালালউদ্দিন এম.পি'র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সিরিয়া ও লেবাননে পাঠায়। এর অপর সদস্য ছিলেন ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী। মধ্যপ্রাচ্যে পাকিস্তান প্রচার করেছিল বাংলাদেশের জনগণের অধিকাংশই হিন্দু ও অমুসলিম। সে জন্য তারা দ্ব্যর্থহীনভাবে অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। প্রতিনিধি দল লেবানন ও সিরিয়ার বিভিন্ন সরকার প্রধান ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরেন।[১৫৩] বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দুই দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশের প্রতি সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন।

মুজিবনগর সরকার অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো আফগানিস্তান ও ইরানেও কূটনীতিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। আফগানিস্তানে কূটনীতিক প্রতিনিধি পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানের সরকারের কাছ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায় ও আফগান জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে জনমত সৃষ্টি করা। মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষী ১৯৭১ সালের ২৯ জুন আবদুস সামাদ আজাদকে এ বিষয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেন। আফগানিস্তান ও ইরানের প্রতিনিধি দলে ছিলেন আশরাফ আলী চৌধুরী এমএনএ, মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী ও অ্যাডভোকেট নুরুল কাদির।[১৫৪] ২৭ আগস্ট আবদুস সামাদ আজাদ ও নুরুল কাদির কাবুলে পৌঁছান। আফগানিস্তানে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কে এল মেহতা ও কূটনীতিক সালমান হায়দর ও এইচ কে লাল আফগানিস্তানে প্রচারকার্যে বাংলাদেশের কূটনীতিক মিশনকে সার্বিকভাবে সহায়তা করেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা আফগানিস্তানের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 'ডায়েরি অন বাংলাদেশ' ও

---

[১৫৩] খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮
[১৫৪] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১

‘রিফিউজি ৭১’ নামে দুটো ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়। অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার কাটিং প্রদর্শন করা হয়।[১৫৫]

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় ভারত বাংলাদেশের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দেখা করার সময় থেকেই ভারত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করবে। তারপরও মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান প্রশ্নে ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্যদের বোঝানোর জন্য মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এর পশ্চাতে অন্যতম কারণ ছিল, ভারত বাংলাদেশকে দ্রুত স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা পাবে এবং ভারত সরকারের ওপর চেপে যাওয়া শরণার্থী সমস্যাসহ অন্যান্য বিষয়ে বহির্বিশ্বের দেশগুলো বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়াবে। সে লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার ১৯৭১ সালের ২৫ মে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লি পাঠায়। নয়াদিল্লিতে তারা ভারতীয় পার্লামেন্টের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে উভয় দেশের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ফণীভূষণ মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত উক্ত প্রতিনিধি দলের অপর সদস্যরা ছিলেন আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার সাধারণ সম্পাদিকা ও জাতীয় পরিষদ সদস্য বেগম নুরজাহান মুরশিদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। প্রতিনিধি দলটি ভারতের কতিপয় প্রদেশ সফর করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। সপ্তাহব্যাপী সফর শেষে তারা মুজিবনগর প্রত্যাবর্তন করে বাংলাদেশে সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে সফর সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন।[১৫৬]

মুজিবনগর সরকার কূটনীতিক তৎপরতার লক্ষ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রেরিত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের দলনেতা ছিলেন ফকির শাহাবুদ্দিন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জ্যোতিঃপাল মহাথের। তারা উভয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলোতে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হয়।

জ. বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক পত্র প্রেরণ

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মুজিবনগর সরকার বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গ্রহণযোগ্যতা আদায় ও সার্বিক সহযোগিতা লাভের জন্য যে কূটনীতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয় তা কয়েকটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চালিয়ে যায়। এসব প্রক্রিয়ার একটি মাধ্যম হচ্ছে বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানের নিকট কূটনীতিক পত্র প্রেরণ। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বহির্বিশ্বের বিভিন্ন সরকার প্রধানের নিকট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা লিখে ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য পত্র প্রেরণ করে। এসব পত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে মুজিবনগর সরকারের পরিচিতি ও কর্মকাণ্ড, মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল, ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থী সমস্যা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বন্দিত্ব জীবন, পাকিস্তানিদের ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদি বিষয়

---

[১৫৫] মুহম্মদ নুরুল কাদির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০

[১৫৬] শামসুল হুদা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৪

তুলে ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি প্রবাসী সরকার থেকে প্রেরিত এসব পত্রের গুরুত্ব রয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৪ এপ্রিলে ভারত সরকার বরাবর পাঠানো পত্রের সূত্র ধরে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যৌথ স্বাক্ষরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে ৯টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত একটি পত্র লেখেন। উক্ত পত্রে ১ম অনুচ্ছেদে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, গণরায়, গণতান্ত্রিক ও মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ পদদলিত করে ২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানের সামরিক জান্তা নৃশংসভাবে আক্রমণ করায় ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা ও স্বাধীনতা সনদ, সরকার গঠন এবং শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার বিষয়টি উল্লেখিত আছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বাঙালি জাতির ওপর পশ্চিম পাকিস্তান কায়েমি চক্র কর্তৃক অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের নিপীড়নের কথা বিবৃতি করে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে সরকার গঠিত হয় যা ২৪ এপ্রিল ১৯৭১ এর পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত, উস্কানির মুখেও জনগণের শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন এবং শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন, পাকিস্তানি শাসকচক্রের ২৪ মার্চ পর্যন্ত রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে প্রহসনের আলোচনা চালানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে ২৫ মার্চ রাত্রিতে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি জনগণের ওপর আক্রমণ চালায়, তারা বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ নারী-পুরুষ, শিশু, বুদ্ধিজীবী, নেতাকর্মী, কৃষক, সাধারণ মানুষ ও ছাত্রদের হত্যা করে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জনগণ অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়। পঞ্চম অনুচ্ছেদে ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার গঠনের পর বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সঙ্গে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এবং অন্যান্য প্যারামিলিটারি সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক নীতি ও নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুক্ত হবার কথা বর্ণিত হয়। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে পাকিস্তান সামরিক জান্তা বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করা বিশেষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে হত্যা, খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মতো জঘন্য ঘটনা অব্যাহত রেখেছে। সে কারণে এসব আশ্রয়হীন ও বিপদাপন্ন মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে। সপ্তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপন আদালতে বিচার করে মৃত্যু সেলে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের গণমানুষের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সামরিক জান্তা বাংলাদেশের ৭৯ জন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সদস্যপদের অযোগ্য ঘোষণা করেছে এবং সত্তর এর নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীদের নিয়ে একটি তথাকথিত বেসামরিক সরকার গঠন করেছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এ সকল কর্মকাণ্ড সাড়ে সাত কোটি মানুষকে প্রতারিত করতে পারবে না। বরং তা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথকে দৃঢ়তর করবে। অষ্টম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সরকার আনন্দের সঙ্গে জানাতে চায় নিজ দেশকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করার জন্য দেশের তরুণ, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, সামরিক-বেসামরিক লোকদের সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দেশের অর্ধেকাংশ তারা মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এসব মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন

ভালোভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিবাহিনীকে সর্বোতভাবে সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন করে যাচ্ছে। নবম অনুচ্ছেদের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির আবেদন জানানো হয়। ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে তা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে প্রচণ্ডভাবে উজ্জীবিত করবে। ভারতের এই স্বীকৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্বাধীন ও শান্তি প্রিয় দেশকে এগিয়ে আসার অনুপ্রেরণা যোগাবে।[১৫৭]

১৯৭১ সালের ২৪ জুন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ইসলামিক কনফারেন্স জেদ্দা সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল টেংকু আবদুর রহমান বরাবর এক টেলিগ্রাম বার্তায় অবিলম্বে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের জন্য প্রভাব ও কর্তৃত্ব ব্যবহার করার আবেদন জানান। টেলিগ্রামের অনুলিপি সকল সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করার অনুরোধ জানান। ইউ.এন.আই বার্তায় বলা হয়, উক্ত টেলিগ্রামে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তার বিবরণ তুলে ধরা হয়। বার্তায় বলা হয়, পবিত্র ইসলামের নাম ব্যবহার করে পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক জান্তা এসব জঘন্য কর্মকাণ্ড ও অপরাধ সংঘটিত করছে।[১৫৮] ১৯৭১ সালের ২৩ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন বরাবর একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। উক্ত টেলিগ্রামে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ মার্কিন সরকার কর্তৃক পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের বিষয়ে গভীরভাবে আহত ও মর্মাহত। টেলিগ্রামে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন, পাকিস্তানে এই অস্ত্র ও ত্রাণকার্য সরবরাহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গণহত্যার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থেই এই গণহত্যার গণ উদ্দেশ্য এবং মূল্যবান সম্পদ ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানাচ্ছি।[১৫৯]

ঝ. বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বহির্বিশ্বকে জানানোর জন্য মুজিবনগর সরকার পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে তার মধ্যে একটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করা। এর মাধ্যমে বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের সামনে বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অভ্যন্তরীণ সমস্যার দোহাই দিয়ে যে ঘৃণ্য কর্ম করছে তা তাদের কাছে উপস্থাপন করা। মুজিবনগর সরকার এ কাজটি করার দায়িত্ব দেয় বাংলাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের। দেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তৎপরতা চালানোর জন্য ১৯৭১ সালের ১৫-১৬ আগস্ট নয়াদিল্লিতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।[১৬০] আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সাহিত্যিক শওকত ওসমান তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন–

---

[১৫৭] আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯-৮০
[১৫৮] এইচ টি ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭০-৪৭২
[১৫৯] আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১
[১৬০] J N Dixit, *Liberation and Beyond, Indo-Bangladesh Relationship*, Dhaka: American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Vol XI, South Asia Crisis, p. 86

> আজ থেকে শুরু হয়েছে, দিল্লীতে দেশের ১৪০ জন প্রতিনিধি নিয়ে বাংলাদেশের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ছ'মাস পরে এমন সংগঠন থেকে বুঝা যায়, বাংলাদেশের ব্যাপার আর ছোটখাট অবহেলাযোগ্য পর্যায়ে নেই।
> মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে মিলে পাকিস্তানী মিলিটারী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে একটি আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গড়ে তোলা হোক। এই প্রস্তাব করেন প্রখ্যাত নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ। বাঙালাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে বাণী পাঠান ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে মালরো, এডওয়ার্ড কেনেডী, ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান ভি ভি গিরি প্রমুখ জনেরা। বাঙালাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন ডক্টর এ আর মল্লিক।[১৬১]

দিল্লির *অমৃতবাজার* পত্রিকায় বাংলাদেশের এ সম্মেলন নিয়ে বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে স্পেনের বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে মিলিটারি ফ্যাসিস্টরা বিদ্রোহ করলে স্পেনীয় সরকারের সাহায্যে আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠন করা হয়। দিল্লির এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান, শেখ মুজিবের মুক্তি, শরণার্থী সমস্যা, পাকিস্তানে শান্তি মিশন পাঠানো, অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ ইত্যাদি বিষয় উত্থাপিত হয়।

২.৭ মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক তৎপরতার সাফল্য

মুজিবনগর সরকার তার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যে কুশলী বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করে কূটনীতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, তার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়ে বেশ কিছু সাফল্য দৃশ্যমান হয়েছে। এসব সফলতাগুলো এসেছে মুজিবনগর সরকারের সুদক্ষ বৈদেশিক নীতি ও সরকারের কর্মতৎপরতার ফলে। কূটনীতিক তৎপরতার ফলে যে সফলতাগুলো অর্জন হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

ক. মুজিবনগর সরকার বিদেশে বাংলাদেশি নাগরিক এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের উদ্‌বুদ্ধ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায় করে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইডেন, জাপান ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের জনগণ, বিভিন্ন সংগঠন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছে। তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছে। তারা নিজ দেশে জনসমর্থন তৈরি করেছেন, সভা-সমাবেশ করেছেন, অর্থ সংগ্রহ করেছেন শরণার্থী শিবিরে পাঠানোর জন্য। এসব কিছু সম্ভব হয়েছে মুজিবনগর সরকারের সফল প্রচার কৌশলের কারণে।

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বহির্বিশ্বের লোকজন জানতে পারে অনেক পরে। তা-ও জানে ইউরোপের একজন সাংবাদিকের প্রকাশিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে। বহির্বিশ্বের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের তুলনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বেশি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ওই দেশের সাধারণ জনগণ। মুজিবনগর সরকারের প্রচারণার কারণে ইউরোপ এশিয়ার অনেক দেশের পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশের সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। আবার অনেক সময় ধারাবাহিকভাবে কোনো প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এসব সংবাদে ওঠে আসে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, নারী নির্যাতন, ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের চিত্র। যা বহির্বিশ্বের জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়।

গ. পঁচিশে মার্চের অপারেশন সার্চলাইটের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী যে মানব হত্যার কর্ম শুরু করেছিল তা পুরো নয় মাস ধরে চলেছে। পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারে টিকতে না পেরে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটে যায় গ্রামাঞ্চলে। কিন্তু সেখানেও তারা নিরাপদে থাকতে পারেনি। এদেশিয় দোসরদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি বাহিনী পৌঁছে যায় প্রত্যন্ত

---

[১৬১] শওকত ওসমান, *স্মৃতিখন্ড মুজিবনগর*, ঢাকা: বিউটি বুক হাউস, ১৯৯২। পৃ. ৭৮

গ্রামগুলোতেও। তাই মানুষ প্রাণ বাঁচাতে জীবন বাজি রেখে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়। ভারত সরকার বাংলাদেশের এ ক্রান্তিকালীন সময়ে বাংলাদেশের লাগোয়া তাদের সকল সীমান্ত দ্বার খুলে দেয়। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পলায়নরত মানুষগুলো ছুটে যায় ভারতে। আশ্রয় নেয় শরণার্থী হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম রাজ্যগুলোতে আশ্রয় নেয়। এক মানবেতর জীবন যাপন করে প্রতিনিয়ত লড়াই করে তারা বেঁচে থাকে। এ বিপুল সংখ্যক লোকের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার সামর্থ্য মুজিবনগর সরকারের ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই ভারত সরকারের ওপর এ দায়িত্ব বর্তায়। ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধকালীন শরণার্থীদের আশ্রয়ের পাশাপাশি খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করে। এজন্য খরচ হয় বিপুল পরিমাণ অর্থ। মুজিবনগর সরকার তার বৈদেশিক নীতির মাধ্যমে বহির্বিশ্বের কাছে আবেদন জানায় এসব শরণার্থীদের জন্য সাহায্য সহযোগিতার। প্রচারণার কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থীদের জন্য বিভিন্ন দেশে তহবিল গঠন করা হয়। এসব অর্থ মুজিবনগর সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এ তহবিল গঠন ও সঠিকভাবে তহবিলের সকল অর্থ শরণার্থী ও মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যয় করা ছিল একটি চ্যালেঞ্জের কাজ। মুজিবনগর সরকার সুচারুভাবে তা সম্পন্ন করেছে। মুজিবনগর সরকারের তহবিল কীভাবে গঠিত হয় সে সম্পর্কে মুজিবনগর সরকারের অর্থ সচিব আসাদুজ্জামান এক সাক্ষাৎকারে বলেন-

> আমরা প্রথমে যখন মুজিবনগর সরকার শুরু করি, তখন বলতে গেলে কোন অর্থসংস্থান ছিল না। ভারত সরকারের সাথে কোনো সমঝোতাও তখন পর্যন্ত হয়নি। এরপর আমরা জানতে পারলাম যে কিছু কিছু জায়গায় কিছু সরকারি কর্মচারি কিছু টাকা নিয়ে এসেছে। সেটা আগরতলাও পৌছলো, পশ্চিম অঞ্চলেও ছিল। সেই টাকাগুলো পরবর্তীতে বিভিন্ন জায়গা থেকে আনা হয়। পরে পাকিস্তানি সরকার জানতে পারলো যে কিছু টাকা চলে গেছে ওপারে এবং এটা ব্যবহারও করা হবে। সুতরাং এটা যেন ব্যবহার করতে না পরে, সেই জন্য অতি দ্রুত তারা ডিম্যারিটাইজ বা বাতিল করে ফেলে।. . . ওই সময়ে আমরা কিছু টাকা ভারতীয়দের মাধ্যমে ভাঙাতে পেরেছিলাম এবং এই টাকা আমরা আমাদের সরকারের, সরকারি কর্মচারীদের বেতন এবং কিছু কিছু রিলিফের কাজে লাগিয়েছিলাম।[১৬২]

ঘ. মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই বিশেষ করে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর থেকেই পৃথিবীর অনেক দেশের পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকরা পাকিস্তান সরকারের প্রতি অনাস্থা জানায়। তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করে। তাদের এ ধরনের কূটনীতিক আচরণ বিশ্বের ইতিহাসে এমনকি কূটনীতিক ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা। এসব কূটনীতিকদের কেউ স্বপ্রণোদিত হয়ে, দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছে। আবার কখনো মুজিবনগর সরকার এর পক্ষ থেকে সকল বাঙালি কূটনীতিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। মুজিবনগর সরকারের সফল প্রচারের কারণে এসব কূটনীতিকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় নভেম্বর মাস পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন ভারতের কলকাতা, দিল্লি, নেপাল, হংকং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, যুক্তরাজ্য, আর্জেন্টিনা, ইরাক, জাপান, সুইজারল্যান্ড, ফিলিপাইন, নাইজেরিয়া সহ বিভিন্ন দেশের ৩৮ জন উচ্চপদস্থ বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছে। আবার অনেকে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করলেও নানা প্রতিকূলতার কারণে মুক্তিযুদ্ধের সময়

---

[১৬২] আসাদুজ্জামানের সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৭৯-৫৮০

করতে পারেননি। তারা মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছেন। এসব বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বড় সফলতা হিসেবে বিবেচিত।

ঙ. মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর মন্ত্রিপরিষদ এর বৈঠকে মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে পরিচালিত হবে তার রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীকে। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও যুদ্ধ কৌশল প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের জন্য সমগ্র দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। চারজন ব্রিগেড কমান্ডারের নেতৃত্বে চারটি ফোর্স গঠন করা হয়। এর পাশাপাশি অনেক আধা সামরিক, বেসামরিক বাহিনী গড়ে ওঠে। এর সবকিছু মুজিবনগর সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হতো। অন্যদিকে বাংলাদেশের মুক্তিপাগল ছাত্র, তরুণ, যুবক, কৃষক, শ্রমিক আপামর জনসাধারণ ভারতে সমবেত হয় প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য। তাদেরকে সামান্য প্রশিক্ষণ দিয়ে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরা মুক্তিবাহিনী হিসেবে পরিচিত। মুক্তিবাহিনী কখনো প্রত্যক্ষ সমরে আবার কখনো গেরিলা কায়দায় পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। তাদের সকলের মনে প্রাণে একটি দৃঢ়প্রত্যয় ছিল যে, দেশকে পাকিস্তানি শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় রণক্ষেত্রে অনেকে আহত হয়েছেন, কেউ শহিদ হয়েছেন। যারা আহত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গহানি হয়েছে তাদেরকে মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাদের অবস্থা গুরুতর ছিল তাদেরকে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য বিদেশে বিশেষ করে পূর্ব জার্মানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রেরণ করা হয়। যা সম্ভব হয়েছিল মুজিবনগর সরকারের সুদক্ষ পররাষ্ট্র নীতির কারণে। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাতে এ ধরনের সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত ছিল।

চ. মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করেছে অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে। শপথ গ্রহণের পর থেকে একটি সুস্পষ্ট বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেছে। বৈদেশিক নীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের ও সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন। এ বিষয়টিতে মুজিবনগর সরকার শুরু থেকেই গুরুত্বের সঙ্গে কার্যকর করেছে। পৃথিবীর অনেক দেশ শুরুতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখায়নি। কারণ পাকিস্তানের শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রচার করছিল পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছে তা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। স্বাভাবিকভাবে একটি দেশ অন্য আরেকটি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। ফলে বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক দেশের ভূমিকা ছিল নীরব। কিন্তু মুজিবনগর সরকার এর প্রচারণা ও বহির্বিশ্বের গণমাধ্যমে ফলাও করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিশ্ববাসী জানতে পারে সত্যিকার ঘটনা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শুরু থেকেই সমর্থন দিয়েছিল ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব জার্মানি। আর তাদের সমর্থন ও সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত ছিল পুরো মুক্তিযুদ্ধকালীন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশের প্রতিটি নদী বন্দর, সমুদ্র বন্দর, সেতু ধ্বংস করেছে, বাংলার মাঠে ঘাটে ফেলে রেখে গিয়েছিল আত্মঘাতী মাইন। এসব মাইন অপসারণ, নৌ পথ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত, সড়ক পথ সংস্কার এসব কিছু করা অত্যাবশ্যক ছিল। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে মুজিবনগর সরকার বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেছিল। যার মধ্যে একটি ছিল সকল নদী বন্দর, নৌ পথ চলাচলের উপযুক্ত করা, সড়কপথ সংস্কার ও পাকিস্তানি বাহিনীর পুতে রাখা মাইন অপসারণ। মুজিবনগর সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের জন্য এ কাজগুলো করে দিতে আগ্রহী হয়। দেশ স্বাধীনের পর খুব অল্প সময়ের মধ্যে তারা এসব কাজ সম্পন্ন করে। মুজিবনগর সরকারের অনুরোধে সোভিয়েত ইউনিয়ন কাজগুলো করে দিয়েছিল পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির সম্পর্কের কারণে। এ সম্পর্ক তৈরির পশ্চাতে সহায়তা করেছিল মুজিবনগর সরকারের সাফল্যজনক বৈদেশিক নীতি।

ছ. পাকিস্তান সরকারের শাসনামল থেকে সকল সরকারি-বেসরকারি চাকরির উচ্চতর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানের যারা সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে যোগ দিতেন তাদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো হতো। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হওয়ার পর আরো উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশেও পাঠানো হতো। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এরকম অনেক বাঙালি দেশের বাইরে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় আটকা পড়েন। তারা মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছেন। স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে তাদের কেউ কেউ পাকিস্তান সরকারের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন। এমনি একটি উদাহরণ দেওয়া যায় ফ্রান্সে পাকিস্তান নৌবাহিনীর কয়েকজন বাঙালি অফিসার প্রশিক্ষণে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনে তারা জীবন বাজি রেখে ভারতে এসে পৌঁছেন। পরবর্তীতে তাদের সহযোগিতায় ও প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ নৌবাহিনী গড়ে ওঠে। এরকম ঘটনা অন্যান্য পেশার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। বিদেশে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণরত সরকারি কর্মকর্তাদের স্বতঃপ্রণোদিত আনুগত্য প্রকাশ ছিল মুজিবনগর সরকারের কর্মতৎপরতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যুদ্ধ চলাকালে এদের আনুগত্য একদিকে যেমন পাকিস্তান সরকারের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছে অন্যদিকে মুজিবনগর সরকারের মনোবল ও আশাকে প্রবলভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে। এসব প্রশিক্ষণরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেছে।

জ. মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বহিঃপ্রচার প্রকাশনা বিভাগ ছিল। তাদের কাজ ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালানো ও জনমত সৃষ্টি করা। মুজিবনগর সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগ কাজ করতো। এ বিভাগের কাজের সফলতার প্রমাণ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান। এ বিভাগের সঠিক কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ তার অবস্থান খুব দ্রুত তৈরি করতে পেরেছে।

ঝ. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত হয়েছিল জাতিসংঘ। বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী একটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি জাতি বাধ্য হয়ে পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর প্রতিনিধি মারফত জাতিসংঘের কাছে আবেদন পাঠায় পাকিস্তানিদের এ অন্যায় আচরণ বন্ধ করতে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কথায় জাতিসংঘও নীরব থাকে এই যুক্তিতে যে, এটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু সমগ্র বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা ও ধ্বংসলীলা প্রকাশিত হলে জাতিসংঘের টনক নড়ে। কিন্তু তারপরও জাতিসংঘ সামান্য বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে তাদের দায়িত্ব শেষ করে। সময়ের পরিক্রমায় মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি, শরণার্থীদের দুর্ভোগ বাড়তে

থাকায় বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের ওপর চাপ বাড়তে থাকে। বিশ্বব্যাপী একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় জাতিসংঘ নীরব ভূমিকা পালন করছে কেন? শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘ তাদের প্রতিনিধি হিসেবে সদরুদ্দিন আগা খানকে বাংলাদেশে প্রেরণ করে। মুজিবনগর সরকার জাতিসংঘের প্রতিনিধিকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে। জাতিসংঘের প্রতিনিধিকে মুক্তাঞ্চল, শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনে নিয়ে যায়। জাতিসংঘের প্রতিনিধি প্রত্যক্ষ করে পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসলীলা ও ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থী শিবিরের দুর্ভোগের চিত্র। জাতিসংঘের প্রতিনিধির পেশকৃত রিপোর্টের ভিত্তিতে জাতিসংঘ বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। এমনকি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে এগিয়ে আসে। যা মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বড় সাফল্য।

ঞ. মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের অন্যতম একটি কূটনীতিক সফলতা হচ্ছে যুক্তরাজ্যে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ইউরোপে কূটনীতিক তৎপরতা এবং প্রবাসী বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও জনমত গঠন। দেশের ক্রান্তিকালীন সময়ে তারা সবাই আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা, সভা-সমাবেশ, ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট বিতরণ, তহবিল সংগ্রহ সবই করা হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছিল বাঙালি জাতির ত্যাগ, সাহায্য ও সহযোগিতার কারণে। তবে মুজিবনগর সরকারের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করতে গিয়ে স্বরোচিষ সরকার মন্তব্য করেছেন-

> সামরিকভাবে পৃথিবীর একটি শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা করা, বাংলাদেশের পক্ষে তথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতকে নিবিড়ভাবে যুক্ত রাখতে পারা, ভারতসহ অন্যান্য মিত্র দেশের সঙ্গে কূটনীতিক প্রক্রিয়ায় ফলপ্রসু হওয়া, ভারতে আশ্রয়প্রার্থী প্রায় এক কোটি মানুষের বহুমাত্রিক সমস্যার সমাধান চেষ্টায় রত থাকা, নানা ধরনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিরসন করা, এক পর্যায়ে মিত্রবাহিনী গঠন করে মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করা প্রভৃতি ছিল মুজিবনগর সরকারের মূল কর্মকাণ্ড।[১৬৩]

২.৮ মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক উদ্যোগের গুরুত্ব

মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর সুপরিকল্পিতভাবে কূটনীতিক উদ্যোগ পরিচালনা করেছে। এসব কূটনীতিক উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছেন মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিদেশে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনীতিকগণ। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক উদ্যোগের সুফল পরিলক্ষিত হয়। কার্যকরী কূটনীতিক উদ্যোগের কারণে পাকিস্তান বাহিনী দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার ব্যাপারে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি হয়। বিশ্বের অনেক দেশের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গিয়ে এসব গণহত্যা প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশেষ করে যেসকল বিদেশি সাংবাদিক ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় এদেশে এসেছিলেন তাদের অনেকেই গোপনে পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যার সংবাদ সংগ্রহ করে পরবর্তীতে তা প্রকাশ করেন। ফলে বিশ্ব জনমত সহজেই এ বিষয়টি জানতে পারে। আবার অনেক রাষ্ট্রপ্রধান পাকিস্তান সরকারকে গণহত্যা বন্ধের জন্য চাপ প্রয়োগ করে। পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে এক কোটি শরণার্থী পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। সেখানে তারা

[১৬৩] স্বরোচিষ সরকার, *ভাবনা নিয়ে ভাবনা জনপ্রিয় বইয়ের আলোচনা*, ঢাকা: সাহিত্য বিলাস, ২০১০। পৃ. ১১৯

মানবেতর জীবন যাপন করে। এ বিপুল পরিমাণ শরণার্থীদের প্রতিও বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এতে মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থী ইস্যু আন্তর্জাতিকীকরণ হয়েছে। মুজিবনগর সরকার থেকে প্রেরিত বিশেষ প্রতিনিধিবৃন্দ ও বিদেশে বাঙালি কূটনীতিকরা ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যসহ অনেক অঞ্চলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সফল ভাবে প্রচারণা চালিয়েছেন। ফলে এসব অঞ্চলের সুশীল সমাজ ও ছাত্র সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ হয় বাংলাদেশের প্রতি। তারা তাদের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিতে। এদের একটি অংশ মার্কিন সুশীল সমাজ ও ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে সরকার পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে। তারা শুরু থেকেই একটি দেশের ওপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া মুক্তিযুদ্ধে শক্তিশালী পক্ষকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার বিরোধিতা করতে থাকে। বিশ্বের গণতান্ত্রিক, মানবতাবাদী জনগণের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে যে স্নায়ুযুদ্ধের অবতারণা হচ্ছিল তা বন্ধ হয়ে যায়। ডিসেম্বর মাসে স্নায়ুযুদ্ধের পরিস্থিতি বিরাজ করতে থাকে। মুজিবনগর সরকারের প্রচেষ্টার ফলে বিশ্ববাসী বুঝতে পারে পাকিস্তান বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যা করছে তা কোনো অভ্যন্তরীণ ইস্যু নয়। বরং মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির মুক্তির সংগ্রাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বোপরি মুজিবনগর সরকারের সময়োচিত ও কার্যকরী পদক্ষেপের কারণে বিশ্ব জনমত ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন বন্ধ করতে সক্ষম হয়। মুজিবনগর সরকারের জোর কূটনীতিক প্রচারণার ফলেই বিশ্ববাসী বুঝতে পারে বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে দেশদ্রোহিতার দায়ে বঙ্গবন্ধুর প্রহসনের বিচার করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রচেষ্টায় মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে কথা বলা হয়েছে। ইয়াহিয়া সরকার শেষ মূহূর্তে বাধ্য হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন বন্ধ করে মুক্তি দিতে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কিন্তু নির্বাচনের পর বাঙালি জাতির গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান না করে পাকিস্তানি শাসকচক্র ষড়যন্ত্র শুরু করে। তাদের এ ষড়যন্ত্র প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৭১ সালের ১ মার্চ আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার মধ্য দিয়ে। ইয়াহিয়া খানের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আপামর জনসাধারণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে বঙ্গবন্ধু ১ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। কার্যত বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে স্থবির হয়ে পড়ে বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে আসে। অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে চলে হরতাল, মিছিল মিটিং, শোভাযাত্রা। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন ইয়াহিয়া খান তাঁর পারিষদবর্গ সহ ঢাকায় আসেন। উদ্দেশ্য বাঙালি জাতির নেতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সংকট নিরসন নিয়ে আলোচনা করা। ইয়াহিয়া খান একদিকে প্রহসনের আলোচনা অব্যাহত রাখেন অন্যদিকে গোপনে বাঙালি নিধনের সামরিক প্রস্তুতি নিতে থাকেন। গণতান্ত্রিক অধিকার কীভাবে হরণ করা যায় তার সকল ব্যবস্থা পাকিস্তানি সামরিক জান্তা পাকাপোক্ত করে। কিন্তু বাঙালি জাতিও বুঝতে পারে তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম অত্যাসন্ন। তারাও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে থাকে। দেশের আপামর জনসাধারণের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়। এমনকি বঙ্গবন্ধুর অন্যতম

রাজনৈতিক সহচর তাজউদ্দীন আহমদও অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন রাইফেল চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আলোচনা অসমাপ্ত রেখে পঁচিশে মার্চ রাতে গোপনে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। নির্দেশ দিয়ে যান বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার ও সারাদেশে গণহত্যা শুরু করার। বাঙালি জাতির ওপর চাপিয়ে দেয় একটি যুদ্ধ। কিন্তু জাতি হিসেবে বাঙালিরা যে সাহসী তার প্রমাণ পাওয়া যায় পঁচিশে মার্চের পূর্ব থেকেই। তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ প্রতিরোধ চলেছে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পিলখানায় ইপিআর সদর দপ্তরে ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। কিন্তু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর সম্মুখে তাদের এ প্রতিরোধ বেশিক্ষণ টিকে থাকেনি। বাঙালি জাতি উপলদ্ধি করে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের। পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নেন এবং ভারত সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন। ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে ইতিবাচক ভাবে গ্রহণ করে। বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে মুক্তিযুদ্ধকালীন সকল সহযোগিতা প্রদান করতে সম্মতি দেয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা। অনেক বাক বিতণ্ডা ও আলোচনা-সমালোচনার পর ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ এপ্রিল এ সরকার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তাঞ্চল মেহেরপুরে শপথ গ্রহণ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার আকারে বিশাল না হলেও অত্যন্ত সুসংগঠিত ছিল। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে এই সরকার গঠন করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে একদিকে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব, অন্যদিকে পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা নির্যাতিত হয়ে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেওয়া প্রায় এক কোটি মানুষের ত্রাণের ব্যবস্থা, লক্ষ লক্ষ মুক্তিপাগল ছাত্র জনতাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা বাহিনী গঠন করা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সর্বোপরি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনসমর্থন আদায় করা এসবই ছিল মুজিবনগর সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব। মুজিবনগর সরকারের সুস্পষ্ট বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতিক তৎপরতার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি, পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য প্রচার প্রচারণা চালায়। মুজিবনগর সরকারের এসব কাজে সহায়ক হয়েছে পাকিস্তান মিশনে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকরা যারা মুজিবনগর সরকারের আহ্বানে পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করেছে। তাদের সঙ্গে ছিল মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রবাসী বাঙালি সমাজ এমনকি বিদেশি বন্ধুরা। এসব দায়িত্ব মুজিবনগর সরকার সুচারুভাবে সম্পন্ন করার ফলেই নয় মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিশ্বের বুকে জেগে ওঠে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

অধ্যায় তিন

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও পাকিস্তান দূতাবাসে নিযুক্ত বাঙালি কূটনীতিকদের অংশগ্রহণ

ভূমিকা

১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় আন্দোলনের ভিন্ন মাত্রা শুরু হয়। বাংলার আপামর জনগণ এর প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে আসে। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া রাজনৈতিক দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সারা দেশে এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে সমগ্র পাকিস্তানে প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু হয় এবং এর ধারাবাহিকতায় একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ধাপে ধাপে অগ্রগতি বিশেষ করে নির্বাচন সম্পন্ন ও নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাঙালি জাতিকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। যে কারণে ইয়াহিয়া খানের পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা তাদের আত্মবিশ্বাসকে যেন নাড়িয়ে দেয়। অসহযোগ আন্দোলনে জনগণের সমর্থন বঙ্গবন্ধুকে নতুনভাবে উদ্দীপ্ত করে। ৭ মার্চ তিনি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেশবাসীকে সম্ভাব্য শত্রুবাহিনীকে প্রতিরোধে প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর ডাকে সারা দেশে চলতে থাকে অসহযোগ আন্দোলন। সমগ্র বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো অচল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ১০ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় দশ জন রাজনৈতিক নেতার যে সম্মেলন আহ্বান করেন তা আওয়ামী লীগ প্রত্যাখ্যান করে। এমন অবস্থায় ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান পুনরায় ২৫ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেন। ১৪ মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো এক অবাস্তব প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ফর্মুলা দেন। বঙ্গবন্ধু এতে বিভ্রান্ত না হয়ে ১৪ মার্চ ৩৫ দফাভিত্তিক এক নির্দেশনামা জারি করেন। বঙ্গবন্ধুর এ নির্দেশ জারির পর পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ অকেজো হয়ে যায়। এসময় পূর্ব পাকিস্তানে যে সরকার বিদ্যমান ছিল তাকে রাও ফরমান আলী 'ছায়া সরকার' বলে মন্তব্য করেন। সেনাবাহিনী ব্যতীত সবকিছুই কার্যত বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতে থাকে। এমন অবস্থায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেন। লোক দেখানো প্রহসনের আলোচনা চলে ২৫ মার্চ পর্যন্ত। কিন্তু আলোচনা থেকে কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। যে নীলনকশার পরিকল্পনা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকে করে আসছিল তা বাস্তবায়নে সবুজ সংকেত দিয়ে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ ঢাকা থেকে পাকিস্তানে ফিরে যান। ২৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান তাঁর বক্তৃতায় পাকিস্তানের এরকম পরিস্থিতির জন্য বঙ্গবন্ধুকে দায়ী করেন। অপারেশন সার্চলাইট চালানোর রাতেই নিজ বাসভবন থেকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার

করা হয়। অবশ্য বঙ্গবন্ধু গ্রেফতারের পূর্বেই ওয়ারল্যাসযোগে স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে যা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এর মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই পাকিস্তান বাহিনী প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। কিন্তু অচিরেই তারা এ প্রতিরোধ ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলোতেও। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সমবেত হন পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়। এখানেই আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যরা প্রয়োজন অনুভব করেন একটি সরকার ব্যবস্থার এবং যুদ্ধের রণকৌশলের। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ এপ্রিল বাংলা ভূখণ্ডের মুক্তাঞ্চলে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। শপথ গ্রহণ করার পর মুজিবনগর সরকার যে কয়েকটি বিভাগের ওপর গুরুত্বারোপ করে তার মধ্যে অন্যতম ছিল পররাষ্ট্র দপ্তর। কেননা একটি দেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে সমর্থন আদায়ের অন্যতম মাধ্যম ছিল জনমত। মুক্তিযুদ্ধের যে বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করে জনমত প্রচারে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়- বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চিত্র অর্থাৎ পাকিস্তান বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা, ধ্বংসলীলা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা, পাকিস্তানের কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি আদায় এবং সর্বোপরি পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে এক কোটি শরণার্থীর ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ও তাদের মানবেতর জীবনযাপন। অবশ্য মুজিবনগর সরকার জনমত প্রচারে দুটি পন্থা অবলম্বন করে। মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ এবং বিশ্বের যে সকল দেশে পাকিস্তানি দূতাবাস রয়েছে সেখানে কর্মরত বাঙালিদের বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে এসে তাদের মাধ্যমে কাজ করা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন সমগ্র বিশ্বের পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে শুধুমাত্র কূটনীতিক পর্যায়ে কর্মরত ছিলেন ৯২ জন বাঙালি। যাদের অধিকাংশ-ই ছিলেন দূতাবাসের উচ্চপদগুলোতে আসীন। যারা তাদের মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে স্থান করে নিয়েছেন। এসব বাঙালি কূটনীতিকদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে। তারা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই গোপনে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ শুরু করেন। আবার অনেকে পাকিস্তান সরকারের চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়ার ক্ষেত্রেও ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারা অপেক্ষা করতে থাকেন সুযোগ ও সঠিক সময়ের জন্য। এমন অবস্থায় মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের পক্ষে জনমত প্রচারে তাদেরকে কাজ করার আহ্বান জানালে অচিরেই সাড়া পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধকালীন তারা নিজেদের মর্যাদাশীল চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে আসতে দ্বিধা করেননি। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে ১৩টি দেশে কর্মরত পাকিস্তান দূতাবাসের ৩৮ জন বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য পরিবর্তন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়েছেন। তাদের অধিকাংশের পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করা ছিল একদিকে ঝুঁকিপূর্ণ অন্যদিকে অনিশ্চিত জীবনের হাতছানি। তারপরও দেশের ডাক তারা অগ্রাহ্য করতে পারেননি। শত বাধা উপেক্ষা করে বাঙালি কূটনীতিকরা মুজিবনগর সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন।

আলোচ্য অধ্যায়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার দৃশ্যমান বৈষম্য, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ সূচনা ও পাকিস্তান দূতাবাসে বাঙালি কূটনীতিকদের অবস্থান, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তান দূতাবাসগুলোর অভ্যন্তরীণ চিত্র, মুজিবনগর সরকার কর্তৃক বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের আহ্বান, বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ ও তাদের প্রতিক্রিয়া, পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ পরবর্তী বাঙালি কূটনীতিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বাঙালি কূটনীতিক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর পাকিস্তানিদের অত্যাচার-নির্যাতন এবং বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগে বিশ্ব গণমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণসহ উপস্থাপন করা হবে।

৩.১ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও পূর্ব বাংলা কখনোই লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়নি। বরং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের দাবিতে পূর্ব বাংলাকে দীর্ঘ ২৪ বছর আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। এ পুরো সময় জুড়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা প্রতিটি খাতে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে। পাকিস্তান শাসনের চব্বিশ বছরের এই বৈষম্যমূলক শাসনকালকে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ' বলে মন্তব্য করেছেন। ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর মতো অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদেও একটি রাষ্ট্রের মধ্যেই গড়ে ওঠে প্রভুত্বকারী ও শোষক গোষ্ঠী। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার বৈষম্য নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার পররাষ্ট্র দফতরে নিয়োগ ও আর্থিক বরাদ্দ পাওয়ার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য বিরাজমান ছিল তা আলোচনা করা হবে।

যে কোনো সরকারি প্রশাসনিক স্তরে সবচেয়ে মর্যাদাশীল চাকরি হচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকরি। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যে হারে বাঙালিদের চাকরি পাওয়ার কথা ছিল সে হারে তারা নিয়োগ পায়নি। এক্ষেত্রে বাঙালিরা বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে।

পাকিস্তানের দুই অংশ- পূর্ব ও পশ্চিম- মাঝখানে ভৌগোলিকভাবে হাজার মাইলের ভারতীয় এলাকা দিয়ে বিচ্ছিন্ন। এই দুই অংশের মধ্যে আয়তন ও জনসংখ্যার ঘনত্বের পার্থক্য ছিল ব্যাপক। আয়তনের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ছয় গুণ। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমের জনসংখ্যা ছিল চার কোটি ত্রিশ লক্ষ আর পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি দশ লক্ষ। ভাষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি সবকিছুতে ছিল পার্থক্য। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানে ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠী। সংখ্যায় তারা এক কোটিরও বেশি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অনুভব করতে শুরু করে যে, পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী তাদের ওপরে 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ' চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে শোষণ করছে। পূর্বের কষ্টার্জিত অর্থে পশ্চিমের উন্নয়ন তাদেরকে বিক্ষুদ্ধ করে তোলে। ১৯৬০ সালে প্রবৃদ্ধির উচ্চতর বার্ষিক হার ছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় ৩২ শতাংশ বেশি। এর পরিপ্রেক্ষিতেই বাঙালি

জাতীয়তাবাদের জন্ম এবং ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ঐতিহাসিক 'ছয়দফা দাবি' পেশ করেন।[১] আবার ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়েই অনেকে উপলব্ধি করেন যে, সম্পদ বণ্টন নিয়ে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের যে দ্বন্দ্ব তা কখনোই শেষ হবার নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষও উপলব্ধি করতে পারে যে, নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে বাঙালিদের অনুপস্থিতি এবং কম রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকাটাই তাদের দুর্দশার মূল কারণ। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গন এবং জনগণ অধিকার আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের যে কোনো আবেদন অনুমোদন হতে এবং সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে বিলম্বের কারণ ছিল কেন্দ্রের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বপূর্ণ মনোভাব। পশ্চিম পাকিস্তান নিজের অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে সবদিক থেকে দাবিয়ে রেখেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের এই ক্ষমতার দাপট থেকে রক্ষা পেতে হলে পূর্ব পাকিস্তানকে অবশ্যই শাসকবর্গের মধ্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া বিকল্প কোনো পন্থা ছিল না।[২]

বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলে ছিল আপেক্ষিক অর্থনৈতিক বঞ্চনার অনুভূতি। পূর্ব বাংলার বাঙালিদের স্বায়ত্বশাসন অর্জনের সংগ্রাম এ বিশ্বাসকে ভিত্তি করে অগ্রসর হয় যে, বাঙালিদেরকে নিজেদের অর্থনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা না দেওয়াতেই অঞ্চলটি আপেক্ষিক বঞ্চনার শিকার হয়েছে।[৩] পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বাঙালিদের ক্ষমতার হিস্যা পাওয়ার এবং পূর্ব বাংলা অঞ্চলে স্বায়ত্ত্বশাসন লাভের লড়াইকে ঘিরে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পাকিস্তানে একটি সম্মিলিত জাতিরাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি তার কারণ ছিল ক্ষমতার অংশ প্রদান কিংবা বাঙালিদেরকে স্বায়ত্তশাসন দানে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির অস্বীকৃতি।

পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আমলাতন্ত্রে ও সকল প্রকার বেসামরিক শাসনকার্যে ছিল পশ্চিমের সম্পূর্ণ প্রাধান্য। এ কারণেই দুই অঞ্চলের কাছে গ্রহণযোগ্য সংবিধান গঠন বিলম্বিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। শুরু থেকেই পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে সক্রিয় ছিল। বিশেষ করে ১৯৫৮ সালের পর থেকে সামরিক বাহিনীর নগ্ন হস্তক্ষেপ দেখা যায়। এই বাহিনীতে বিপুল সংখ্যাধিক্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের, যার ফলাফল ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনের অভ্যুত্থান এবং গণতন্ত্র চর্চার অবসান। ইতিমধ্যে পশ্চিমের পক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপব্যবহার ছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দেওয়া। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর, অনৈতিক ও অযৌক্তিক আঘাত। তাছাড়া ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমের সংস্কৃতিকে নগ্নভাবে পূর্বের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়টি এতে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল। তারপরই ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী আন্দোলন ও প্রচণ্ড প্রতিবাদ। ইতিমধ্যে পশ্চিমের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন ও নিজস্ব সুবিধার্থে সেই ক্ষমতার প্রয়োগের ফলে, সময়ের সঙ্গে আর্থিক অবস্থায় দুই অঞ্চলের মধ্যে অসমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনিতেই রাষ্ট্র গঠনের সূচনায় পশ্চিমে অধিকতর বিস্তৃত এবং উন্নত অবকাঠামো ছিল। পশ্চিমের কুক্ষিগত

---

[১] জেকব জে এফ আর (লে. জেনারেল), আনিসুর রহমান মাহমুদ অনূদিত, *সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা একটি জাতির জন্ম*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৯। পৃ. ১৭

[২] আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭। পৃ. ২৫৮-২৫৯

[৩] রেহমান সোবহান, *আমার সমালোচক আমার বন্ধু*, ঢাকা: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, ২০০৭। পৃ. ৩

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতিত্বমূলক নীতিমালা, দুই অঞ্চলের মধ্যে অসম সম্পদ বণ্টন ও আর্থিক বিনিয়োগ- সকল কিছু মিলে দুই অঞ্চলের মধ্যকার আর্থিক বৈষম্যকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলে।[৪] পূর্ব ও পশ্চিমের অংশের মধ্যে বৈষম্যের চিত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃশ্যমান হলেও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও বৈষম্য ছিল চোখে পড়ার মতো। সরকারি চাকরিতে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ শতাংশ।[৫] সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বাঙালিরা যে প্রতিনিয়ত বৈষম্যের শিকার হতো তার একটি তুলনামূলক চিত্র নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো-

সারণি ১: চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে পাকিস্তানি ও বাঙালিদের বৈষম্যের চিত্র

ক্রমিক নং	চাকরির ক্ষেত্র	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
১.	কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস	৮৪%	১৬%
২.	বৈদেশিক মন্ত্রণালয়	৮৫%	১৫%
৩.	বিদেশি মিশন প্রধান	৬০%	৯%
৪.	সেনাবাহিনী	৯৫%	৫%
৫.	সেনাবাহিনী অফিসার জেনারেল র‍্যাংক	১৬	১
৬.	নৌবাহিনী টেকনিক্যাল	৮১%	১৯%
৭.	নৌবাহিনী নন-টেকনিক্যাল	৯১%	৯%
৮.	বিমানবাহিনীর পাইলট	৮৯%	১১%
৯.	সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য	৫০০০০০	২০০০০
১০.	পাকিস্তান এয়ারলাইন্স	৭০০০	২৮০
১১.	পিআইএ পরিচালক	৯	১
১২.	পিআইএ এরিয়া ম্যানেজার	৫	০
১৩.	রেলওয়ে বোর্ড পরিচালক	৭	১

সূত্রঃ *Bangladesh Documents*, Volume 1,
Ministry of External Affairs, Government of India, 1971. p. 20

উপরোক্ত সারণির বৈষম্য চিত্র পাকিস্তানের চাকরির প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান ছিল। সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ করে সিভিল সার্ভিস, সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাঙালিদের প্রতি বৈষম্যের মনোভাব অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় বজায় রাখা হয়েছিল। চাকরিতে নিয়োগের প্রধান কেন্দ্রগুলো, সকল কেন্দ্রীয় দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল। চাকরিতে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। চাকরির বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে এমন সব শর্ত জুড়ে দেওয়া হতো যে, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের কেউ আবেদন করতে না পারে। বিশেষ করে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে শারীরিক যোগ্যতার মান এমনভাবে নির্ধারণ করা হতো যাতে গড়পড়তা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা এই যোগ্যতার মাপকাঠি কোনোভাবে উতরে যেতে না পারে।[৬]

---

[৪] নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশ জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা*, ঢাকা: ইউপিএল, ২০০৭। পৃ. ৪-৫
[৫] সালাম আজাদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান*, ইন্ডিয়া: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২০১৪। পৃ. ৮৬
[৬] *Bangladesh Documents*, Volume 1, Ministry of External Affairs, Government of India, 1971. p. 20

পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মতো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও একই চিত্র দেখা যায়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের পররাষ্ট্র দপ্তরে নিয়োগ করতো না। কারণ পাকিস্তানি পররাষ্ট্রনীতি একমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল চক্র দ্বারা প্রণীত হতো। বাঙালিদের প্রগতিশীল নীতিকে তারা কোনোদিনই গ্রহণ করেনি। এ কারণেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রতিবেশী রাষ্ট্র আফগানিস্তান ও ভারতের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে পারেনি। শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের পরিবর্তে তারা এসব দেশের সঙ্গে সব সময়ই শত্রুতা বজায় রেখেছিল। পররাষ্ট্র দপ্তরে ১০৪ জন প্রথম শ্রেণির কর্মচারীর মাত্র ৩০ জন ছিল বাঙালি। দ্বিতীয় শ্রেণির নন গেজেটেড ২০৪ জন কর্মচারীর মধ্যে বাঙালি ছিল ৫৫ জন।[৭] পাকিস্তানিদের ভাষায় বাঙালি অফিসাররা কোনো কাজের নয়। তাদের মতে 'এদেরকে বুট জুতার নিচে রেখে কলোনীর মতো শাসন করা উচিত'।[৮] পাকিস্তানিরা বাঙালিদের কম মেধাবী মনে করতো। বাঙালিদের উপহাস করে 'মাছলি খানেওয়ালে বাঙালি' বলে সম্বোধন করতো। এমনকি বাঙালিদের উচ্চতা ও শক্তিশালী কম বলে সেনাবাহিনীতেও তাদের নিত না।[৯] বাঙালি কূটনীতিক শাহ এ এম এস কিবরিয়া এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, 'দূতাবাসের পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসাররা এসব বাঙালিকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো। কারণ এদের শিক্ষা-দীক্ষা তেমন ছিলো না, আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিলো না।'[১০] আবার যোগ্যতার পরীক্ষায় বাঙালিরা উত্তীর্ণ হয়ে চাকরি পেলেও কর্মস্থল পাওয়ার ক্ষেত্রে বাঙালিরা বৈষম্যের শিকার হতেন। বাঙালিদের রাজনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ও অনাকর্ষণীয় স্থানে পদায়ন করা হতো।[১১] পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ভীরু ও দুর্বল বলে মনে করতো। এরকম একটি ঘটনার কথা মহিউদ্দিন আহমদ তাঁর সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মস্থলে থাকাকালীন তিনি একদিন বাসে উঠেন। নির্দিষ্ট স্টেশনে নামার জন্য তিনি বাস থামাতে বললে বাসটি না থেমে চলতে থাকে। এ ব্যাপারে তিনি বাসের চালক ও হেলপারের সঙ্গে কথা বলেন এবং নির্দিষ্ট স্টপেজে সম্পূর্ণ বাস থামলে তিনি নামবেন বলে স্থির করেন। এতে বাসের হেলপার তার চালককে বলে, 'ওস্তাদ বাঙালি নামবে, গাড়ি পুরো থামান'। গাড়ি চালনার আইন অনুযায়ী নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের উঠা-নামার জন্য গাড়ি নির্দিষ্ট স্টপেজে পুরোপুরি থামতে হয়। কারণ তারা শারীরিকভাবে দুর্বল। এর সঙ্গে তুলনা করে তারা বাঙালিদের ব্যঙ্গ করে দুর্বল ভাবতো এবং মনে করতো যে, বাস পুরোপুরি না থামলে বাঙালিরা নামতে পারবে না।[১২]

সিভিল সার্ভিসে লোক নিয়োগের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকিস্তানে ১৯৪৯ সালে প্রথম কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১৩] সব মিলিয়ে এ পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে ২০ জন প্রার্থী মনোনীত ও নিয়োগ লাভ করেছিল। যার মধ্যে ১১

---

[৭] রফিকুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বিরোধীশক্তি ও বৃহৎ শক্তির প্রতিক্রিয়া*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ২০১২। পৃ. ৬৯

[৮] অশোক রায়ের সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ* ১৯৭১, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭। পৃ. ৬৪৪

[৯] গবেষকের সঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মার্চ ২০১৮

[১০] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *পেছন ফিরে দেখা*, ঢাকা: ইউপিএল, ২০০৬। পৃ. ৭৬

[১১] Fazrin Huda and Jamal Khan, Defection of Bengali Diplomats in 1971: An Historical Analysis, *Journal of Social Science Review*, The Dhaka University Studies, Part D, Vol. 33, Number 2, December 2016. p. 272

[১২] গবেষকের সঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মার্চ ২০১৮

[১৩] এই পরীক্ষায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৭২টি আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। এর মধ্যে ৪৬টি আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইয়ের সময় বাতিল করা হয়। চূড়ান্তভাবে বাছাই করা ১২৬ জন পরীক্ষা দিয়েছিল এবং ৮৮ জন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিল। একইভাবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৩৪১টি আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। যার মধ্যে বাছাই প্রক্রিয়ায় বাতিল হয় ৮৭টি। চূড়ান্তভাবে বাছাই করা ২৫৪ জন পরীক্ষা দিয়েছিল এবং অকৃতকার্য হয়েছিল ২১১ জন। উল্লেখ্য যে, প্রথম সেন্ট্রাল

জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের এবং অবশিষ্ট ৯ জন পূর্ব পাকিস্তানের। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা কম হলেও সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন চট্টগ্রামের এস. এম. শফিউল আজম।[১৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর একটি পররাষ্ট্র সার্ভিস গড়ে তোলা হয়। এখানে প্রথমদিকে অনেক আইসিএস অফিসার এবং কিছু সংখ্যক প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের বা অন্য কোনো বিভাগের অফিসার এবং ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের যুদ্ধকালে প্রথম শ্রেণিতে সরাসরি নিযুক্ত অফিসার কয়েকজনকে মৌখিক পরীক্ষা ও তাদের চাকরির রেকর্ড বিবেচনা করে নিয়োগ দেওয়া হয়। এরাই পাকিস্তান পররাষ্ট্র সার্ভিসের প্রথম কূটনীতিক হিসেবে কাজ করেছে। এর পাশাপাশি সময়ে সময়ে কিছু রাজনৈতিক নেতা ও অন্যান্য অফিসার যারা পররাষ্ট্র সার্ভিসে এ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ বা দায়িত্ব পেতেন। তাদেরও পরবর্তীতে পররাষ্ট্র সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাকি সবাই সমগ্র পাকিস্তানের জন্য গৃহীত বার্ষিক কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিযুক্ত হন। সুপিরিয়র সার্ভিসে শুধু সিএসপি ও পিএফএসরাই (Pakistan Foreign Service) উঁচু বেতন স্কেলের কর্মচারী ছিলেন। তাদের সংখ্যা প্রতি বছরে সিএসপি ২০-২৫ এবং পিএফএস সর্বোচ্চ ৮ জন অর্থাৎ মোট ৩০ জনের মতো ছিল। অন্যান্য সার্ভিসের যেমন- পুলিশ, অডিট ও একাউন্টস, আয়কর, বাণিজ্য, শুল্ক, সচিবালয়ের সহকারী সচিব হিসেবে নিয়োগ পেতো। একজন সিএসপি বা পিএফএস প্রাথমিকভাবে তাদের চাকরি শুরু করতেন ৩৫০ টাকা বেতনে অন্যরা করতেন ৩০০ টাকা বেতনে। পুরো পাকিস্তান আমলে এই নিয়ম বহাল ছিল।[১৫]

পাকিস্তানি আমলে অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যে পররাষ্ট্র বিভাগে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে কম ছিল। ১৯৪৯ সাল থেকে পররাষ্ট্র সার্ভিসে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুপাত রাখার যে চেষ্টা চলছিল তা আন্তরিক ছিল না। যেমন, ১৯৪৮ সালের ব্যাচে পররাষ্ট্র সার্ভিসে বাছাই করা হয় ১৫ জনকে। এর মধ্যে একজনও বাঙালি ছিলেন না। অস্থায়ী ভিত্তিতে সে সময় গুটিকয় বাঙালি অফিসারকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে পররাষ্ট্র সার্ভিসে বাঙালি অফিসারদের যে সংখ্যা থাকা উচিত ছিল তা হয়নি। বাঙালি অফিসারদের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট কম। অধিকাংশ বাঙালি অফিসার আবার ভালো কর্মস্থল পেতেন না। তবে ১৯৬০ সালের পর থেকে এই পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতে থাকে। অকূটনৈতিক পদসমূহে বাঙালিদের নিয়োগ করা হতো খুব কম। এক্ষেত্রে একটা বৈষম্যমূলক নীতি ইচ্ছাকৃতভাবে অনুসরণ করা হতো। ১৯৬৮ সালের পর থেকে এই প্রবণতা বিপরীতমুখী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে পদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা এবং এসব পদ আবার পাকিস্তানের উভয় অংশে ভাগ করে দেওয়া হতো। এতে করে পশ্চিম পাকিস্তানের সুবিধাজনক অবস্থান অব্যাহত থাকে। এসময় একজন বাঙালি কূটনীতিক ইসলামাবাদে পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে

সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ১০-২৪ জানুয়ারি এবং লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ২ জুন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় (১৮-২০ জুন ১৯৪৯), চট্টগ্রামে ২৩ জুন ১৯৪৯ ও পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে (১-৯ জুলাই ১৯৪৯)। বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ *Second Report of the Pakistan Public Service Commission for the Period 1st January to 31st December 1949*, pp. 6-7, 20.

[১৪] কাবেদুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধে সিএসপি ও ইপিসিএস অফিসারদের ভূমিকা*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৬। পৃ. ৩২; বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১২ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ৬ জানুয়ারি ১৯৮৪

[১৫] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতিময় কর্মজীবন*, ঢাকাঃ চন্দ্রাবতী একাডেমি, ২০১৮। পৃ. ১৩৪-১৩৫

পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[১৬] তিনি জানান যে, শাহ আবু মোহাম্মদ শামসুল কিবরিয়া পররাষ্ট্র দপ্তরের পরিচালক হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন আরো অফিসার নিয়োগ শুরু করেন। সে প্রক্রিয়া ফখরুদ্দীন আহমদ আরো জোরদার করেন এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বাঙালিদের কোটার অধিক লোক নিয়োগ করেন। এমনকি বিদেশে বাঙালি স্টাফ নিয়োগের প্রক্রিয়াও জোরদার করেন।[১৭] **১৯৭০** সাল পর্যন্ত বিশ্বে পাকিস্তানের ৬৮টি বৈদেশিক মিশন ছিল যার মাত্র **১৪**টিতে বাঙালি রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত এর আলোকে বিশ্বের কোন কোন দেশে বাঙালি কূটনীতিকরা কর্মরত ছিলেন তার একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। তালিকাটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১৯৭১ সালে বিশ্বব্যাপী পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের তালিকা[১৮]

ক্রমিক নং	বাঙালি কূটনীতিকদের নাম	পদমর্যাদা	কর্মরত দেশ
১.	হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী	কাউন্সেলর	নয়াদিল্লি, ভারত
২.	রিয়াজ রহমান	প্রথম সচিব	নয়াদিল্লি, ভারত
৩.	কে এম শিহাবুদ্দিন	দ্বিতীয় সচিব	নয়াদিল্লি, ভারত
৪.	তাহের কুদ্দুস	দ্বিতীয় সচিব	নয়াদিল্লি, ভারত
৫.	আমজাদুল হক	প্রেস এটাচি	নয়াদিল্লি, ভারত
৬.	এম হোসেন আলী	ডেপুটি হাইকমিশনার	কলকাতা, ভারত
৭.	রফিকুল ইসলাম চৌধুরী	প্রথম সচিব	কলকাতা, ভারত
৮.	আনোয়ারুল করিম চৌধুরী	তৃতীয় সচিব	কলকাতা, ভারত
৯.	কাজী নুরুল ইসলাম	তৃতীয় সচিব	কলকাতা, ভারত
১০.	এম. মাকসুদ আলী	সহকারী প্রেস এটাচি	কলকাতা, ভারত
১১.	ফখরুদ্দীন আহমদ	পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান
১২.	তবারক হোসেন	মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান
১৩.	মুস্তাফিজুর রহমান	দ্বিতীয় সচিব	নেপাল
১৪.	মোখলেছ উদ্দিন	দ্বিতীয় সচিব	নেপাল
১৫.	কাজী আনওয়ারুল মাসুদ	দ্বিতীয় সচিব	বার্মা
১৬.	এ কে এম ফারুক	দ্বিতীয় সচিব	থাইল্যান্ড
১৭.	মাহবুবুল আলম	তৃতীয় সচিব	থাইল্যান্ড
১৮.	খুররম খান পন্নী	রাষ্ট্রদূত	ফিলিপাইনস
১৯.	আবদুল কাইয়ুম	দ্বিতীয় সচিব	মালয়েশিয়া
২০.	আমিনুল ইসলাম	দ্বিতীয় সচিব	মালয়েশিয়া
২১.	মোহাম্মদ হুমায়ুন কামাল	তৃতীয় সচিব	মালয়েশিয়া

[১৬] ফখরুদ্দীন আহমদ **১৯৬৮** সালের আগস্ট মাসে ঘানা থেকে এসে এ পদে যোগ দেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে তাঁকে আবার বদলি করা হয় গবেষণা অধিদপ্তরে। এখানে তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন অধ্যাপক জি. ডব্লিউ চৌধুরী। তিনি আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানের খুব ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

[১৭] ফখরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ আলী সরকার অনুদিত, *উত্তাল তরঙ্গের দিনগুলি*, ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০১। পৃ. ৬০

[১৮] পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছর ব্লু বুক নামে একটি ডাইরেক্টরি প্রকাশ করা হতো। যেখানে বিশ্বব্যাপী কোন কোন দেশে পাকিস্তানের দূতাবাস বা মিশন বা কনসুলেট অফিস আছে এবং সেগুলোতে কে কোন পদে কর্মরত আছেন তার সম্পূর্ণ তালিকা উল্লেখ থাকতো। গবেষণার প্রয়োজনে বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমির গ্রন্থাগারে **১৯৭১** ও এর পূর্ববর্তী ব্লু বুকের কোনো কপি আছে কিনা খোঁজ করা হয়েছিল। কিন্তু পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে ফরেন সার্ভিস একাডেমির অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বপালনকারী বাঙালি কূটনীতিক মহিউদ্দিন আহমদ এর সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হয়। তিনিও এ ব্যাপারে কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে পারেননি। তাই গবেষণাকাজে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত, সাক্ষাৎকার ইত্যাদির ভিত্তিতে বিশ্বের কোন কোন দেশে **১৯৭১** সালে কোন বাঙালি কূটনীতিক ব্যক্তিবর্গ কর্মরত ছিলেন তা জানার জন্য এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

২২.	আবুল ফজল শামসুজ্জামান	রাষ্ট্রদূত	ইন্দোনেশিয়া
২৩.	মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ	দ্বিতীয় সচিব	ইন্দোনেশিয়া
২৪.	আবেদীন	প্রেস কাউন্সেলর	ইন্দোনেশিয়া
২৫.	সৈয়দ মোতাহের হোসেন	রাষ্ট্রদূত	জাপান
২৬.	এ কে এইচ মোর্শেদ	প্রথম সচিব	জাপান
২৭.	মোস্তফা ফারুক	দ্বিতীয় সচিব	জাপান
২৮.	কিউ. এ. এম. আবদুর রহীম	তৃতীয় সচিব	জাপান
২৯.	নাসির আহমদ	তৃতীয় সচিব	জাপান
৩০.	সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুদ	প্রেস এটাচি	জাপান
৩১.	খাজা মোহাম্মদ কায়সার	রাষ্ট্রদূত	চীন
৩২.	আখতার	ডেপুটি ডিরেক্টর	চীন
৩৩.	খুরশিদ হামিদ	দ্বিতীয় সচিব	চীন
৩৪.	সৈয়দ নুর হোসেন	তৃতীয় সচিব	চীন
৩৫.	আবুল আহসান		চীন
৩৬.	হুমায়ুন কবির		চীন
৩৭.	মহসীন আলী	মিশন প্রধান	হংকং
৩৮.	মহিউদ্দিন আহমেদ	ভারপ্রাপ্ত বাণিজ্য কমিশনার	হংকং
৩৯.	এ এইচ মাহমুদ আলী	ভাইস কনসাল	নিউইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৪০.	আরশাদ-উজ-জামান	প্রেস এটাচি	নিউইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৪১.	সৈয়দ আনোয়ারুল করিম	উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি	জাতিসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৪২.	এনায়েত করিম	মিনিস্টার	ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৪৩.	শাহ এ এম এস কিবরিয়া	রাজনৈতিক কাউন্সেলর	ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৪৪.	বশির	মিনিস্টার	ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৪৫.	আবুল মাল আবদুল মুহিত	ইকনমিক কাউন্সেলর	ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৪৬.	আবু রুশদ মতিনউদ্দিন	শিক্ষা ও সংস্কৃতি কাউন্সেলর	ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৪৭.	সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী	তৃতীয় সচিব	ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৪৮.	আতাউর রহমান চৌধুরী	তৃতীয় সচিব	ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৪৯.	আবদুর রাজ্জাক খান	সহকারী শিক্ষা এটাচি	ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৫০.	মোসলেহ উদ্দিন আহমদ	কমার্শিয়াল কাউন্সেলর	প্যারি, কানাডা
৫১.	আবদুল মোমেন	রাষ্ট্রদূত	আর্জেন্টিনা
৫২.	এম সলিমুজ্জামান	ডেপুটি হাইকমিশনার	যুক্তরাজ্য
৫৩.	এম এম রেজাউল করিম	কাউন্সেলর	যুক্তরাজ্য
৫৪.	মহিউদ্দিন আহমদ	দ্বিতীয় সচিব	যুক্তরাজ্য
৫৫.	আকবর লুৎফুল মতিন	ডিরেক্টর, একাউন্টস এন্ড অডিটস	যুক্তরাজ্য
৫৬.	আবদুর রউফ	ডেপুটি ডিরেক্টর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা	যুক্তরাজ্য
৫৭.	আজিজুল হক চৌধুরী	তৃতীয় সচিব	যুক্তরাজ্য
৫৮.	এ এফ এম এহসানুল কবীর	ইকনমিক মিনিস্টার	যুক্তরাজ্য

৫৯.	ফজলুল হক চৌধুরী	লেবার এটাচি	যুক্তরাজ্য
৬০.	এ এস এম খায়রুল আনাম	দ্বিতীয় সচিব	বেলজিয়াম
৬১.	এ এইচ এস আতাউল করিম	কাউন্সেলর	ইতালি
৬২.	মনজুর আহমেদ চৌধুরী	কাউন্সেলর	ফ্রান্স
৬৩.	ফারুক সোবহান	প্রথম সচিব	ফ্রান্স
৬৪.	মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন	তৃতীয় সচিব	ফ্রান্স
৬৫.	এস এম রাশেদ	তৃতীয় সচিব	অস্ট্রিয়া
৬৬.	আবদুর রাজ্জাক		সুইডেন
৬৭.	ওয়ালিউর রহমান	দ্বিতীয় সচিব	সুইজারল্যান্ড
৬৮.	মোস্তফা কামাল	দ্বিতীয় সচিব	সুইজারল্যান্ড
৬৯.	নূর		সুইজারল্যান্ড
৭০.	ইউসুফ খান মজলিশ		সুইজারল্যান্ড
৭১.	এ এফ এম বশিরুল আলম	রাষ্ট্রদূত	পোল্যান্ড
৭২.	মোস্তফা কামাল	রাষ্ট্রদূত	বুলগেরিয়া
৭৩.	ফজলুল করিম	চ্যান্সেরী প্রধান	মিশর
৭৪.	মোহাম্মদ জমির	তৃতীয় সচিব	মিশর
৭৫.	খাজা শারজিল হাসান	তৃতীয় সচিব	মিশর
৭৬.	আব্দুল্লাহ আল আহসান	তৃতীয় সচিব	মিশর
৭৭.	এম. আনোয়ারুল হক	রাষ্ট্রদূত	সেনেগাল
৭৮.	মহিউদ্দিন আহমেদ জায়গীরদার	তৃতীয় সচিব	নাইজেরিয়া
৭৯.	আতাউর রহমান	রাষ্ট্রদূত	সুদান
৮০.	এ কে এম ফজলুর রহমান	দ্বিতীয় সচিব	সুদান
৮১.	আব্দুল মমিন চৌধুরী	দ্বিতীয় সচিব	তাঞ্জানিয়া
৮২.	এ এইচ কায়সার মোরশেদ	কাউন্সেলর	অস্ট্রেলিয়া
৮৩.	জিয়াউস শামস চৌধুরী	দ্বিতীয় সচিব	অস্ট্রেলিয়া
৮৪.	রেয়াজুল হাসান	তৃতীয় সচিব	সোভিয়েত ইউনিয়ন
৮৫.	নিজামুর রহমান	বাণিজ্য সচিব	চেকোশ্লোভাকিয়া
৮৬.	এম আনোয়ারুল হাশিম	দ্বিতীয় সচিব	যুগোশ্লাভিয়া
৮৭.	এস এম রাশেদ আহমদ চৌধুরী	দ্বিতীয় সচিব	যুগোশ্লাভিয়া
৮৮.	মুস্তফা কামাল	তৃতীয় সচিব	পশ্চিম জার্মানি
৮৯.	তোফায়েল করিম হায়দার	তৃতীয় সচিব	পশ্চিম জার্মানি
৯০.	আমীর আনোয়ার সাদানী	তৃতীয় সচিব	পশ্চিম জার্মানি
৯১.	কামাল আহমেদ	রাষ্ট্রদূত	চেক প্রজাতন্ত্র
৯২.	এ এফ এম আবুল ফতেহ	রাষ্ট্রদূত	ইরাক
৯৩.	মীর্জা রশিদ তালুকদার	রাষ্ট্রদূত	লেবানন
৯৪.	এম রুহুল আমিন	তৃতীয় সচিব	লেবানন
৯৫.	এইচ কে পন্নী	রাষ্ট্রদূত	সিরিয়া
৯৬.	আবদুল মোমেন চৌধুরী	দ্বিতীয় সচিব	সিরিয়া
৯৭.	এ এইচ খান	কনসাল জেনারেল	তুরস্ক

৯৮.	এম আফসারুল কাদের	তৃতীয় সচিব	তুরস্ক
৯৯.	আজহারুল আনোয়ার চৌধুরী	বাণিজ্য প্রতিনিধি	সংযুক্ত আরব আমিরাত
১০০.	মোহাম্মদ রুহুল আমিন	তৃতীয় সচিব	জর্ডান
১০১.	মাহবুবুল হক	প্রথম সচিব	ইরান
১০২.	আহমেদ তারিক করিম	দ্বিতীয় সচিব	ইরান
১০৩.	কাজী আফজালুর রহমান	তৃতীয় সচিব	ইরান

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কূটনীতিক পদগুলোকে ঢেলে সাজাতে পাকিস্তান পররাষ্ট্র দফতরের পরিচালক হিসেবে ফখরুদ্দীন আহমদ নির্দেশনা দিতে শুরু করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল বৈদেশিক মিশন একটিই হবে, কিন্তু দুই অঞ্চলের জন্য থাকবে দুই স্বতন্ত্র দফতর। বাংলাদেশের ভাগ্য বাঙালিরাই নির্ধারণ করবে।[১৯] পাকিস্তান মিশন বা দূতাবাসগুলোতে বাঙালিদের সংখ্যা কেমন ছিল তার একটি চিত্র পাওয়া যায় শাহ এ এম এস কিবরিয়ার স্মৃতিকথায়। জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সচিবালয়ে তখন প্রায় ১৭/১৮ জন পাকিস্তানি নাগরিক কর্মরত ছিলেন। কিন্তু কোনো বাঙালি সেখানে ছিলেন না। নিউ ইয়র্কের পাকিস্তান মিশনে মাত্র দুজন বাঙালি অফিসার ছিলেন। প্রেস এ্যাটাচি আরশাদ-উজ-জামান ও শাহ এ এম এস কিবরিয়া। তিনি উল্লেখ করেছেন, পাকিস্তানের তৎকালীন স্পিকার তমিজউদ্দিন খান নিউ ইয়র্ক সফরে যান। রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি স্যার জাফরুল্লা খান স্পিকারের সম্মানে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করেন। জাতিসংঘের সেক্রেটারিয়েটে কর্মরত পাকিস্তানিদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সংবর্ধনা সভায় স্পিকার স্থানীয় বাঙালিদের সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু একজন বাঙালিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এসময় শাহ এ এম এস কিবরিয়া ও আরশাদ-উজ-জামান স্পিকারের সামনে উপস্থিত হন। স্পিকার বাঙালি দু'জনকে দেখে হতাশ হন। তিনি হয়তো জানতেন যে, পাকিস্তানে বাঙালিদের স্থান একেবারে পেছনের সারিতে।[২০]

সারণি ২: ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব

মন্ত্রণালয়	প্রথম শ্রেণি			দ্বিতীয় শ্রেণি গেজেটেড			দ্বিতীয় শ্রেণি নন গেজেটেড			তৃতীয় শ্রেণি		
	মোট	পূ.পা.	শতকরা হার	মোট	পূ.পা.	শতকরা হার	মোট	পূ.পা.	শতকরা হার	মোট	পূ.পা.	শতকরা হার
পররাষ্ট্র	২২০	৬	২৭.৭%	২৫	১	৪%	৪৭১	১৪৬	৩১%	৩৫২	১৩৫	৩৮.৪%

সূত্রঃ *National Assembly of Pakistan Debates 1964*, (15 June 1964), Vol II, P. 750-755

[১৯] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান* ১৯৭১, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬। পৃ. ২৩
[২০] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬-৭৭

সারণি ৩: বিদেশে পাকিস্তান মিশনগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য চিত্র

ক্যাটাগরি	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট
প্রথম শ্রেণি	৩০	৬৯	৯৯
দ্বিতীয় শ্রেণি গেজেটেড	-	১৪	১৪
দ্বিতীয় শ্রেণি নন গেজেটেড	৪৮	১৪৬	১৯৪
তৃতীয় শ্রেণি	৮৯	১৩৬	২২৫
মোট	১৬৭	৩৬৫	৫৩২

সূত্রঃ *National Assembly of Pakistan Debates* 1968, 13 June 1968

১৯৫২ সালের ৫ এপ্রিল পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কে স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান জানান যে, পাকিস্তান সরকার ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ২৩টি দেশে কূটনীতিক মিশন স্থাপন করেছে। এসব মিশনগুলোতে মিশনপ্রধান হিসেবে ১৭ জনকে পশ্চিম পাকিস্তান এবং ৬ জনকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।[২১] ১৯৫৬ সালের ৫ এপ্রিল সংসদ বিতর্কের এক প্রশ্নের উত্তরে জানানো হয় যে, ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বিদেশে পাকিস্তান মিশনগুলোতে ১২৯ জন প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিলেন ৫৩ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ছিলেন ৭৬ জন। আবার দ্বিতীয় শ্রেণির ৯৭৬ জন গেজেটেড কর্মকর্তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ১৭৬ জন এবং ৭০০ জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের।

সারণি ৪: পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে নিয়োগপ্রাপ্ত পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা (১৯৪৯-১৯৫৬)

ক্রমিক নং	দূতাবাসগুলোতে পদের নাম	পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা
১.	রাষ্ট্রদূত	৯	৮
২.	হাইকমিশনার	৪	-
৩.	কমিশনার	-	১
৪.	মিনিস্টার	৩	-
৫.	ডেপুটি হাইকমিশনার	২	১
৬.	সহকারী কমিশনার	২	-
৭.	চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স	৪	৩
৮.	কাউন্সেলর	৬	৪
৯.	কনসাল জেনারেল	১	-
১০.	প্রথম সচিব	৫	৪
১১.	কনসাল	১৭	২
১২.	ভাইস কনসাল	৪	-
১৩.	দ্বিতীয় সচিব	১৯	৭
১৪.	তৃতীয় সচিব	১০	১৮

সূত্রঃ হাবিবুল্লাহ বাহার, *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯) পার্লামেন্টের ভাষ্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৫। পৃ. ২৪৬

[২১] *Constituent Assembly (Legislative) of Pakistan Debates*, 1952, Vol 1, p. 1051-1052; *দৈনিক আজাদ*, ১০-১১ জুন ১৯৬৬

উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, বিশ্বের বিভিন্ন পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে ১৭ জন রাষ্ট্রদূতের মধ্যে ৮ জন পূর্ব পাকিস্তানের ও ৯ জন পশ্চিম পাকিস্তানের, ৪ জন হাইকমিশনারের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের কেউ ছিল না। শুধুমাত্র ১ জন কমিশনার ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের। আবার ৩ জন মিনিস্টারের মধ্যে কেউই পূর্ব পাকিস্তানের ছিল না। ৩ জন ডেপুটি হাইকমিশনারের মধ্যে ১ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের, ২ জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। ২ জন সহকারী কমিশনারের কেউই পূর্ব পাকিস্তানের ছিল না। ৭ জন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে ৩ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের, ৪ জন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের। ১০ জন কাউন্সেলর এর মধ্যে ৬ জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ও ৪ জন পূর্ব পাকিস্তানের। ২ জন কনসাল জেনারেলের দুইজনই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের। ৯ জন প্রথম সচিবের মধ্যে ৪ জন পূর্ব পাকিস্তানের এবং ৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানের। ১৯ জন কনসালের মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের এবং ১৭ জন পশ্চিম পাকিস্তানের। ৪ জন ভাইস কনসালের সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের। ২৬ জন দ্বিতীয় সচিবের মধ্যে ৭ জন পূর্ব পাকিস্তানের ১৯ জন পশ্চিম পাকিস্তানের। ২৮ জন তৃতীয় সচিবের মধ্যে ১৮ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের এবং ১০ জন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান মিশনগুলোতে তৃতীয় সচিব পদগুলোতে বাঙালিদের সংখ্যাই কেবল বেশি ছিল।

১৯৫৬ সালের ৯ এপ্রিল সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ১৯৩ নং প্রশ্নের বিতর্কে যুক্তফ্রন্টের শেখ মুজিবুর রহমান পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিসে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী জানান যে, ১৯৫৬ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত বিদেশি মিশনে স্থানীয় নিয়োগসহ পশ্চিম পাকিস্তানের ২২৫১ জন এবং পূর্ব পাকিস্তানের মোট ৫৩৮ জন কর্মরত রয়েছে। শতকরা হিসেবে যা দাঁড়ায় পূর্ব পাকিস্তানের ৩৯% এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৬১%।[২২] পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী জানান যে, খুব শিগগিরই পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সমতা তৈরি করা হবে। তিনি জানান যে, এখন থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ২০% মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। বাকি ৮০% মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অংশ থেকে ৪০% করে নেওয়া হবে।

১৯৬২ সালের ১ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন পদমর্যাদায় পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ৩৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। যাদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ১৯ জন এবং পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ১৪ জন। ১৯৬২ সালের ২৭ জুন কামরুল আহসান ১ নং প্রশ্নোত্তরের বিতর্কে জানা যায় যে, বিদেশে পাকিস্তান মিশনের প্রশাসন পরিচালনায় ১৯৫৩-১৯৫৪ অর্থবছর থেকে ১৯৬১-১৯৬২ অর্থবছর পর্যন্ত ব্যয় হয় ১৯৫২৮২৮৯৬ রুপি। প্রতি বছরে গড় খরচ হয় ২১৬৯৮১০০ রুপি। ১৯৬১-১৯৬২ সাল পর্যন্ত বিদেশে পাকিস্তানের দূতাবাস, হাইকমিশন, কনসুলেটসহ মিশন ছিল ৪৬টি। এসব পরিচালনার জন্য পাকিস্তানের ১৯৬২-১৯৬৩ অর্থবছরে ব্যয় হয়েছিল ২২০৮৮৮০০ রুপি। এছাড়া এসময় পাকিস্তানের ১০টি অনারারী কনসুলেট ছিল। যার জন্য ব্যয় হয়েছিল ৩৩০০০ রুপি। এসময় বিদেশে নিয়োগপ্রাপ্ত ২৮ জন রাষ্ট্রদূতদের ৭ জন ছিল পূর্ব

[২২] হাবিবুল্লাহ বাহার, *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯) পার্লামেন্টের ভাষ্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৫। পৃ. ২৪৭

পাকিস্তানের বাকি ২১ জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের।[২৩] ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত পাকিস্তানের দূতাবাস ছিল ৫০-৬০ টি দেশে। ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথ এর সদস্যদের দেশে রাষ্ট্রদূতকে বলা হতো হাইকমিশনার এবং অন্যরা ছিলেন এ্যাম্বাসেডর। ভারত, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও চীনে ছিল পাকিস্তানের প্রধান দূতাবাসগুলো। গুরুত্বের দিক থেকে এরপরে ছিল সৌদি আরব, জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান এবং বেলজিয়াম। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস তৎকালীন সময়ে ইউরোপে মুক্তবাজারের প্রধান কার্যালয় হিসেবে স্বীকৃত ছিল। প্রথম পাঁচটি দেশের একাধিক দেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকলে তাঁকে উঁচুমানের কর্মকর্তা ও দক্ষ কূটনীতিক হিসেবে গণ্য করা হতো।[২৪]

১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিদেশে পাকিস্তান মিশনে প্রথম শ্রেণির ১৮৫ জন অফিসারের মধ্যে ১১৮ জন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের এবং ৬৭ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের। দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড অফিসার হিসেবে ৯ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের, নন গেজেটেড ১৮০ জন অফিসারদের মধ্যে ১৪২ জন পশ্চিম পাকিস্তানের এবং ৩৮ জন পূর্ব পাকিস্তানের। তৃতীয় শ্রেণির ৫২ জনের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ৩৮ জন পশ্চিম পাকিস্তানের ও ১৪ জন পূর্ব পাকিস্তানের। এমনকি চতুর্থ শ্রেণির ৯৩ জনের মধ্যে ৮৪ জন পশ্চিম পাকিস্তানের ও ৯ জন পূর্ব পাকিস্তানের। সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক মিশনগুলোতে ৫১৯ জনের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ৩৯০ জন এবং ১২৯ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। এ নিয়োগের ক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যের মাত্রা ছিল ৭৫.১৪%।[২৫]

১৯৬৪ সালের ১২ আগস্ট জান মিয়া ও ফরিদ আহমদের প্রশ্নের উত্তরে পাকিস্তানের তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী আব্দুল ওয়াহিদ খান জানান যে, জাতিসংঘসহ বিদেশে পাকিস্তান দূতাবাস ও মিশনগুলোতে ১১ জন প্রেস এটাচি কর্মরত রয়েছেন। যাদের মধ্যে ৯ জন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের এবং ২ জন পূর্ব পাকিস্তানের।[২৬]

১৯৬৬ সালের ১০ জুন এক প্রশ্নোত্তর বিতর্কে পররাষ্ট্রবিষয়ক সংসদীয় সচিব জানান যে, বিদেশে অবস্থিত পাকিস্তানের বিভিন্ন দূতাবাসে যে সকল কর্মচারী ১৯৬০-১৯৬৫ মেয়াদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার থেকে তৃতীয় সচিব পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ১৭৯ জন (৬৪.৫%), পূর্ব পাকিস্তানের ৯৮ জন (৩৫.৫%)। দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড ও নন গেজেটেড হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৯৬ জন (৮০%) এবং পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ৪৮ জন (২০%)। তৃতীয় শ্রেণির নন গেজেটেড অফিসারদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৩৮ জন (৬৮%) এবং পূর্ব পাকিস্তানের ১৮ জন (৩২%)। চতুর্থ শ্রেণির নন গেজেটেড অফিসার হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৮৯ জন (৯১%) এবং পূর্ব পাকিস্তানের ৮ জন (৯%)।[২৭]

---

[২৩] হাবিবুল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭

[২৪] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

[২৫] হাবিবুল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭

[২৬] *National Assembly of Pakistan Debates*, Vol 1, Part II, 1969, pp. 777-779

[২৭] *National Assembly of Pakistan Debates*, Vol 1, Part II, 1968. 9 December 1968, pp. 154-156

১৯৬৮ সালের ৯ ডিসেম্বর ড. আলীম আল রাজীর ৮৯ নং প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে, বিদেশে ৩১টি দেশে রাষ্ট্রদূত এবং ৭টি দেশে হাইকমিশনারসহ মোট ৩৮টি দেশে পাকিস্তান কূটনীতিক মিশন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে ৩১টি দেশে পশ্চিম পাকিস্তানের এবং ৭টি দেশে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। বিভিন্ন মিশন প্রধান ও রাষ্ট্রদূত হিসেবে ১২টি দেশে পাকিস্তানের দায়িত্ব যারা পালন করছেন তাদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ৯ জন এবং পূর্ব পাকিস্তানের ৩ জন দায়িত্ব পালন করছেন। এসময় সিঙ্গাপুর, হংকং ও মন্ট্রিলে পাকিস্তানের ট্রেড কমিশনার ছিল। যাদের মধ্যে ২ জন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের এবং ১ জন পূর্ব পাকিস্তানের।[২৮] আবার একই বছরের ১৪ ডিসেম্বর সংসদের বিতর্কে ড. আলীম আল রাজী প্রশ্ন উত্থাপন করলে আব্দুল আউয়াল ভূঁইয়া জানান যে, পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির মোট ৫৩২ জন জনবল রয়েছে। যাদের মধ্যে ৩৬৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানের এবং ১৬৭ জন পূর্ব পাকিস্তানের। এই বক্তব্যেও পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যকার বৈষম্য দৃশ্যমান। এই দুই অঞ্চলের বৈষম্যের মাত্রা ছিল ৩৭.২২%।

এ এস এম সোলায়মানের উত্থাপিত ৫৪১ নং প্রশ্নের উত্তরে ১৯৬৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে, জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ মোট ২৩ জনের মধ্যে ১৮ জন পশ্চিম পাকিস্তানের, ৪ জন পূর্ব পাকিস্তানের এবং ১ জন বিদেশের বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু এক বছর পূর্বে এস এম সোলায়মানের ১২০১ নং প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম আরশাদ হোসাইন জানান যে, ১৯৪৯ সালের ১ মার্চ জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে পাকিস্তান প্রথম নিয়োগ প্রদান করে। এসময় থেকে ১৯৬৮ সালের ১৩ জুন পর্যন্ত পাকিস্তানের ৯ জন স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে ৯ জনের ৮ জন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের এবং ১ জন ছিলেন বিদেশে বসবাসরত প্রিন্স আলী খান।[২৯] যেখানে পূর্ব পাকিস্তানিদেরকে কখনো নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম আরশাদ হোসাইন এই বৈষম্যের জবাবে বলেন যে-

> ২০% মেধা আর ৪০% পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০% পশ্চিম পাকিস্তান থেকে রিক্রুট করা হয়, যা একেবারেই ধাপ্পাবাজি। কেননা ১৯৫০ সালে এডহক ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৭ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৫৩ জন নিয়োগ দেয়া হয়। মন্ত্রী বলেন যে, এই বৈষম্যের বিষয়টি পূর্ব থেকেই চলে আসছে বিধায় এখনো (১৯৬৮ সালে) সেই ধারাটাই লক্ষ্যণীয় হচ্ছে।[৩০]

একথার সত্যতা জানা যায় বাঙালি কূটনীতিক মহিউদ্দিন আহমদ এর সাক্ষাৎকারেও। ১৯৬৭ সালে তিনি পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেওয়ার সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাঙালি ছিলেন ২৫-৩০ শতাংশ। তিনি জানিয়েছেন বাঙালিদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ পক্রিয়া শুরু হয় ১৯৪৯ সাল থেকে। ডিসপ্যারিটি বা বৈষম্য নিয়ে তাদের সময় পত্রিকায় প্রতিদিন চর্চা হতো। যে কারণে সর্বত্র এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। এতে পাকিস্তানিরা কিছুটা নমনীয় হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাঙালিদের নিয়োগ সংখ্যা একটু বাড়ায়। তারপরই কোটা সিস্টেম চালু করা হলো। এতে বাঙালি অফিসারদের সংখ্যা কিছুটা বাড়তে শুরু করে। কোটা অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৪০ ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৪০ এবং ২০ ভাগ মেধায়

---

[২৮] *National Assembly of Pakistan Debates*, Vol 1, Part II, 1968. 9 December 1968, pp. 154-156; *দৈনিক আজাদ*, ১২-১৩ আগস্ট ১৯৬৪

[২৯] *National Assembly of Pakistan Debates*, Vol 1, Part II, 1968, pp. 154-156

[৩০] হাবিবুল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮

নিয়োগ করা হতো। সব ক্যাটাগরিতে বাঙালিদের জন্য ৪০ ভাগ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। সে হিসেবে তাদের সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাঙালির সংখ্যা ছিল ২৫-৩০ ভাগ।[৩১] পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে নিয়োগের এ কোটা ব্যবস্থার তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় সরাসরি কূটনীতিক না হলেও ১৯৭১ সালে লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের অডিট এন্ড একাউন্টস এর ডিরেক্টর আকবর লুৎফুল মতিনের সাক্ষাৎকারে।

সিভিল বা অন্যান্য সার্ভিস থেকে সিভিল ও পররাষ্ট্র সার্ভিসে কিছু সংখ্যক আমলা অন্যান্য চাকরি থেকে যোগদান করার সুযোগ পান। সুষ্ঠু নিয়োগ নীতি প্রবর্তিত হয় ১৯৪৮ সালে এবং সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সিভিল, পররাষ্ট্র, পুলিশ এবং ফাইন্যান্স ইত্যাদি সার্ভিসে পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের প্রথা চালু হয় ১৯৪৯ সাল থেকে।[৩২] উদাহরণ স্বরূপ বাঙালি কূটনীতিক এনায়েত করিম ও শামসুল কিবরিয়া পাকিস্তান পররাষ্ট্র সার্ভিস ও আবুল মাল আবদুল মুহিত সিভিল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন।

সারণি ৫: আইয়ুব খানের দশক পালনের জন্য বিভিন্ন বিভাগের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ
১.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৭০০০	২৭০০০

সূত্রঃ *National Assembly Debates*, Vol II, 6 December 1968. p. 30

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে দৃশ্যমান বৈষম্য তা জেনারেল ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর কিছুটা মোচনের চেষ্টা করেন। ক্ষমতার প্রথম বছরেই ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাঞ্জাবিদের প্রাধান্য খর্ব করে অপাঞ্জাবি অঞ্চলে নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেন। প্রশাসন ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের প্রাধান্য বৃদ্ধি করে নানা উপায়ে বেসামরিক আমলাদের ক্ষমতা সংকুচিত করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই পূর্ব বাংলার দীর্ঘ অবহেলিত দাবি-দাওয়া পূরণের উদ্যোগ প্রচেষ্টাও শুরু করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সচিবদের পদে কতিপয় বাঙালিকে নিয়োগ দান করেন, কিছু বাঙালি সামরিক অফিসারকে পদোন্নতি দিয়ে এমনকি কোনো কোনো খাতে পূর্ব বাংলার বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তাদের প্রতি অতীত অবহেলা প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল অতীতের যে কোনো শাসকের তুলনায় তিনি পূর্ব বাংলার প্রতি অপেক্ষাকৃত সদয় ও মনোযোগী এমন ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা। ইয়াহিয়া খানের এ ধরনের কর্মকাণ্ডগুলোর বর্ণনা মঈদুল হাসানের বক্তব্যেও প্রতিফলিত হয়েছে।[৩৩]

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ ও বরাদ্দ পাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন বৈষম্য দৃশ্যমান ছিল তেমনি একজন কূটনীতিকের সাক্ষাৎকারে জানা যায় যে, নিয়োগ পাওয়ার পরও বাঙালিদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতো। কূটনীতিক কমর রহীম তাঁর

[৩১] গবেষকের সঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মার্চ ২০১৮
[৩২] জাওয়াদুল করিম, *মুজিব ও সমকালীন রাজনীতি*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১। পৃ. ১৪৫
[৩৩] মঈদুল হাসান, *উপধারা একাত্তর মার্চ-এপ্রিল*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫। পৃ. ৭৫

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে এমন একটি ঘটনার কথা জানিয়েছেন। ইসলামাবাদ ও লাহোরে দুই বছর থাকাকালীন পাকিস্তানিদের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন। প্রশিক্ষণ পর্বে একাডেমির ডাইনিং হলের বড় ডাইনিং টেবিলে সকলের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এমনকি একটি টেবিলেই সকলের অনায়াসে জায়গা হতো। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর দেখা যায় বাঙালিরা টেবিলের এক দিকে বসে অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বসে। তিনি বুঝতে পারেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে তখন থেকেই একটা মানসিক বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠে।[৩৪]

বাঙালি কূটনীতিক ওয়ালিউর রহমান তাঁর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরে কী পরিমাণ বৈষম্য বিরাজমান ছিল তা ব্যক্ত করেছেন। ওয়ালিউর রহমান ১৯৬৬ সালের ৬ অক্টোবর পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগ দেন। তাঁর মতে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পাকিস্তান গণপরিষদে ভাষার প্রশ্নে প্রথম বৈষম্যের কথা বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল দু'চারজন। ১৯৫৩ সালে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ও ১৯৫৪ সালে শামসুল কিবরিয়া পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগ দেওয়ার পর থেকেই বাঙালিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৫৩ সালের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের ভালো ছাত্ররা সিভিল সার্ভিসে পরীক্ষা দিতে শুরু করে এবং তাদের অধিকাংশ পররাষ্ট্র সার্ভিসকে পছন্দের তালিকায় স্থান দেয়। বাঙালিদের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হতো তা তখন থেকেই পরিস্কার ছিল। কিন্তু ষাটের দশক থেকে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। বিশেষ করে ওয়ালিউর রহমানদের ব্যাচ পররাষ্ট্র দপ্তরের চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময় পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের সম্পর্কে চিন্তা করে কথা বলতো। ওয়ালিউর রহমানের মতে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ও পররাষ্ট্র দপ্তরে ১৯৫৮ সালের পর থেকে বাঙালিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার বৈষম্য শুরু হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মের প্রথম দিন থেকেই। আর পাকিস্তানে প্রথম বৈষম্য শুরু হয় রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে। ওয়ালিউর রহমান পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগ দেওয়ার পর লাহোরের পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে (Pakistan Foreign Service Academy) প্রশিক্ষণে যাওয়ার পর সেখানে দৃশ্যমান বৈষম্য প্রত্যক্ষ করেন। সেখানে অধিকাংশ বাঙালিদের রাখা হলো একটি নতুন ভবনে। যেটি ছিল বেশ খারাপ, অত্যন্ত গরম ও ছোটো কক্ষগুলোতে ২ জন করে থাকতে হতো। একজন বাঙালি একজন অবাঙালি এভাবে থাকার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ছিল একজন বাঙালি। ওয়ালিউর রহমান প্রথম এ ব্যাপারে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর যুক্তি ছিল 'আমরা বাঙালিরা মেজরিটি, আমরা এখানে কেন থাকবো। আমরা পুরোনো বিল্ডিংয়ে বড় রুম ও ভালো ব্যবস্থাসহ সুযোগ সুবিধা আছে সেখানে থাকবো।' তাঁর এ কথায় তখন ২০ জন বাঙালিদের মধ্যে শুধুমাত্র এ এইচ মাহমুদ আলী তাঁকে সমর্থন করেন। বাকিরা সবাই নিশ্চুপ থাকেন।[৩৫]

[৩৪] গবেষকের সঙ্গে কমর রহীম এর সাক্ষাৎকার, ১৯ মার্চ ২০১৮
[৩৫] গবেষকের সঙ্গে ওয়ালিউর রহমান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯

ওয়ালিউর রহমান দুটি উদাহরণের সাহায্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার বৈষম্য অর্থাৎ পাকিস্তানিরা বাঙালিদের কীভাবে দেখতো তা তুলে ধরেছেন। প্রথম ঘটনাটি ঘটে লাহোরে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস একাডেমির প্রশিক্ষণকালীন পরিচালক মি. মজিদ এর সঙ্গে। একজন পাঞ্জাবি সিভিল সার্ভিসের ব্যক্তি বাঙালিদেরকে কীভাবে দেখেছেন তা বোঝার জন্য তাদের কথোপকথন উদ্ধৃত করছি-

> During training period, one day Mr. Majid told us that we will be visiting a jute mill in Lyallpur. After his announcement was finished, I raised my hand to say something. I asked him, "If we are leaving for East Pakistan on the 7th of July, why can't we go to the Adamjee Jute Mill which is the biggest jute mill in the world, instead of going to Lyallpur Jute Mill." He replied, "We will, alright." "We may go to Lyallpur Jute Mill but I think we should also have a programme in East Pakistan for the Adamjee Jute Mill." He didn't expect it from me. But he replied, "I think that's a good idea. Please come and see me in the evening at the 6:30 p.m. and also have a cup of tea with me." I said, "Thank you so much Sir. I will be there right in time."
>
> My colleagues were surprised seeing such type of conversation. At 6:30 p.m. I reached his room. He welcome me and said, "Wali, You are a bright fellow but you know in this kind of a class or classes we don't expect our officers or 'provisioner' 'provisioners officers' to speak over the voice of the Director. You have to remember that I am your director; I am the head of this whole organization. I decide, you don't decide." Then I said, "Mr. Director I agree with you. You are the master. But I also strongly believe that it will be more convenient for us and we can laearn more about jute and jute mills if we visit the Adamjee Jute Mill and not Lyallpur Jute Mill. And also I had been there only once as a student and it was really amazing. So, Sir, please rethink what you decide". . .[৩৬]

এ ঘটনার প্রভাব পড়ে কিছুদিনের মধ্যে। প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করে ওয়ালিউর রহমান ইসলামাবাদে পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগ দেন। সেখানে প্রতি শুক্রবার সকাল ১১ টায় পররাষ্ট্র সচিব নিচে এসে সকল অফিসারদের সঙ্গে কফি খেতেন এবং সকলের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করতেন। তৎকালীন সময়ে পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিব ছিলেন এস এম ইউসুফ যিনি পাকিস্তানের উত্তর প্রদেশের লোক। পররাষ্ট্র সচিব তরুণ অফিসারদের কাছ থেকে প্রশ্ন আশা করতেন। এসময় ওয়ালিউর রহমান প্রশ্ন করেছিলেন পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি কেন কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়? উত্তরে তিনি বলেছিলেন কাশ্মীর হচ্ছে পাকিস্তানের অস্থিমজ্জার মতো, পাকিস্তানের হৃদয়। এর বেশি কিছু তিনি বলেননি। এ বিষয়টি নিয়ে আর কোনো কথা হয়নি। কিছুদিন পরে পররাষ্ট্র সচিব ওয়ালিউর রহমানকে তাঁর কক্ষে ডেকে পাঠান। এতে তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে ভয় দেখাতে থাকে যে, হয়তো তাঁর চাকরি চলে যাবে। উল্লেখ্য যে, ওয়ালিউর রহমান এসময় পররাষ্ট্র সচিবের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন। পররাষ্ট্র সচিব ওয়ালিউর রহমানের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন (ACR) বের করে দেখান যে, মি. মজিদ লিখেছেন Wali-ur Rahman is a rabbit Bengali nationlist. He has to be watched and he should not be given any sensitive posting in his carreer.

---

[৩৬] গবেষকের সঙ্গে ওয়ালিউর রহমান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯

এটি পড়ে তিনি মি. মজিদকে ফোন করে এরকম প্রতিবেদন লেখার কারণ জানতে চান। তিনি তাঁকে বলেন ওয়ালিউর রহমান একজন মেধাবী অফিসার। আপনি কী তাঁর ক্যারিয়ার নষ্ট করতে চান? তারপর পররাষ্ট্র সচিব সাদা কালি দিয়ে সেটি কেটে নিজেই মন্তব্য লিখে দেন। পররাষ্ট্র সচিব পাকিস্তানের উত্তর প্রদেশের লোক হওয়ায় বাঙালিদের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিল এবং পররাষ্ট্র দপ্তরে মেধাবী বাঙালি অফিসারদের তিনি সুনজরে দেখতেন। এমনকি তিনি ওয়ালিউর রহমানকে প্রায়ই তাঁর পুত্রসম বলে সম্বোধন করতেন।[৩৭] পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে একই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় শাহ এ এম এস কিবরিয়ার স্মৃতিকথায়। তিনি লিখেছেন- 'পাকিস্তানের ওইসব দিনে ভারতবিদ্বেষ ছিলো দেশপ্রেমের অপর নাম। কাশ্মীর নীতিই ছিলো পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির সারমর্ম।'[৩৮]

এই দুটো ঘটনা যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে কয়েকটি বিষয় দৃশ্যমান। দুটো ঘটনার মূল ব্যক্তি ছিলেন দুই জন পাকিস্তানি কিন্তু ভিন্ন দুটি অঞ্চলের। এমনকি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল ভিন্ন। উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ পাটকল ছিল আদমজী জুট মিল। একজন প্রশিক্ষণার্থীর মনে এ প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক যে, এত বড় একটি পাটকল না দেখে কেন লায়ালপুরের মতো ছোট একটি পাটকল দেখতে যাবে? প্রশ্নের চেয়ে পরিচালক মজিদের মনোকষ্ট-ই বেশি চোখে পড়ে। বাঙালিরা পাকিস্তানিদের চেয়ে বেশি জানে এবং বাঙালিদের গৌরব করার মতো কোনো বিষয় উপস্থাপন করবে তা তারা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারতো না। এজন্য বাঙালি কূটনীতিক হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীর প্রতি তার মনোভাব ছিল প্রদেশের লোক। যাদেরকে তারা অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ও কম যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করতো। একজন পাকিস্তানি হিসেবে তিনি হীন মানসিকতারও পরিচয় দিয়েছেন ওয়ালিউর রহমানের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদনের মূল্যায়নে। এক্ষেত্রে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি প্রশিক্ষণার্থী যত মেধাবী হোক না কেন সে যেন ভালো কর্মস্থল না পায় এবং কর্মক্ষেত্রে বেশিদূর অগ্রসর হতে না পারে তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা। এটা যে শুধুমাত্র মি. মজিদ করেছেন তা কিন্তু নয়। সে সময়ে নেতৃস্থানীয় পদে আসীন অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানিদের এরকম মনোভাব ছিল। আবার ভিন্ন চিত্র দেখা যায় পররাষ্ট্র সচিবের। তিনি নিজে বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকায় একজন বাঙালি প্রশিক্ষণার্থীর যোগ্যতা ও মেধা খুব কাছ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ করে ওয়ালিউর রহমান প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করে বিদেশের দূতাবাসে যোগ দেওয়ার পূর্ব সময় পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে কাজ করেছেন। এতে করে পররাষ্ট্র সচিব তাঁর অধীনস্থ একজন কর্মকর্তাকে যথার্থ মূল্যায়ন করার সুযোগ পেয়েছেন। তাই তিনি ওয়ালিউর রহমানের মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশোধন করে তাঁর সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করতে দ্বিধা করেননি। একজন বাঙালির মেধা ও শিক্ষাকে তিনি মূল্যায়িত করেছেন। সর্বোপরি দ্বিতীয় ঘটনাটির বর্ণনায় জানা যায় যে, জন্মের পর থেকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রের মূল নীতি ছিল কাশ্মীর কেন্দ্রিক। এটা যেমন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানিরা বুঝতে পারতো তেমনি একজন পাকিস্তানিও বুঝতো। তাই এ ব্যাপারে সরকারের সন্দেহের দৃষ্টিতে যেন না পড়তে হয় সেজন্য কোনো ব্যক্তি কাশ্মীর ইস্যুতে কোনো বাড়তি মন্তব্য করতেন না।

[৩৭] গবেষকের সঙ্গে ওয়ালিউর রহমান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯

[৩৮] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

৩.২ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ সূচনা ও পাকিস্তান দূতাবাসে বাঙালি কূটনীতিকদের অবস্থান

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট দীর্ঘদিনের। মুক্তিযুদ্ধের পথে একটি দেশ অগ্রসর হওয়ার পেছনে কিছু নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। বিদ্যমান দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে শুরু করে অনেক কিছুই নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে ১৯৪৭ সালের পর থেকেই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কর্মরত ছিলেন তাদের অধিকাংশই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির ব্যাপারে ছিলেন সচেতন। বিশেষ করে ষাটের দশক থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের যে ধারা বাংলা অঞ্চলে উত্থান ঘটে সেই সময়ে তারা প্রতি মুহূর্তে সজাগ ছিলেন নিজের দেশের সংবাদ জানার ব্যাপারে। সত্তর সালে পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সামরিক শাসনের নিযুক্ত নির্বাচন কমিশন ও সামরিক শাসনযন্ত্রের মোড়কে। তাই নির্বাচনকে ঘিরে দেশের আপামর জনসাধারণের আগ্রহের পাশাপাশি বিদেশে অবস্থানরত পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও সমান আগ্রহ ছিল। এ এম এ মুহিত জানিয়েছেন ওয়াশিংটনে কূটনীতিকদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে বা আসরে পাকিস্তানের নির্বাচন নিয়ে যে আলোচনা হতো তাতে অধিকাংশের মত ছিল নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১২০ বা ১২৫ এর বেশি আসন পাবে না। কিন্তু সদ্য ওয়াশিংটনে যোগ দেওয়া এ এম এ মুহিত এমনি এক আসরে সাহস করে বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ ১৪০ আসনের কম পাবে না।[৩৯] বিশেষ করে ওয়াশিংটনে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিক এনায়েত করিম এর অফিসে বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হতো। এ এম এ মুহিত, এস এ এম এস কিবরিয়া, জাওয়াদুল করিম প্রমুখ এসব আলোচনায় যোগ দিতেন। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর এনায়েত করিম ফোন করে জাওয়াদুল করিমকে তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে যাওয়ার পর এনায়েত করিম জানান যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিষয়টি বাঙালি কুটনীতিক এনায়েত করিমের কাছেও ছিল অভাবিত। কেননা তিনি ব্যতীত তাদের আলোচনায় অংশ নেওয়া অপর দুই বাঙালি কূটনীতিক আশা করেছিলেন আওয়ামী লীগ ১৩০ থেকে ১৪৫ টি আসন পাবে।[৪০] নির্বাচনের এই ফলাফল একদিকে যেমন তাদের আনন্দের কারণ আবার অন্যদিকে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে কিনা তা নিয়েও ছিল তাদের প্রশ্ন।

প্রবাসে বাঙালি জনগোষ্ঠীরা এ সময় সুসংগঠিত ছিল। তারা দেশের অভ্যন্তরে কী ঘটছে এ সম্পর্কে সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর রাখতেন। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও করতেন। দেশের সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়, বাংলাদেশের নেতৃত্বের আসনে আসীন আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে দেশকে পরিচালনা করবেন এসকল কিছু তাদের আলোচ্য বিষয় ছিল। এমনকি তারা দেশের প্রতিটি ঘটনা নিয়েও উদ্‌বিগ্ন ও উত্তেজিত থাকতেন। তবে পাকিস্তানের এই সাধারণ নির্বাচন নিয়ে বাঙালি কূটনীতিক এমনকি পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতেও উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

---

[৩৯] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতিময় কর্মজীবন*, পৃ. ১৪৪

[৪০] জাওয়াদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল আশাতীত। ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও পাকিস্তান দূতাবাসের কয়েকজন বাঙালি কূটনীতিক এই বিষয়ে বাজি ধরেছিলেন। তাদের আশা ছিল আওয়ামী লীগ ১৪০ টি আসন পেতে পারে। কিন্তু ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনের পক্ষে ছয়দফার সমর্থনে ভোট পড়ায় তখন দুই রকমের কথাবার্তা শুরু হয়। এসময় পশ্চিম পাকিস্তানিরা বলতে থাকে, ছয়দফা হচ্ছে একটি সংলাপের ব্যাপার। আবার কেউ কেউ বললেন যে, ভুট্টো পশ্চিমের নেতা হবেন এবং শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বের নেতা। কেননা তারা এককভাবে কেউ ফেডারেল সরকার গঠন করতে পারবেন না। এ ব্যাপারে ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রদূত এর বক্তব্য ছিল, ভুট্টো হবেন উপপ্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র দফতর তিনিই পরিচালনা করবেন। রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন তার বাঙালি সহকর্মী এনায়েত করিম কিন্তু আগা হিলালি তাতে পাত্তা দেননি।[৪১]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আগা হিলালি এতে পাত্তা না দেওয়ার অবশ্য কারণও ছিল। তৎকালীন সময়ে যারা বিদেশে চাকরি করতো তারা দেশের খবর খুবই কম জানতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে হিলালি ছিলেন এগিয়ে। পাকিস্তান থেকে যারা বিভিন্ন কাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেতেন তাদের সকলের কাছ থেকে তিনি খুটিয়ে খুটিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেন। আগা হিলালি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো দুটি দেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্বে থাকায় পাকিস্তান সংক্রান্ত সংবাদগুলো সংগ্রহ করতেন। আগা হিলালির অবসরের সময়ও ঘনিয়ে আসছিল। অবসর গ্রহণের পূর্বে ১৯৭১ সালের শুরুর দিকে তিনি পাকিস্তানে ঘুরে যান। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে পূর্ব পাকিস্তানও গিয়েছিলেন। এমনকি ভুট্টো ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর সফরের সময় একদিকে চলছিল ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পুনর্বাসন কাজ এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক পরিবর্তন। তাই এক্ষেত্রে তাঁর অভিমত ছিল যে, ভুট্টোকে ছাড়া কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হতে পারে না। তাঁর এ কথার প্রতিবাদ করে এনায়েত করিম বলেছিলেন যে, কোয়ালিশন সরকার হলেও ভুট্টো যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, প্রধানমন্ত্রী নিজেই হয়তো সেই দায়িত্ব নিতে পারেন।[৪২]

আরেকজন বাঙালি কূটনীতিকের বয়ানে জানা যায় যে, পাকিস্তানে যে সকল বাঙালি কূটনীতিক কর্মরত ছিলেন তারা দেশের কোনো খবরই ভালোভাবে জানতেন না। বিশেষ করে ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর কালো রাত্রি ও তার পরবর্তী ঘটনাগুলোর পুরো খবর ইসলামাবাদে বসে পাওয়া ছিল অত্যন্ত দুষ্কর। খবরের জন্য পাকিস্তানি পত্রপত্রিকা ও রেডিও টেলিভিশনের ওপর নির্ভর করা ছিল বৃথা প্রচেষ্টা। কেননা পাকিস্তানি গণমাধ্যমে এ সংবাদ ছিল পুরোপুরি সেন্সরযুক্ত। তাদের কাছে একমাত্র ভরসা ছিল বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলো। কিন্তু বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলো তাৎক্ষণিকভাবে ২৫ মার্চের হামলার যথার্থ গুরুত্ব অনুধাবন করতে তখনও সম্ভব হয়নি। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে বসে পূর্ব বাংলার সংবাদের জন্য বাঙালি কূটনীতিকদের হাপিত্যেশ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।[৪৩] এ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে কিংবা বিদেশে যে সকল বাঙালিরা কর্মরত ছিলেন তাদের মানসিক অবস্থা ছিল কষ্টদায়ক। পাকিস্তানের বাঙালি সমাজের অনুভূতি ছিল যে, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন

---

[৪১] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
[৪২] ওই, পৃ. ২৯
[৪৩] ফারুক চৌধুরী, *স্মরণে বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৭। পৃ. ১২

পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপনে যে আশার সঞ্চার করেছিল তা পঁচিশে মার্চ রাতের আক্রমণের মধ্য দিয়ে ভেঙে গিয়েছে। কেননা পার্লামেন্টের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি। ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে আসার পর করাচি বিমানবন্দরে তোলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর একটি ছবি ছাড়া জনসাধারণ তখন তাঁর সম্বন্ধে আর কোনো খবরই জানতো না।[৪৪] কূটনীতিক ফারুক চৌধুরী যেন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাঙালি সমাজের মানস জগতে কী কাজ করছিল তা যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি বাঙালি জাতির স্বাধীনতার অগ্রনায়কের অনুপস্থিতি ও সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বন্দি অবস্থার ছবির কথাও ব্যক্ত করেছেন।

তবে এসব বাঙালি কূটনীতিকদের প্রতিক্রিয়ার পূর্বে সবচেয়ে জোরালো প্রতিবাদ দেখা যায় যুক্তরাজ্যে। ভুট্টোর ১ মার্চের কথায় সম্মত হয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। খবরটি যুক্তরাজ্যে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শহরে বাঙালিরা এর প্রতিবাদ করেন। লন্ডনে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের আহ্বানে ওই দিনই বিকেলে হাইড পার্ক স্পিকার্স কর্নারে গাউস খানের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিনও বাঙালিরা প্রতিবাদ-মিছিল সহকারে পাকিস্তান হাইকমিশনে স্মারকলিপি দিতে যান এবং হাইকমিশনার নিজে এসে স্মারকলিপি গ্রহণ করার জন্য দাবি জানান। কিন্তু হাইকমিশনার সালমান আলী নিজে না এসে বাঙালি প্রথম সচিব (ফার্স্ট সেক্রেটারি) এম এম রেজাউল করিমকে পাঠালে নেতৃবৃন্দ তাঁর হাতে স্মারকলিপি দিতে অস্বীকার করেন। যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বাঙালিরা হাইকমিশনের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন। ঘন্টা দু' এক অবরুদ্ধ থাকার পর বাধ্য হয়ে সালমান আলী স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। তখন ক্রুদ্ধ জনতা তাকে জুতা ছুড়ে মারে।[৪৫] লন্ডনের প্রবাসী বাঙালিদের এ ঘটনা লন্ডনে অবস্থানরত বাঙালি কূটনীতিকদের প্রভাবিত করে। এ ঘটনার বিবরণ লন্ডনের বাংলা সংবাদপত্র *সাপ্তাহিক জনমত* এ প্রকাশিত হয়। এখানে বলা হয়- লন্ডনে অবস্থিত প্রবাসী বাঙালিরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে স্থানীয় ছাত্রাবাসে আসতে শুরু করেন। রাত নয়টার মধ্যে তাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচশ'য়ের বেশি দাঁড়ায়। রাত নয়টার স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে পাকিস্তান দূতাবাসের উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রা শুরু করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দূতাবাসে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা। পতাকা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে পুলিশের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ তাদের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা কেড়ে নেয়। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা সারারাত পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে অবস্থান নেয়।[৪৬]

যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বাঙালি কূটনীতিকরাও মার্চ মাসের শুরু থেকেই বাংলাদেশ পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছিলেন। বিশেষ করে ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ও বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা সবকিছু নিয়ে তারা বেশ উত্তেজনায় ছিলেন। তাদের মতে বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ জ্বলন্ত চুলার মতো হয়ে দাঁড়ায়। তখন কী হবে, কী ঘটছে সবসময় এ নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণে

---

[৪৪] ফারুক চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

[৪৫] ফারুক আহমদ, *সাপ্তাহিক জনমত মুক্তিযুদ্ধের অনন্য দলিল*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৬। পৃ. ৩৫-৩৬

[৪৬] *ওই*, পৃ. ৯৫-৯৬

তিনি কী স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন নাকি করবেন না এসব নিয়েও ছিল তাদের আগ্রহ। ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি কূটনীতিকদের মধ্যে অনেকেই পরদিন শুনতে পান। তারপর থেকেই লন্ডনের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বিভিন্ন স্থানে গুলি করে মানুষ হত্যা করতে থাকে। পুরো বাংলাদেশ একটি জ্বলন্ত চুলার মতো যে জ্বলছে সে সংবাদও বাঙালি কূটনীতিকরা জানতো। তারা প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিলেন যে কোনো সময় কিছু একটা ঘটবে। সবকিছু মিলে তাদের মনোকষ্ট, যাতনা সবকিছু আরো বেড়ে যায়। পঁচিশে মার্চের ঘটনা লন্ডনের বাঙালি কূটনীতিকরা ২৬ মার্চ *ডেইলি টেলিগ্রাফ* পত্রিকার সাংবাদিক সাইমন ড্রিং এর রিপোর্ট থেকে জানতে পারেন। বাঙালি কূটনীতিক মহিউদ্দিন আহমদ এর মতে, 'ডেইলি টেলিগ্রাফ একটি ডানপন্থি পত্রিকা। সাইমন ড্রিং প্রত্যক্ষভাবে ঘটনা দেখে এসেছে। এরকম কোনো বর্ণনা অন্য পত্রিকায় দেখা যায়নি। এটা পড়ার পর নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে এক রাতে এত মানুষ মারা গেল।'[৪৭]

যুক্তরাজ্যের প্রবাসী বাঙালি সমাজ পাকিস্তানের আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ রাস্তায় নেমে আসে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালি কূটনীতিকদের মধ্যে ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত অধিকাংশ বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আগ্রহের আধিক্য ছিল। তাদের করণীয় স্থির করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এ এম এ মুহিত এর বাড়িতে। এই সভার বক্তৃতায় এ এম এ মুহিত বলেছেন, 'আজকে থেকে কোনো পাকিস্তান নেই এবং আমরা এখন বাংলাদেশের কর্মচারী।'[৪৮] তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের মুক্তিযুদ্ধের সূচনার পর করণীয় স্থির করার পাশাপাশি তারা কিছু কৌশল গ্রহণ করে। বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা সেখানে একটু খারাপ ছিল। কেননা তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তারা আরো কিছুদিন স্ব স্ব দূতাবাসে কর্মরত থাকবেন। এই সময় তারা প্রকাশ্য কোনো কার্যক্রমে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তারা নিজেরাই বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[৪৯]

এ সিদ্ধান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকরা নিজেই স্থির করেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কীভাবে কাজ করা যায় তার জন্য নিজেরাই তৎপর হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে তারা মুজিবনগর সরকারের কাছ থেকে নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করেনি। তবে অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ সূচনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের স্বদেশ নিয়ে উদ্‌বেগ ১৯৭১ সালের শুরু থেকেই ছিল। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে ওয়াশিংটনে বাঙালি কূটনীতিক যারা কর্মরত ছিলেন তারা সবাই বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। বাংলাদেশে যা হচ্ছিল সেসব ঘটনা অত্যন্ত গভীরভাবে তারা পর্যবেক্ষণ করতেন। বিশেষ করে ৪ ও ৭ মার্চের ঘটনা সম্পর্কে তারা অত্যন্ত গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। তখনই তারা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেন সম্ভব হলে ওয়াশিংটনের বাঙালি কূটনীতিকরা বাংলাদেশ দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করবে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পরপরই তারা দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করবে। এরকম চিন্তা নিয়ে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তাদের এ চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য বাঙালি কূটনীতিকদের পক্ষ থেকে মার্কিন স্টেট

---

[৪৭] গবেষকের সঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মার্চ ২০১৮

[৪৮] গবেষকের সঙ্গে আবুল মাল আবদুল মুহিত এর টেলিফোনে নেওয়া সাক্ষাৎকার, ৫ মার্চ ২০১৯

[৪৯] আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৩

ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করা হয়।[৫০] তাদের এ ধরনের চিন্তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ওয়াশিংটনের বাঙালি কূটনীতিকরা ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই দেশের সার্বিক পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। তারা মানসিকভাবে প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য। এক্ষেত্রে তারা বাঙালি জাতির নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুস্পষ্ট নির্দেশনার অপেক্ষা করছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পাওয়ার পর তারা বাংলাদেশ দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করার কথাও ভেবেছিলেন। যা ছিল তাদের দূরদৃষ্টিপূর্ণ চিন্তার পরিচায়ক। কিন্তু শাহ এ এম এস কিবরিয়ার স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, যখন তাঁর সহকর্মীরা অনেকে ইসলামাবাদে বাড়ি নির্মাণ করছেন তখন তিনি তাঁর এ ধরনের উদ্দেশ্য সফল করে তোলার জন্য বাড়ি ক্রয় করা দূরের কথা, বরং তাঁর ব্যাংক একাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ইসলামাবাদ থেকে বদলি হওয়ার পূর্বে নিজের বাসার মালপত্র বিক্রি করে দিয়ে বাকি জিনিসপত্র পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।[৫১] এমনকি তিনি ১৯৭০ সালের জুন মাসে ইসলামাবাদ ত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সময় নিশ্চিত ছিলেন যে, পাকিস্তানের রাজধানীতে আবার চাকরি করার জন্য ফিরে আসবেন না। কেননা তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্লেষণে মনে হয়েছিল, পাকিস্তানের দুই অংশের বিভক্তির কোনো বিকল্প ছিল না। তাঁর এ ধরনের চিন্তার মূল কারণ- বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পর্কে তাঁর অবিচল আস্থা ছিল। এমনকি তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল বঙ্গবন্ধু ছয়দফার প্রশ্নে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন করতে সম্মত হবেন না। এমনকি তিনি আপসও করবেন না। আবার তিনি এও জানতেন যে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ছয়দফা কোনোমতেই মেনে নিবে না। কেননা পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ বহু ব্যক্তির সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারেন যে, ছয়দফা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা হয়তো স্বায়ত্তশাসনের পরিধি কিছু বৃদ্ধি করতে রাজি হবেন। কিন্তু তাদের মতে ছয়দফা পাকিস্তানের অখণ্ডতায় আঘাত করার শামিল এবং তারা পাকিস্তানকে এভাবে দুর্বল হতে দিবে না।[৫২]

ওয়াশিংটনে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের মধ্যে শামসুল কিবরিয়া রাজনৈতিক কাউন্সেলর হিসেবে পাকিস্তানের রাজনীতির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। বাঙালি কূটনীতিকরা মনে করেছিল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করার পর জনপ্রতিনিধিরা যা চায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাই সমর্থন করবে। রাজনৈতিক বিষয়ক কাউন্সেলর হিসেবে স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রাথমিক দায়িত্বও শামসুল কিবরিয়ার ওপর ন্যস্ত ছিল। স্টেট ডিপার্টমেন্ট একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান এবং এর সাংগঠনিক বিভাগগুলোর বিভাজন ও বিন্যাস অতি জটিল। সংক্ষেপে বলা যায়, স্টেট ডিপার্টমেন্ট বেশ কয়েকটি ব্যুরোতে বিভক্ত। ব্যুরোর অধীনে উপবিভাগ এবং তার অধীনে একটা বা কয়েকটা দেশকে নিয়ে একটা ‘কান্ট্রি ডেস্ক’। পাকিস্তান ডেস্কের ডিরেক্টর ছিলেন জোসেফ স্পেংলার (Joseph Spenglar)। ১৯৭১ সালের জুন মাসের শেষ দিকে তাকে বদলি করে পিটার কনস্টেবল (Peter Constable) কে ডিরেক্টর নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।[৫৩] মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাকিস্তান ডেস্কের কর্মরত অফিসারদের বাঙালিদের গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনের প্রতি প্রাথমিকভাবে সমর্থন ছিল। মার্কিন

---

[৫০] গবেষকের সঙ্গে আবুল মাল আবদুল মুহিত এর টেলিফোনে নেওয়া সাক্ষাৎকার, ৫ মার্চ ২০১৯
[৫১] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২
[৫২] ওই, পৃ. ৯২
[৫৩] ওই, পৃ. ৯৪

যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিকদের ধারণা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে। এর পরপরই বাঙালি কূটনীতিকরা স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন দূতাবাস চালু করবেন। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। কেননা ২৫ মার্চের পর বাংলাদেশের পরিস্থিতি জটিল সমীকরণে পৌঁছে।[৫৪]

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে ক্র্যাগ বাক্সটার (Craig Buxter) ছিলেন পাকিস্তান ডেস্কের সিনিয়র পলিটিক্যাল অফিসার। তাঁর সঙ্গে ওয়াশিংটনের বাঙালি কূটনীতিক শামসুল কিবরিয়া যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দূতাবাসের একজন রাজনৈতিক কাউন্সেলর হিসেবে শামসুল কিবরিয়া বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্টেট ডিপার্টমেন্টে ক্র্যাগ বাক্সটারকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে বাঙালি কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য। রাজনৈতিক কাউন্সেলর হিসেবে তিনি-ই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।[৫৫] তবে এ এম এ মুহিতের বক্তব্য থেকে এটা পরিস্কার যে, ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসে নিয়োজিত বাঙালি কূটনীতিকদের মধ্যে মোটামুটি একটা বোঝাপড়া ছিল যে, বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেই তারা স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে সংহতি প্রকাশ করবেন। তবে তাদের এই প্রচেষ্টা কীভাবে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বাধাগ্রস্থ করেছিল তা জানা যায় এ এম এ মুহিতের বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, ২৬ মার্চের ভয়াবহ ঘটনা ওয়াশিংটনে নিযুক্ত পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিকরা জানতে পারেন ২৭ মার্চ। এ সংবাদ জানার পর বাঙালি কূটনীতিকরা দূতাবাস স্থাপনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। বিশেষ করে তারা একটি সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ দূতাবাস প্রতিষ্ঠার কথা জানান দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এসময় মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের পাকিস্তান ডেস্কের ডিরেক্টর ক্র্যাগ বাক্সটার পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিকদের বারবার নিষেধ করছিলেন এরকম কিছু না করতে। ক্র্যাগ বাক্সটার এর বক্তব্য ছিল– এখনই কিছু না করতে। কারণ, ঢাকার অবস্থা বাঙালিরা যেরকম আশা করেছিল বাস্তবে সেটা হয়নি। পাকিস্তানিদের আক্রমণের কারণে ঢাকার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায় এবং বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার সংবাদ মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট পায়। কাজেই এ অবস্থায় বাঙালি কূটনীতিকদের কোনো ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নিষেধ করে।[৫৬]

ক্র্যাগ বাক্সটারের এ কথার পর পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিকরা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। তারা সকলে দূতাবাস ত্যাগ করা কিংবা বাংলাদেশের নামে দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছিলেন না। এ সময় বাঙালি কূটনীতিকরা প্রতিদিন এক সঙ্গে বসে তাদের করণীয় স্থির করার জন্য বৈঠক করতেন। এক সময় তারা পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তা ড. হারুন-অর-রশিদকে কলকাতায় পাঠানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্য তারা ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন সূত্রে জানতে পারেন যে, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অনেকেই কলকাতায় সমবেত হয়েছেন। ড. হারুন-অর-রশিদকে কলকাতায় পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল, কলকাতায় সমবেত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে কোনো দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় কিনা তা জানা। কিন্তু তারা এটিও জানতে পারে যে, তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো প্রবাসী সরকার গঠিত হয়নি। তাই তারা আরো বেশি দ্বিধান্বিত হয়ে

---

[৫৪] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪-৯৫

[৫৫] এ এফ সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নানা প্রসঙ্গ*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১৮। পৃ. ১০১-১০২

[৫৬] ওই, পৃ. ১০১-১০২

পড়ে যে, কলকাতায় কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। শেষ পর্যন্ত নিজেরা চাঁদা দিয়ে কলকাতায় একজন লোক পাঠান। কিন্তু তিনি ওয়াশিংটনে ফেরত যাওয়ার পর তাঁর কাছ থেকে বাঙালি কূটনীতিকরা কোনো দিকনির্দেশনা পাননি। আসমা কিবরিয়া জানান যে, নির্বাচনের পর থেকেই শামসুল কিবরিয়া ও দূতাবাসের সবাই ঘন ঘন বৈঠক করছিল। মার্চের শুরু থেকে শামসুল কিবরিয়া ও তাঁর সহকর্মীদের বাংলাদেশ দূতাবাস খোলার পরিকল্পনা ছিল। ২৩ মার্চ এনায়েত করিমের বাসায় বাংলাদেশের পতাকাও উত্তোলন করা হয়। আসমা কিবরিয়া ছবি দেখে নিজ হাতে পতাকা তৈরি করেন। বাংলাদেশের মানচিত্র ও সবুজ লাল দিয়ে সেলাই করে এই পতাকাটি বানিয়েছিলেন।[৫৭] ২৬ মার্চ রয়টারের এক লাইনের বার্তা পান শামসুল কিবরিয়া। সেই বার্তায় লেখা ছিল– 'Sheikh Mujibur Rahman proclaimed Independence of People's Republic of Bangladesh'।[৫৮] এই বার্তাটি পাওয়ার পর শামসুল কিবরিয়া তাঁর সহকর্মী এনায়েত করিমের বাসায় যান পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করার জন্য। শামসুল কিবরিয়া জানিয়েছেন যে, ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তারা ২৬ মার্চ থেকেই দূতাবাস ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ শোনার পর তাদের মনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। একজন বিদেশি বন্ধুর সাহায্যে ওই ভাষণের টেপ তিনদিনের মধ্যেই শামসুল কিবরিয়া সংগ্রহ করেন। বঙ্গবন্ধুর আদেশ পালন করার জন্য তারা সবাই প্রস্তুত ছিলেন।[৫৯] এ ব্যাপারে শাহ এ এম এস কিবরিয়া লিখেছেন-

> মার্চ মাসের গোড়া থেকেই আমি এবং আমার সহকর্মীরা স্বাধীন বাংলাদেশের দূতাবাস খোলা সম্পর্কে বিভিন্ন পরিকল্পনা করছিলাম। বিশেষত ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার পর আমাদের সামনে অন্য কোনো অপশন আছে বলে মনে হয়নি। বিশ্বব্যাংকের একজন কর্মকর্তা ভাষণের টেপ আমাদের দিয়েছিলেন। ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা ভেঙে যাবে এবং আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে হবে-এমন একটা ধারণা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে বঙ্গবন্ধু চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়েছেন কিন্তু কৌশলগত কারণে ঘোষণা দেননি।[৬০]

এ এম এ মুহিত ও শামসুল কিবরিয়ার বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, মুক্তিযুদ্ধ সূচনার পর থেকে বাঙালি কূটনীতিকরা পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একদিকে তাদের দূতাবাস থেকে বের হয়ে যেতে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের বাধা অপরদিকে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা না থাকায় তাদের পরবর্তী করণীয় স্থির করতে বিলম্ব হয়। বিলম্ব হওয়ার ব্যাখ্যায় শাহ এ এম এস কিবরিয়া লিখেছেন, ২৭ মার্চ বাঙালি কূটনীতিকরা সবাই একত্রিত হয়ে কর্মপন্থা স্থির করার জন্য আলোচনা করেছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে এমন সংবাদ পাওয়ার পর তারা পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। তখন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা ব্যতীত তাদের সামনে অন্য কোনো পথ ছিল না। এমন অবস্থায় তারা কয়েকটি দিন অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটিয়েছেন।

---

[৫৭] আসমা কিবরিয়া, *শুধুই স্মৃতি নয়*, ঢাকা: পারিজাত প্রকাশনী, ২০১৭। পৃ. ৬২
[৫৮] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬
[৫৯] *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৩
[৬০] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

কিন্তু প্রথম আশার আলো তারা দেখতে পান ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের সংবাদ সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার পর।[৬১]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিকরা তাদের কর্মসূচি নিয়ে এতটাই দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিলেন যে, নিজেরাই কলকাতায় একজন প্রতিনিধি পাঠায়। প্রতিনিধি যখন কলকাতায় আসে তখনও বাংলাদেশের কোনো প্রবাসী সরকার গঠিত হয়নি। যে কারণে প্রতিনিধি কোনো দিকনির্দেশনা ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যায়। কিন্তু এ এম এ মুহিত তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন তাদের প্রেরিত প্রতিনিধি কলকাতায় পৌঁছার পর মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। ওয়াশিংটনের প্রতিনিধি মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও কলকাতায় বাংলাদেশ মিশন প্রধান এম হোসেন আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ড. হারুন-অর-রশিদ কলকাতা থেকেই ওয়াশিংটনের বাঙালি কূটনীতিকদের কাছে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের বার্তা পাঠান। বার্তা পাঠানোকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝি প্রাথমিকভাবে বাঙালি কূটনীতিকদের মধ্যে হতাশাবোধ তৈরি করে। বাঙালি কূটনীতিকদের হতাশার কথা ব্যক্ত হয়েছে ফখরুদ্দীন আহমদের বক্তব্যেও- '২৬ শে মার্চের ভয়াবহ ঘটনার পর আমরা সকলে ভেঙ্গে পড়ি। এপ্রিল মাসে মুজিব নগরে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হবার আগে পর্যন্ত আমরা মানসিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।'[৬২] কিন্তু তাদের হতাশাবোধ বেশিদিন বজায় থাকেনি। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর এ সংবাদ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিকরা জানতে পারেন যে, মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করেছে কিন্তু তখন পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্থাপিত হয়নি। এমনকি কোনো বৈদেশিক কার্যক্রমও শুরু হয়নি। এরকম অবস্থায় মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে অধ্যাপক রেহমান সোবহান ওয়াশিংটনে আসেন। তাঁর কাছ থেকেই ওয়াশিংটনের পাকিস্তানি দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিকরা কলকাতার পুরো পরিস্থিতি জানতে পারেন। অধ্যাপক রেহমান সোবহানের কাছে তারা জানতে পারেন যে, মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সকল পাকিস্তানি দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ পাওয়ার পর ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিকরা গোপনে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ শুরু করেন। তারা অধ্যাপক রেহমান সোবহানের কাজকে তরান্বিত করতেও সহযোগিতা করেন।[৬৩] তবে এসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিক মহলে সৃষ্ট একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কূটনীতিকদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যোগদান নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠতম কূটনীতিক এনায়েত করিম হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। মুজিবনগর সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ তখনও তারা পায়নি। এ প্রেক্ষিতে তারা কিছুদিন অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। রেহমান সোবহান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছার পর মুজিবনগর সরকারের

[৬১] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬

[৬২] ফখরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

[৬৩] এ এফ সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

পক্ষ থেকে দূতাবাস ত্যাগ করার তারিখ নির্ধারণ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে তারা ৪ আগস্ট পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করে প্রকাশ্যে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৬৪]

তবে বাঙালি কূটনীতিকদের এই প্রচেষ্টার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে একটি দ্বান্দ্বিক পরিবেশ তৈরি হয়। যা এ এম এ মুহিতের সাক্ষাৎকারে জানা যায়। তিনি বলেছেন- 'একটা পিরিয়ড ছিল যখন অ্যামবেসি এবং বাঙালি সমাজের সম্পর্কটা ভালো ছিল না। বলা যায় খুবই তিক্ত ছিল। ওরা মনে করত যে, ইনারা চাকরি করছেন আমরা যুদ্ধ করছি। উনারা কেন বেরিয়ে আসেন না। এই সব নিয়ে তাদের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়।'[৬৫]

এই দ্বান্দ্বিক পরিবেশ বিরাজ করলেও পঁচিশে মার্চের ঘটনার পর ওয়াশিংটন দূতাবাসের বাঙালিদের মনের সার্বিক অবস্থা ছিল খুব খারাপ। এ এম এ মুহিত জানিয়েছেন যে, পঁচিশে মার্চের ঘটনার পরদিন তিনি বেশি দেরি করে দূতাবাসে যান। পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া বর্বর হত্যাকাণ্ড নিয়ে কারো মুখে কথা নেই। দূতাবাসের তিনতলার আড্ডা সেদিন হয়নি। বাঙালি কূটনীতিকরা সবাই ছিলেন গম্ভীর এবং ম্রিয়মান, কেউ দুঃখিত। পশ্চিম পাকিস্তানিরা ছিল আহ্লাদিত কিন্তু এ এম এ মুহিত ছিলেন ক্ষুদ্ধ। দূতাবাসের বাঙালিরা ২৭ মার্চ বিকেলে এ এম এ মুহিতের বাড়িতে সমবেত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।[৬৬]

বাঙালি কূটনীতিকরা একজন অপরজনের কাছ থেকে দেশের সর্বশেষ অবস্থা জানতে চাইতেন। এক্ষেত্রে বলা যায় আবুল ফজল শামসুজ্জামান জাকার্তায় তাঁর নতুন কর্মস্থলে যোগ দেন। সেখানে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিক শামসুল কিবরিয়া আবুল ফজল শামসুজ্জামানের নিকট দেশের অবস্থা জানতে চান। কেননা আবুল ফজল ওই সময় ঢাকা থেকে পাকিস্তান হয়ে জাকার্তায় পৌঁছেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল তিনি হয়তো দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানেন। তাদের মধ্যেকার কথোপকথনে কয়েকটি বিষয় ওঠে আসে। প্রথমত, ছয়দফার দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ব্যানারে সকল বাঙালি সমবেত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আবুল ফজল জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ঢাকায় সংঘটিত বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের যা চিত্র দেখেছেন তা বিধৃত করেছেন। ঢাকার এই চিত্র দেখে তাদের দুজনেই একমত হয়েছিলেন যে, বাঙালিরা যেভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছে, এবার আর বুলেটের ভয় দেখিয়ে কাজ হবে না। এমনকি তাদের কূটনীতিক জ্ঞানে তারা বিচার বিশ্লেষণ করেন যে, ছয়দফা পুরোপুরি না মানলেও পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীকে একটি আপসে আসতে হবে। তবে শামসুল কিবরিয়ার ব্যাখ্যা ছিল যে, পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের দেড় হাজার মাইলের ব্যবধান ক্রমে বেড়েই চলেছে। যা আর জোড়া লাগানো সম্ভব নয়। কিবরিয়ার ব্যাখার সঙ্গে একমত হয়ে আবুল ফজলের মন্তব্য ছিল- 'বাইরে থেকে দেশের পরিস্থিতি ভাল বুঝা যায়, আর সঠিক বিশ্লেষণ করা যায়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্ভুল ইঙ্গিত দেয়া যায়।'[৬৭]

পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় ও নিরস্ত্র মানুষের ওপর বর্বরোচিত সশস্ত্র হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। স্বাধীনতা ঘোষণার পর কলকাতাস্থ পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনার এম হোসেন

---

[৬৪] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬-৯৭

[৬৫] আফসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩

[৬৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

[৬৭] আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *জাকার্তায় একাত্তরের ঢেউ*, ঢাকা: ত্রিভুজ প্রকাশনী, ১৯৮৪। পৃ. ১৬-১৭

আলীসহ হাইকমিশনের ৬৫ জন বাঙালি কমকর্তা-কর্মচারী ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। অবশ্য হোসেন আলী জানিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা নয় ২৮ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া খানের ভাষণ তিনি শুনতে পান কলকাতা ক্লাবে অবস্থানকালীন। যেখানে তিনি প্রায়ই যেতেন।[৬৮] বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশের পর পাকিস্তান সরকার এতে ভারতের হাত রয়েছে এবং ভারত সরকার জোর করে এসব পাকিস্তানি কূটনীতিককে আটকে রেখেছে বলে ঢালাও অভিযোগ শুরু করে। এমনকি কলকাতার এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পাকিস্তান সরকার ঢাকাস্থ ভারতীয় কূটনীতিক মিশন আকস্মিকভাবে বন্ধ করে দেয় এবং কূটনীতিকসহ মিশনের সকল কর্মচারীকে গৃহবন্দি করে রাখে। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের মিথ্যা অভিযোগের অসারতা প্রমাণ এবং ঢাকায় আটক ভারতীয় কূটনীতিকদের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে দিল্লিতে নিযুক্ত সুইস রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে কলকাতাস্থ সাবেক পাকিস্তানি কূটনীতিকদের পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮ জুলাই কলকাতায় সুইস প্রতিনিধির সঙ্গে বাংলাদেশ মিশনের কূটনীতিক ও অন্যান্য কর্মচারীর এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লিস্থ সুইস রাষ্ট্রদূত অসুস্থতা জনিত কলকাতায় উপস্থিত থাকতে না পারায় তার পক্ষ থেকে সুইস দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারি ড. বোনার্ড তাদের মতামত গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারত সরকারের প্রতিনিধি অশোক রায় এবং পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কলকাতাস্থ পাকিস্তানি কূটনীতিক মেহেদী মাসুদ উপস্থিত ছিলেন। এই তিনজন কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলী সহ মোট ৬৫ জন ব্যক্তির মধ্যে ৬৪ জনের মতামত গ্রহণ করে। সকলেরই উত্তর ছিল 'না'। বাংলাদেশ মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা সুইস প্রতিনিধিকে সরাসরি জানিয়ে দেয় যে, তারা কেউ পাকিস্তানে ফিরে যেতে চান না। তারা আরও জানায় যে, স্বেচ্ছায়, সানন্দে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য পরিবর্তন করেছেন। তাদের ওপর কোনো শক্তিই কোনো চাপ সৃষ্টি করেনি। বাংলাদেশ মিশনের একজন কর্মী ছুটিতে কলকাতার বাইরে থাকায় তার মতামত গ্রহণ করা সুইস প্রতিনিধির পক্ষে সম্ভব হয়নি।[৬৯] তবে বাংলাদেশ মিশনের সর্বশেষ কর্মচারীও পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নে সুইস প্রতিনিধিকে লিখিত ও মৌখিকভাবে না যাওয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। অবশ্য সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে সুইস প্রতিনিধিদের মারফত পাকিস্তান সরকার জানায় যে, দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের হাইকমিশনার সাজ্জাদ হায়দার ও কলকাতার নতুন ডেপুটি হাইকমিশনার মেহেদী মাসুদ এম হোসেন আলীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে হোসেন আলী তাৎক্ষণিকভাবে সুইস প্রতিনিধিকে কোনো মতামত জানাননি। পরবর্তীতে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে তিনি পূর্ণ নিরাপত্তা দানের নিশ্চয়তা পেলে সাক্ষাৎকার দিতে সম্মতি হন।[৭০]

---

[৬৮] The Diary of Hossain Ali
[৬৯] *বাংলাদেশ পত্রিকা*, ১৯ জুলাই ১৯৭১
[৭০] The Diary of Hossain Ali

কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতায় বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কোনো আপত্তি তুলবে না বলে বাংলাদেশ সরকারকে আশ্বস্ত করে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিবও নতুন প্রতিষ্ঠিত মিশনের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।[৭১]

কলকাতায় পাকিস্তান দূতাবাসের ৬৫ জন বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারী একযোগে পদত্যাগ করার ঘটনাটি বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ ঘটনার পর পাকিস্তান সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করে *জয়বাংলা* পত্রিকায় এক সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে উল্লেখ করা হয় যে-

> জঙ্গী ইয়াহিয়া শাহীর বধ্যভূমি পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নে বাংলাদেশ মিশনের ৬৫ জন কর্মচারী স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে না জবাব দেয়ায় পাক জঙ্গীশাহী তার জয়ঢাকা ঢাকা বেতারের মিথ্যা প্রচারের ধুম্রজাল থেকে সত্য উন্মোচিত হয়ে গেল। পাক জঙ্গীশাহী ও ঢাকা বেতার এই সকল সাবেক পাক কূটনীতিবিদকে ভারত সরকার বলপূর্বক আটকিয়ে রেখেছিল বলে অহোরাত্র গলাবাজী করতো। পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নে সাবেক পাক মিশনের এই ৬৫ জন বাঙ্গালী কর্মচারীরই শুধু এই সাফ জবাব নয় বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকেও আজ এই প্রশ্ন করা হলে সাড়ে ৭ কোটি মানুষ এক সুরে শুধু একটি জবাবই দিবেন–আমরা পাকিস্তান চাই না, আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ চাই।[৭২]

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জানতে পারেন ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছেন। অন্যান্যদের মতো তারাও প্রতিদিন রেডিও'র মাধ্যমে দেশের সংবাদ শুনতেন। ২৬ মার্চ ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতা শোনার পর বুঝতে পারলেন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে তারা ঢাকার নারকীয় ঘটনার কথা জানতে পারেন। তবে পাকিস্তান দূতাবাসে এ সংক্রান্ত কোনো সংবাদ কিংবা আলোচনা ছিল না। এমন অবস্থায় *টাইমস অব ইন্ডিয়া*র সাংবাদিক দিলীপ মুখার্জী পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব হিসেবে কর্মরত কে এম শিহাবুদ্দিনকে বাংলাদেশ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সংবাদ জানান। দিলীপ মুখার্জী জানান যে, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের লাইন করে গুলি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেণ্য শিক্ষকদের হত্যা করা হয়েছে। বাঙালি পুলিশ ও ইপিআর-এর ওপর ট্যাংক, কামান, মর্টার, মেশিনগান নিয়ে পাকিস্তান সেনারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নিরস্ত্র জনগণকে একমাত্র ঢাকায়ই বিগত ৪৮ ঘন্টায় হাজারে হাজারে হত্যা করা হয়েছে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, বস্তি এলাকায় চলেছে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ।[৭৩]

দিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব কে এম শিহাবুদ্দিন ও প্রেস এটাচি আমজাদুল হক এই সংবাদে মর্মাহত হন। তারা দু'জন ২৮ মার্চ দিলীপ মুখার্জীকে নিয়ে ভারত সরকারের খুব আস্থাভাজন ব্যক্তি ড. ত্রিগুনা সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। ড. ত্রিগুনা সেন বাঙালি কূটনীতিকদের মনের বিক্ষোভ এবং আকাঙ্খাকে ভারত সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেন। কিন্তু নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের হাইকমিশনার সাজ্জাদ হায়দার এ সংবাদ জেনে যান। সাজ্জাদ হায়দার এর নির্দেশে কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হকের দূতাবাস সংক্রান্ত

---

[৭১] *The Statesman* (India), 24 April 1971

[৭২] *জয়বাংলা*, ২৩ জুলাই ১৯৭১

[৭৩] *দৈনিক বাংলা* (ঢাকা), ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২

সকল কাজ প্রত্যাহার করা হয় এবং তাদের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি শুরু করে। এ সময় হাইকমিশনার সাজ্জাদ হায়দারের বাসায় যান কে এম শিহাবুদ্দিন। কথায় কথায় হাইকমিশনার বলেন, বাঙালিদের কুকুরের মতো মারা হবে। এমনকি হাইকমিশনারের সামরিক উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার হাসান একদিন তাদের শুনিয়ে বলে যে, ইয়াহিয়ার কথা শেখ মুজিবুর রহমান না শুনলে মুজিবকে পাগল করে ফেলা হবে। দূতাবাসের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের এ ধরনের মন্তব্যে দুজনে স্থির করেন তারা পাকিস্তান সরকারের চাকরি ছেড়ে দিবেন।[৭৪]

মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের প্রধান ছিলেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। তবে '৭১ এর মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি জাকার্তায় কর্মরত ছিলেন। নতুন কর্মস্থল নয়াদিল্লিতে যোগদানের পূর্বে তিনি এক মাসের ছুটি নিয়ে ঢাকায় যাওয়া মনস্থির করেন। তাঁর ঢাকায় যাওয়ার কথা ছিল ২৫ মার্চ। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময়ে পাকিস্তান থেকে ঢাকায় বিমান আসতো ব্যাংকক হয়ে। ঢাকায় যাওয়ার পূর্বে তিনি অবস্থান করছিলেন ব্যাংককে। ব্যাংকক বিমানবন্দরে যাওয়ার পর তিনি জানতে পারেন যে পিআইএ'র ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। পিআইএ'র কাউন্টারে গিয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে কাউন্টারের ব্যক্তি তাঁর দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকান। কাউন্টারের ব্যক্তি ও বিমানবন্দরে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপে তিনি ঢাকার সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারেন। বিমানবন্দর থেকে ফিরে কূটনীতিক মহল ও রেডিও'র সংবাদ শুনে ঢাকার প্রকৃত অবস্থা বোঝার চেষ্টা করেন। পাকিস্তান কিংবা ভারতের বেতার থেকে এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে হতাশ হয়ে বিবিসি'র মাধ্যমে পুরো সংবাদ জানতে পারেন। ব্যাংককে বসেই তারা চারজন বাঙালি তাদের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন। এদের মধ্যে কূটনীতিক আনোয়ারুল হক চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। তারা সবাই একমত হন যে, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে হবে এবং এ প্রতিশোধের জন্য তারা শপথও গ্রহণ করেন। কিন্তু অচিরেই তাদের শপথের কথা জানাজানি হয়ে যায়। পরদিন ব্যাংককের পাকিস্তান হাইকমিশনে গেলে রাষ্ট্রদূত তাঁর সঙ্গে শীতল আচরণ করেন। কিন্তু এতে তিনি পাত্তা না দিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞায় সংকল্পবদ্ধ থাকেন।

অবশ্য হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী কূটনীতিক সূত্রে দুটি ঘটনা জানতে পারেন যা থেকে তাঁর মনে হয়েছিল পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ওপর সামরিক কোনো অভিযান চালাবে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে। সে সময় তিনি এক সপ্তাহের ছুটিতে ইসলামাবাদে ছিলেন। একদিন আরও তিনজন পাকিস্তানির সঙ্গে ব্রিজ খেলছিলেন। সেখানে ছিলেন পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান জেনারেল আকবর, পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন কর্মকর্তা। খেলা চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রসঙ্গে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলেন 'পশ্চিমাদের দিন ফুরিয়েছে। এখন তো আমাদের রাজত্ব।' এর উত্তরে জেনারেল আকবর বলেছিলেন, 'এত সহজে তোমরা পার পাবে না।' এ ঘটনা থেকে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বুঝতে পারেন পাকিস্তানিরা বাঙালিদের আন্দোলনকে ভালোভাবে নিচ্ছে না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মাধ্যমে কিছু একটা করবে তা তিনি আন্দাজ করেন। এ সংবাদ তিনি ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় ড. কামাল হোসেনের মাধ্যমে এ সংবাদ পৌঁছে দেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী জাকার্তায় কর্মরত থাকা

---

[৭৪] *দৈনিক বাংলা* (ঢাকা), ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২

অবস্থায়। কূটনীতিক সূত্রে তিনি জানতে পারেন যে, দুটি অস্ত্র বোঝাই জাহাজ পূর্ব পাকিস্তানে যাচ্ছে। কিন্তু বাইরে প্রকাশ করা হয় যে, চিনি পাঠানো হচ্ছে। জাহাজের কর্মকর্তারা তাঁকে চিনি পাঠানোর কথা বলেছিলেন। বাস্তবে চিনির আড়ালে অস্ত্র পাঠানো হচ্ছিল। এ থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে, পাকিস্তানিরা গোপনে কিছু করার পরিকল্পনা করছে। তাই পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠাচ্ছে।

১ এপ্রিল নতুন কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার জন্য হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী নয়াদিল্লি পৌঁছেন। কিন্তু বিমানবন্দরে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে আটকে রাখে। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় যে, ঢাকার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন কিনা? এ প্রেক্ষিতে তিনি কী করবেন তা-ও জানতে চায়। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ও কাস্টমস এর লোকজন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে জানায় যে, দূতাবাসে কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদেরকে অবহিত করার জন্য।[৭৫]

মুক্তিযুদ্ধকালীন জাপানের পাকিস্তান দূতাবাসে তৃতীয় সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন কিউ.এম.এ. রহীম। তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী ঘটনা সম্বন্ধে। কূটনীতিক কমর রহীম ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন। এক বছর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে ১৯৭০ সালে জাপানের টোকিওতে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসে তৃতীয় সচিব হিসেবে যোগ দেন। জাপানের পাকিস্তান দূতাবাসে যোগ দেওয়ার সময় বাঙালি ছিল হাতে গোনা কয়েকজন। যাদের অধিকাংশই ছাত্র। কয়েকজন বাঙালি শুধুমাত্র দূতাবাসে কাজ করতেন। যারা ছাত্র হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু লেখাপড়া শেষ করে ওখানে এনএইচকে রেডিওতে চাকরি নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে দুই জন ছিলেন এস এ জালাল ও ইস্কান্দার চৌধুরী। এর বাইরে আট দশজন ছাত্র ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রেডিওতে বাঙালি সেকশনে খণ্ডকালীন চাকরি করতেন। কাজেই বাঙালি খুব একটা ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলনের সময়কালীন বিদেশের অনেক দূতাবাসের মতো বিশেষ করে লন্ডনের মতো তারাও সবাই উৎসুক্য নিয়ে দেখছিলেন যে, পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে। তাদের পর্যবেক্ষণ করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। এরকম কিছু যে হতে পারে সেটা কমর রহীম ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে টোকিওতে যাওয়ার সময় বুঝতে পেরেছিলেন। সেজন্য তাঁর অন্যান্য সহকর্মী যারা ওই সময় গিয়েছিল তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকলেও কমর রহীম মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। এজন্য তিনি জাপান যাওয়ার পথে হংকং হয়ে যান। জাপানের পাকিস্তান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত ছিলেন বাঙালি। তিনি তাঁকে হংকং থেকে কাপড় বানিয়ে ও কিছু জরুরি জিনিস নিয়ে যেতে বলেছিলেন। সে মোতাবেক তিনি কয়েকটা স্যুট বানিয়েছিলেন এবং একটি ছোট ক্যামেরা ও একটি থ্রি ব্রান্ডের রেডিও কিনেছিলেন। এমনকি টোকিওতে গিয়ে তিনি কোনো গাড়ি কিনেননি। তিনি হেঁটে, সাব ওয়েতে বা ট্রেনে যাতায়াত করতেন। পিছুটান হতে পারে এমন কোনো জিনিস তিনি করেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজন হলে যাতে তিনি খালি হাতে চলে যেতে পারেন। তিনি তখন ব্যাচেলর ছিলেন। মানসিকভাবে তাঁর প্রত্যাশা ছিল যে এভাবে আর চলবে না। দেশকে স্বাধীন করার জন্য বঙ্গবন্ধু যুদ্ধের জন্য ডাক দিবেন এটা মাথায় ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানের লাহোর বা ইসলামাবাদে

[৭৫] *বাংলাবাজার পত্রিকা* (ঢাকা), ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯২

থাকার সময় তিনি অনুভব করেছেন এভাবে আর থাকবে না। সেটা হয়তো মসৃণ ভাবে হবে না। পাকিস্তানিরা বাঙালিদেরকে সেটা সহজে দিবে না। বাঙালিদেরকে এটা আদায় করে নিতে হবে। আদায় করতে হলে বাঙালিদেরকে সংগ্রাম করতে হবে। কী ধরনের সংগ্রাম সে সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিক হিসেবে তাদেরকে কঠিন পথ অতিক্রম করতে হবে এজন্য তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। এমনকি তিনি জানিয়েছেন পাকিস্তানি গণহত্যার সংবাদ বিবিসি রেডিও এর মাধ্যমে ২৬ তারিখ সকালে পান। কমর রহীম আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন যে, ব্যাপারটা জটিল হয়ে যাবে। এমনকি পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালিদের পরিস্থিতি এতো সহজ থাকবে না। দেশের ভাগ্য যেমন অনিশ্চিত নিজের ভাগ্যও তেমনি অনিশ্চিত। কোন দিকে যাবে, তখন ওয়েট এন্ড সী ছাড়া তাদের আর কিছুই করার ছিল না।[৭৬]

মুক্তিযুদ্ধকালীন ইন্দোনেশিয়ার চিত্রও অনুরূপ দেখা যায়। ইন্দোনেশিয়ার পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালিদের প্রতিষ্ঠিত সংগঠন 'আমরা'র তৎপরতা ও পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মতামত জাকার্তায় পাকিস্তান দূতাবাসকে ভাবিয়ে তোলে। দূতাবাসের পাকিস্তানি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বাঙালিদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত পত্রপত্রিকাগুলোকে প্রভাবিত করা ছাড়াও ১০ মে জাকার্তার পত্রিকাগুলোর সাংবাদিক মালিকদের সম্মানে এক নৈশভোজ প্রদান করেন। সেখানে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের তথ্য প্রকাশ না করা এবং এ ব্যাপারে পাকিস্তানপন্থি লেখালেখির আহ্বান জানান।[৭৭] *ইন্টারন্যাশনাল ট্রিবিউন* ছাড়া কোনো পত্রিকায়ই পাকিস্তানের পক্ষে তেমন উদ্যোগী ছিল না। বরং নৈশভোজে যোগদানকারী *ইন্দোনেশিয়া অবজারভারের* সাংবাদিক পূর্ব পাকিস্তান সংকট নিয়ে দীর্ঘ প্রতিবেদন লিখেন। যা পরের দিনই পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। ১১ মে প্রকাশিত পত্রিকার এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ফলাও করে লেখা হয়-

ক. ২৫ মার্চের পর পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ৪ লক্ষ বাঙালি নিহত হয়েছে।

খ. অনেক জায়গায় রেল, সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

গ. ৫৫% পাটকলে ১৫% শ্রমিকের বেশি কর্মে নিয়োজিত নেই।

ঘ. লক্ষ লক্ষ লোক বুভুক্ষু রয়েছে।

ঙ. পরিস্থিতি দৃষ্টে মনে হচ্ছে ইয়াহিয়ার পক্ষে এ বছর টিকে থাকা সম্ভব নয়।

চ. সৈন্যদের দ্বারা দোকানপাট লুট হচ্ছে।

ছ. একজন শীর্ষস্থানীয় পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ী মন্তব্য করেছেন ৬০% পণ্যের এই উপনিবেশটি তাদের হাতছাড়া হয়েছে।[৭৮]

---

[৭৬] গবেষকের সঙ্গে কমর রহীম এর সাক্ষাৎকার, ১৯ মার্চ ২০১৮

[৭৭] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা: তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ১৯৮২। পৃ. ৩৮৫

[৭৮] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার ভূমিকা, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৭-২৮, বর্ষ ১৪০৯-১৪১১। পৃ. ২৪৪-২৬২

১৯৭১ সালে ইরানে পাকিস্তান দূতাবাসে ৫ জন বাঙালি ছিলেন। প্রথম সচিব, তৃতীয় সচিব, দুই জন সহকারী ও একজন স্টেনোগ্রাফার। মুজিবনগর সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি নুরুল কাদির ইরানে পৌঁছে ভারতীয় দূতাবাসের প্রথম সচিব বাঙালি এস পি ঘোষ এর সহায়তায় পাকিস্তান দূতাবাসের প্রথম সচিবের ফোন নম্বর সংগ্রহ করে টেলিফোন করেন। টেলিফোনে ইরানের পাকিস্তান দূতাবাসের প্রথম সচিব বাংলা ভাষা শুনে ফোন রেখে দেন। পরপর দুইবার এরকম হওয়ায় নুরুল কাদির তৃতীয়বার ফোন দিয়ে ইংরেজিতে কথা বলে নিজের পরিচয় দেন। ইরানে নিযুক্ত পাকিস্তান দূতাবাসের প্রথম সচিব ও মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি নুরুল কাদির উভয়ে ১০ সেপ্টেম্বর সাক্ষাৎ করেন। তাদের এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সচিবের গাড়িতে। নুরুল কাদির তাঁকে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকারের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্যে অনুরোধ জানান। এ প্রস্তাবে রাজি হলে তাঁর স্ত্রীসহ তাঁকে নিরাপদে ইরান থেকে বের করে নেওয়ার পুরো দায়িত্ব মুজিবনগর সরকার বহন করবে। তাঁকে আরো জানানো হয় যে, তিনি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে যোগদান করার পর সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে নিয়মিত বেতন-ভাতা দেওয়া হবে। তাঁকে আরো বলা হয় যে, ইরান ও পাকিস্তান আর.সি.ডি'র সদস্য হওয়ায় ইরানের পাকিস্তান দূতাবাসের প্রথম সচিবের মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করলে তা বিশ্বব্যাপী এক আলোড়ন সৃষ্টি হবে। এতে তিনি যথাযথ সম্মান ও প্রচার পাবেন। নুরুল কাদিরের সকল কথা ধৈর্য সহকারে শোনার পর প্রথম সচিব বলেন যে, 'ইরানে শাহেনশাহের নিজস্ব ইনটেলিজেন্স সাভাক পাকিস্তানের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তাই সাভাককে তিনি খুবই ভয় পান। তাছাড়া পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালী ১ম সেক্রেটারী হিসেবে তার প্রতি সাভাক এর বিশেষ নজর থাকাটাই স্বাভাবিক।'[৭৯] বাঙালি কূটনীতিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকালীন সূচনা পর্বে প্রথম দুই দিন টেলিফোনে বাংলা ভাষা শুনে তিনি সাভাকের ভয়েই টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর মনে ভয় ছিল, তিনি ও তাঁর স্ত্রী ইরান ত্যাগ করার সময় সাভাক এর হাতে ধরা পড়ে যাবেন। এতে তাদের জীবনে মারাত্মক পরিণতি হবে। তাঁর ব্যক্তিগত মতামত ছিল, সাভাক এর চোখে ধুলো দিয়ে ইরানে কোনো কাজ করা একেবারেই অসম্ভব। এ সাক্ষাৎকারে আরো জানা যায় যে, তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর পাসপোর্ট পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিজস্ব সেফ কাস্টডিতে রেখে দিয়েছেন। যা উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এছাড়া তাঁর আরো ভয় ছিল যে, তাঁর এক ভাই পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত আছেন। পাশাপাশি বাংলাদেশে তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজন সকলের ঠিকানাও রাষ্ট্রদূত নিয়েছেন। তিনি আশঙ্কা করেন যে, বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করার পর তাদেরও ক্ষতি হবে। তবুও বিষয়টা নিয়ে তিনি আরও চিন্তা-ভাবনা করে ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিকে মতামত জানাবেন বলে স্থির করেন।

ইরানের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। মুজিবনগর সরকার শুরু থেকেই মুসলিম দেশগুলোর সমর্থন আদায়ে চেষ্টা করছিল। এর অংশ হিসেবে নুরুল কাদিরকে ইরানে পাঠানো হয়। নুরুল কাদির তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে

---

[৭৯] মুহাম্মদ নুরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৭। পৃ. ২৫৫; উল্লেখ্য যে, ইরান, পাকিস্তান ও তুরস্কের সমন্বয়ে গঠিত হয় আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান RCD (Regional Cooperation for Development)।

সম্পন্ন করার জন্য ইরানের পাকিস্তান দূতাবাসের প্রথম সচিবের সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু বাঙালি কূটনীতিক হয়েও তিনি ইরানের গোয়েন্দা বাহিনীর ভয়ে ভীত ছিলেন। নুরুল কাদির সকল বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও তিনি দূতাবাস ত্যাগ করেননি।

৩.৩ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তান দূতাবাসগুলোর অভ্যন্তরীণ চিত্র

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আইনগত বৈধতা পায় এবং বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু এবং মুজিবনগর সরকার গঠন হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে পাকিস্তানি সামরিক সরকার বহির্বিশ্বকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যা হচ্ছে তা অভ্যন্তরীণ সংকট এবং এ সংকটে ভারত সরকার হস্তক্ষেপ করছে। কিন্তু একটি দেশের নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করে রাষ্ট্রপ্রধানের নামে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করার পর তা নিয়ে প্রশ্ন উঠার আর কোনো সুযোগ থাকে না। সমগ্র বিশ্বে পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে পাকিস্তানিদের পাশাপাশি বাঙালি কূটনীতিক ও পদস্থ কর্মকর্তা এমনকি কর্মচারীদের সংখ্যাও ছিল উল্লেখযোগ্য। যারা তাদের মেধা দিয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিভাগে স্থান করে নেয়। এসব বাঙালি কূটনীতিকদের অধিকাংশের চাকরির যোগদানের সময়কাল ছিল ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর। আবার অনেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব সময় চাকরিতে যোগদান করেছে। কূটনীতিক ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেওয়া অধিকাংশ উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। স্বাভাবিকভাবেই দেশভাগ পরবর্তী বিশেষ করে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান তার চেতনায় উজ্জীবিত ছিলেন এরা। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ ও বঞ্চনার চিত্র তারা প্রত্যক্ষ করেছেন। এমনকি তারা তাদের প্রশিক্ষণপর্বেও তা উপলব্ধি করেছেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা দাবি উত্থাপন করার সময় থেকেই পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কর্মরত এসব বাঙালি কূটনীতিকরা দেশের সকল সংবাদ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। বিশ্ববাসীর মতো তারাও অপেক্ষা করতে থাকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল কী হয় তা দেখার জন্য। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও সামরিক শাসক ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে টালবাহানা শুরু করলে এসব বাঙালি কূটনীতিকরা প্রতি মুহূর্তে দেশের সংবাদ সংগ্রহের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। যদিও পাকিস্তান দূতাবাসের লোকজন আওয়ামী লীগের এই বিজয়কে মোটেই ভালো চোখে দেখেনি।[৮০] মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সে সংবাদ তারা অচিরেই পেয়ে যান। দূতাবাসে চাকরিতে নিয়োজিত থাকায় এসময় তারা পাকিস্তানিদের মনোভাব খুব ভালো ভাবে অবলোকন করতে পারে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তান দূতাবাসগুলোর চিত্র কেমন হয়েছিল তা কয়েকটি দূতাবাসের ঘটনাবলী আলোচনা করলেই পরিস্কার হয়ে উঠবে।

মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করার পরের দিন ১৮ এপ্রিল কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের উপ হাইকমিশনার এম হোসেন আলীর নেতৃত্বে ৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর অচিরেই এর তীব্র

[৮০] জাওয়াদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬

প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান কলকাতার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থানের পাকিস্তান দূতাবাস হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েন। কূটনীতিক বিশেষজ্ঞরা কলকাতা দূতাবাস হাতছাড়া হয়ে যাওয়াকে পাকিস্তান সরকারের কূটনীতিক পরাজয় হিসেবে দেখেছেন। এ ঘটনার পর পাকিস্তান সরকার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লিতে নিযুক্ত পাকিস্তান হাইকমিশনের মারফত ভারত সরকারের কাছে কলকাতার বাড়ি ফেরত চেয়ে পাঠান এবং মেহেদী মাসুদকে কলকাতায় ডেপুটি হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগদান করেন। মেহেদী মাসুদ সশরীরে কলকাতায় উপস্থিত হলেও বাড়ি ফিরে পাননি। তবে সিদ্ধার্থ শংকর রায় মুজিবনগর সরকারকে জানিয়েছিল যে, কলকাতার মুসলমান সমাজকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে মেহেদী মাসুদ সমর্থ হন।[৮১]

২ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হলে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগা হিলালি এ এম এ মুহিতকে টেলিফোন করে পাকিস্তানের বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থা জানান। মুহিত তাঁকে বলেন যে, ইয়াহিয়া নিজে ঢাকায় গিয়ে এর সুরাহা না করলে দেশ ভাগ হয়ে যাবে। এসময় হিলালির উপদেশ ছিল 'তোমরা মাথা গরম করো না, বিদেশে উত্তেজনা প্রকাশ করা সমীচীন হবে না।' একই সঙ্গে হিলালি মন্তব্য করেছিলেন How can he accept a centre with only two and half subjects?[৮২] পঁচিশে মার্চের পর ওয়াশিংটন পাকিস্তান দূতাবাসের অভ্যন্তরে শীতল সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। পারস্পরিক কথাবার্তাও কিছুদিন ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানি যারা ছিল তারাও একটু যেন দমে গিয়েছিল। তারা একটু নরম ছিল। রাষ্ট্রদূত প্রথম ১০-১৫ দিন চুপচাপ ছিলেন কিন্তু পরে তিনি অত্যন্ত শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ এম এ মুহিত তখন অফিসে যেতেন না। তিনি সকালে গিয়ে গাড়ি রেখে বাইরে ঘোরাঘুরি করতেন। রাষ্ট্রদূত কোনোদিন কিছু বলেননি। সময়ের পরিক্রমায় বাংলাদেশে তাদের দখল বৃদ্ধি পেলে বাঙালি কূটনীতিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়।[৮৩]

এই দূতাবাসের আরেকজন বাঙালি কূটনীতিক শাহ এ এম এস কিবরিয়ার বক্তব্যেও জানা যায় যে- 'নির্বাচনের ফলাফল দূতাবাসের পাকিস্তান অফিসারদের যেমন বিস্মিত করেছিলো, মার্কিন সংবাদপত্র পাঠকদের তেমনি বিস্মিত করেছিলো। আমরা দূতাবাসের বাঙালিরা অবশ্যই অবাক হইনি, তবে ভীষণ খুশি হয়েছি। আমাদের মনে হয়েছে, একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে ভোটারদের সুস্পষ্ট রায় জাতিকে দিকনির্দেশনা দেবে। শেখ মুজিব যে বাঙালিদের একমাত্র মুখপাত্র, সে সম্পর্কেও কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না।'[৮৪]

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও আমেরিকাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসে পাকিস্তানিরা বেশ মাথা উঁচু করে কথা বলছিল। তাদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কিছুই ঘটেনি। পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছে তার পক্ষে রাষ্ট্রদূত আগা হিলালি কতগুলো প্রচারপত্র ও পুস্তিকা বিতরণ করতে লাগলেন। অবশ্য ইতিমধ্যে পাকিস্তান একটি সংবাদ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে।[৮৫] এ এম এ মুহিত আরো জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত মাস শেষে খুব তৎপরতা দেখাতে লাগলেন। তিনি অনেকগুলো

---

[৮১] আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭। পৃ. ৮৫
[৮২] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
[৮৩] আবুল মাল আবদুল মুহিত এর সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭০-৩৭১
[৮৪] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪
[৮৫] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

প্রচারপত্র বিলি করলেন। আমেরিকার জনপ্রতিনিধিদের অনবরত তারবার্তা আর চিঠি লিখে নাস্তানাবুদ করে তুলেন। বাঙালি কর্মচারীদের বিশ্বাস করা যায় না বলে তিনি দু'জন পাকিস্তানি কর্মকর্তা আমদানি করেন। কানাডায় কাউন্সেলর পদে নিযুক্ত আকরাম জাকি ও সিঙ্গাপুর থেকে এনায়েত করিমের পূর্বসুরী উপপ্রধান জহিরুদ্দিন ফারুকী কে নিয়ে আসেন। কুতুবউদ্দিন আজিজ ও নাসিম আহমদ নামে দু'জন পাকিস্তানি কর্মচারী হিসেবে দূতাবাসে কর্মরত ছিল। তারা কংগ্রেসে খুব ঘনঘন যাতায়াত শুরু করে। এমনকি সংবাদ মাধ্যমে জোর তদবির চালাতে থাকে।[৮৬] মার্কিন দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত এক সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করেন। অন্যতম উদ্দেশ্যে ছিল জেনারেল ইয়াহিয়ার ২৪ মার্চ তারিখের বক্তব্যের ব্যাখ্যা ও প্রচার। আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল দুরভিসন্ধিমূলক। কারণ ইতিমধ্যে মাহমুদ আলীর আনুগত্য পরিবর্তন, রাজ্জাকের বরখাস্ত, বাঙালি কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ এসব নিয়ে স্থানীয় পত্রিকায় কয়েকদিন যাবত সংবাদ প্রকাশ হতে থাকে। এমনকি পত্রিকাগুলো এ ধারণা দেয় যে, দূতাবাসেই এক ধরনের মুক্তিযুদ্ধ চলছে। হিলালি এই প্রচারটিকে বন্ধ করতে কূটকৌশল অবলম্বন করেন। তিনি একটি সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি একপাশে এনায়েত করিমকে এবং অন্যপাশে শামসুল কিবরিয়াকে রাখেন। এ এম এ মুহিতকেও সংবাদ সম্মেলনে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তখন কাজ উপলক্ষে দূতাবাসের বাইরে ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে দূতাবাসে বাঙালি পাকিস্তানি মন কষাকষি নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন। হিলালি এর জবাবে তার দু'পাশে বসা বাঙালিদের দেখিয়ে ঘোষণা করেন যে, সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার আর বাংলাদেশেও এই রকম সম্পর্ক বিরাজ করছে। ৪ আগস্ট সকল বাঙালি কূটনীতিক একযোগে পদত্যাগ করার সময় হিলালির দূতাবাসে কোনো বাঙালি এমনকি কোনো পিয়নও অবশিষ্ট ছিল না।[৮৭] এই সংবাদ সম্মেলনের পর এ এম এ মুহিত ওয়াশিংটনে ফিরে আসার পর আতাউর রহমান চৌধুরী সংবাদ দেন যে, তাঁকে রাওয়ালপিন্ডিতে বদলি করা হয়েছে। আতাউর রহমান চৌধুরী টিপ্পনি কেটে এ এম এ মুহিতকে বলেন যে, পাকিস্তানিরা জেনে গেছে তিনি অচিরেই দূতাবাস পরিত্যাগ করবেন।[৮৮] মে মাসের শেষের দিকে আমেরিকার কংগ্রেসে Foreign Assistance Ammedment প্রস্তাব পেশ করা হয়। সিনেটে স্যাক্সবি-চার্চ প্রস্তাবে পাকিস্তানে সকল সাহায্য বন্ধ করার দাবি করা হয়। এমনকি হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভে গালাগার প্রস্তাবে একই দাবি উত্থাপন করা হয়। এসময় থেকে দূতাবাসের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে। বহু লোককে চাকরিচ্যুত করা হচ্ছিল। বাঙালি কূটনীতিকরা দেশের কোনো খবর পাচ্ছিল না। এমনকি তাদেরকে কোনো কাজও করতে দেওয়া হতো না। দূতাবাসের কাজের জন্য অনেক পাকিস্তানিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তারাই সব কাজ করতো।[৮৯]
ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তান দূতাবাস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। যা দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত আগা হিলালির আচরণ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। ওয়াশিংটনে প্রতি বছর পাকিস্তান মেলা অনুষ্ঠিত হতো। সেখানে রাষ্ট্রদূতের স্ত্রীসহ অন্যান্য কূটনীতিকদের স্ত্রীরা অংশ নিতেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই পাকিস্তান মেলা

[৮৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪
[৮৭] ওই, পৃ. ৮৫
[৮৮] ওই, পৃ. ১০৬
[৮৯] আবুল মাল আবদুল মুহিতের সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *সম্মুখ সমরে বাঙালী*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯। পৃ. ২৫২-২৫৩

অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। পাকিস্তান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত আগা হিলালির স্ত্রী মিসেস শামসুল কিবরিয়াকে ফোন করে মেলায় অংশগ্রহণের কথা জানান। পাকিস্তান মেলায় মিসেস আসমা কিবরিয়াকে কিছু খাবার নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। কিন্তু মিসেস কিবরিয়া এতে অংশ না নেওয়ার কথা জানালে তিনি তাঁর ওপর বিরক্ত হন। মেলায় অংশ না নেওয়ার পেছনে মিসেস আসমা কিবরিয়ার যুক্তি ছিল, 'যখন আমার দেশে হত্যাযজ্ঞ চলছে তখন আমার পক্ষে পাকিস্তান ফেয়ারে কোনো কিছু করা সম্ভব হবে না।'[৯০]

একযোগে ১৫ জন বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর পাকিস্তান দূতাবাস ও সেখানে কর্মরত পাকিস্তানিদের মনোভাব কেমন হয়েছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায় এ এম এ মুহিতের স্মৃতিকথায়। পাকিস্তানিরা এই সংবাদে একদম হতম্ভব হয়ে যায়। এত বড় ঘটনা তারা মোটেই আঁচ করতে পারেনি। এমনকি এনায়েত করিমের পরিবার আগের রাতে ম্যাকলিন চলে গিয়েছে তা-ও তারা জানতে পারেনি। এ এম এ মুহিত এর মতে, রাষ্ট্রদূত হিলালি এই ঘটনাকে তার ব্যক্তিগত ব্যর্থতা হিসেবে মনে করেন। এর ফল স্বরূপ মাস দুয়েক পরে পাকিস্তান সরকার তাকে অবসর দিয়ে জেনারেল এএনএম রাজাকে রাষ্ট্রদূত করে পাঠায়।[৯১] পাকিস্তানি দূতাবাসের ভাড়া করা জনসংযোগ কর্মকর্তা কুতুবউদ্দিন আজিজ বাঙালিদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ সম্বন্ধে তাঁর *By Mission to Washington* গ্রন্থে লিখেছেন- যখন প্রেসিডেন্ট নিক্সন পাকিস্তানের জন্য তার সমর্থন ঘোষণা করছিলেন ঠিক তখন ১৪ জন পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মচারী ন্যাশনাল প্রেসক্লাবে তাদের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন। যে ব্যক্তি এই ঘটনাটি পরিচালনা ও তদারকি করেন সেই মুহিত পাকিস্তানের নিন্দাবাদ ঘোষণা রচনা করেন। তারা এ ব্যাপারে দূতাবাসকে কোনো পূর্বাভাস দেননি।[৯২]

পাকিস্তানিদের প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি এসময় শাসকগোষ্ঠীর পদলেহনকারী কোনো কোনো বাঙালি কূটনীতিকদের এমন সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। শাহ এ এম এস কিবরিয়া তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন- 'দেশ থেকে সরকারি কাজে ওয়াশিংটনে এসে একজন উচ্চপদস্থ বাঙালি আমাদের তিরস্কার করে বললেন, দেশে সবাই নিজ নিজ চাকরি করে যাচ্ছে অথচ তোমরা চাকরি ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছো।'[৯৩]

পশ্চিম পাকিস্তানের ইসলামাবাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত ফখরুদ্দীন আহমদ এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তান, বিশেষ করে ঢাকায় সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের খবর তারা ২৬ মার্চ সকালে পান। এতে ইসলামাবাদে কর্মরত বাঙালি অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে একটা বিষাদের ছায়া নেমে আসে। এ সময় কয়েকজন উর্ধ্বতন বাঙালি অফিসার উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে শেখ মুজিবের সমালোচনা করেন এবং এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য শেখ মুজিবকে দায়ী করেন। তাদের আচরণ ফখরুদ্দীন আহমদ এর কাছে ঘৃণ্য মনে হয়েছে। তাদের কেউ কেউ এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঘোষণাও প্রকাশ্যে দেন যে তারা ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের ধারণায় বিশ্বাসী।[৯৪]

---

[৯০] আসমা কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫
[৯১] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪
[৯২] ওই, পৃ. ১২৪
[৯৩] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪
[৯৪] ফখরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১

এ্যাডভোকেট নুরুল কাদিরের বড় বোনের মেয়ের জামাতা আজিজুল হক চৌধুরী সে সময় লন্ডনে পাকিস্তান হাইকমিশন অফিসের তৃতীয় সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মিসেস আজিজুল হক চৌধুরী তাঁর এক চিঠিতে জানায়, বিভিন্ন পাকিস্তান দূতাবাসে অনেক বাঙালি অফিসারকে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ চাকরি থেকে বিনা কারণে বরখাস্ত করেছে। অনেককে জোরপূর্বক বিদেশ থেকে ইসলামাবাদে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। আবার অনেককে ইচ্ছাকৃতভাবে অসুবিধায় ফেলার জন্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি করা হচ্ছে। তাছাড়া বিদেশে বিভিন্ন পাকিস্তান দূতাবাসে বাঙালি অফিসার ও কর্মচারীদের গতিবিধি ও কাজকর্মের ওপরেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।[৯৫] এক কথায়, বিদেশে বাঙালি অফিসার, কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ তখন এক ভয়াবহ অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন।

পঁচিশে মার্চের পর লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের অভ্যন্তরীণ চিত্র কেমন ছিল সে সম্পর্কে মহিউদ্দিন আহমদ তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন, 'দূতাবাসের অবস্থা খুব স্বাভাবিক ছিল। তারা মনে করেছিল এটা একটা পুলিশি অ্যাকশন। কোনো জায়গায় গোলমাল হচ্ছে, সেখানে পুলিশ ও বিডিআর পাঠিয়ে শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা হচ্ছে। তাদের কাছে এটা সাধারণ ঘটনা। তাদের পক্ষ থেকে বিষয়টা এরকম ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এটা নিয়ে পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে সামান্যতম ঢেউও কোথাও দেখা যায়নি। কেননা তখন পাকিস্তানে মার্শাল 'ল জারি ছিল। অনেক ধরনের নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু সাধারণ যে প্রতিক্রিয়া হবে সেটাও পাকিস্তান হাইকমিশনে দেখা যায়নি। হাইকমিশনের সবাই সরকারি চাকুরে। তারা সরকারের বিরুদ্ধে যেতেও পারবে না। সরকার যা বলতে বলেছে তাই বলেছে। এটা স্বাভাবিকভাবে বলা হয় যে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছিল যা দমন করতে অন্য কোনো উপায় ছিল না। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতেও তাই প্রচার করা হয়েছিল। দূতাবাসে যারা অবাঙালি তারা সবাই পাকিস্তানের পক্ষে। বাঙালিদের মধ্যে হয়তো কেউ কেউ বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন কিন্তু বিভিন্ন কারণে প্রকাশ করেননি। কোথায় যাবেন, কী করবেন এসব নিয়ে কারো সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন না। আমরা স্বামী-স্ত্রী দুই জন। বাঙালিদের কার কী ফ্যামিলি লায়াবিলিটি আছে তা প্রকাশ্যে বলতে পারছে না বা কী অসুবিধা আছে তা-ও না। সুতরাং এটা নিয়ে কারো সাথে আলোচনা করা যেতো না। আমরা সবাই বাঙালি একই মিশনে কাজ করি কিন্তু আলোচনা করা নিষেধ ছিল।'[৯৬]

কলকাতাস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের উপ হাইকমিশনার এম হোসেন আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত বাঙালি কর্মকর্তারা এ সংবাদে খুশি হন। এম হোসেন আলীর পক্ষ ত্যাগের সংবাদে পশ্চিম পাকিস্তানিরা দারুণভাবে মর্মাহত হয়। অনেকের-ই প্রশ্ন ছিল 'একজন অত্যন্ত ধর্মভীরু মুসলমান হয়ে হোসেন আলী কি করে একাজ করতে পারলেন এবং কি করে তিনি বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগ দিতে পারলেন?'[৯৭]

---

[৯৫] মুহাম্মদ নুরুল কাদির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১
[৯৬] গবেষকের সঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মার্চ ২০১৮
[৯৭] ফখরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

পাকিস্তান মিশনে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান সরকার সন্দেহের চোখে দেখত। যার সমর্থন পাওয়া যায় একজন কূটনীতিকের ভাষ্যে। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে মার্কিন দূত হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তান সফর করেন। প্রাথমিকভাবে ইসলামাবাদে কর্মরত বাঙালি অফিসাররা মনে করেছিলেন, কিসিঞ্জার ইসলামাবাদ আসছেন পাকিস্তানের সামরিক জান্তার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে। যাতে শেখ মুজিব মুক্তি পান এবং সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান হয়। কিন্তু পরে তারা জানতে পারেন এ সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল, গোপনে চীন সফর করা। কিসিঞ্জারের সফরের একদিন আগে মার্কিন দূতাবাসের কাউন্সেলর ডেনিস কাক্স (Dennis Cux) নিজের বিদায় উপলক্ষে একটি পার্টি দিয়েছিলেন। সেখানে ফখরুদ্দীন আহমদও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ১৯৫৪-৫৫ সালে এই ডেনিস কাক্স এবং তাঁর স্ত্রী মলি ও ফখরুদ্দীন আহমদ ফ্লেচার স্কুলে সহপাঠী ছিলেন। ডেনিস কাক্সের সঙ্গে ফখরুদ্দীন আহমদের ঘনিষ্ঠতা পাকিস্তান গোয়েন্দা দফতর ভালো চোখে দেখেনি। পরবর্তীতে ফখরুদ্দীন আহমদক লিখিতভাবে এ ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল যে, এই সাক্ষাতের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই এবং পুরোনো বন্ধু হিসেবেই তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। বিরাজমান পরিস্থিতিতে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ঝুঁকিপূর্ণ হবে জেনেও ফখরুদ্দীন আহমদ ওই অনুষ্ঠানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানে ফখরুদ্দীন আহমদ অনেকক্ষণ অবস্থান করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীতে মার্কিন মনোভাব জানার চেষ্টা করেন।[৯৮] ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভুট্টো পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে চীন সফর করেন এবং দাবি করেন যে, সকল বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। ওই সময়ে পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বাঙালি অফিসার তবারক হোসেন। তাঁকেও ওই সফরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁকে প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত করার পেছনে কারণ হিসেবে ধরা হয় যে, তখনও বহু বাঙালি অফিসার পাকিস্তানের প্রতি অনুগত রয়েছেন তা দেখানো।[৯৯]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তানি দূতাবাসগুলোতে নিয়োজিত বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। এর ফলে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর অন্যান্য বাঙালি কূটনীতিকদের আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। বিশ্বব্যাপী বাঙালি কূটনীতিকদের একের পর এক পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগে পাকিস্তান সরকার কূটনীতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বাঙালি কূটনীতিক অফিসার ও কর্মচারীদের বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি নজিরবিহীন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পাকিস্তান সরকার তাদের দূতাবাসে নিয়োজিত কূটনীতিক অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের পাসপোর্ট ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করে। পাকিস্তানের কূটনীতিক পাসপোর্ট ব্যবহার করে তারা যেন নির্বিঘ্নে দেশ দেশান্তরে সফর করতে না পারে এজন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[১০০] এরকম সন্দেহজনক অবস্থায় লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনে কর্মরত বাঙালি ডেপুটি হাইকমিশনার সলিমুজ্জামানকে অস্থায়ী হাইকমিশনার পদে নিয়োগ করা হয়। সলিমুজ্জামানের পাকিস্তান প্রীতির কারণে তাকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ৫ অক্টোবর লন্ডনের *দি টাইমস* পত্রিকা তার

---

[৯৮] ফখরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩
[৯৯] *ওই*, পৃ. ৬৫
[১০০] *The Guardian* (London), 3 September 1971

পদোন্নতির সংবাদ প্রকাশ করে।[১০১] লুৎফুল মতিন জানিয়েছেন, ২৫ মার্চের পূর্বে লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের পরিবেশ স্বাভাবিক ছিল। বিশেষ করে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে লুৎফুল মতিনের সম্পর্ক ছিল খুবই আন্তরিক। তারা একসঙ্গে বসে দূতাবাসের কাজ করতেন, বিভিন্ন বিষয়ে গল্প করতেন। কিন্তু ২৫ মার্চের পর রাষ্ট্রদূতের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এসময় তিনি বাঙালিদের সঙ্গে একটু দূরত্ব বজায় রাখতেন। অফিসিয়াল প্রয়োজন ছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দূতাবাসের অভ্যন্তরে পদস্থ বাঙালিদের সম্পর্ক শীতল হয়ে পড়ে।[১০২]

আগস্ট মাসে লন্ডনের পাকিস্তান দূতাবাসের পদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তখন এ সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ বৈদেশিক দপ্তরে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এ ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের বক্তব্য ছিল- এ কেমন ধরনের আচরণ? রাষ্ট্রদ্রোহী পাকিস্তানি ইংল্যান্ডে গেলেই আশ্রয় পেয়ে যায় এ কেমন নীতি? [১০৩] এ ধরনের উষ্মা প্রকাশ করার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল, কয়েকদিন পূর্বে ইরাকের রাষ্ট্রদূত এ এফ এম আবুল ফতেহ ইংল্যান্ডে এসে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। স্থানীয় সংবাদপত্রে এই সংবাদটি বেশ ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছিল। জাপানের পাকিস্তান দূতাবাস থেকে পদত্যাগ করার পর রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোতাহার হোসেন কমর রহীমের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাদের দু'জনের মধ্যে যে আলাপচারিতা হয়েছিল-

> আমার অ্যাম্বাসাডার ফরচুনেটলি যে কোনো কারণেই হোক আমি উনাকে বিশ্বাস করতাম না কিন্তু উনি আমাকে খুব বিশ্বাস করতেন। যার জন্য আমি যেদিন ডিফেক্ট করে প্রেস কনফারেন্স করলাম প্রেস থেকে উনাকে টেলিফোন করেছে কনফারমেশনের জন্য। উনি বলেছেন এটা ফালতু। তারপর আমার বাসায় টেলিফোন করেছেন। আমি বাসায় নাই। কারণ আমি তো প্রেস কনফারেন্স করেছি মাসুদ সাহেবের বাসায়। আমাকে না পেয়ে মাসুদ সাহেবের ওখানে টেলিফোন করেন। মাসুদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছেন কমর রহীম আছে কিনা? মাসুদ সাহেব বললেন আছে। বলে আমি কথা বলতে পারি? হ্যাঁ বলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করে প্রেস থেকে আমাকে জানতে চেয়েছে তোমরা নাকি ডিফেক্ট করেছো? আমি বললাম ইয়েস স্যার। সে বললো দিস ইজ স্যাডেস্ট ডে অব মাই লাইফ। বললো তুমি আমাকে বলতে পারতে। উনাকে ফ্রাঙ্কলি বললাম আপনি আমার সিনিয়র অফিসার। আপনি বাঙালি। আপনার সাথে আলাপ করেই ডিফেক্ট করতে পারতাম। তা আমি করিনি। কারণ আমি জানতাম আই নিউ ইওর মাইন্ড। ইউ আর কমপ্লিটলি কমিটেড টু পাকিস্তানিস। আমি ওখানে কোনো গেইন করতে পারতাম না। কাজেই আমি যদি আপনাকে বলতাম তাহলে আপনি একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যেতেন। এটা কি আপনার জানার পর পাকিস্তান সরকার কি অ্যাম্বাসাডারকে আর জানাবেন নাকি এজ এ মাই ওয়েল উইশার আপনি চেপে যাবেন পরে পাকিস্তানিদের কাছে বিপদে পড়বেন। আপনাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে চাইনি বলে আপনাকে আমি কিছুই বলিনি। আমার ডিসিশান আমি নিয়েছি, ভালো মন্দ যাই হোক আমার ডিসিশান আমার। আমাকে যদি কেউ মেরে ফেলে আমি আমার নিজ দায়িত্বে মরে যাবো। আমি কাউকে বলতে পারবো না যে কেউ আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। আমি এটা আমার কর্তব্য মনে করেছি। আপনি এখন আপনার সরকারের কাছে রিপোর্ট করেন। উনি বললেন তোমাকে আমি সবরকম হেল্প করার চেষ্টা করেছি। আমি তোমার ছুটির ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তারপরও তুমি আমাকে বললে না। আমি বললাম স্যার আপনি যদি এটাকে অফেন্স মনে করেন আমার কিছু করার নেই। কিন্তু আমি এটা ভালো মনে করেছি। দিস ইজ ওয়ে, আই হ্যাভ ডান।[১০৪]

---

[১০১] আবদুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী*, ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৭। পৃ. ১৬২-১৬৩
[১০২] গবেষকের সঙ্গে আকবর লুৎফুল মতিন এর সাক্ষাৎকার, ২৭ এপ্রিল ২০১৮
[১০৩] শওকত ওসমান, ১৯৭১ *স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর*, ঢাকা: বিউটি বুক হাউস, ১৯৯২। পৃ. ৬৭
[১০৪] গবেষকের সঙ্গে কমর রহীম এর সাক্ষাৎকার, ১৯ মার্চ ২০১৮

দিল্লিতে পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব কে এম শিহাবুদ্দিন ও প্রেস এটাচি আমজাদুল হকের বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাও পাকিস্তান সরকারকে নাড়া দেয়। এ সময় পাকিস্তান দূতাবাস কর্তৃপক্ষের আচরণ কেমন ছিল সে সম্পর্কে কে এম শিহাবুদ্দিন বলেছেন-

> Since the start of the non-cooperation movement in East Pakistan in early March 1971, West Pakistani intelligence working in the High Commission had intensified its surveillance on the Bengali officers and staff working in the mission. As the longest serving Bengali PFS officer in Delhi, with a large circle of friends and contacts. I was an obvious target and my movements and activities were monitored round the clock. I realized this when the high commissioner came to his office at midnight on 31 March and sent a secret message to the Foreign office in Islamabad asking for my immediate recall to the headquarters in Islamabad, on the grounds that I was holding secret meetings with Indian leaders and inciting Bengali officials in the High Commission to turn against their non-Bengali superiors. . . On 2 April, the high commissioner summoned me to his office and informed me of my immediate recall to Pakistan, even though I was yet to complete my normal three years' tour of duty in Delhi.[১০৫]

দিল্লিতে এ ঘটনা যখন ঘটে তখনও মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়নি। মুজিবনগর সরকার গঠন হওয়ার পর দিল্লিতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মিশন চালু হলে পাকিস্তান সরকার এ ঘটনাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারকে পররাষ্ট্র দপ্তরে ডেকে নিয়ে ধমকসহ ঘোর প্রতিবাদ জানায় পাকিস্তান সরকার। দিল্লিতে যে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তাতে ইতিমধ্যে পক্ষ ত্যাগকারী অনেক বাঙালি কার্যরত ছিল।[১০৬]

পাকিস্তানের আনুগত্য ত্যাগকারী বাঙালি কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর প্রায়ই বিষোদগার করে। বিশ্বাসঘাতক, তহবিল তছরূপকারী এ জাতীয় নিন্দাসূচক শব্দ তারা এক্ষেত্রে ব্যবহার করতো। ইরাকের রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ'র পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর এসকল শব্দ ব্যবহারে আধিক্য দেখা যায়। অবশ্য মুজিবনগর সরকার আবুল ফতেহ'র কর্মকাণ্ডে প্রশংসা করায় তারা আরো বেশি কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করতে থাকে। এ ঘটনার পর বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের মনোভাব সম্পর্কে বিশ্বের সকল মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানায়। আবুল ফতেহ ইরাক থেকে শুধু পালিয়ে আসেননি। রাষ্ট্রদূত হিসেবে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যেন বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) পাউন্ড জমা পড়ে। এটি ছিল মুজিবনগর সরকারের প্রথম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।[১০৭] পাকিস্তান কূটনীতিক মিশনে যে সকল বাঙালি কূটনীতিক কর্মরত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তারা পাকিস্তানের পক্ষ পরিত্যাগ করার প্রক্রিয়ায় বাগদাদ থেকে রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহও পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন। পাশাপাশি সাহসিকতার সঙ্গে যে কাজ করেছেন তার কার্যক্রম সমর্থনে করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, আবুল ফতেহ সময়োচিতভাবে শুধু বাংলাদেশ সরকারের আদেশ যথার্থভাবে পালন করেছেন। এটা বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত শেয়ারের একটি অংশ মাত্র।

---

[১০৫] K M Shehabuddin, *There and Back Again A Diplomat's Tale*, Dhaka: UPL, 2006. p. 79

[১০৬] শওকত ওসমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

[১০৭] *ওই*, পৃ. ৭৫; আবু সাইয়িদের বইয়ের সুত্রে জানা যায় যে, আবুল ফতেহ ৩৪ হাজার ইরাকি ডলার মুজিবনগর সরকারে পাঠিয়েছিলেন। আবার আবুল ফতেহ'র ছেলের বর্ণনায় জানা যায় যে, ২৮০০০ ডলার দূতাবাসের ব্যাংক হিসাব থেকে উত্তোলন করেছিলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই অর্থ বাংলাদেশ সরকারের এবং তা মুক্তিযুদ্ধে শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্য বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়। এই বিবৃতি প্রচারের পর পাকিস্তান সরকার তার দূতাবাসগুলোতে ব্যাপকহারে রদবদল করতে শুরু করে। এ রদবদলের প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নীকে দামেস্ক থেকে দিল্লি কনসাল জেনারেল, এএইচ খানকে ইস্তাম্বুল থেকে বৈরুতে, আজাহারুল আনোয়ার চৌধুরীকে দুবাই থেকে বৈরুতে, কাউন্সেলর মঞ্জুর চৌধুরীকে দুবাই থেকে বৈরুত, মাহবুবুল হককে তেহরান থেকে দিল্লি, ফজলুল করিমকে কায়রো থেকে বৈরুত, আহমেদ তারিক করিমকে তেহরান থেকে বৈরুত, মোহাম্মদ জামিরকে কায়রো থেকে বৈরুত, আফসারুল কাদেরকে আঙ্কারা থেকে বৈরুত, খাজা সারজিল হাসানকে আঙ্কারা থেকে বৈরুত, আবদুল মোমেন চৌধুরীকে দামেস্ক থেকে বৈরুত যেতে নির্দেশ প্রদান করে।[১০৮]

জাপানস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের পরও একই চিত্র দেখা যায়। জাপানের পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোতাহের হোসেন দেশত্যাগী বাঙালিদের কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরে জাপান সরকারের কাছে এক সরাসরি অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন যে, বৃত্তি নিয়ে পড়তে আসা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা যেসব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করছে তা বৃত্তির নীতি বহির্ভূত। তিনি আরো বলেন, মোমবুশো বৃত্তি নিয়ে পড়তে আসা বাঙালি ছাত্ররা বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশ সলিডারিটি লীগ গঠন করেছে।[১০৯]

দূতাবাসগুলোতে এসময় পাকিস্তানিরা বাঙালিদের সঙ্গে কূটকৌশল করে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতো তার প্রমাণ পাওয়া যায় কূটনীতিক আবুল ফজলের স্মৃতিকথায়। তিনি লিখেছেন- 'আমি ভেবে পেতাম না-গায়ে পড়ে এরা আমাদের সংগে এত খাতির জমাচ্ছেন কেন। অথচ অন্যান্য বাঙালী অফিসার ও তাদের পত্নীরা অনেক চেষ্টা করেও সামরিক বাহিনীর অফিসারদের সাথে অত ঘনিষ্ঠ হতে পারেন নি। কখনও ভাবতাম, আমি নিরিবিলি থাকি বলে বোধহয় ওরা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। আমার গতিবিধি, চিন্তাভাবনার খোঁজ রাখার জন্যই বোধহয় অত দহরম মহরম।'[১১০]

জাকার্তায় কূটনীতিক অঙ্গনে একটি ঘটনা ঘটে। যা দেখে বোঝা যায় বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিদের ব্যবহার কেমন ছিল। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসে আইপেকের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগ দেয় বাংলাদেশের বুলবুল একাডেমি অব ফাইন আর্টস এর শিল্পীরা। অনুষ্ঠান চলাকালে বাঙালি শিল্পীদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করেন রাষ্ট্রদূতের ব্যক্তিগত সচিব শাহেদ আলী। এমনকি কমার্শিয়াল সেক্রেটারির ব্যক্তিগত সহকারী একরাম আলীর মেয়েকে নিয়ে কটূক্তি করার অনুষ্ঠান শেষে একরাম আলীর ছেলে আলমগীর শাহেদ আলীর ওপর চড়াও হয়। নবম শ্রেণিতে পড়া একজন বাঙালি কর্মচারীর

---

[১০৮] K M Shehabuddin, *idid*, pp. 126-127

[১০৯] Sheikh Ahmed Jalal, *Japan Contribution in the Independece of Bangladesh*, Dhaka: Hakkani Publishers, 2002. p. 74

[১১০] আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

ছেলের মনেও সেদিন দেশপ্রেম লক্ষ করা যায়।[১১১] বাঙালি এমনকি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কেও পাকিস্তানিদের মনোভাব ছিল নেতিবাচক তার পরিচয় পাওয়া যায় কূটনীতিক আবুল ফজলের স্মৃতিকথায়।[১১২]

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় বার্মার জাতীয় দিবসের পার্টিতে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক এবং স্থানীয় বহু পদস্থ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের অনেক কূটনীতিক জাকার্তায় নিযুক্ত বাঙালি কূটনীতিক আবুল ফজল শামসুজ্জামান এর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতার তীব্র নিন্দা জানান। তাদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আবুল ফজলকে কিছুই বলতে হয়নি। তিনি বুঝতে পারলেন যে, পাকিস্তানের পরিস্থিতি তারা ভালোভাবে বুঝেন এবং একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে এ সম্বন্ধে তারা নিঃসন্দেহ ছিলেন।[১১৩] পঁচিশে মার্চের ঘটনার পর জাকার্তার পাকিস্তান দূতাবাসের অবস্থা ছিল থমথমে। পরের দিন রাষ্ট্রদূতের কক্ষে মিটিংয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাঙালি কূটনীতিকরা উপস্থিত হয়। কর্ণেল হাসান ঠোটের কোনে হাসি ফুটিয়ে বাঙালি কূটনীতিক আবুল ফজলকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভাইসাবকা কেয়া হাল হ্যায়!'। তার এই কথা ব্যঙ্গের মতো শোনায়। আবুল ফজল তার দিকে তাকাননি, কোনো কথাও বলেননি। সভায় কথাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন কথা হয়। সভায় উপস্থিত গাইয়ুর খান খুব চিন্তিত মনে বসেছিলেন। মিলিটারি শাসক গোষ্ঠীর হঠকারিতায় তিনিও হয়তো স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন। ভারতীয় হিন্দুদের ঠেস দিয়ে কথা বলতে লাগলেন কিন্তু বাঙালিদের বিরুদ্ধে বিরূপ কোনো মন্তব্য করেননি। আবুল ফজলের মতে, মনে মনে তিনিও বোধ হয় যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, অন্ততঃ লজ্জা বোধ করছিলেন।[১১৪]

১৫ এপ্রিল *জাকার্তা টাইমসে* Is Islam Dead শিরোনামে আবুল ফজলের একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে দূতাবাসের অভ্যন্তরেও প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়-

> অফিসে গিয়ে শুনি-এ্যামবাসাডার আর ডিফেন্স অফিসাররা নাকি হৈ চৈ শুরু করেছেন। লেখাটা তাদের মাথা হেট করে দিয়েছে। দি জাকার্তা টাইমস এখানকার একমাত্র প্রভাতী দৈনিক। প্রতিটি বিদেশী, অধিকাংশ ইংরেজী জানা ইন্দোনেশিয়ান কাগজটা পড়ে থাকে। আর সেই কাগজে ফলাও করে ছাপানো নিবন্ধে পাক-সরকারের বর্বরতা, পশ্চিম পাকিস্তানীদের অমানুষিক ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের কথা বলা হয়েছে। জাকার্তা টাইমস এর সম্পাদক নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন লেখাটা কোন বাঙালীর। জেনেশুনেই তিনি লেখাটা ছাপিয়েছিলেন।[১১৫]

পাকিস্তানের সামরিক সরকার সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে বাঙালি জাতির ওপর একটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। এ যুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিরোধ এবং মুজিবনগর সরকার গঠন হওয়ার সংবাদ বহির্বিশ্বে প্রচারিত হওয়ার পর তারা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। পাকিস্তান সরকার পাকিস্তান দূতাবাস মারফত প্রচার করতে শুরু করে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিমরা দেশভক্ত এবং পাকিস্তানের অনুরক্ত। গোলমাল করছে হিন্দুরা এবং হিন্দু আদর্শে প্রভাবান্বিত অন্যরা। আর তাদের উস্কানি দিচ্ছে, সাহায্য করছে ভারত সরকার ও ভারতের হিন্দু জনগণ। পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান করতে আন্তরিক চেষ্টা করছে।

---

[১১১] আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
[১১২] ওই, পৃ. ২৭
[১১৩] ওই, পৃ. ৩০
[১১৪] ওই, পৃ. ৩২
[১১৫] ওই, পৃ. ৩৫

পাকিস্তান সরকারের প্রচারিত এসব মিথ্যা বুলি অবশ্য ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় সাংবাদিকরা বিশ্বাস করতেন না এবং স্বাভাবিকভাবে তা ইন্দোনেশিয়ার সংবাদপত্রে তেমন স্থান পেত না। পাকিস্তান দূতাবাসের প্রেস বিজ্ঞপ্তি জাকার্তার খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য স্থানীয় পাকিস্তানিরা অনেক অর্থ ব্যয় করতেন। বিদেশি সংবাদ সংস্থা, বেতার সংস্থা, *টাইমস*, *নিউজউইক*, *ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ* প্রভৃতি ম্যাগাজিন তখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভয়াবহ পরিস্থিতির বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করতো। এসব তথ্যের প্রতিফলন দেখা যেত স্থানীয় সংবাদপত্রে। ইন্দোনেশিয়ার জনগণও সে খবর বিশ্বাস করতেন এবং বাংলাদেশের প্রতি তাদের সহানুভূতি প্রকাশ করতেন।[১১৬]

৩.৪ মুজিবনগর সরকার কর্তৃক বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তানের আনুগত্য পরিবর্তনের আহ্বান

মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে। প্রথমত, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সঠিক যুদ্ধকৌশল অবলম্বন এবং বহির্বিশ্বে জনমত সৃষ্টি। বর্হিবিশ্বে জনমত সৃষ্টির জন্য মুজিবনগর সরকার বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে ছিল- বিদেশে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট চিঠি পাঠিয়ে বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরা, মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিদের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ যাতে তারা বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি করতে পারে। এক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকারের লক্ষ্য ছিল ইউরোপ ও মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো। বাংলাদেশে যেহেতু ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বেশি তাই মুসলিম দেশগুলোর সমর্থন আদায় ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তৎকালীন বিশ্বে পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র হওয়ায় বিশ্বের বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো শুরু থেকেই পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়ে আসছিল। মুজিবনগর সরকার প্রশাসনের ক্ষেত্রেও দুটি বিষয়ের ওপর জোর দেয়। প্রথমত, বিদেশে পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে উৎসাহিত করণ; দ্বিতীয়ত, সরকারি কর্মচারীদের পাকিস্তান ত্যাগ করে মুজিবনগর সরকারে যোগদান করা। সরকারে যোগদান করলে তাদের ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়।[১১৭] এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করার পশ্চাতে অন্যতম কারণ ছিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করার পর লক্ষ করে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে বাঙালি কূটনীতিকসহ অনেক পদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। তাদেরকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কাজ করানো সম্ভব হলে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি সহজ হবে। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এর নজরে আসে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ শুরু করার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। কেননা ওয়াশিংটনে বাঙালি কূটনীতিকরা একজন প্রতিনিধিকে কলকাতায় পাঠায়। এ প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ওয়াশিংটনের সার্বিক অবস্থা মুজিবনগর সরকারের কাছে ব্যক্ত করেন। এজন্য তিনি মুজিবনগর সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় গঠনের পাশাপাশি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতি বেশি জোর দেন। মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য পাকিস্তান মিশনগুলোতে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের বেছে নেন। তাদের কাছে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করার বার্তা পাঠানো হয়। ক্ষেত্রবিশেষে আনুগত্য প্রকাশ করা সম্ভব না হলে যেন গোপনে বাংলাদেশ

---

[১১৬] আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮
[১১৭] আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৯

সরকার তথা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুজিবনগর সরকার পাকিস্তানি বাঙালি কূটনীতিকদের পক্ষ ত্যাগের বিষয়টিতে যে গুরুত্ব দেয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা অরুন্ধুতী ঘোষ এক সাক্ষাৎকারে। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কলকাতা শাখা কার্যালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি অরুন্ধুতী ঘোষ তাঁর সাক্ষাৎকারে জানান যে, বাঙালি ও পাকিস্তানি কূটনীতিক যারা বের হয়ে আসার জন্য ইচ্ছা পোষণ করতো তারা তাকে জানাতো। তিনি প্রথমে দিল্লিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তা অবহিত করতেন। বিশ্বের সকল দেশের ভারতের মিশনগুলোতে দিল্লি থেকে নির্দেশনা দেওয়া ছিল যে, যদি কোনো বাঙালি কূটনীতিক সহযোগিতা চায় তাকে না বলা যাবে না।[১১৮] ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ কর্মকর্তা আরো জানান যে, প্রতিনিয়ত যে নামগুলো পেতেন তাদের সাহায্য করতেন। তিনি জানিয়েছেন যে, তখন প্রচুর তরুণ বিশেষ করে জুনিয়র কূটনীতিক যারা বিদেশে কর্মরত ছিল তারাই বেশি আসতো। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সরকারের নিকট তাদের সম্পর্কে হ্যাঁ বা না বলার জন্য তালিকা পাঠাতো। সেখান থেকে তারা নির্বাচন করতো।[১১৯] তবে ভারতীয় এই কর্মকর্তার ওপর নির্দেশনা ছিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছ থেকে সব বিষয় পরিস্কারভাবে জেনে নেওয়া। কিন্তু তিনি এই প্রক্রিয়াকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ, তাকে সকল কিছুই নিয়মমাফিক বৈদেশিক অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন কলকাতা বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রধান হোসেন আলী, পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ এসব উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হতো। তবে সকল কিছু সম্পন্ন হতো প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সম্মতিতে এবং তাঁর অনুমোদনের ভিত্তিতেই সকল বড় বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো।[১২০]

মুজিবনগর সরকার এ কাজটিকে যে গুরুত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করে তার সমর্থন পাওয়া যায় আনিসুজ্জামানের বক্তব্যে। জুন মাসে এক আলাপচারিতায় মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জানিয়েছেন যে, 'দূতাবাসের সবার সঙ্গে যোগাযোগ আছে; সময় হলেই তারা আনুগত্য ঘোষণা করবেন।'[১২১]

মুজিবনগর সরকার এই কৌশল বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য বিদেশে একজন প্রতিনিধি পাঠানো স্থির করে। এক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হয় তরুণ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে। রেহমান সোবহানকে দুটি দায়িত্ব প্রদান করে একজন কূটনীতিকের মর্যাদায় বিদেশে প্রেরণ করা হয়। রেহমান সোবহানের ওপর অর্পিত দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানের কূটনীতিক মিশনে নিযুক্ত সকল বাঙালি অফিসারদের বোঝানো তারা যেন পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিশন চালানো যেখানে যোগ্যতম বাঙালি অফিসাররা কর্মরত রয়েছেন। কেননা তাদের পক্ষ ত্যাগ রাজনৈতিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ সেই সঙ্গে বাংলাদেশের জন্য স্বার্থ-সহায়ক হবে।[১২২] রেহমান সোবহান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর বাঙালি কূটনীতিক এনায়েত করিমের বাসায়

---

[১১৮] আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬৯-৬৭০
[১১৯] *ওই*, পৃ. ৬৭২
[১২০] *ওই*, পৃ. ৬৭৪
[১২১] আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩
[১২২] রেহমান সোবহান, *উতল রোমন্থন পূর্ণতার সেই বছরগুলো*, ভারত: সেইজ পাবলিকেশন্স, ২০১৮। পৃ. ৩৩৭

উপস্থিত হন। সেখানে তিনি মুজিবনগর সরকারের বার্তা তুলে ধরেন। তাদের করণীয় কী তা ব্যাখ্যা করেন। বাঙালি কূটনীতিকদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য ও বাঙালি কূটনীতিকদের মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল তা তিনি ব্যক্ত করেছেন-

> বেশ থমথমে ছিল সেই প্রথম রাতের পরিবেশ। এনায়েতের বাড়িতে যারা উপস্থিত ছিল সেই তারা পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ কর্মকর্তা। বেথেসডা, আলেকজান্দ্রিয়া এবং ম্যাকলিনে আরামপ্রদ বাড়িতে থাকার, তাদের ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুলে পড়ানোর জন্য পাকিস্তান সরকার তাদের মাইনে দিত এবং তারপরেও ছিল চাকরির নিরাপত্তা ও কেরিয়ারে উন্নতির সম্ভাবনা। সকলেই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা আমার পরিচিতির সূত্রে চিনত, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে আমার নৈকট্যের কথা জানত। সুতরাং তাদের অধিকাংশদের থেকে বয়সের ছোটো, তুলনায় কম পদ মর্যাদার এই আমাকে যতখানি প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক বেশি শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে তারা গ্রহণ করেছিল। . . . যখন বললাম তাজউদ্দীন তাদেরকে বাংলাদেশের স্বার্থে ভাগ্য সপে দিতে অনুরোধ করেছেন . . . চাকরি জীবনে যা কিছু তারা করেছে ওয়াশিংটন পৌছাতে সেসব বিপন্ন করুক তারা। . . . মিশনের বাঙালিরা সবাই ছিল অনুগত দেশপ্রেমী। স্বজনদের উপর পাকিস্তানি সেনার অত্যাচার তাদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল এবং সকলেই স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থানের বিষয়ে নীতিগতভাবে দায়বদ্ধ ছিল। তারা এও বুঝত যে বাংলাদেশের স্বার্থে দলবদ্ধভাবে তাদের আনুগত্য পরিবর্তন শুধু যুক্তরাষ্ট্রের জনমত নয়, বিশ্ব জনমতের উপরও শিহরণ জাগানো প্রভাব ফেলবে।[১২৩]

মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বাঙালি কূটনীতিকদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিলেও অনেকের মনে সংশয় ছিল যে, মুজিবনগর সরকার থেকে সরাসরি কোনো বার্তা তাদের কাছে পাঠানো হয়নি। মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন কামাল সিদ্দিকী। এছাড়া যারা বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করতে চাইতেন তাঁদের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন আদেশ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করতেন কামাল সিদ্দিকী।[১২৪] ইতিমধ্যে ৫ জুলাই মুজিবনগর থেকে বার্তা আসে পাকিস্তান দূতাবাসের সব বাঙালি কূটনীতিকদের কাছে। নিউইয়র্কের প্রাক্তন ভাইস কনসাল এ এইচ মাহমুদ আলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদের এই বার্তা সবাইকে বিতরণ করেন। তাতে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশ সরকার বিদেশে অনেকগুলো মিশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন তাদের জন্য প্রকাশ্যে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করার উপযুক্ত সময় এবং এইসব মিশনে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হবে। আনুগত্য পরিবর্তনের সম্মতি তারবার্তায় কলকাতার ৯ সার্কাস এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে পনের দিনের মধ্যে জানিয়ে দিলে তাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হবে। বাংলাদেশ সরকার তাদের সবাইকে উপার্জন ও চাকরির নিশ্চয়তা দিচ্ছে। স্থানীয়ভাবে সাহায্যের জন্য বন্ধুস্থানীয় মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়।[১২৫]

মুজিবনগর সরকারের এই বার্তা প্রেরণের সংবাদ যে সঠিক তার সমর্থন পাওয়া যায় একজন মার্কিন কূটনীতিকের বয়ানেও। তিনি তাঁর গ্রন্থে এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে-

> On July 5 Mujibnagar asked all Bengali diplomats posted abroad to transfer their allegiance. The Bangladesh government in exile decided to establish Bangladesh missions abroad and undertook to pay for the expenses of the missions and their staffs. The Bengali diplomats in the U.S. agreed to transfer their allegiance in the following month. On August 4 all the Bengali officers and staff

[১২৩] রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৮
[১২৪] কামাল সিদ্দিকীর সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ১৪১
[১২৫] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

in the Pakistan Embassy in Washington, the Pakistan Consulate General in New York and the Pakistan Permanent Mission in the UN in New York transferred their allegiance to Bangladesh.[১২৬]

বাংলাদেশ সরকার আনুগত্য পরিবর্তনের জন্য শুধু কূটনীতিকদেরই নির্দেশ দেয়। নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ছিল যে, কেউ যদি দূতাবাস ছেড়ে দেয় বা কাউকে যদি বরখাস্ত করা হয় তবে তাকে অবশ্যই কোনো না কোনো মিশনে নিযুক্ত করা হবে। এক্ষেত্রে সমস্যা ছিল দুই রকমের। প্রথমত, সকল দেশে মিশন স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। যেমন রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ ইরাকের রাজধানী বাগদাদ ছেড়ে লন্ডনে গিয়ে আনুগত্য পরিবর্তনের ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি ২১ আগস্ট এই পদক্ষেপ নেন এবং পরবর্তীতে মুজিবনগর গিয়ে সেখানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয়ত, টাকা পয়সারও একটি সমস্যা ছিল। বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ খুব সহজসাধ্য ছিল না এবং নানা কাজে তার প্রয়োজন ছিল। ভারত সরকারের কাছ থেকে একটি সাহায্য বৈদেশিক মুদ্রায় পাওয়া যাওয়ার পরই আনুগত্য পরিবর্তনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ জারি হয়। এতে বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে নিয়ে আসতে কয়েক মাস বিলম্ব হয়।[১২৭] বাংলাদেশ সরকার কূটনীতিকদের আনুগত্য যেমন আশা করেছিলেন তেমনি তার জন্য যথেষ্ট মূল্যও দেন। তবে সরকারিভাবে এসব বাঙালি কূটনীতিকদের দায়িত্ব নিতে মুজিবনগর সরকারের প্রথম দিকে অসুবিধা ছিল। জুন মাসে মুজিবনগর সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, বিদেশে কতগুলো মিশন স্থাপন করা হবে এবং সকল কূটনীতিকদের আনুগত্য ঘোষণার আহ্বান জানানো হবে। জনসংযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে এ রকম আনুগত্য ঘোষণা ছিল নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এতে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি গোষ্ঠীর ব্যাপক সমর্থন প্রকাশ পেতো।

দ্বিতীয়ত, এরা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জনমত গঠনে এবং প্রচারণায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারতেন।

তৃতীয়ত, কূটনীতিকদের পক্ষ ত্যাগে রণাঙ্গনের যোদ্ধা ও বন্দি বাংলাদেশে নিষ্পেষিত জনগণ ভরসা পেতো এবং উদ্‌বুদ্ধ হতো।[১২৮]

বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক আহ্বানের পূর্বেই অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করার পরপর এপ্রিল মাসে বেশ কয়েকজন বাঙালি কূটনীতিক আনুগত্য প্রকাশ করেন। এসব কূটনীতিকদের কর্মকাণ্ডে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে মুজিবনগর সরকার অন্যান্যদেরও আনুগত্য প্রকাশের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। জুলাই মাসে বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের নিকট সরকার আনুগত্য ঘোষণার জন্য যে চিঠি দেয় তাতে উল্লেখ করা হয়, আনুগত্য ঘোষণা করার পর তাদের পদ ও বেতন কাঠামো ঠিক রাখা হবে। জুলাই মাসে এ চিঠি প্রেরণের পর আগস্ট মাসে ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বাঙালি কূটনীতিক বাংলাদেশ পক্ষে যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর বাঙালি কূটনীতিকদের কত বেতন দেওয়া হয়েছিল তা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তবে এক্ষেত্রে শাহ এ এম এম কিবরিয়া তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন যে,

---

[১২৬] Archer K. Blood, *The Cruel Birth of Bangladesh: Memoirs of an American Diplomat*, Dhaka: UPL, 2002. pp. 320-321

[১২৭] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

[১২৮] ওই, পৃ. ৫৬

মুজিবনগর সরকার বাঙালি কূটনীতিকদের পূর্ণ বেতন-ভাতা দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু যুদ্ধাবস্থায় দেশের বিশেষ সংকটময় পরিস্থিতি বিবেচনা করে তারা তাদের বেতন-ভাতার ৬০% গ্রহণ করেছিলেন।[১২৯] একই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় বাঙালি কূটনীতিক মহিউদ্দিন আহমদ এর সাক্ষাৎকারে। তিনি জানিয়েছেন পাকিস্তান সরকার থেকে কূটনীতিকরা যে বেতন পেতেন তার ৬০ ভাগ বেতন মুজিবনগর সরকার পক্ষ ত্যাগকারী বাঙালি কূটনীতিকদের প্রদান করতেন।[১৩০] একে একে ইরাক, জাপান, নেপাল, আর্জেন্টিনাসহ বিভিন্ন দেশের বাঙালি কূটনীতিকগণ বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন করেন। প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ ও বেতন কাঠামো পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ঠিক রাখা হয়।[১৩১] অবশ্য মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর সময়কালীন মুজিবনগর সরকার পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষীকে বিদেশের বিভিন্ন পাকিস্তান দূতাবাস ও মিশনে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের নিকট সরাসরি বা স্থানীয় ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে বেশ কিছু চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠাতে বলে। এর ভিত্তিতে দিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান কে এম শিহাবুদ্দিন বাঙালি কূটনীতিকদের পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন।[১৩২] যেমন-

ক. প্রথম শ্রেণিভুক্ত (A Category) - যেসব বাঙালি কূটনীতিক শুরুর দিকে যোগাযোগ করেননি অথবা যারা যেসব দেশে অবস্থান করছিলেন সেখান থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেননি।

খ. দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত (B Category) - সেসব বাঙালি কূটনীতিকদের বর্তমান কর্মস্থল থেকে নির্ধারিত স্থানে গিয়ে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছিল অর্থাৎ পক্ষত্যাগ করার নির্দিষ্ট ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল।

গ. তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত (C Category) - যেসব বাঙালি কূটনীতিকদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে বলা হয়েছিল।

ঘ. চতুর্থ শ্রেণিভুক্ত (D Category) - এ পর্যায়ে ছিলেন সেসব কূটনীতিক যারা ইতিমধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন এবং তাদের সাত দিনের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

ঙ. পঞ্চম শ্রেণিভুক্ত (E Category) - এ পর্যায়ে ছিলেন সেসব কূটনীতিক যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করার প্রেক্ষিতে তাদেরকে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, এই পাঁচটি শ্রেণি বা ক্যাটাগরিতে কোন কোন কূটনীতিক ছিলেন তাদের নাম নিচের তালিকায় উল্লেখ করা হলো[১৩৩]-

---

[১২৯] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩

[১৩০] গবেষকের সঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মার্চ ২০১৮

[১৩১] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮। পৃ. ২২২-২২৩

[১৩২] K M Shehabuddin, *ibid*, pp. 126-127

[১৩৩] বিস্তারিত K M Shehabuddin, *ibid,* pp. 126-128

সারণি ৬: মুজিবনগর সরকার কর্তৃক আহ্বান করা বাঙালি কূটনীতিকদের তালিকা
প্রথম শ্রেণিভুক্ত (A Category)

ক্রমিক নং	বাঙালি কূটনীতিকদের নাম	পদমর্যাদা	কর্মস্থল
১.	মীর্জা রশিদ তালুকদার	রাষ্ট্রদূত	বৈরুত, লেবানন
২.	এ এইচ এস আতাউল করিম	কাউন্সেলর	রোম, ইতালি
৩.	এ কে এইচ মোরশেদ	কাউন্সেলর	ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া
৪.	খায়রুল আনাম	দ্বিতীয় সচিব	ব্রাসেলস, বেলজিয়াম
৫.	জিয়াউস শামস চৌধুরী	তৃতীয় সচিব	ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া
৬.	এস এম রাশেদ	তৃতীয় সচিব	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া
৭.	তোফায়েল করিম হায়দার	তৃতীয় সচিব	বন, পশ্চিম জার্মানি
৮.	এম রুহুল আমিন	তৃতীয় সচিব	বৈরুত, লেবানন
৯.	আমীর আনোয়ার সাদানী	তৃতীয় সচিব	বন, পশ্চিম জার্মানি

সারণি ৭: মুজিবনগর সরকার কর্তৃক আহ্বান করা বাঙালি কূটনীতিকদের তালিকা
দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত (B Category)

ক্রমিক নং	বাঙালি কূটনীতিকদের নাম	পদমর্যাদা	কর্মস্থল	পক্ষ ত্যাগ করার নির্দিষ্ট স্থান
১.	কামাল আহমেদ	রাষ্ট্রদূত	প্রাগ, চেক প্রজাতন্ত্র	লন্ডন, যুক্তরাজ্য
২.	বশিরুল আলম	রাষ্ট্রদূত	ওয়ারশ, পোল্যান্ড	লন্ডন, যুক্তরাজ্য
৩.	মোস্তফা কামাল	রাষ্ট্রদূত	সোফিয়া, বুলগেরিয়া	লন্ডন, যুক্তরাজ্য
৪.	এইচ কে পন্নী	রাষ্ট্রদূত	দামাস্কাস, সিরিয়া	নয়াদিল্লি, ভারত
৫.	এ এইচ খান	কনসাল জেনারেল	ইস্তাম্বুল, তুরস্ক	বৈরুত, লেবানন
৬.	আজহারুল আনোয়ার চৌধুরী	বাণিজ্য প্রতিনিধি	দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত	বৈরুত, লেবানন
৭.	মনজুর চৌধুরী	কাউন্সেলর	প্যারিস, ফ্রান্স	লন্ডন, যুক্তরাজ্য
৮.	মাহবুবুল হক	দ্বিতীয় সচিব	তেহরান, ইরান	নয়াদিল্লি, ভারত
৯.	ফজলুল করিম	দ্বিতীয় সচিব	কায়রো, মিশর	বৈরুত, লেবানন
১০.	মোহাম্মদ জমির	তৃতীয় সচিব	কায়রো, মিশর	বৈরুত, লেবানন
১১.	আহমেদ তারিক করিম	তৃতীয় সচিব	তেহরান, ইরান	বৈরুত, লেবানন
১২.	রেজাউল হোসেন	তৃতীয় সচিব	মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন	লন্ডন, যুক্তরাজ্য
১৩.	এম আফসারুল কাদের	তৃতীয় সচিব	আঙ্কারা, তুরস্ক	বৈরুত, লেবানন
১৪.	খাজা শারজিল হাসান	তৃতীয় সচিব	কায়রো, মিশর	বৈরুত, লেবানন
১৫.	আবদুল মোমেন চৌধুরী	দ্বিতীয় সচিব	দামাস্কাস, সিরিয়া	বৈরুত, লেবানন

সারণি ৮: মুজিবনগর সরকার কর্তৃক আহ্বান করা বাঙালি কূটনীতিকদের তালিকা
তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত (C Category)

ক্রমিক নং	বাঙালি কূটনীতিকদের নাম	পদমর্যাদা	কর্মস্থল
১.	এম. সলিমুজ্জামান	ডেপুটি হাইকমিশনার	লন্ডন, যুক্তরাজ্য
২.	আনোয়ারুল হক	রাষ্ট্রদূত	ডাকার, সেনেগাল
৩.	এম এম রেজাউল করিম	প্রথম সচিব	লন্ডন, যুক্তরাজ্য
৪.	হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী	কাউন্সেলর	নয়াদিল্লি, ভারত
৫.	রিয়াজ রহমান	প্রথম সচিব	নয়াদিল্লি, ভারত
৬.	ফারুক সোবহান	দ্বিতীয় সচিব	প্যারিস, ফ্রান্স
৭.	এ কে এম ফারুক	দ্বিতীয় সচিব	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
৮.	কিউ.এ.এম. আবদুর রহিম	তৃতীয় সচিব	টোকিও, জাপান
৯.	মাহবুবুল আলম	তৃতীয় সচিব	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড

সারণি ৯: মুজিবনগর সরকার কর্তৃক আহ্বান করা বাঙালি কূটনীতিকদের তালিকা
চতুর্থ শ্রেণিভুক্ত (D Category)

ক্রমিক নং	বাঙালি কূটনীতিকদের নাম	পদমর্যাদা	কর্মস্থল
১.	ওয়ালিউর রহমান	দ্বিতীয় সচিব	বার্ন, সুইজারল্যান্ড
২.	মুস্তফা কামাল	তৃতীয় সচিব	বন, পশ্চিম জার্মানি

সারণি ১০: মুজিবনগর সরকার কর্তৃক আহ্বান করা বাঙালি কূটনীতিকদের তালিকা
পঞ্চম শ্রেণিভুক্ত (E Category)

ক্রমিক নং	বাঙালি কূটনীতিকদের নাম	পদমর্যাদা	কর্মস্থল	নতুন কর্মস্থল
১.	মুস্তাফিজুর রহমান	দ্বিতীয় সচিব	কাঠমাণ্ডু, নেপাল	নয়াদিল্লি, ভারত
২.	আবদুল কাইয়ুম	দ্বিতীয় সচিব	কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর
৩.	আনোয়ার হাশিম	দ্বিতীয় সচিব	বেলগ্রেড, যুগোশ্লাভিয়া	লন্ডন, যুক্তরাজ্য
৪.	আমিনুল ইসলাম	তৃতীয় সচিব	কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর

এই পাঁচ শ্রেণিভুক্ত কূটনীতিকদের মধ্যে প্রথম চার শ্রেণির কূটনীতিকদের নিকট মুজিবনগর সরকার থেকে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল। প্রথম শ্রেণিভুক্ত (A Category) কূটনীতিকদের নিকট প্রেরিত টেলিগ্রামে উল্লেখ ছিল-

> Bangladesh Foreign Minister and Foreign Secretary have previously sent you letters giving instructions to you regarding declaration of allegiance to the Government of Bangladesh. Time is running out fast and you are urged to declare your allegiance without any further delay at your present place of posting where you should set up a nucleus of a mission. Friendly sources will arrange for alternative modest accommodation. Government guarantees existing condition of

service subject to usual terms and conditions. Please let us know the date you want to declare your allegiance.[১৩৪]

দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত (B Category) কূটনীতিকদের নিকট প্রেরিত টেলিগ্রামে উল্লেখ ছিল-

> Bangladesh Foreign Minister and Foreign Secretary have previously sent you letters giving instructions to you regarding declaration of allegiance to the government of Bangladesh. Time is running out fast and you are urged to declare your allegiance without any further delay. Please proceed to – and declare your allegiance there. Friendly sources at your post and at – will arrange for passage, incidentials and accommodation on timely notice. If your passport has been impounded, friendly source will provide travel documents. The government guarantees existing condition of service subject to usual terms and condition. Please let us know the date you want declare allegiance.[১৩৫]

তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত (C Category) কূটনীতিকদের নিকট প্রেরিত টেলিগ্রামে উল্লেখ ছিল-

> You have already been approached through authorized intermediaries to declare allegiance to Bangladesh Government. Your response or lack of it has not been viewed as satisfactory by the Bangladesh Government. You are therefore again requested to declare your alleigiance within seven days of the receipt of this communication. If you fail to comply with this request you will be entirely responsible for the consequences.[১৩৬]

চতুর্থ শ্রেণিভুক্ত (D Category) কূটনীতিকদের নিকট প্রেরিত টেলিগ্রামে উল্লেখ ছিল-

> Please declare your allegiance immediately and set up a Bangladesh mission at your present post. Advance will be available from friendly source to meet initial expenditure.[১৩৭]

৫ জুলাইতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ সকল বাঙালি কূটনীতিকদের আনুগত্য ঘোষণার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাতে তাদের চাকরির নিশ্চয়তা ছিল। ফলে এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কের অধিকাংশ কূটনীতিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। যারা অনেক আগে থেকেই মানসিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কাজ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক আহ্বানের অপেক্ষায় ছিলেন।

বেশিরভাগ বাঙালি কূটনীতিকরাই মুজিবনগর সরকার প্রদত্ত সময়সীমা ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে বাংলাদেশ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশ সরকারের আহ্বানে বা স্বপ্রণোদিত হয়েই বাঙালি কূটনীতিকরা বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য পোষণ করেন। মূলত তাদের এ প্রক্রিয়া চলেছে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু সেপ্টেম্বরের শেষে গিয়ে দেখা যায় যে, বিদেশের অনেক পাকিস্তান

---

[১৩৪] বিস্তারিত K M Shehabuddin, *ibid*, p. 126
[১৩৫] *Ibid*, pp. 126-127
[১৩৬] *Ibid*, p. 127
[১৩৭] *Ibid*, p. 127

দূতাবাসের পদস্থ কূটনীতিকরা তখনও বাংলাদেশ সরকারের আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তাদের প্রতি পুনরায় গোপন নির্দেশ জারি করে বাংলাদেশ সরকার। যার প্রমাণ পাওয়া যায় *বাংলার বাণী* পত্রিকায়। পত্রিকায় এ সম্পর্কে বলা হয় যে- ইসলামাবাদের যে সকল বিদেশি দূতাবাসে এখনও বাঙালি কূটনীতিকরা কর্মরত রয়েছেন তাদের প্রতি আগামী পনের দিনের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উক্ত নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, যে সকল বাঙালি কূটনীতিক আগামী পনের দিনের মধ্যে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে ব্যর্থ হবে তাঁরা দেশদ্রোহী বলে পরিগণিত হবেন।[১৩৮]

মুজিবনগর সরকারের আহ্বান সত্ত্বেও বেশ কিছু বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তানের প্রতি তাদের আনুগত্যের পুনরুল্লেখ করেন।[১৩৯] অভিজ্ঞ ও কৌশলী হিসেবে পরিচিত এসব কূটনীতিকগণ একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁদের কেউ কেউ মুজিবনগর সরকারকে জানায় যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের আনুগত্য স্বীকার না করে তাঁরা যদি পাকিস্তান দূতাবাসেই নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহলে পাকিস্তান সরকারের অনেক গোপন তথ্য বাংলাদেশের জন্য পাঠাতে পারেন।[১৪০] যুক্তিটা যে অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ ও আকর্ষণীয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ওই সংকট সময়ে বাঙালি কূটনীতিকদের গুরুত্বপূর্ণ ডেস্ক বা দপ্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া পাকিস্তানের সকল গোপন আলোচনা রাওয়ালপিণ্ডিতে হতো, কোনো বিদেশি দূতাবাসে নয়। স্বাভাবিকভাবে তাই একান্ত গোপনীয় সংবাদটি রাষ্ট্রদূত ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে জানার কথা নয়।

বাংলাদেশ সরকারের এই গোপন নির্দেশ সকল পাকিস্তানি দূতাবাসে প্রচার হওয়ার পর পিকিংস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের কে এম কায়সার ও ফিলিপাইনের পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নী পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। রাষ্ট্রদূত পন্নী জেনেভা, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে যোগাযোগ করেন। কে কবে নাগাদ ডিফেক্ট বা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করবেন তার একটা সময় জানতে চেষ্টা করেন। দিল্লিতে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতেন বলে তাঁকেও জোর তাগিদ দিয়েছিলেন কিন্তু ফল হয়েছিল বেশ পড়ে।[১৪১]

মুজিবনগর সরকারের আহ্বান সত্ত্বেও কেন বাঙালি কূটনীতিকরা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে বিলম্ব করে সে সম্পর্কে শিহাবুদ্দিন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে তিনি কয়েকটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত- অধিকাংশ কূটনীতিক পক্ষ ত্যাগ করতে ইতস্তত করেন কারণ তারা তাদের মর্যাদাশীল চাকরি হারাতে চাননি। এমনকি নিজের পরিবারকেও সংকটের মুখে ফেলে দিতে চাননি। দ্বিতীয়ত- বাংলাদেশ কবে পাকিস্তানিদের হাত থেকে দখলমুক্ত হবে কিংবা আদৌ স্বাধীন হবে কিনা তা নিয়ে তারা অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন। তৃতীয়ত- তারা নতুন গঠিত বাংলাদেশ সরকারের নিকট তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে নিশ্চয়তা আশা করছিল যেটি তারা পাকিস্তান মিশনে ভোগ করতো। চতুর্থত- কূটনীতিকদের মধ্যে

[১৩৮] *বাংলার বাণী*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
[১৩৯] জাওয়াদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১
[১৪০] মফিজ চৌধুরী, *বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায়*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯১। পৃ. ৫৪
[১৪১] *ওই*, পৃ. ৫৪-৫৫

একটি অংশ এখুনি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে যোগ না দিয়ে পাকিস্তান সমর্থক রাষ্ট্র বা রাজধানী যেমন চীন, জেদ্দা, তেহরান প্রভৃতি স্থানে তাদের বদলির চেষ্টা করে। পঞ্চমত- একটি দল কখনো বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে চায়নি। সর্বশেষ একটি দল বাংলাদেশ স্বাধীন হলে সেক্ষেত্রে নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা তাদের অনেকের পরিবার তখন পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল।[১৪২] এসব কারণগুলোর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ ত্যাগকারী বাঙালি কূটনীতিক এ এম এ মুহিতের ব্যাখার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বাঙালি কূটনীতিকদের নিয়ে আসার জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ যে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিলেন সে সম্পর্কে মূল্যায়ন করে বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন বলেছেন-

> I must state here clearly for the historical record that, in Bangabandhu's absence, Prime Minister Tajuddin played a very significant and effective role in every field of our liberation movement. He maintained close contact with freedom fighters working inside the country as well as with Bengali patriots engaged in the liberation efforts from outside Bangladesh. He arranged guerrilla training and weapons for our young men. A great statesman, he recognized the potential of the Bengali diplomats working in Pakistani missions abroad. Having appointed me as chief of our Delhi office, one of the many important tasks he entrused to me was to contact our diplomats in Delhi and other capitals with a view too making them defect and work for Bangladesh. Very much aware of the special significance of the Pakistan mission in Kolkata- given its proximity to Bangladesh, its spacious well-equipped building and office facilities, and its all-Bengali officers and staff- he had already taken it upon himself to persuade Deputy High Commissioner Hossain Ali to join the liberation movement with all his officers, staff, and the mission's physical assets.[১৪৩]

মুজিবনগর সরকারের আহ্বান সত্ত্বেও অনেক বাঙালি কূটনীতিক মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেননি। তারা অনেকেই দেশ স্বাধীনের পর বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন। সদ্য স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের অনেককে পুনর্বাসিত করেছিলেন। একজন কূটনীতিক হিসেবে একটি স্বাধীন দেশ কেন তাদের পুনর্বাসিত করলো এর পেছনে দুটি কারণ কে এম শিহাবুদ্দিন উল্লেখ করেছেন- প্রথমত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার সিভিল অফিসারদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে পুনর্বাসিত করে ও দ্বিতীয়ত, নতুন দেশে ব্যাপকভাবে অভিজ্ঞ অফিসারদের প্রয়োজন ছিল।[১৪৪]

৩.৫ বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ ও তাদের প্রতিক্রিয়া

মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করার পর বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল তা এক বার্তার মাধ্যমে বিশ্বের পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের কাছে পাঠানো হয়। এ প্রেক্ষিতে অনেক বাঙালি কূটনীতিক কোনো কিছুর পরোয়া না করেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করেন। আবার কেউ সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে পক্ষ ত্যাগে বিলম্ব করেন। বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের

---

[১৪২] K M Shehabuddin, *ibid*, pp. 116-117
[১৪৩] *Ibid*, p. 102
[১৪৪] *Ibid*, p. 125

এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এপ্রিল মাস থেকেই এবং তা বিজয় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আবার কেউ কেউ ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন। তাদের এ প্রক্রিয়াও অব্যাহত ছিল ১৯৭২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আনুগত্য পরিবর্তন করার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাঙালি কূটনীতিকরা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তা পাকিস্তানের কূটনীতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বপ্রথম আনুগত্য পরিবর্তন করেন কলকাতার পাকিস্তান দূতাবাসের ৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। মুজিবনগর সরকার গঠন হওয়ার পূর্বেই দিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের দুই জন বাঙালি কূটনীতিক সর্বপ্রথম তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করেন। তাদের কর্মে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকরা বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে আনুগত্য পরিবর্তন করতে থাকেন। বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ ও তাদের প্রতিক্রিয়া দেশ অনুযায়ী বিন্যস্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে।

ভারত

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসের প্রধান ছিলেন বাঙালি কূটনীতিক এম হোসেন আলী। তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি তাঁর দূতাবাসের উচ্চ পদস্থ চারজন বাঙালি কর্মকর্তাকে নিজ বাসভবনে ডেকে পাঠান এবং তাদের কাছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। এসময় তাঁদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য ছিল- 'Time comes when we have to take a vital decision & this was a watershed in our lives.'[১৪৫] ২৮ মার্চ প্রচারিত ইয়াহিয়া খানের ভাষণ শুনে মিসেস হোসেন আলী ভীত হয়ে পড়েন। তিনি নিজেদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানের তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক বলে মনে করতেন। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ কলকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাজউদ্দীন আহমদ তাঁকে বাংলাদেশের পক্ষে চলে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু হোসেন আলী প্রাথমিকভাবে ব্যাপারটি গুরুত্বের সঙ্গে নেননি। কেননা তিনি ততদিনে বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কোন পথে পরিচালিত হবে এসব সম্পর্কে তেমন বিস্তারিত কিছুই জানতেন না। এসময় পাকিস্তান সরকার তাঁকে রাওয়ালপিন্ডি বদলি করতে চাইলে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশ্য পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই বিদেশের মাটিতে পাকিস্তান দূতাবাসগুলোর ক্ষেত্রে এক ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছিল। যেসব পাকিস্তান দূতাবাসগুলো মুক্তিযুদ্ধকালীন বেশি স্পর্শকাতর ছিল এমনকি যেসব বাঙালি কূটনীতিকদের ব্যাপারে সন্দেহ ছিল তাদের অধিকাংশকে পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সংবাদ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জানতে পেরে ১৫ এপ্রিল হোসেন আলীর সঙ্গে দেখা করেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের একদিন পর ১৮ এপ্রিল পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী এবং আরো ৫ জন অফিসারসহ মোট ৬৫ জন

---

[১৪৫] The Diary of Hossain Ali

বাঙালি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন।[১৪৬] হোসেন আলী কলকাতাস্থ মিশনের পশ্চিম পাকিস্তানের ৩০ জন স্টাফ এবং কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেন।

এম হোসেন আলী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কীভাবে যোগ দিলেন এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন তাঁর ডায়েরিতে। এতে তিনি উল্লেখ করেছেন- মার্চের শেষ সপ্তাহে তিনি নিউইয়র্ক থেকে সিএসপি অফিসার হারুন অর রশিদের টেলিফোন পান। তিনি জানতে পারেন এম. এন. চৌধুরী নিউইয়র্কের পাকিস্তান কনস্যুলেট জেনারেল অফিসটিকে শীঘ্রই বাংলাদেশ মিশনে রূপান্তর করবেন। তাঁর পরামর্শে হোসেন আলী আমেরিকার ইস্ট পাকিস্তান লীগের নিকট একটি টেলিগ্রাম পাঠান। যার বক্তব্য ছিল শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এরপর তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে ভারত সরকার ও জনগণের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করেন। তিনি আশা করেছিলেন, খুব শীঘ্রই বাংলাদেশের একটি সরকার গঠিত হবে। যারা ভারত ও অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট স্বীকৃতি দাবি করবে এবং তখন তিনি নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন। ৩০ মার্চ তিনি নিজেকে বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে ঘোষণা করে তাঁর মিশনকে বাংলাদেশের মিশন রূপে পরিবর্তন করবেন। তিনি পাকিস্তানের দূতাবাসগুলোতে কর্মরত বাঙালি অফিসারদের নিকটও দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য টেলিগ্রাম পাঠানোর কথা চিন্তা করেন। অবশ্য এ ধরনের একটি টেলিগ্রাম তিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষীকে পাঠিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক সংবাদ বিবৃতি প্রচার করা হয় যে, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাজউদ্দীন আহমদের পরিচালনায় মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়েছে। হোসেন আলী মিশনে থাকাবস্থায় এসব অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করছিলেন। ৩১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে হরতাল পালিত হয়। এদিন কলকাতায় অনেক লোক সমবেত হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করছিলেন তারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। হোসেন আলী গোপনে তাঁর অফিসের একজন ব্যক্তিকে বাংলাদেশ থেকে আগত লোকদের নিকট থেকে প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য খোঁজ নিতে পাঠান। পাশাপাশি তিনি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটি সংযোগ তৈরির চেষ্টা করেন। এ সময় ভারতে প্রেসিডেন্টের শাসন অনুযায়ী বাংলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট অজয় কুমার মুখার্জীর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান রাজভবনে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে হোসেন আলী একজন পাকিস্তানি কূটনীতিক হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন। একজন বাঙালি হওয়ায় সেখানে কেউ তাঁকে বাংলাদেশ সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করেননি, যা তাঁকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে পারে। এসময় ভারতের যশোর সীমান্ত খুলে দেওয়া হয়েছিল। সাংবাদিকরা সে পথ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতো। হোসেন আলী বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারেন, তাজউদ্দীন আহমদ ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। সংবাদের সত্যতা যাচাই করার জন্য তিনি তাঁর এক অফিসারকে দায়িত্ব দেন। কিন্তু তিনি কোনো সংবাদ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে কিছুটা হতাশ হন। এসময় কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাস ভারতীয় গোয়েন্দা, নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশের নজরদারিতে ছিল। আওয়ামী লীগের একজন প্রতিনিধির নিকট হোসেন আলী জানতে পারেন যে, বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এক বা দুই দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হবেন একটি সরকার গঠনের

[১৪৬] সালাহ্উদ্দীন আহ্‌মদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭। পৃ. ২৪৮-২৪৯

জন্য। ৬ এপ্রিল হোসেন আলী নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে টেলিগ্রাম পান। সেখানে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে কী হচ্ছে তার ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হয়। এসময় পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিপরিষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভারত সরকারকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও বাংলাদেশের লোকদের সাহায্যের জন্য আড়াই লক্ষ রুপি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়। হোসেন আলী এই সময় তাঁর অফিসের দুইজন বাঙালি কূটনীতিক তৃতীয় সচিব নজরুল ইসলাম ও প্রেস এটাচি মাকসুদ আলীর বদলি সংক্রান্ত টেলিগ্রাম পান। পশ্চিম পাকিস্তানিদের সন্দেহ এড়াতে তিনি স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী টেলিগ্রামের উত্তর দিয়ে জানান যে, অফিসাররা মে মাসের শুরুর দিকে নতুন কর্মস্থলে যোগ দিবে। তিনি প্রত্যক্ষ করেন এই সময় বাঙালি অফিসারদের বিভিন্ন স্থানে বদলি করা হচ্ছিল। তিনি অফিস ছুটির পর প্রতিদিন তাঁর বাসায় বাঙালি অফিসারদের নিয়ে মিটিং করতেন। ইতিমধ্যে ৬ এপ্রিল দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব কে এম শিহাবুদ্দিন ও সহকারী প্রেস এটাচি আমজাদুল হকের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের সংবাদ পান। যা তাদেরকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। এই ঘটনার পর তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সকল অফিসারদের নিয়ে মিটিং করেন। অফিসাররা তাঁকে জানান যে, তিনি যে পদক্ষেপ নিবেন তারা তাতে সমর্থন দিবেন। দিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশন ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরে ‘defectio issue’তে একটি নোট পাঠায়। এর পরপর হোসেন আলী দিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে একটি টেলিগ্রাম পান। যেখানে উল্লেখ ছিল কে এম শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক তাঁর দূতাবাসের তিন জন বাঙালি অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে যাদের ইতিমধ্যে বদলির আদেশ হয়ে গিয়েছে। ৯ এপ্রিল তিনি ইসলামাবাদ থেকে প্রেরিত একটি টেলিগ্রাম পান। যেখানে কলকাতা দূতাবাসের বাঙালিদের সংখ্যা হ্রাসে তাঁর মন্তব্য জানতে চাওয়া হয়। ১২ এপ্রিল সিএসপি অফিসার কামালউদ্দিন সিদ্দিকী এম হোসেন আলীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে বলেন। তাঁর কাছে হোসেন আলী জানতে পারেন তাজউদ্দীন আহমদ ও এ এইচ এম কামরুজ্জামান এখন কলকাতায়। এছাড়া ১১ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত একটি ঘোষণার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে একটি সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকার বিশ্বের সকল স্বাধীনতাকামী মানুষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর নিকট বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানায়। এই সময় কামালউদ্দিন সিদ্দিকী মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে হোসেন আলীর সাক্ষাতের সময় ঠিক করেন। যা হয়েছিল ১৫ এপ্রিল। তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হোসেন আলীর ডায়েরি থেকে উদ্ধৃত করছি-

> I meet Mr. Tajuddin Ahmed at 7-30 PM at Park Circus Maidan. He was accompanied by Mr. Sardindu Chattopadhay of BSF. We drove to Outramghat & strolled.
> Mr. Tajuddin asks me to defect immediately without waiting to inform Bengali officers in other Missions for synchronization effect. He suggested that I fly the Bangladesh flag on 18 April. Later I learnt that 17 April was the day when the new Bangladesh Cabinet would be sworn in & the next day i.e. on 18 April, would be the correct date for me to transfer the allegiance of my Mission & myself to that Government duly installed.[১৪৭]

---

[১৪৭] The Diary of Hossain Ali

তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর হোসেন আলী তাঁর অফিসের বাঙালিদের জানান যে, তাজউদ্দীন আহমদ চাচ্ছেন তারা যেন ১৮ এপ্রিল পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন। তারা সকলে এ ব্যাপারে একমত হন। শুধুমাত্র প্রথম সচিব রফিকুল ইসলাম চৌধুরী প্রাথমিকভাবে ইতস্তত করছিলেন। কেননা তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা তখনও ঢাকায় ছিল। কিন্তু কোনো উপায়ও তাদের সামনে খোলা ছিল না। বাংলার মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে তারাও তাদের ভাগ্য জুড়ে দিয়েছিল। হোসেন আলী তাঁর অফিসারদের জানান যে, তাদের মিতব্যয়িতার সঙ্গে চলতে হবে। কেননা তাদের নিকট যে অর্থ আছে তা দিয়ে মিশন কার্যক্রম চলাতে হবে। এমনকি মুক্তিযুদ্ধ যতদিন চলবে ততদিন অফিসার ও কর্মচারীদের নূন্যতম সম্মানী দিয়ে তাদের সংসার খরচ চালাতে সহায়তা করতে হবে। ১৬ এপ্রিল হোসেন আলী পার্ক স্ট্রীটের বাফেট রেস্টুরেন্টে পুনরায় তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাজউদ্দীন আহমদকে অনুরোধ করেন, যেন বিশেষ বাহিনী দ্বারা কলকাতা মিশনের চারপাশ ঘিরে রাখা হয় যাতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা কোনো ধরনের ঘটনা না ঘটাতে পারে। হোসেন আলী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে জানান যে, তিনি চান দূতাবাসের ব্যাংক হিসাব থেকে সকল অর্থ তুলে আনতে ও নিজেদের প্রয়োজনে এটি ব্যবহার করতে। তাজউদ্দীন আহমদ তাঁকে এটি করতে বলেন তবে কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে নিষেধ করেন। যদি না পাওয়া যায় তাহলে বাংলাদেশ সরকার মিশনের কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয় বহন করবে বলে তাজউদ্দীন আহমদ জানান। এই সাক্ষাতের পর ফিরে এসে হোসেন আলী তাঁর বাঙালি সহকর্মীদের সঙ্গে পুনরায় বৈঠক করেন এবং তাদেরকে পক্ষ ত্যাগ করার বিস্তারিত পরিকল্পনার কথা জানান। এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে হোসেন আলী এত উত্তেজিত ও উদ্‌বিগ্ন ছিলেন যে তিনি রাতে ঠিকমত ঘুমাতে পারতেন না। ১৭ এপ্রিল হোসেন আলী দূতাবাসের তৃতীয় সচিব এ কে চৌধুরীকে দায়িত্ব দেন দূতাবাসের ব্যাংক হিসাব থেকে সাত লাখ টাকার মধ্যে চার লাখ উত্তোলন করে তাঁর হাতে দেওয়ার জন্য এবং বাকি তিন লাখ টাকা তাঁর ব্যক্তিগত হিসাবে স্থানান্তর করার জন্য। এই তিন লাখ টাকা পরবর্তীতে উত্তোলন করে নিরাপদে মিশনে নিয়ে আসা হয়েছিল। দূতাবাসের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনা নিয়ে অনেক বাঙালি উদ্‌বিগ্ন ছিলেন কিন্তু নীরব থাকা ব্যতীত তাদের কিছু করার ছিল না। ১৭ এপ্রিল রাত ৮ টায় হোসেন আলী মিশনের সেভ্রলেট গাড়ির চাবি পাকিস্তানি ড্রাইভারের কাছ থেকে নিয়ে তাকে চলে যেতে বলেন। প্রেস এটাচি মাকসুদ আলীকে দায়িত্ব দেন বাংলাদেশের একটি নতুন পতাকা সংগ্রহ করার জন্য। কিন্তু সংগ্রহ করা পতাকাটি ছিল আকারে বড় এবং পতাকার লাল অংশের মাপ সঠিক ছিল না। এমন অবস্থায় মিসেস হোসেন আলী সারারাত জেগে পতাকাটি ঠিক করেন।

১৮ এপ্রিল সকাল ৭ টার সময় দূতাবাসের সকল বাঙালি অফিসার ও কর্মচারী দূতাবাস প্রাঙ্গণে সমবেত হন। আনোয়ারুল করিম চৌধুরী বিনীতভাবে হোসেন আলীকে পতাকাটি এখনি উত্তোলন করতে নিষেধ করেন। তিনি তাঁকে নিজে গাড়ি চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট নিয়ে যান। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে সব ধরনের নিরাপত্তা ও কূটনীতিক শিষ্টাচার রক্ষা করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। পরবর্তীতে এই নিশ্চিতের বিষয়টি সুদৃঢ় করার জন্য হোসেন আলী রফিকুল ইসলাম চৌধুরীকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পুনরায় দেখা করেন। দুপুর ১২ টার সময় হোসেন আলী বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করতে

আদেশ দেন। কিন্তু সে সময় এক দমকা হাওয়া বয়ে যাওয়ায় তিনতলা বিল্ডিংয়ের পতাকা দণ্ড থেকে পাকিস্তানের পতাকাটি ছিড়ে নিচে পড়ে যায়। হোসেন আলী পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করার আদেশ দেন। বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করার সময় সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান জানান। একজন বাঙালি হিসেবে হোসেন আলীর কাছে সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল তিনি নতুন করে পুনর্জন্ম নিয়েছেন। বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করার পর হোসেন আলীর মনের অভিব্যক্তি ছিল- Immediately after the flying of the flag I started leading a new life, and somehow all my anxieties were gone.[১৪৮] এর পরপরই হোসেন আলী একটি সংবাদ বিবৃতি দেন যা তাঁর নির্দেশনায় আনোয়ারুল করিম চৌধুরী তৈরি করেছিলেন। কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে একযোগে ৬৫ জন বাঙালির বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সংবাদ শোনার পর উৎসুক জনতা দূতাবাসের সামনে ভিড় করতে থাকে। হোসেন আলী দূতাবাসের সদর দরজা খুলে দেওয়ার আদেশ দেন। প্রথমবারের মতো দূতাবাসের গেট সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এত লোক দূতাবাসে প্রবেশ করে যে, সকলের সঙ্গে হোসেন আলীর কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না। অল ইন্ডিয়া রেডিও হোসেন আলীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এমনকি মিসেস হোসেন আলী ও তাঁর দুই কন্যা সন্তানেরও সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। মিসেস হোসেন আলী সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন যা পরদিন পত্রিকার শিরোনাম আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি সাক্ষাৎকারে বলেন, পাকিস্তানি ইয়াহিয়া শাসক তাঁর দেশের নিরীহ জনগণের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদেরও হত্যা করেছে। এমন অবস্থায় তিনি হোসেন আলীকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। হোসেন আলীর দুই কন্যা জলি ও ইয়াসমিনও তাদের পাশে দাঁড়ানো ছিলেন। তারাও সংবাদ প্রতিনিধিকে জানান যে, তারা বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করবে এবং যত দ্রুত সম্ভব স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করবেন।

বাংলাদেশের পতাকা দেখে উত্তেজিত জনতা 'জয় বাংলাদেশ', 'জয় মুজিবুর' ও 'জয় হোসেন আলী' বলে স্লোগান দিতে থাকে। দূতাবাস ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বড় ছবি এবং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের ছবি ফুলের মালা দিয়ে সজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যার দিকে ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তরের আন্তঃ বিভাগীয় গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন হোসেন আলীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তারা পাকিস্তানি সাইফার কোড ভাঙ্গার ব্যাপারে হোসেন আলীর সহযোগিতা চান। পাশাপাশি তাদের হাতে সাইফার ডকুমেন্টস হস্তান্তর করার পরামর্শ দেন। কিন্তু এটি ছিল হোসেন আলীর জন্য একটি বড় আকারের মানসিক পরীক্ষা। শেষ পর্যন্ত হোসেন আলী তাদের নিকট কিছু সাইফার ডকুমেন্টস দিয়েছিলেন, সবগুলো নয়।[১৪৯] এই বক্তবের সমর্থন পাওয়া যায় মহিউদ্দিন আহমদ এর গ্রন্থেও।[১৫০]

---

১৪৮ The Diary of Hossain Ali

১৪৯ The Diary of Hossain Ali

১৫০ The Diary of Hossain Ali

বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর হোসেন আলী বাংলাদেশের জন্য স্বীকৃতি আদায় করা হবে তাঁর প্রথম কাজ বলে সংবাদ বিবৃতিতে উল্লেখ করেন। যদিও তিনি জানতেন এ কাজটি সহজ নয়। ১৯ এপ্রিল কলকাতা দূতাবাসের স্টাফ আলিমুজ্জামানের সহায়তায় এম হোসেন আলী ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন।
এম হোসেন আলী কীভাবে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন তার বর্ণনা দিয়েছেন গোলক মজুমদার। তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন-

> আমাদের হোসেন আলী সায়েব যিনি পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার ছিলেন, তিনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করতে লাগলেন। তিনি বললেন যে, কোনোদিকে তাকাতে পারছি না। কিন্তু আমার মন অন্যদিকে। তাজউদ্দিন সায়েব যদি আমাকে একবার বলেন তাহলে আমি চলে আসব। তাজউদ্দিন সায়েব তাকে বললেন, তার সঙ্গে একটা মিটিং হলো গোপনে। মিটিং হয়ে তাজউদ্দিন সায়েব তাকে বললেন এবং তিনি তখন বললেন যে, আমি চলে আসব। সেই সময়ে পাকিস্তানের পতাকা নেমে গেল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা উঠে পড়ল। আর গেটে যে সাইনবোর্ড ছিল সে সাইনবোর্ড পরিবর্তিত হয়ে ওখানে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' বলে সাইনবোর্ড লেগে গেল। এই ঘটনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানান জায়গায় যেখানে বাঙ্গালী ডিপ্লোম্যাটরা ছিলেন তারা সমস্ত ডিফ্যাক্ট করতে লাগলেন। তারা ডিফ্যাক্ট করে কলকাতায় চলে এলেন, অনেকে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন। তাদের সব ব্যবস্থা হল। তারা কীভাবে কাজ করবেন তার ঠিকঠাক নির্দেশনা।[১৫১]

মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এর একান্ত সহকারী ছিলেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম। তিনি তাজউদ্দীন আহমদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কলকাতায় পাকিস্তান মিশনের হোসেন আলীকে বাংলাদেশের পক্ষে আনা যায় কিনা। ফরিদপুর নিবাসী তাঁর আত্মীয় শহিদুল ইসলামের মাধ্যমে হোসেন আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। হোসেন আলী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজি হন। গঙ্গার তীরে একটি হোটেলে দু'জনের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এই সাক্ষাতের পর হোসেন আলী বাংলাদেশের পক্ষে আসতে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন।[১৫২]
ফারুক আজিজ খান তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কালীঘাটের হিন্দু সমাধিস্থলের পেছনে ডেপুটি হাইকমিশনারের কালো রঙের ডজ গাড়িতে বসে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে অনেক দর-কষাকষির পর হোসেন আলী আনুগত্য পরিবর্তন করতে সম্মত হন। বেতন-ভাতা, কূটনৈতিক সুবিধা, উপদূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়মুক্তি নিশ্চিত করে এবং দূতাবাসের ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত ৩০ লাখ রুপি হোসেন আলীর জিম্মায় রাখার ফলেই তিনি এতে রাজি হন।[১৫৩] উল্লেখ্য যে, হোসেন আলী তাঁর নিজের ডায়েরিতে উল্লেখ করেছেন তিনি দূতাবাসের ব্যাংক হিসাব থেকে ৭ লাখ টাকা তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু ফারুক আজিজের গ্রন্থে উল্লেখ আছে ৩০ লাখ রুপির কথা। দূতাবাসের ব্যাংক হিসাবে কত টাকা ছিল তা নিয়ে দু ধরনের বক্তব্য পাওয়া যাওয়ায় হোসেন আলীর ডায়েরিতে তিনি যেটি উল্লেখ করেছেন তা সঠিক ধরা হয়। এখানে কত টাকা নিয়ে হোসেন আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন তা মুখ্য নয়। মূলত তিনি ৬৫ জন বাঙালি সহকর্মীদের নিয়ে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছেন এবং কলকাতা দূতাবাসটি বাংলাদেশের দখলে চলে আসায় বিশ্ব পরিমণ্ডলে এক নব উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল।

---

[১৫১] গোলক মজুমদারের সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩৫-৬৩৬
[১৫২] আমীর-উল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি*, ঢাকা: কাগজ প্রকাশনা, ১৯৯১। পৃ. ৫৫
[১৫৩] ফারুক আজিজ খান, *বসন্ত ১৯৭১*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭ তৃতীয় মুদ্রণ। পৃ. ১১৮-১১৯

আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আবদুল মালেক উকিল তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, কীভাবে কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের উপ হাইকমিশনার এম হোসেন আলীকে বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসা হয়। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন-

> আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নড়াইলের তৎকালীন এম.পি.এ. মিঃ শহীদ ও তদানীন্তন পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব হোসেন আলীর বিশেষ সহকারী মিঃ জাকির আহমদ-এর সহায়তায় আমি হাইকমিশনারকে বাংলাদেশের পক্ষে ডিফেক্ট করার প্রস্তাব করি। তিনি প্রায় সব বাঙ্গালী কর্মচারীসহ ডিফেক্ট করতে রাজী হন। তবে তিনি সমস্ত কর্মচারীর নিরাপত্তা, ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য বিষয় আলোচনার জন্য সরাসরি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য একটি প্রস্তাব করেন। সে মতে আমি তাঁর পক্ষে এই প্রস্তাব নিয়ে ২/এ লর্ড সিনহা রোডে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করে একটি তৃতীয় স্থানে বৈঠকের ব্যবস্থা করি। ঐমতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে পার্ক সার্কাসের ৯নং এভিন্যুতে অবস্থিত পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার অফিস বাংলাদেশ মিশন হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[১৫৪]

ভারতীয় পূর্বাঞ্চলের সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব তাঁর গ্রন্থে হোসেন আলীর পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ সম্পর্কে উল্লেখ করেন- 'The staff (the Calcutta deputy high commission) agreed to come over provided they were guaranteed their future service, pay, allownaces and pensions. In mid-April I met Tajuddin and Nazrul Islam, who agreed to provide the required gurantees.'[১৫৫]

একজন কূটনীতিক মাত্রই বুঝতে পারেন কোন পরিস্থিতির কারণে আরেকজন কূটনীতিক পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেন। হোসেন আলীর সিদ্ধান্তহীনতার ব্যাপারে কে এম শিহাবুদ্দিন মন্তব্য করেন যে- It is quite likely that in those trying days following 26 March, he was simply overwhelmed by the enormity of having to decide on his own the fate of such a large office with its 70 officers and staff and their families, all of them Bengali. He had also received a threatening cipher telegram from the Pakistani Foreign Ministry, sternly warning him and his staff about any contact with us, the "traitors".[১৫৬]

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দিল্লির দুজন কূটনীতিকের পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য পরিবর্তনের কথা জানার পর থেকেই কলকাতা দূতাবাসের বাঙালিদের মধ্যেও প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। কলকাতা দূতাবাসের বাঙালিরা কী করবে তা নিয়ে তারা গোপনে আলোচনা করতে থাকেন। এ ব্যাপারে ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। যা করার সবাই একসঙ্গে করবো। ডেপুটি হাইকমিশনার কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু মন্ত্রীরা স্বাভাবিক কারণে দায়িত্ব এড়িয়ে যান। এসময়ই তাজউদ্দীন আহমদ গোপনে সংবাদ পাঠান হোসেন আলীর কাছে। গোপন সংবাদে বলা হয়, বিকেল চারটায় গড়ের মাঠে মনুমেন্টের কাছে মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। নির্দিষ্ট সময়ে তাজউদ্দীন আহমদ আসেন কিন্তু ময়দানে মানুষের ভিড় থাকায় তারা সেখান থেকে ডায়মন্ড হারবারে চলে যান। নিরিবিলি পরিবেশে একান্ত আলোচনা স্থায়ী

---

[১৫৪] আবদুল মালেক উকিলের সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ৩৮

[১৫৫] J F R Jacob, *Surrender at Dacca Birth of A Nation*, Dhaka: UPL, 1997. p. 118

[১৫৬] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 118

হয়েছিল প্রায় ৯০ মিনিট। তারপর দু'জনে তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে চলে যান। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের আগে হোসেন আলী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আনুগত্য পরিবর্তনের পরিকল্পনার কথা জানান।[১৫৭]

অন্য এক সূত্রে কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার এম হোসেন আলীর পাকিস্তানের আনুগত্য পরিবর্তন সম্পর্কে জানা যায় যে, ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। ১২ এপ্রিল বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেওয়া নড়াইলের সাবডিভিশনাল অফিসার কামালউদ্দিন সিদ্দিকী হোসেন আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জোর সুপারিশ করেন। ১৫ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় হোসেন আলী নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে পার্ক সার্কাস ময়দানে সাক্ষাৎ করেন। তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে ছিলেন বিএসএফের কর্মকর্তা শরবিন্দু চট্টোপাধ্যায়। সেখান থেকে তারা আউটরাম ঘাটে গিয়ে গেলর্ড রেস্টুরেন্টে আলোচনায় বসেন। তাজউদ্দীন আহমদ মিশনের সকল বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়ে অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের কথা বলেন। হোসেন আলী তখনো জানতেন না যে ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করবে। মিশনে ফিরে এসে হোসেন আলী বিষয়টি সহকর্মীদের জানিয়ে তাদের সম্মতি গ্রহণ করেন। এ সময় দূতাবাসে চারজন বাঙালি কর্মকর্তা এবং প্রায় ৬০ জন বাঙালি ও ৩০ জন অবাঙালি কর্মচারী কর্মরত ছিলেন।

১৮ এপ্রিল সকাল সাতটায় হাইকমিশনের সকল বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারী মিশনের মধ্যে একত্র হন। এ পর্যন্ত আনুগত্য পরিবর্তনের পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের মধ্যেই সীমিত ছিল। হোসেন আলীর কাছ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের ঘোষণা শুনে কর্মচারীদের অনেকেই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি সামাল দিতে হোসেন আলী দুই দফা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিবের সঙ্গে দেখা করেন। এদিকে সকাল থেকে বিএসএফের মহাপরিচালক কে এফ রুস্তমজী, ডেপুটি ডিরেক্টর গোলক মজুমদার ও রাজ গোপাল, মেজর জেনারেল নরেন্দর সিং দলবলসহ মিশনের আশপাশে গোপনে অবস্থান নিয়ে চারদিকে সতর্ক নজর রাখছিলেন। মিশনের মধ্যে সিদ্ধান্তহীনতা দেখে তারাও অস্থির হয়ে পড়েন। এভাবেই দুপুর প্রায় ১২টা বেজে যায়।

এরই মধ্যে শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। ঝড়ের দাপটে মিশনের ছাদে থাকা পাকিস্তানের পতাকা ছিঁড়ে ঝুলে পড়ে। এ ঘটনা হোসেন আলীর জন্য তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়। তিনি সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা মিশনের ছাদে উত্তোলন করেন। পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিএসএফের সদস্যরা মিশনের পাকিস্তানের নামফলক সরিয়ে বাংলাদেশের নামফলক লাগিয়ে দেয়। হোসেন আলী তাঁর অফিস কক্ষ থেকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও কবি ইকবালের ছবি সরিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কবি নজরুল ইসলামের ছবি স্থাপন করেন।[১৫৮]

---

[১৫৭] *দৈনিক সংবাদ*, ১০ মার্চ ১৯৯৭

[১৫৮] P.V. Rajgopal edited, *The British the Bandics the Bordermen From the Diaries and Articles of K.F. Rustamji*, Delhi: Wisdom Tree, 2009. pp. 309-312

১৮ এপ্রিল হোসেন আলী পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার পদে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় তাঁর অফিস ভবনের উপর বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি সমবেত সাংবাদিকদের বলেন, পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা অভিযান পরিচালনা করছে বলে তিনি বিভিন্ন সূত্রে খবর পেয়েছেন। তিনি সাক্ষাৎকারে বলেন- সকল ঘটনা, সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে পাকিস্তানি সরকার বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে গণহত্যা করে চলেছে, এই অবস্থায় পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব নয়। ১৬শ শব্দের এক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক রায় পাকিস্তান সরকার কীভাবে নসাৎ করে বাঙালি জাতিকে পদানত ও ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছে তা আজ স্পষ্ট।[১৫৯] বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর এম হোসেন আলী তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, তাঁর ৬০ জন বাঙালি কর্মচারীর সবাই 'উদ্দীপনার সঙ্গে' কাজ করছেন। তাঁরা তাঁদের বেতন হ্রাসেও প্রস্তুত। এম হোসেন আলীর ভাষায়, "আমাদের অনাড়ম্বরভাবে বাঁচতে হবে, বিলাসিতা আমাদের পোষায় না।"[১৬০]

২০ এপ্রিল পাকিস্তান সরকার হোসেন আলীকে উৎখাত করার জন্য ভারত সরকারের নিকট দাবি জানায়। ভারত সরকার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে।[১৬১] পাবনার তৎকালীন পুলিশ সুপার আর আই চৌধুরী (রফিকুল ইসলাম চৌধুরী) তখন কলকাতা পাকিস্তান মিশনে কর্মরত ছিলেন। কলকাতাস্থ পাকিস্তান মিশনের ৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য পোষণ করলেও তিনি করেননি। তিনি তাঁর বাসায় রয়ে যান কিন্তু মিশনে আসেননি। তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করার অন্যতম কারণ ছিল তাঁর স্ত্রী তখনও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। কিছুদিন পর তাঁর স্ত্রী কলকাতা আসার পর আর আই চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেন।[১৬২] উল্লেখ্য যে, রফিকুল ইসলাম চৌধুরী পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীর একজন অফিসার হিসেবে কলকাতাস্থ দূতবাসে গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি প্রাথমিকভাবে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন তাঁর পক্ষ ত্যাগ নিয়ে। পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্য হিসেবে ভারতের নজরদারিতে ছিলেন তিনি। কেননা তিনি পাকিস্তানের জন্য সকল গোপন সংবাদ ভারত থেকে সরবরাহ করতেন। কিন্তু কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের সকল বাঙালির পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করায় তাঁর সামনে দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা ছিল না। নতুন পরিস্থিতির জন্য তিনি নিজেই তৈরি হন। পাকিস্তান সরকার অবশ্য চেষ্টা করেছিল তাঁকে ফিরিয়ে নিতে কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় সেটি আর সম্ভব হয়নি।[১৬৩] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে বাঙালি উর্ধ্বতন কূটনীতিকদের মধ্যে হোসেন আলীর বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা ছিল এক দুঃসাহসিক কাজ। তিনি শুধু মাত্র কলকাতা বাংলাদেশে মিশনের প্রধানই ছিলেন না, তিনি পরিণত হয়েছিলেন নয়মাস

---

[১৫৯] আবু সাইয়িদ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতার কূটনৈতিক যুদ্ধ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪। পৃ. ৮৭

[১৬০] *কালান্তর* (কলকাতা), ২০ এপ্রিল ১৯৭১

[১৬১] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

[১৬২] আমীর-উল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭-৫৮

[১৬৩] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 117

ব্যাপী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান প্রেরণার উৎস। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় কলকাতার বাংলাদেশ মিশন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম প্রধান দুর্গে পরিণত হয়েছিল।[১৬৪]

১৮ এপ্রিল রবিবার দুপুর একটায় কলকাতার সার্কাস অ্যাভিনিউতে অবস্থিত পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশনের নাম পরিবর্তন হয়ে ভারতস্থ বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন দপ্তর নামে পরিচিত হয়। পাকিস্তানের পতাকার জায়গায় স্বাধীন বাংলাদেশের সবুজ, লাল ও সোনালী বর্ণ শোভিত পতাকা স্থান পায়। ডেপুটি হাইকমিশনার এম হোসেন আলী নিজে এই পতাকা উত্তোলন করেন। উল্লেখ্য যে, হাইকমিশন ভবনে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হলেও ৮ নম্বর থিয়েটার রোড ভবনে কোনো পতাকা উত্তোলন করা হয়নি। কেননা, ভারত ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি।[১৬৫] অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বাংলাদেশ ও তার সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তিনি সরকারের নতুন নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছেন বলে মন্তব্য করেন। স্বাধীন, সার্বভৌম এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ ও তার সরকার প্রতিষ্ঠার একদিনের মধ্যেই এই প্রথম পাকিস্তানের একটি বৈদেশিক দপ্তর ইয়াহিয়া খানের হাতছাড়া হয়। এম হোসেন আলী তাঁর এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ঘোষণা করে বলেন তিনি বা তাঁর অফিসের অন্য কোনো ব্যক্তি রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেননি এমনকি করার প্রশ্নই ওঠে না।[১৬৬] কলকাতার এ সংবাদ তখন লন্ডনের *সাপ্তাহিক জনমত* পত্রিকায়ও গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ পত্রিকায় লেখা হয়-

> কলকাতা থেকে খবর পাওয়া গেছে যে, সেখানকার সহকারী পাকিস্তানী দূত নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আস্থা স্থাপন করে সেখানে বাংলাদেশ সরকারের দূত হিসেবে কাজ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। আরও জানা গেছে যে, তিনি বাংলাদেশ দূতাবাস ভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছেন এবং বাংলাদেশের দূত হিসেবে স্বীকৃতি দাবি করেছেন।[১৬৭]

পাকিস্তান সরকার বিষয়টি সম্পর্কে পূর্বেই অবগত থাকায় মিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অবিলম্বে ইসলামাবাদে ডেকে পাঠায়। কিন্তু তার পূর্বেই বাঙালিরা সবাই একযোগে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে। কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাস হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তান সরকার তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এ সময় পাকিস্তান সরকার মেহেদী মাসুদকে কলকাতায় নতুন ডেপুটি হাইকমিশনার নিযুক্ত করে এবং ডেপুটি হাইকমিশন অফিসটির দখল তাকে দেওয়ার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করে। পাকিস্তান সরকারের এ অনুরোধের জবাবে ভারত সরকার জানায়, এটি একটি ভাড়া করা বাড়ি। কাজেই এ সম্বন্ধে তারা কিছু করতে অক্ষম।[১৬৮] এ সংক্রান্ত পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে যোগাযোগ হয়েছিল সে সম্পর্কে হোসেন আলী তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন-

---

[১৬৪] শামসুল হুদা চৌধুরী, *একাত্তরের রণাঙ্গন*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২। পৃ. ৮২

[১৬৫] ফারুক আজিজ খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

[১৬৬] *কালান্তর* (কলকাতা), ১৯ এপ্রিল ১৯৭১

[১৬৭] ফারুক আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫

[১৬৮] আবদুল হক, *লেখকের রোজনামচা চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ* ১৯৫৩-১৯৯৩, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৬। পৃ. ২২০

Pak threatens India with 'serious consequences' if premises of my Mission was not cleared of 'illegal occupants'. India took the stand that this was 'internal affairs of Pakistan.' Indian laws did not permit use of force with regard to eviction of tenants.[১৬৯]

হোসেন আলীর পরিবর্তে পাকিস্তান সরকার মেহেদী মাসুদকে কলকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনার পদে নিয়োগ দেয়। কিন্ত তিনি হাইকমিশনার হিসেবে কলকাতায় যোগদান করতে ব্যর্থ হন। মেহেদী মাসুদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কে এম শিহাবুদ্দিন বলেন- On 18 April 1971, Masud was sent to recover the Pakistan Deputy High Commissioner building and properties, A decent man not really fit for such a difficult task in the hostile, anti-Pakistan environment of Kolkata, the had to remain confirmed to his hotel room because of the blockade of the hotel by expatriate and local Bengalis. The poor man almost starved to death because the hotel staff refused to serve him food and beverages![১৭০] উল্লেখ্য যে, ভারতের বহিঃরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে হোসেন আলীকে একটি সংবাদ বিবৃতি দেওয়ার জন্য বলা হয়। যেখানে ভারতীয় জনগণের প্রতি আবেদন থাকবে মেহেদী মাসুদের বিরুদ্ধে যেন কোনো শোভাযাত্রা না হয়। কিন্তু মুজিবনগর সরকার এ ধরনের বিবৃতি দিতে সম্মত হয়নি।[১৭১]

আনুগত্য প্রকাশের পাশাপাশি এম হোসেন আলী সাহসিকতার সঙ্গে যে কাজ করেছেন সে সম্পর্কে বি বি বিশ্বাস বলেন, পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধে যে সহযোগিতা করেছেন তা অত্যন্ত মূল্যবান মূলধন হয়ে দাঁড়ায়। এতে কলকাতায় বাঙালিদের নিজস্ব একটি সরকারি কার্যালয় পাওয়া যায়। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হোসেন আলী তাঁর দূতাবাসের জন্য পাকিস্তান সরকারের বরাদ্দকৃত সকল টাকাই প্রকাশ্যে আনুগত্য স্বীকার করার একদিন আগেই ব্যাংক থেকে উঠিয়ে নিয়ে নতুন ব্যাংক এর নতুন হিসাবে জমা রেখেছিলেন। পাকিস্তান সরকারের চিঠি ব্যাংকে আসার পর দেখা যায় যে, ইতিপূর্বেই সেখান থেকে টাকা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। হোসেন আলীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর অফিসের সকল বাঙালিও বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে কাজকর্ম শুরু করেন। কতিপয় পাকিস্তানি আমলা যারা এই দূতাবাসে চাকরি করছিলেন তাদেরকে এখানে আর ঢুকতে দেওয়া হয়নি।[১৭২]

কলকাতার এই ঘটনার পর বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ভারতে বাংলাদেশ হাইকমিশনার পদে এম হোসেন আলীকে নিযুক্ত করা হয়েছে। এ মিশনের নাম দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ হাইকমিশন। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতার পূর্বে দিল্লিতে বাঙালি দুই জন কূটনীতিক পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করায় স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, শিহাবুদ্দিনকে বাদ দিয়ে কেন হোসেন আলীকে কলকাতা মিশনের প্রধান নিযুক্ত করা হলো? এর উত্তর অবশ্য দিল্লির কূটনীতিক শিহাবুদ্দিন নিজেই দিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি কে এম

---

[১৬৯] The Diary of Hossain Ali
[১৭০] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 68
[১৭১] The Diary of Hossain Ali
[১৭২] বি বি বিশ্বাস, *একাত্তরে মুজিবনগর*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪। পৃ. ৩৩

শিহাবুদ্দিন দিল্লিতে প্রেসক্লাব অব ইন্ডিয়ার এক মধ্যাহ্নভোজ অনুষ্ঠানে বলেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ এ যোগ দিবে। এই কারণেই হোসেন আলীকে ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার রূপে নিয়োগ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কে এম শিহাবুদ্দিন বলেন, এতে নব-সৃষ্ট বাংলাদেশের নানাদিক দিয়ে সুবিধে হবে।[১৭৩]

কলকাতায় বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা ও হোসেন আলীকে হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগের ব্যাপারে *বাংলার বাণী* যে সংবাদ প্রকাশ করে–

> কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশন এখন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ হাইকমিশনের মর্যাদা অর্জন করিয়াছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে এই মিশনকে ভারতে বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ হাইকমিশনের মর্যাদায় উন্নীত এবং মিশনের প্রধান জনাব হোসেন আলীকে ভারতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।
>
> ওয়াকেবহাল মহলের মতে ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়ক পরিকল্পনা সেলের চেয়ার মিঃ ডি ডি ধরের সহিত মুজিবনগরের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্রদের যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, উহার পরিপ্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কূটনৈতিকমহল কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনকে পূর্ণাঙ্গ হাইকমিশনে রূপান্তরীত করার এবং জনাব হোসেন আলীকে ভারতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের হাইকমিশনার পদে উন্নীত করণের সিদ্ধান্তের উপর গভীর কূটনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন।
>
> উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে ইহাই প্রথম হাই কমিশন।[১৭৪]

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি কূটনীতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি অবস্থানে ছিল। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ২৫ মার্চের পর থেকে ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে কলকাতায় সমবেত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুক্তিযুদ্ধে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানান। ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন তৈরি করার জন্য তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে একটি প্রবাসী সরকার গঠন করেন। যা মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। ভারতের অভ্যন্তরীণ ভূখণ্ডে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কৌশল প্রণয়ন ও নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য তাজউদ্দীন আহমদ সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। এজন্য প্রথমেই মনোযোগী হন ভারতের কলকাতা ও রাজধানী নয়াদিল্লিতে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসগুলোর ব্যাপারে। এ দুটি দূতাবাসে যে সকল বাঙালি কর্মরত ছিলেন তাদেরকে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয় পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের। কিন্তু মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পূর্বেই ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন[১৭৫] ও প্রেস এটাচি আমজাদুল হক ৬ এপ্রিল পাকিস্তান সরকারের চাকরি থেকে প্রকাশ্যে ইস্তফা প্রদান করেন। অবশ্য কে এম শিহাবুদ্দিনের নিকট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল- ‘The news of the 25-26 March Pakistani

---

[১৭৩] *বিপ্লবী বাংলাদেশ*, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

[১৭৪] *বাংলার বাণী*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

[১৭৫] কে এম শিহাবুদ্দিন দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসে যোগ দেন ১৯৬৮ সালে।

crackdown and the declaration of independence did not come as a complete surprise.'[১৭৬] কে এম শিহাবুদ্দিন কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন সে সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, মুক্তিযুদ্ধের সূচনা সময়ে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী বুলবুল শিহাবুদ্দিন প্রতি সন্ধ্যায় বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, অল ইন্ডিয়া রেডিও শুনতেন এবং এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ জানার চেষ্টা করতেন। এছাড়াও তারা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তথ্য জানার জন্য বিদেশি পত্রিকাগুলোর ওপর চোখ রাখতেন। পঁচিশে মার্চ রাতের ঘটনা জানার পর তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি আর পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি করবেন না। পাকিস্তান সরকারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কূটনীতিক ফ্রন্টে যোগদান করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন।[১৭৭] এ ব্যাপারে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য মার্চের শুরু থেকেই ভারতীয় নীতি নির্ধারক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে শক্ত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি দিল্লিতে অবস্থিত কূটনীতিক মহলের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রেডিওতে স্বাধীনতার ঘোষণা শোনার পর তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন যে, এখন আর তাদের কূটনীতিক পরিচয়ে এক মুহূর্ত অলস সময় কাটানো যাবে না। যেখানে দেশের মাটিতে হাজার হাজার ভাই-বোন নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হচ্ছে, গণহত্যার শিকার হচ্ছে। এসময় তিনি ভারতীয় সাংবাদিক দিলীপ মুখার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।[১৭৮] নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে কে এম শিহাবুদ্দিন স্থির করেন তিনি ২৮ মার্চ পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত চাকরি পাকিস্তান হাইকমিশন এর দায়িত্ব ছেড়ে দিবেন। কে এম শিহাবুদ্দিনের পক্ষে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়েছিল তাঁর স্ত্রী বুলবুল শিহাবুদ্দিনের সহযোগিতার ফলে। এ ব্যাপারে তাঁদের দুজনের বক্তব্য ছিল- `We should do whatever was right for the people of East Pakistan.'[১৭৯] দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের সহকারী প্রেস এটাচি আমজাদুল হকও এসময় কে এম শিহাবুদ্দিনের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং কে এম শিহাবুদ্দিনকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেন।[১৮০] মার্চের শেষ সপ্তাহে ২৮ মার্চ কে এম শিহাবুদ্দিন ভারতের বহিঃরাষ্ট্র বিষয়ক দপ্তরের পাকিস্তানের দায়িত্বে থাকা যুগ্ম সচিব এ কে রায় এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, বাংলাদেশের হয়ে দিল্লিতে বসে কাজ করার অনুমতি গ্রহণ। এ লক্ষ্যে এ কে রায় এর সঙ্গে সার্বক্ষণিক্ষ যোগাযোগ করেন এবং তাঁর অনুমতির ব্যাপারে ভারত সরকারের ইতিবাচক মন্তব্যের জন্য চেষ্টা করেন। সাক্ষাতে এ কে রায় শিহাবুদ্দিন কে জানান যে, ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিসংগ্রামের অগ্রগতি দেখে অবাক হয়েছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই ভারত এ সংকট নিয়ে তাদের নীতি নির্ধারণ করবে। এসময়ই শিহাবুদ্দিনের প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কূটনীতিক সম্পর্ক থাকায় ভারত উদ্ভুত সংকট নিয়ে রাজনৈতিক ও কূটনীতিক দিক বিবেচনা করে শিহাবুদ্দিনকে ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার অনুমতি প্রদান করবে। উল্লেখ্য যে, এ কে

---

[১৭৬] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 70
[১৭৭] *Ibid*, p. 70, 75
[১৭৮] *Ibid*, p. 76
[১৭৯] *Ibid*, p. 77
[১৮০] গবেষকের সঙ্গে আমজাদুল হক এর সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯

রায় মুক্তিযুদ্ধকালীন কলকাতায় একজন পূর্ণ সচিব হিসেবে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের লিয়াঁজো হিসেবে কাজ করেছেন।[১৮১] এ সাক্ষাতের পর কে এম শিহাবুদ্দিন বারবার ভারত সরকারের নিকট তাঁর আবেদনের ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছিলেন। এমনকি তিনি ভারত সরকারকে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। অবশেষে ভারত সরকার কে এম শিহাবুদ্দিনের অনুমতি প্রার্থনা জোর তাগিদ সম্পর্কে বুঝতে পারে এবং ৫ এপ্রিল তাঁকে ভারতের মাটিতে বসে বাংলাদেশের হয়ে কাজ করার অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু একটি শর্ত দেয় যে- এমন কোনো রাষ্ট্রীয় পরিপন্থি কাজ করা যাবে না যাতে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের কূটনীতিক সম্পর্ক কোনো ধরনের হুমকির সম্মুখীন হয়।[১৮২] ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়ার পর কে এম শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক বিলম্ব না করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। ২৮ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল কী করেছেন সে সম্পর্কে কে এম শিহাবুদ্দিন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন-

> After my meeting with Ray on 28 March, we had to wait several days before we could formally declare our allegiance to Bangladesh, following the completion of formalities with the Indian government. We were finally able come out into the open on 6 April 1971. Again, we had to wait another week before we could begin any real activities, this time pending the formation of the Bangladesh Government. On 13 April, the Bangladesh government was formally set up, and we were then all ready to begin work.[১৮৩]

ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়ার পর কে এম শিহাবুদ্দিন কীভাবে নিজেকে এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কোনোরকম সন্দেহ ব্যতীত পাকিস্তান হাইকমিশন তথা হাইকমিশন প্রাঙ্গণে অবস্থিত বাসা থেকে বের হয়ে যাবেন তার একটি পরিকল্পনা করেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী বাসার সকল কিছু গুছিয়ে নেন। এসময় তাঁদের মনে ছিল- ‘We were joining the War of Liberation, not on the frontline or inside Bangladesh where bullets were being exchanged; but an elusive frontline of words and ideas, with some personal risk, and a great deal of uncertainty.’[১৮৪] পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পূর্বে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য কে এম শিহাবুদ্দিন ও ত্াঁর স্ত্রী নিকটস্থ কৈলাস এন মার্কেটে যান। সেখানে গিয়ে কেনাকাটার এক পর্যায়ে মূল্য পরিশোধ করার সময় দেখতে পান একজন পাকিস্তানি অফিসার মার্কেটে পায়চারি করছে। পাকিস্তানি গোয়েন্দা তাদের ওপর নজরদারি করছে এটা তারা বুঝতে পারেন। বাসা গোছানো কাজ শেষ করার পর একজন অতিথি আসেন। পাকিস্তান সামরিক গোয়েন্দার প্রধান যিনি দিল্লিস্থ দূতাবাসে দায়িত্বে ছিলেন। তিনি শিহাবুদ্দিনের বাসায় আসেন গল্প করতে। তারা তাঁকে ড্রয়িংরুমে বসতে দেন এবং কিছুক্ষণ গল্প করে তিনি চলে যান। এসময় তাঁদের হৃস্পন্দন বেড়ে যায়। কিন্তু আগন্তুক কোনো কিছু সন্দেহ না করায় তারা চিন্তামুক্ত হন।[১৮৫] সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর ৬ এপ্রিল কে এম শিহাবুদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী এবং তাদের দুই কন্যা সন্তানকে নিয়ে পাকিস্তান

---

[১৮১] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 77-78
[১৮২] *Ibid*, p. 80
[১৮৩] *Ibid*, pp. 78-79
[১৮৪] *Ibid*, P. 80
[১৮৫] *Ibid*, pp. 80-81

সরকারের চাকরি ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। তাদের সঙ্গে যোগ দেন আমজাদুল হক। দিল্লির এই দুই জন বাঙালি কূটনীতিকের পাকিস্তান সরকারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কূটনীতিক ফ্রন্টের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু কে এম শিহাবুদ্দিন আশঙ্কায় ছিলেন যে, শেষ মুহূর্তে হয়তো পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়ে যাবেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-

> Bulbul and I knew that from the moment we left the High Commission, we were choosing a path strewn with grave personal risk and much uncertainty. Bulbul, our two little girls and I left our residence quietly around 10 p.m. and drove to a predetermined location near a newly built cinema hall named Paresh. In true 007 styles, we quickly changed our cars to confuse any Pakistani intelligence people on our trail. We were surprised to see Mehdi Masud loitering in front of the cinema hall although we knew that he was a great fan of Indian films; luckily he did not see us. After driving for an hour in and around Delhi, we arrived at a house in a desolate area near Qutb Minar for temporary residence, out of the reach of Pakistani intelligence.[১৮৬]

রাত বারোটার সময় কে এম শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক গ্রেট কৈলাসে অবস্থিত সাংবাদিক দিলীপ মুখার্জীর বাড়িতে উপস্থিত হন। তিনি তাঁদের জন্য দিল্লির লোদী হোটেলে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। যেখানে সমবেত হয়েছিল বিবিসি, এএফপি, ইউপিআই, তাস, পিটিআই, ইউএনআই ও কিছু ভারতীয় দৈনিকের সাংবাদিকরা। সংবাদ সম্মেলনটি নিরাপত্তার কারণে মধ্যরাতে অল্প সময়ের নোটিশে আহ্বান করা হয়েছিল।[১৮৭] বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর এক সংবাদ বিবৃতিতে কে এম শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক যৌথ বিবৃতিতে জানান-

> . . . ইসলামাবাদের ফ্যাসিবাদী সামরিক একনায়কত্বের সঙ্গে আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করেছি। আমাদের বিবেকের নির্দেশে ইসলামাবাদের চাকরি আমরা ত্যাগ করলাম। বাংলাদেশের পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা দখলদার বাহিনী ছাড়া কিছুই নয়।
> এখন থেকে আমরা বাংলাদেশের কাছেই আমাদের আনুগত্য জানাচ্ছি। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সুস্পষ্ট নির্দেশেই বাংলাদেশ সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। আমরা পৃথিবীর সব সভ্য মানুষের কাছে সহানুভূতি ও সুনির্দিষ্ট সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। পৃথিবীর সব দেশকেই আমরা আবেদন করছি-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিন।
> আমাদের অনুরোধেই ভারত সরকার আমাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সার্বভৌম সরকারের নেতৃবৃন্দের নির্দেশিত পথ অনুযায়ী আমাদের দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে আমরা শীগগিরই ফিরে আসছি! জয় বাংলা।[১৮৮]

দিল্লির দুই জন বাঙালি কূটনীতিকের পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগের সংবাদ জানার পর অচিরেই পাকিস্তান বিশেষ করে দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের প্রতিক্রিয়া জানা যায়। ৬ এপ্রিল মধ্য রাতে ঘুম থেকে ওঠে এই সংবাদ শোনার পর হাইকমিশনার সাজ্জাদ হায়দার চ্যান্সেরিতে ছুটে যান এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে দূতাবাসের লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। চ্যান্সেরিতে পৌঁছে তিনি এস.ও.এস বার্তার মাধ্যমে তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিকভাবে আসতে বলেন। তিনি তাদের সঙ্গে রাত দুইটার সময় বৈঠক করেন। যেখানে দুজন বাঙালি কূটনীতিকের পাকিস্তানের চাকরি ত্যাগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এমনকি তিনি এরকম দুঃখজনক সংবাদ দেওয়ার জন্য ইসলামাবাদে পররাষ্ট্র সচিবকে টেলিফোন

[১৮৬] K M Shehabuddin, *ibid*, pp. 81-82
[১৮৭] *Ibid*, p. 82
[১৮৮] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৬৮১

করেন। তারা সবাই হতবিহ্বল হয়ে যান এবং এটিকে তারা তাদের দূতাবাসের গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা হিসেবে উল্লেখ করেন। টেলিফোনের মাধ্যমে পররাষ্ট্র সচিব ও হাইকমিশনার কিছু জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সম্মত হন। এগুলোর মধ্যে ছিল-

ক. বিদেশে অবস্থিত বিশেষ করে দিল্লি ও কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত সকল বাঙালিদের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি। যাতে তাদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ রোধ করা যায়।

খ. জরুরি ভিত্তিতে কলকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনারকে একটি সাইফার বার্তা দেওয়া যে, যাতে সে এবং তাঁর অফিসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কে এম শিহাবুদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ না করে।

দিল্লিস্থ পাকিস্তান মিশনে অবশ্য এসময় জোরে শোরে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় কেন শিহাবুদ্দিনের মতো কূটনীতিক ব্যক্তি পাকিস্তানের কূটনীতিক জীবন ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যোগ দিয়েছে। যা তখনও প্রারম্ভিক পর্যায়ে ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল।[১৮৯] অবশ্য এই সময় দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের অভ্যন্তরে অবস্থানরত বাঙালিদের অবস্থা কেমন হয়েছিল সে সম্পর্কে কে এম শিহাবুদ্দিন মন্তব্য করে বলেন যে- The lives of the Bengali officers were dramatically altered after that morning’s meetings with the high commissioner. They were now on their own, unable to trust one another.[১৯০] পাকিস্তান সরকার ও নাগরিকদের পাশাপাশি ভারতীয় মুসলমানরাও এ ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তাদের মতে তারা বিশ্বাসঘাতক হিসেবে কাজ করেছে, তাদেরকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনা বা হত্যা করা উচিত বলেও মন্তব্য করে। এমনকি হাইকমিশনের কিছু সহকর্মীও পক্ষ ত্যাগকারী দুই জন বাঙালি কূটনীতিক মুক্তিরসংগ্রামে যোগ দিয়ে বোকমিপূর্ণ কাজ করেছে যা ছিল খুবই অপরিপক্ক সিদ্ধান্ত। কেননা তখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়নি এমনকি মুক্তিযুদ্ধে গতিপথ তখনও কী হবে তা ছিল অনিশ্চিত। একজন তাদের সতর্ক করেছিল "You may end up being refugees all your life without a home or job."[১৯১] অবশ্য যারা এমন মন্তব্য ও কটুক্তি করেছিল তাদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের পক্ষে ফিরে এসেছিল এবং বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদে আসীন হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কেন যোগ দিয়েছেন এবং কী উদ্দেশ্যে কাজ করতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে শিহাবুদ্দিন বলেছেন- ‘I also desperately needed authority from a legally constituted government of Bangladesh to legitimise my mission and activities in a foreign country.’[১৯২]

বাঙালি দুজন কূটনীতিকের পাকিস্তান সরকারের চাকরি থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত ও তৎপরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তাদের বক্তব্য দিল্লির বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। অনেক রাজনীতিবিদ তাদের কর্মসূচির প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ শিহাবুদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী বুলবুল কে অভিনন্দন জানিয়েছেন এই ঐতিহাসিক কাজের

---

[১৮৯] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 82
[১৯০] *Ibid*, p. 84
[১৯১] *Ibid*, p. 92
[১৯২] *Ibid*, p. 93

জন্য। আবার বাঙালি রাজনীতিবিদদের অনেকেও তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। এদের মধ্যে ছিলেন মওলানা ভাসানী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মনি সিং ও ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ। তারা জানান যে, তাদের সাহসীপূর্ণ কাজ ও সময়োচিত সংবাদ সম্মেলনের কারণে তারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তারা এও বর্ণনা করেছেন কীভাবে তাদের সাক্ষাৎকারটি বাঙালি নেতাদেরকে সঠিকপথে অগ্রসর হতে এবং কী করতে হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছে।[১৯৩] বাঙালি কূটনীতিকদের এমন পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন ভারতীয় কূটনীতিক জে এন দীক্ষিত। তিনি তাঁর বইতে লিখেছেন-

> The defection of the East Pakistan Government officials to the cause of freedom of Bangladesh proved to be an incremental phenomenon between May and December 1971. The very first defection was by a young East Pakistani Second Secretary in the Pakistan High Commission in New Delhi, Mr. K. M. Shehabuddin, in March 1971. He was the first Pakistani civilian officer to formally resign from the Pakistan Government. It was a spontaneous and emotional action on the very night when a military crackdown was unleashed by Lt.-General Tikka Khan. He resigned and sought political asylum in India, which was promptly given. He was followed by the entire Bengali component of the Pakistani Consulate-General (Deputy High Commission) in Calcutta, resigning and defecting to the liberation struggle.[১৯৪]

কে এম শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক বৈরী পরিবেশের মধ্যে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য পরিবর্তন করেন তা নিঃসন্দেহে সাহসিকতাপূর্ণ কাজ। একদিকে পাকিস্তান সরকারের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নৃশংস গণহত্যা অপরদিকে পাকিস্তান দূতাবাসে অসহযোগিতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে তারা দুজনে ৪ এপ্রিল পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৬ এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলনে তারা তাদের আনুগত্য পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেন। পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করার পর কে এম শিহাবুদ্দিন ও তাঁর পরিবার এক নার্সারিতে আত্মগোপনে ছিলেন। সেখানে এক সপ্তাহ থাকার পর দিল্লির বিভিন্ন হোটেলে অবস্থান করে ভারতের সহায়তায় গোপনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতে লাগলেন। কে এম শিহাবুদ্দিন পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য পরিবর্তন করা সত্ত্বেও দিল্লিতে অবস্থান করেন। কারণ তখন পর্যন্ত নানা প্রতিবন্ধকতায় নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের কোনো কূটনীতিক দফতর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া তারা দু'জনেই ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। উপরন্তু ঢাকায় তখনও ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের কর্মচারীরা আটক ছিলেন। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পরপর ১৮ এপ্রিল কলকাতাস্থ পাকিস্তানি দূতাবাস বাঙালিরা দখল করে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা করে। ১৩ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কে এম শিহাবুদ্দিন যোগাযোগ করেন এবং ২১ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি মিটিং নির্ধারিত হয়। ২০ এপ্রিল আমজাদুল হক ও শিহাবুদ্দিন দিল্লি থেকে কলকাতায় আসেন এবং কলকাতায় তাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এম হোসেন আলী ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ। ইতিমধ্যে ১৮ এপ্রিল তারা সকলে

---

[১৯৩] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 94

[১৯৪] J. N. Dixit, *Liberation and Beyond: Indo-Bangladesh Relations,* Dhaka: UPL, 1999. pp. 38-39

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ায় শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক দুজনেই ছিলেন আনন্দিত। কেননা তারা ভাবলেন কূটনীতিক ফ্রন্টে তারা আর একা নন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাতে শিহাবুদ্দিন জানিয়েছেন, তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের কূটনীতিক ফ্রন্ট শুরু করতে চাচ্ছেন। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ শিহাবুদ্দিন কে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি বলেন- "I was waiting for the Kolkata mission to come out and join us. Since the formation of my government, I have been secretly talking to Hossain Ali in an effort to persuade him to do so. I have finally succeded and the mission is now with us."[১৯৫]

আলোচনার এক পর্যায়ে তাজউদ্দীন আহমদ কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি দিল্লি বা কলকাতা কোথায় কাজ করতে ইচ্ছুক? এ ব্যাপারে শিহাবুদ্দিন দিল্লিতে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে দিল্লিতে তাদের শক্ত উপস্থিতি থাকা প্রয়োজন। কেননা দিল্লি হচ্ছে সকল ক্ষমতার কেন্দ্র। ভারতের আইনসভা, বৈদেশিক দপ্তর, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এমনকি বিদেশি দূতাবাসগুলো সেখানে অবস্থিত। এতে করে সহজেই তাদের কাছে যাওয়া যাবে এবং তারা তাদের বোঝাতে সক্ষম হবেন। আমজাদুল হক ও তিনি গত কয়েকবছর ধরে দিল্লির বিভিন্ন পর্যায়ে যে সম্পর্ক তৈরি করেছেন তা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করতে পারবেন। তাঁর এ প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী সম্মত হন। তাদের জানানো হয় যে, আপাতত দিল্লিতে একটি অফিস স্থাপন করা হবে।[১৯৬] পরদিন তাজউদ্দীন আহমদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তারা তাঁকে কী দিতে পারেন? কেননা তিনি হচ্ছেন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রথম অফিসার যিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। সে যে পরিচয় বা পদমর্যাদার অবস্থান চায় তা তাঁকে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে শিহাবুদ্দিনের বক্তব্য ছিল- My family and I did not want anything in exchange. My greatest satisfaction was that I had had the opportunity to participate in the liberation efforts of our country. My sole purpose was to serve the national- not my personal- interest.[১৯৭]

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মুজিবনগর সরকারের উর্ধ্বতন মন্ত্রীদের সহযোগে কে এম শিহাবুদ্দিনের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেন যে, বাংলাদেশ দূতাবাসের পরিবর্তে দিল্লিতে বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। যা সহজেই ভারত সরকার দ্বারা গৃহীত হবে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তথ্য দিয়ে সহায়তা করে বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। শিহাবুদ্দিনকে তথ্য কেন্দ্রের প্রধান এবং আমজাদুল হককে প্রেস এটাচি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, আমজাদুল হকের এক ধাপ পদোন্নতি হয়। কেননা পাকিস্তান দূতাবাসে তিনি ছিলেন সহকারী প্রেস এটাচি।[১৯৮] প্রধানমন্ত্রী তাঁদের এসব সিদ্ধান্তের বিষয় ভারত সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংকে ২৬ এপ্রিল একটি চিঠি লিখেন। কে এম শিহাবুদ্দিন দিল্লিতে ফিরে ২৮ এপ্রিল সরাসরি শরণ সিং এর সঙ্গে দেখা করে এই চিঠি হস্তান্তর

---

[১৯৫] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 100
[১৯৬] *Ibid*, p.100
[১৯৭] *Ibid*, p. 101
[১৯৮] গবেষকের সঙ্গে আমজাদুল হক এর সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯

করেন। এটি ছিল মুজিবনগর সরকারের আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশি কোনো সরকারের নিকট পাঠানো প্রথম চিঠি। প্রধানমন্ত্রী কে এম শিহাবুদ্দিনকে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ও আমজাদুল হককে বাংলাদেশ তথ্য মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত করেন। ২৬ এপ্রিল ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত এই দুজনের নিয়োগ সম্পর্কিত চিঠি ইস্যু করা হয়। যা ছিল বাংলাদেশ সরকারের প্রথম আনুষ্ঠানিক নিয়োগ আদেশ।[১৯৯]

৩০ জুন ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা করার সময় আয়োজিত এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে নয়াদিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান কে এম শিহাবুদ্দিন লাখো বাঙালির রক্তে রঞ্জিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় কে এম শিহাবুদ্দিন বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারত সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অবশ্য তারা উভয়ে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে ভারত সরকার তা মঞ্জুর করে। এ সংবাদ ভারতীয় গণমাধ্যম ও বিশ্ব গণমাধ্যমে প্রচারিত হলে তা মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদের নজরে আসে। তাদের এ পদত্যাগ সম্পর্কে শামসুল হুদা চৌধুরী মন্তব্য করেন যে, ৬ এপ্রিল ১৯৭১ মধ্যরাতের কিছু পর দিল্লির পাকিস্তানি হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব কে এম শিহাবুদ্দিন এবং প্রেস এটাচি আমজাদুল হক পাকিস্তান দূতাবাসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন এবং দূতাবাস ভবন ত্যাগ করেন। নয়াদিল্লি তাদেরকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের মিশন চালু হলে শিহাবুদ্দিন এই মিশনের প্রধান এবং আমজাদুল হক এর প্রেস এটাচি নিযুক্ত হন। আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠিত হওয়ার আগেই ৬ এপ্রিল ১৯৭১ দিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের উক্ত দুজন বাঙালি কূটনীতিক কর্তৃক সদ্য ঘোষিত বাংলাদেশের প্রতি তাৎক্ষণিক আনুগত্য প্রকাশ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্পষ্টতই পাকিস্তানের অন্যান্য বৈদেশিক মিশনের বাঙালি সদস্যগণকেও এমনি ভাবে এগিয়ে আসার জন্য তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।[২০০] নয়াদিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের দুই জন বাঙালি কূটনীতিকের পাকিস্তানের চাকরি ত্যাগ সংক্রান্ত সংবাদ ইউরোপেও ছড়িয়ে গিয়েছিল তা জানা যায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর স্মৃতিকথায়-

> ৬ই এপ্রিল পাকিস্তানের দু'জন কূটনৈতিক অফিসার পাকিস্তানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তারা হলেন খান মোহাম্মদ শিহাবউদ্দিন এবং আমজাদুল হক। এরা দু'জনেই বাঙালী। শিহাবউদ্দিন দিল্লীর পাকিস্তানী দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারী আর আমজাদুল হক প্রেস এ্যাটাচী ছিলেন। এদের আগে আর কোনো সরকারী কর্মচারী পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেননি। আমরা যখনই সময় পেতাম দিল্লীর রেডিও ধরার চেষ্টা করতাম। ৬ই এপ্রিল রাতে ইয়র্ক থেকে ফিরে হঠাৎ দিল্লী রেডিও থেকে শিহাবউদ্দিন ও আমজাদুল হকের কণ্ঠেই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের কথা শুনলাম। এই সংবাদটি বাঙালি মহলে আমরা প্রচার করি এবং এতে খুব উৎসাহের সৃষ্টি হয়।[২০১]

---

[১৯৯] K M Shehabuddin, *ibid*, pp. 101-102; গবেষকের সঙ্গে আমজাদুল হক এর সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯

[২০০] শামসুল হুদা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

[২০১] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

নয়াদিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব কে এম শিহাবুদ্দিন এবং সহকারী প্রেস এটাচি আমজাদুল হকের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা ছিল একটি আলোচিত ঘটনা। কেননা বাংলাদেশে তখন পর্যন্ত কোনো সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি কী হবে তা নিয়েও কোনো পরিস্কার ধারণা ছিল না। এমন অবস্থায় দুই বাঙালি কর্মকর্তার 'পক্ষত্যাগ' ছিল নিঃসন্দেহে সাহসী পদক্ষেপ। পাকিস্তান সরকারের প্রতি আনুগত্য পরিবর্তন করার পর রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে ভারত সরকারও অনতিবিলম্বে তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করে। এই ঘটনার পর দিল্লিস্থ পাকিস্তান মিশনে কর্মরত ছিলেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর মতো অভিজ্ঞ বাঙালি কূটনীতিক। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বের সকল পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার আহ্বান জানায়। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী দিল্লিস্থ পাকিস্তান মিশনে যোগ দেওয়ায় বাঙালি কূটনীতিকরা খুশি হয়েছিলেন। তারা আশা করেছিলেন যে, তিনি বাংলাদেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে তাদেরকে পরিচালিত করবেন। কিন্তু অচিরেই তারা হতাশ হয়। তিনি তাদের জানান যে, ব্যক্তিগত কারণে তিনি এখনই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পারবেন না। কেন তিনি বিলম্বে যোগ দিলেন এ সম্পর্কে তাঁর সহকর্মী বাঙালি কূটনীতিক শিহাবুদ্দিন মন্তব্য করেন যে- He had assets and interests in Pakistan that he had to secure or dispose of before he could defect. He also wanted assurances from the Mujibnagar government about his job, status, pay and allowances, and diplomatic privileges.[২০২]

মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষী তাঁর বন্ধু হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর সঙ্গে গোপনে দিল্লিতে কয়েকদফা দেখা করে তাঁকে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে বলেছিলেন। তিনি পাকিস্তান দূতাবাসের হাইকমিশনার সাজ্জাদ হায়দার ও পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করেছেন। এমনিক তিনি চ্যান্সেরির প্রধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আসীন ছিলেন। দূতাবাসের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দিল্লিতে তিনি বাঙালিদের আন্দোলনের আদেশসমূহে স্বাক্ষর করে ইসলামাবাদ পাঠাতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি অবাধে বেশ কয়েকবার দিল্লি থেকে পাকিস্তান ভ্রমণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মুজিবনগর সরকারের নিকট কোনো বিকল্প না থাকায় তাঁকে পক্ষত্যাগের জন্য চূড়ান্ত সময়সীমা দেওয়া হয়। সাত দিনের চূড়ান্ত সময়সীমা জানিয়ে চিঠির আদেশ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন মুজিবনগর সরকারের পক্ষে কে এম শিহাবুদ্দিন। শিহাবুদ্দিন এই চিঠি তাঁর বাসায় পৌঁছে দেন ১৯৭১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর।[২০৩] প্রসঙ্গত আলোচ্য বিষয় যে, ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের পক্ষে কাউন্সেলর হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী একটি সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন। এ সংবাদ সম্মেলনে তিনি ঢাকার ভারতীয় দূতাবাসে আটককৃত কূটনীতিক ও অফিস স্টাফদের সঙ্গে কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের পক্ষ ত্যাগকারী বাঙালিদের বিনিময়ের বিষয় তুলে ধরেছিলেন। ভারতীয় পত্রিকায় হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর নাম উল্লেখ করে বলা হয় যে, একজন বাঙালি হয়ে পাকিস্তান পক্ষ নিয়ে কথা বলায় তারা

[২০২] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 123
[২০৩] *Ibid*, p. 123-124

তাঁকে পছন্দ করছেন না।[২০৪] মুজিবনগর সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কিছুটা বিলম্বে হলেও হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ৪ অক্টোবর নিজ বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রকাশ্যে বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগদানের কথা ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সিলেটের এমএনএ আবদুস সামাদ আজাদ। আবদুস সামাদ আজাদ তাঁকে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। বিশেষ করে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তথা বামপন্থি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগের সংযোগ তৈরি করেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। অবশ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁর পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগে বিলম্বের অভিযোগ দূর করতে। এমনকি বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁকে আবদুস সামাদ আজাদ পুনর্বাসিতও করেছেন।[২০৫] বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী নিজ বাসভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে- পাকিস্তানের জঙ্গি শাসকদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি মাতৃভূমির মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাকিস্তান ধ্বংসের জন্য ইয়াহিয়া খানই দায়ী, শেখ মুজিবুর রহমান নন। মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ করার জন্য ইয়াহিয়া খানের বিচার হওয়া উচিত। একটা প্রাচীন সভ্য জাতিকে সুপরিকল্পিত উপায়ে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া খান লাখ লাখ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে চলেছে।[২০৬] এই সংবাদ সম্মেলনে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী আরো জানান যে, বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে বিশেষ সহায়তা করেন।[২০৭] অবশ্য সংবাদ সম্মেলনের পূর্বে তিনি এক সংবাদ বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে-

> . . . history will certainly indict Yahya Khan not only for the fiendish genocide of innocent people but also for having provoked the disintegration of Pakistan. It is he, and not Sheikh Mujibur Rahman that should be tried not only for crimes against Pakistan but also for crimes against humanity. [২০৮]

সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা প্রদান করার পর পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী তাঁর বাসভবন, আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র বাংলাদেশ সরকারের কাছে অর্পণ করেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাঁকে এক নোটিশ দিয়ে জানায় যে, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এসব জিনিসপত্র পাকিস্তান মিশনকে ফেরত না দিলে পাকিস্তান সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাকিস্তান সরকারের এ হুমকির জবাবে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী জানান যে, এসব সম্পত্তি বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছেন কারণ-উত্তরাধিকারী সরকার অনুসারে ঐসব সম্পত্তির আইনত মালিক বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে তাঁকে ওই সকল সম্পত্তি পাকিস্তানি হাইকমিশনে ফেরত না দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া

---

[২০৪] The Diary of Hossain Ali
[২০৫] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 124
[২০৬] মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত, *গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ*, পঞ্চম খণ্ড, ঢাকা: অনন্যা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৪। পৃ. ১০৪-১০৫
[২০৭] *জয়বাংলা*, ২২ অক্টোবর ১৯৭১
[২০৮] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৩৫

হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ মোতাবেকেই তিনি এই কাজ করেছেন। পশ্চিমা সেনাবাহিনীর দখলাধীন বাংলাদেশে অবস্থিত তাঁর সম্পত্তি পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে দখলের কোনো চেষ্টা করা হলে গুরুতর পরিণতি দেখা দিবে।[২০৯]

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে দিল্লিতে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।[২১০] হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বিলম্বে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার কারণ উল্লেখ করেন ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে নয়াদিল্লির *দি সানডে স্ট্যান্ডার্ড* এর প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে। এতে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বলেন, বিগত জুলাই মাসে তিনি গোপনে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান করেন। মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করা হয় আপাতত পাকিস্তান দূতাবাসের উচ্চপদে নিয়োজিত থেকে তিনি বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করবেন। যথাসময়ে তিনি প্রকাশ্যে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করবেন।[২১১] কিন্তু তাঁর এ বক্তব্যের পক্ষে কোনো কূটনীতিকের বয়ান পাওয়া যায়নি এমনকি কূটনীতিকদের স্মৃতিকথায়ও ওঠে আসেনি। তাই স্বাভাবিকভাবে বলা যায় যে, তিনি শুরু থেকেই হয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন নতুবা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ নিয়ে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে দরকষাকষি করছিলেন। কিন্তু অক্টোবর মাস পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী একের পর এক বাঙালি কূটনীতিকদের পদত্যাগে তখন তিনিও পাকিস্তানের চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অথবা দরকষাকষিতে সফল হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৪ অক্টোবর দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সেলর হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী পদত্যাগ করার পূর্বের দিন ৩ অক্টোবর একই দূতাবাসের স্টেনোগ্রাফার ফরিদউদ্দিন আহমদ পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন।[২১২] অবশ্য মুনতাসীর মামুনের গ্রন্থে জানা যায় যে, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর প্রাইভেট সেক্রেটারি ফরিদউদ্দিন আহমদ একই দিনে তাঁর পাঁচ ঘন্টা আগে স্ত্রী ও চার সন্তানসহ দূতাবাসের প্রাচীর টপকে দূতাবাস থেকে বেরিয়ে যান এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[২১৩]

বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক-এই দুই জন বাঙালি কূটনীতিকের পথ অনুসরণ করে দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তা আবদুল করিম, আবদুল মজিদ বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[২১৪] ৯ আগস্ট দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী করিম বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[২১৫] ৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের স্টাফ সদস্য আমজাদ আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। আমজাদ আলী সহ তখন পর্যন্ত নয়াদিল্লিতে ৫ জন বাঙালি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। আমজাদ আলী অনেক চেষ্টার পর তার তিন মাসের শিশু সন্তানসহ দূতাবাসের বাইরে আসতে পেরেছেন। আমজাদ আলী তাঁর তিন মাসের শিশুর জন্য ছবি তোলার উদ্দেশ্যে দূতাবাস কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেন। কিন্তু দূতাবাস কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে

---

[২০৯] মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০-১১১

[২১০] সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫

[২১১] *The Sunday Standard* (London), 30 January 1972

[২১২] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৩৫

[২১৩] মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪-১০৫

[২১৪] *জয়বাংলা*, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

[২১৫] *ওই*, ১৩ আগস্ট ১৯৭১

গোয়েন্দা বিভাগের একজন লোককে পাঠায়। দূতাবাসের বাইরে এসে আমজাদ আলী তাঁর পরিবার নিয়ে একটি চলন্ত ট্যাক্সিতে উঠে পড়েন। গোয়েন্দা বিভাগের লোকটি কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি গাড়িতে উঠে পড়েন।[২১৬] ২৮ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লির পাকিস্তান দূতাবাস থেকে আরো ৪ জন বাঙালি কর্মচারী সুকৌশলে বের হয়ে যান। পরে তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেন। এই চারজন বাঙালি কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন মফিজুর রহমান (স্টেনোগ্রাফার), এ কে আজাদ (ইউ.ডি সহকারী), মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (এল.ডি. সহকারী) এবং গোলাম মোস্তাফা (ডিসপেনসার)। এই চারজনের পক্ষে মফিজুর রহমান বাংলাদেশ মিশনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন- একটি বাসে করে ১৬ জন পাকিস্তানি বাঙালি কর্মচারীদের পাকিস্তান সীমান্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সন্দেহ ছিল এসব বাঙালি কর্মচারীরা যে কোনো সময় দূতাবাস থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। তাই তাদের পক্ষ ত্যাগ রোধ করার জন্য তাদের রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু পাকিস্তানের সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছলে তারা সকলে সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে। এতে আশে পাশে অনেক লোক জমায়েত হয়। তখন তারা বলে যে, তারা বাঙালি কিন্তু পাকিস্তানিরা তাদের জোর করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাচ্ছে। উপস্থিত জনতার চাপের মুখে পাকিস্তানিরা তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।[২১৭]

১ অক্টোবর নয়াদিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে ৪০ বৎসর বয়স্ক বাঙালি কর্মচারী আবদুল শহীদ দেয়াল টপকে পালিয়ে চলে আসেন। তিনি ছিলেন হাইকমিশন অফিসের পিয়ন। পালিয়ে আসার পর তিনি বাংলাদেশ মিশনে সাংবাদিকদের বলেন যে, হাইকমিশনের ১৩ জন বাঙালি কর্মচারীকে পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে না গিয়ে পালিয়ে আসেন।[২১৮] নয়াদিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশনের বাঙালি কর্মচারী ২৭ বৎসর বয়স্ক টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুপারভাইজার এস এম নুরুল হুদা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করেন। হাইকমিশন অফিসের দেয়াল টপকে ট্যাক্সি নিয়ে তিনিও বাংলাদেশ মিশনে চলে আসেন। সেখানে তিনি এক সংবাদ বিবৃতিতে জানান যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতা তিনি গভীর উদ্‌বেগ ও আশঙ্কা নিয়ে লক্ষ্য করেছেন এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কাজ করার জন্য আগ্রহী ছিলেন। তিনি হানাদারদের অধীনে চাকরি করতে পারেন না। হানাদারদের নিন্দা এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য তিনি বিশ্ব সমাজের কাছে আবেদন জানান।[২১৯] সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন- পাকিস্তানি সশস্ত্র লোকরা চ্যান্সেরির অভ্যন্তরে পাহারায় নিয়োজিত রয়েছে। যা সহ্য করা যাচ্ছে না। তিনি সকলের কাছে যারা চ্যান্সেরির অভ্যন্তরে বন্দি হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে তাদের উদ্ধার করার আহ্বান জানান। তিনি আরও জানান যে, দূতাবাসের অভ্যন্তরে বাঙালি কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তাদেরকে নানা ভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে।[২২০]

---

[২১৬] *কালান্তর* (কলকাতা), ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

[২১৭] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮২৭

[২১৮] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮২৭ ; *বাংলার বাণী*, ৫ অক্টোবর ১৯৭১

[২১৯] *জয়বাংলা*, ৪ অক্টোবর ১৯৭১

[২২০] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮২৭

সুযোগ এবং সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু সংখ্যক কর্মচারী পাকিস্তান মিশনে রয়ে যান। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তদবির করে নয়াদিল্লি থেকে ইসলামাবাদে বদলি নিয়ে চলে যান। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সঙ্গে নিজেদেরকে তারা জড়িত করতে চাননি। এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন নয়াদিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশনের শেষ বাঙালি কূটনীতিক রিয়াজ রহমান। যিনি ইসলামাবাদে বদলি হয়ে যান। এর ফলে দিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশনে আর কোনো বাঙালি কূটনীতিক অবশিষ্ট থাকেনি। পুরো হাইকমিশনে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অবস্থান দৃঢ় হয়। রিয়াজ রহমান পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরীর জামাতা। রিয়াজ রহমান বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করে পাকিস্তান সরকারের চাকরিতে নিজেকে বহাল রাখেন।[২২১] রিয়াজ রহমান পাকিস্তানি সরকারের চাকরি ত্যাগ করতে রাজি হননি। কোনো অনুরোধ-উপরোধকেই রিয়াজ রহমান পাত্তা দেননি। বরং ঘৃণা প্রকাশ করেছেন প্রবাসী সরকার এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপারে। রিয়াজ রহমান বলেছেন, পাকিস্তানের সেবাদাস হয়ে থাকা তাঁর ফরজ। দুই মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের মুখে এবং তাজউদ্দীন আহমদের মুখে থুথু ছিটানোর ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। তাজউদ্দীন আহমদ রিয়াজ রহমানকে পাকিস্তানের চাকরি ত্যাগের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। রিয়াজ রহমান সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতের দালাল বলে গালাগাল করেন।[২২২] অবশ্য রিয়াজ রহমানের সহকর্মী কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিনের মতে, দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের প্রথম সচিব রিয়াজ রহমান শুরুর দিকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কে এম শিহাবুদ্দিন ২৬ মার্চ পর্যন্ত রিয়াজ রহমানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান ইস্যুতে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতেন। কিন্তু পরে তাঁর আচরণের নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কিত সকল ধরনের কথোপকথন বন্ধ করে দেন। মুজিবনগর সরকার থেকে তাঁকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার কথা বললে তিনি তা নাকচ করে দেন।[২২৩] এছাড়া এসময় দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন তাহের কুদ্দুস। তিনি মে মাসে কূটনীতিক সফরে পাকিস্তান যাওয়ার পর বন্দি জীবন করেন। তাঁকে নিরাপত্তা জনিত কারণে ভারত থেকে অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কেননা সে ভারত সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্য জানতো। সে যেন পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করতে না পারে এজন্য পাকিস্তান সরকার কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি।[২২৪]

নয়াদিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশনের বাঙালি কূটনীতিক ও কর্মচারীরা যখন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে দূতাবাস থেকে বেরিয়ে আসে, তখন তাদের মধ্যে একজন বাঙালি ড্রাইভার ছিলেন আবুল হোসেন। নয়াদিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের ড্রাইভার আবুল হোসেন একজন অবাঙালি মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। বাঙালি সকল কূটনীতিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দূতাবাস ত্যাগ করার সময় আবুল হোসেন তার স্ত্রীকে বাংলাদেশের পক্ষে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু তার স্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেননি। পরবর্তীতে দিল্লিতে পাকিস্তান দূতাবাস বন্ধ হয়ে গেলে আবুল হোসেনের স্ত্রী

[২২১] *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১
[২২২] *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ৩০ জানুয়ারি ১৯৯৪
[২২৩] K M Shehabuddin, *ibid*, p.124
[২২৪] *Ibid*, p. 123

ও শিশু সন্তান পাকিস্তানে ফিরে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও আবুল হোসেন তার স্ত্রী ও সন্তানের কোনো খোঁজ পাননি। আবুল হোসেন বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন ড্রাইভার। মুক্তিযুদ্ধে উজ্জীবিত হয়ে সেদিন স্ত্রী কন্যার মায়া ত্যাগ করেছিলেন। দেশপ্রেম আবুল হোসেনের কাছে সেদিন এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে স্ত্রী-সন্তান তাকে এতটুকু দুর্বল করতে পারেনি। আবুল হোসেন স্ত্রী-সন্তান ও পাকিস্তান হাইকমিশন ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলেন। সেদিন আবুল হোসেন ভাবেননি বাংলাদেশ কখন স্বাধীন হবে, বাংলাদেশ কেমন হবে, সে বাংলাদেশে আবুল হোসেনের স্থান কী হবে।[২২৫]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্বব্যাপী যতগুলো দেশে পাকিস্তান দূতাবাস ছিল তার মধ্যে বাঙালিদের সংখ্যাধিক্য ছিল ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘ এসব প্রতিষ্ঠানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে তৎকালীন সময়ে বাঙালিরা কর্মরত ছিলেন। আবার মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে যে দুটি দেশের কূটনীতিক অঞ্চলকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

আমেরিকায় বাংলাদেশ লীগ এর নামে সংগঠনের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাস থেকে। এ এইচ মাহমুদ আলী উপদেষ্টা হিসেবে এর নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন।[২২৬] ১৯৭০ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলাদেশ লীগ মতামত প্রকাশ করে এবং স্বাধীন বাংলার পক্ষে জনমত গড়ে তোলে। এসময় তারা কতগুলো উল্লেখযোগ্য কাজ করে যেমন- জাতিসংঘের সামনে র‍্যালি, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ, পাকিস্তান মিশনের সামনে প্রতিবাদ ইত্যাদি। তাদের প্রতিবাদে সাড়া দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইয়াহিয়া খানকে বাংলাদেশ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য চিঠি দেয়। বাংলাদেশ লীগ বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্যের জন্য আবেদন করে।[২২৭] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তান দূতাবাস, বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘে অনেক বাঙালি কর্মরত ছিলেন। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন সৈয়দ আনোয়ারুল করিম, নিউইয়র্ক পাকিস্তান দূতাবাসের ভাইস কনসাল হিসেবে ছিলেন এ এইচ মাহমুদ আলী, বিশ্বব্যাংকে ড. হারুন-অর-রশিদ, ড. আবদুন নুর ও ড. মনোয়ার হোসেন। ওয়াশিংটনে উপ মিশন প্রধান ছিলেন মিনিস্টার এনায়েত করিম, রাজনৈতিক কাউন্সেলর ছিলেন শামসুল কিবরিয়া, শিক্ষা কাউন্সেলর ছিলেন সৈয়দ আবু রুশদ মতিন উদ্দিন, হিসাবরক্ষক দ্বিতীয় সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন আতাউর রহমান চৌধুরী, তৃতীয় সচিব ছিলেন সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী। তিনজন স্থানীয় অফিসার ছিলেন- শিক্ষা বিভাগে আবদুর রাজ্জাক খান, প্রশাসনে এম এ শরফুল আলম এবং প্রচারে শেখ রুস্তম আলী।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বাংলাদেশের ওপর ভয়াবহ গণহত্যা পরিচালনার সংবাদ বিশ্ব গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এ ঘটনার পর ওয়াশিংটন পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি ও প্রবাসী বাঙালিদের উদ্যোগে ২৯ মার্চ সোমবার কংগ্রেসের সামনে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। টেলিফোনে যোগাযোগ করে, একে অন্যের মুখে শুনে

---

[২২৫] *দৈনিক সংবাদ*, ২৭ ও ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪০০

[২২৬] বাংলাদেশ লীগের সদস্য ছিলেন- ড. মহসিন সিদ্দিক, ড. আবদুর রাজ্জাক খান, ড. এনায়তুর রহিম, মোহিদ চৌধুরী, গউস আহমদ, কাফি খান, শরফুল আলম, ফজলুল বারী, মুশতাক আহমদ, মোহাম্মদ সোলায়মান, আজীজ মিয়া, একেএম বাতেন, খালিদ হাসান, মাহবুব আলী প্রমুখ।

[২২৭] সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৯

আমেরিকার দূর দূরান্ত থেকে বাঙালিরা সমবেত হয় ওয়াশিংটনে। তাদের কেউ কেউ হাজার বা আটশো মাইল রাস্তা সারা রাত গাড়ি চালিয়ে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে আসেন। নিউইয়র্ক, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া, ডেট্রয়েট, শিকাগো, ওহিয়ো ইত্যাদি প্রদেশ থেকে অনেকেই আসেন। কংগ্রেসের সিঁড়িতে মূল বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় তিন শতাধিক লোক যোগ দেয়। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট, বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সামনেও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার, বাঙালিদের স্বাধিকার ও পাকিস্তানের নিন্দার দাবি ওঠে এই বিক্ষোভ মিছিলে।[২২৮]

উল্লেখ্য যে, ওয়াশিংটন থেকে ১৩ এপ্রিল বিশ্বব্যাংকে কর্মরত ড. হারুন-অর-রশিদকে প্রতিনিধি হিসেবে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল সরেজমিনে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা খবরের কাগজে ২৮ মার্চ জানা যায় কিন্তু তারপর কী হচ্ছে, কী পরিকল্পনা, কী বৃত্তান্ত তা তখনো খুব অস্পষ্ট। ড. হারুন-অর-রশিদ কলকাতায় অবস্থানকালে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল এবং হোসেন আলীর নেতৃত্বে কলকাতার পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশনের বাঙালিরা ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণা করে। ড. হারুন-অর-রশিদ ২৬ এপ্রিল ওয়াশিংটনে ফিরে যাওয়ার সময় মুক্তিযুদ্ধকে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার এবং তার রাজনৈতিক ভিত্তি প্রদানের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়ে যায়। এসময় নিউইয়র্কে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের পক্ষ থেকে ফারুকুল ইসলাম ও মাহবুবকে কলকাতায় তাদের দূত হিসেবে পাঠানো হয়। নিউইয়র্কে পাকিস্তান কনসুলেট এর ভাইস কনসাল এ এইচ মাহমুদ আলী আগে থেকেই বাংলাদেশ লীগে সক্রিয় ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্ব থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। তাঁর প্রতি পাকিস্তান সরকার প্রসন্ন ছিলেন না। কারণ তিনি সে বছর জাঁকজমকের সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করেছিলেন। পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনী সেই থেকে তাঁর পেছনে লেগেই ছিল।[২২৯] তাঁর এসব কর্মকাণ্ড নিউইয়র্কের পাকিস্তানিরাও সুনজরে দেখেনি। এমন অবস্থায় এ এইচ মাহমুদ আলী মুজিবনগর সরকার গঠন হওয়ার মাত্র নয় দিনের মাথায় আনুগত্য পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে অনুযায়ী ২৬ এপ্রিল এ এইচ মাহমুদ আলী ভারতের বাইরে প্রথম বাঙালি কূটনীতিক হিসেবে আনুগত্য পরিবর্তন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি যোগ দেন। তিনি মে মাসেই নিউইয়র্কে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য এসময় এপ্রিল মাসে ঢাকা থেকে যে সকল মার্কিন নাগরিকদের বের করে নিয়ে আসা হয় তাদের অনেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বাংলাদেশের পক্ষে এবং পাকিস্তানি সামরিক শক্তির বর্বরতার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে কাজ শুরু করেন। বাঙালি কূটনীতিকদের কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত হয়ে পাকিস্তান সরকারের অন্যান্য চাকরিতে নিযুক্ত বাঙালিরা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে। বিশেষ করে বলা যায়, বাল্টিমোরে পাকিস্তানের নোঙ্গর করা জাহাজ ময়নামতি ও শালিমারে কয়েকজন বাঙালি নাবিক ছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন তরুণ উদ্যোগী অফিসারও ছিলেন। ৮ এপ্রিল আবদুল আউয়াল মিন্টুর নেতৃত্বে ছয় জন নাবিক জাহাজ ছেড়ে চলে আসেন। পাকিস্তানি জাহাজ থেকে বাঙালি

---

[২২৮] সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৯-৩৬০

[২২৯] A M A Muhith, *American Response to Bangladesh Liberation War*, Dhaka: UPL, 1996. p. 388

নাবিকদের এককভাবে অথবা দল বেধে পরিত্যাগের এই সূচনা ধরে বিভিন্ন দেশ থেকে নানা সময়ে এর পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। পাকিস্তানিদের বাঙালি নিষ্পেষণ শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তারা যেখানে যেভাবে পেরেছে সেখানেই বাঙালিদের ওপর আঘাত হানে। উল্লেখ্য যে, এসময় কানাডার মন্ট্রিলে একটি পাকিস্তানি জাহাজের তিনজন কর্মচারী কানাডা সরকারের নিকট রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে।[২৩০] সামরিক বর্বরতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে পাকিস্তানি দূতাবাসের স্থানীয় কর্মচারী গউসুদ্দিন আহমদ যোগ দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে ১ এপ্রিল বরখাস্ত করা হয়। গউসুদ্দিন কোনো প্রকার ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত ছিলেন না বরং প্রকাশ্যে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন। যা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানিদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়।[২৩১]

এ এইচ মাহমুদ আলী পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ পররাষ্ট্র দফতরের মাধ্যমে মাহমুদ আলীকে অভিনন্দন জানিয়ে দুটি নির্দেশ পাঠান। প্রথমত, আমেরিকায় বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বাংলাদেশের পক্ষে স্বীকৃতি অর্জনের চেষ্টা করা এবং সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রেখে বাংলাদেশের পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলা।[২৩২] ২৬ এপ্রিল নিউইয়র্কের ভাইস কনসাল মাহমুদ আলী পাকিস্তান কনসুলেট জেনারেল ছেড়ে বাংলাদেশের আনুগত্য ঘোষণা করার পর নিউইয়র্কে নিযুক্তি পেয়েই সাহসী ভূমিকা পালন করতে থাকেন। ভারতের বাইরে এ এইচ মাহমুদ আলী ছিলেন আমেরিকায় মুজিবনগর সরকারের প্রথম প্রতিনিধি। মাহমুদ আলীর বীরোচিত পদক্ষেপ *নিউইয়র্ক টাইমসে* প্রকাশিত হয়। ক্যাথলিন টেলটস তাঁর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদটি প্রকাশ করেন। এ বক্তব্যে মাহমুদ আলী বলেন- আমার দোষ হলো যে, আমি বাঙালি এবং আমার স্বদেশিদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে আমি পারিনি। আমরা দূতাবাসে জিম্মি অবস্থার মতে থাকায় কোনো কাজ করতে পারি না। যে সরকার আমার ভাইদের হত্যা করছে আমি তাদের চাকরি করবো না।[২৩৩]

এ এইচ মাহমুদ আলীর সফল নেতৃত্বের কথা স্মরণ করে হায়দার আলী খান বলেন, ছাত্রজীবনে তিনি কখনো বামপন্থি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তবে ১৯৭১ সালে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান আওয়ামী লীগের ঠিক কোন বৃত্তে ছিল তা তখন কেউ বুঝতে পারেনি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে যখন নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে অন্য বাঙালি কূটনীতিকরা প্রায় সবাই তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ে দোদুল্যমানতায় ছিলেন। সে সময় মাহমুদ আলী অসীম সাহসিকতার সঙ্গে ও শক্ত হাতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্দোলনের হাল ধরেছিলেন।[২৩৪] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন পাকিস্তানি ভাইস কনসাল এ এইচ মাহমুদ আলী পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে স্থায়ীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয়। অবশ্য এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর শুভাকাঙ্খীরা তাঁকে জানিয়েছেন, রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুরের কোনো প্রয়োজন নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তাঁকে স্থায়ীভাবে বসবাসের

---

[২৩০] আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭
[২৩১] সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬০-৩৬১
[২৩২] *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ২৯ এপ্রিল ১৯৭১
[২৩৩] *The New York Times*, 28 April 1971
[২৩৪] হায়দার আলী খান, *মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি প্রবাসে আলোর গান*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৬। পৃ. ১০৭

অনুমতি প্রদান করবে। পরবর্তীতে মার্কিন মহলের সংবাদে জানা যায় যে, মাহমুদ আলীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেওয়ায় তিনি এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। এমনকি তিনি রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়েও যেতে পারবেন। রাজনৈতিক আশ্রয় না দিয়ে মাহমুদ আলীকে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়ার পেছনে মার্কিন সরকারের একটি নীতি ছিল। মার্কিন সরকার মাহমুদ আলীকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিলে রাজনৈতিক ভাবে অস্বস্তিতে পড়বে। এছাড়া রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে মাহমুদ আলী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে পারবেন, সেক্ষেত্রে তিনি কোনো ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন না। বায়াফ্রা যুদ্ধের সময় বায়াফ্রার প্রতিনিধিদেরও একই রকম সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।[২৩৫] জাতিসংঘে পাকিস্তানের ভাইস কনসাল এ এইচ মাহমুদ আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর ইসলামাবাদের পররাষ্ট্র দপ্তর রেডিও পাকিস্তানের মাধ্যমে প্রচার করে যে, মাহমুদ আলীকে বরখাস্ত করা হয়েছে।[২৩৬] ওয়াশিংটনের পাকিস্তানি দূতাবাস দাবি করে যে, মাহমুদ আলীকে ঘানায় বদলি করা হয়েছে এবং সে উদ্দেশ্যে তিনি আগাম ভ্রমণ ভাতাও তুলেছেন। পাকিস্তান দূতাবাস আরো বলে যে, এ এইচ মাহমুদ আলীকে এজন্য কোনো বিপদের মধ্যে পড়তে হবে না। মাহমুদ আলী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, তাকে প্রথমে আক্রায় যোগদান করার আদেশ দেওয়া হলেও ২১ এপ্রিল সে আদেশ বাতিল করে অবিলম্বে ইসলামাবাদে পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সে আদেশ পালন না করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।[২৩৭]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল বাঙালি কূটনীতিক কর্মরত ছিলেন তাদের মধ্যে এ এইচ মাহমুদ আলীর পর পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন এ এম এ মুহিত। তিনি শুরু থেকেই পাকিস্তান সরকারের সকল কার্যক্রমের ওপর সতর্ক নজর রাখছিলেন। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পূর্বে ১৬ এপ্রিল এ এম এ মুহিত পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে একটি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য তুরস্ক সফর করেন। সেখানে তুরস্কের প্রতিনিধির সঙ্গে এ এম এ মুহিতের প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা হয়। এই বাক-বিতণ্ডার বিষয় ছিল তুরস্ক কর্তৃক পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দান। এর তিনদিন পর এ এম এ মুহিতকে সম্মেলন থেকে প্রত্যাহার করা হয় এবং তাঁর চলাফেরার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। তিনি যেন অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারেন সেজন্য তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়।[২৩৮] এই ঘটনার পর ১১ মে পাকিস্তান সমস্যার ওপর কংগ্রেসে গালাগার শুনানিতে যোগ দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি এম এম আহমেদ (মীর্জা মোজাফফর আহমদ) ৯ মে ওয়াশিংটন পৌঁছেন। এম এম আহমেদ ওয়াশিংটনে এসে সকল জায়গায় প্রচার করতে থাকেন যে, অবস্থা যত খারাপ বলা হচ্ছে মোটেই ততটা খারাপ নয়, আওয়ামী লীগের সমর্থন সর্বব্যাপী নয়। তাছাড়া বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি (এম এম আহমেদ) জানান যে, পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান একান্ত প্রয়োজনীয়। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা মার্চের 'গন্ডগোলের'[২৩৯] ফলে খারাপ হয়ে গেছে। তিনি গালাগার শুনানিতে

---

[২৩৫] *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ৬ মে ১৯৭১
[২৩৬] *কালান্তর* (ভারত), ২৮ এপ্রিল ১৯৭১
[২৩৭] *The Statesman* (India), 28 April 1971
[২৩৮] আবুল মাল আবদুল মুহিতের সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০-২৫১
[২৩৯] পশ্চিম পাকিস্তানিরা ২৫ মার্চ রাতের অপারেশন সার্চলাইট ও তৎপরবর্তী অবস্থাকে গন্ডগোল বলে সম্বোধন করতো।

পাকিস্তানের ঋণ শোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানান।[২৪০] পূর্ব পরিচিত হওয়ার কারণে এ এম এ মুহিতের সঙ্গে এম এম আহমেদ আলাপচারিতায় খোলাখুলিভাবে ভিন্ন সুরে কথা বলেন। তিনি বলেন যে, নির্মম এবং দুঃখজনক ঘটনা ব্যাপকভাবে চারদিকে ঘটেছে। সকলের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং বাঙালিদের মনোভাব তিনি সহজেই অনুমান করতে পারেন। তাঁর মতে, মার্চের ঘটনার পর যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তা নিরাময় করা সত্যিই একটি সমস্যা হবে। তিনি আরো বলেন যে, ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আগ্রহী। এজন্য তিনি একদল মধ্যপন্থি আওয়ামী লীগের লোকজন খুঁজছেন এবং তাদের সঙ্গে বৈঠকে ছয়দফাকে যতদূর সম্ভব মেনে নেওয়া হবে। এ প্রচেষ্টায় তারা কতটুকু সফল হতে পারে এ এম এ মুহিতের এমন প্রশ্নের জবাবে এম এম আহমেদ জানান যে, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত কোনো উত্তর দিতে পারছেন না। তার মতে সেটি একটি কঠিন সমস্যা। এম এম আহমেদ আরো বলেন, মার্চ মাসে ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবের আলোচনাকালে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবগুলো কার্যকর কতটুকু এমন প্রশ্ন প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন যে, প্রস্তাবগুলো কার্যকর করা সম্ভব তবে সামান্য যৌক্তিকীকরণের প্রয়োজন। যেমন প্রতিরক্ষার জন্য শিল্প খাত এবং কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কেন্দ্রের হাতেই থাকবে। বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে দুটি একাউন্ট তখনই শুরু করা সম্ভব নয়, তবে ভবিষ্যতে হতে পারে। বিদেশি সাহায্য সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা প্রদেশ ভিত্তিক হওয়া উচিত নয়। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে একমত হওয়া যেতে পারে ও তার ভিত্তিতে আলোচনা হতে পারে। ইয়াহিয়া খান এম এম আহমেদকে ভুট্টোর সঙ্গে আলাপ করতে বলেন। কিন্তু ভুট্টো কেবলমাত্র রাজনীতি নিয়ে আলাপ করতে চেয়েছিলেন। এম এম আহমেদ এর মতে ভুট্টো প্রস্তাবগুলো মেনে নিতে কোনোক্রমেই রাজি ছিলেন না। তিনি এ এম এ মুহিতকে জানান যে, ২৫ মার্চের হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না যে এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত পরামর্শ হিসেবে তিনি এ এম এ মুহিতকে দেশে ফিরে কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্ম-সচিব হিসেবে যোগ দিতে বলেন।[২৪১]

২৯ মে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে এ এম এ মুহিতের সাক্ষাৎ হয়। একই সময়ে বিখ্যাত স্থপতি ফজলুর রহমান খানের নেতৃত্বে শিকাগোয় Defence League of Bangladesh গঠিত হয়। যেটি আমেরিকাতে বাঙালি সংগঠনের সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করতো। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সবার সঙ্গে আলোচনার পর স্থির করেন যে, নিউইয়র্কে মাহমুদ আলীর গঠিত সংগঠনকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা হবে এবং এ এম এ মুহিত ১৫ জুন পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর কোনো একটি বাঙালি সংগঠনে যোগ দিবেন। ৬ জুন শিকাগোতে ফজলুর রহমান খানের বাসায় আরেকটি সভা হয়। এ সভায় এ এম এ মুহিত কয়েকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। প্রথমত, নিউইয়র্কে মাহমুদ আলীকে যে সাহায্য দেওয়ার কথা ছিল তা তখনও দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত, কার্যনির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন সদস্য বারবার দূতাবাসের কর্মচারীদের ওপর চাপ দিচ্ছিলেন আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য কিন্তু নিজেরা আমেরিকাবাসী হওয়া সত্ত্বেও ছদ্মনাম ব্যবহার করছিলেন। এক্ষেত্রে এ এম এ মুহিত প্রশ্ন করেন, তারা যখন নিজেরাই ছদ্মনাম ব্যবহার করছেন তাহলে কীভাবে আশা

[২৪০] আবুল মাল আবদুল মুহিতের সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১-২৫২
[২৪১] ওই, পৃ. ২৫২

করেন যে, দূতাবাসের কর্মচারীরা আনুগত্য প্রকাশ করবেন?[২৪২] ওয়াশিংটনের বাঙালি কূটনীতিকরা একযোগে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পূর্বেই এ এম এ মুহিত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। কারণ ইতিমধ্যে বিশ্বের সকল পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে বিশেষ করে যেখানে বাঙালিরা কর্মরত ছিলেন তাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করে আবু সাঈদ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করেছেন। মুজিবনগর সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিকরা বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন এবং যোগাযোগ করার দায়িত্বটি দেওয়া হয় এ এম এ মুহিতকে। তিনি জানতে পারেন যে, বিচারপতি চৌধুরী ইংল্যান্ডে ফিরে এসেছেন। তখন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এ এম এ মুহিতের যোগাযোগ করার ব্যাপারটি বিচারপতি চৌধুরী প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরবর্তীতে উপলদ্ধি করতে পারেন। কেননা এ এম এ মুহিত যখন বিচারপতি চৌধুরীকে লন্ডনে ফোন করেন তখন ছিল কাকডাকা ভোর। তিনি প্রথমে মুহিতের কথাটি বুঝতে পারেননি। তাই ঘন্টাখানেক পর তিনি নিজে মুহিতকে টেলিফোন করেন। মুহিতের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের সকল বাঙালি পাকিস্তান দূতাবাস কয়েক ঘন্টার মধ্যে পরিত্যাগ করবেন।[২৪৩] উল্লেখ্য যে, এ এম এ মুহিত বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে জানান যে, জুনের পনেরো তারিখে তিনি দূতাবাস ত্যাগ করবেন এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠিত মিশনে যোগ দিবেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এসময় এ এম এ মুহিতকে দুটো উপদেশ দেন। প্রথমত: তাঁর এখন পদত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা মুজিবনগর সরকার গঠন হলেও তা এখনও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করতে সমর্থ হয়নি। তাই তাঁর আরো কিছুদিন অপেক্ষা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত: বিচারপতি চৌধুরী তাঁকে বলেন, এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই ব্যক্তিগত এবং প্রত্যেকেরই উচিত নিজের বিচার বিবেচনা ধীরে সুস্থে প্রয়োগ করা। একদিকে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগে বিলম্ব অন্যদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতে না পারায় বাঙালি কূটনীতিক এ এম এ মুহিত মনোকষ্টে ভুগতে থাকেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, মে মাসটি তাঁর খুব মনোকষ্টে কাটে। ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ছিলেন। আবু সাঈদ চৌধুরীর আশ্বাস তাঁর ভালো লাগে কিন্তু দ্বিধা পুরোপুরি কাটেনি। সবচেয়ে খারাপ লাগছিল দূতাবাসের সহকর্মীরা যখন আগেভাগেই সরে যেতে থাকে। আতাউর রহমান চৌধুরী মাঝে মাঝে মুহিতের খবর নিতেন। আর প্রায় প্রতি রাতে মোয়াজ্জেম ও নিশাত একবার করে মুহিতের সঙ্গে দেখা করে সকল খবর দিতেন। ৩০ জুন এ এম এ মুহিত দূতাবাস থেকে বিদায় নেন এবং ঐদিন বোস্টন থেকে তৈয়ব মাহতাব তাঁর কাছে আসেন। কেননা মাহতাব মুজিবনগরে যাচ্ছেন যোগাযোগ যন্ত্রপাতির জন্য প্রশিক্ষণ দিতে। মুজিবনগর যাওয়ার পূর্বে তাঁর কাছ থেকে মুজিবনগর সরকারের জন্য প্রতিবেদন নিয়ে যাবেন। ওয়াশিংটন থেকে পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলমকে মুহিতের হাতে লেখা সাত পৃষ্ঠার চিঠি ছিল মুজিবনগর সরকারের কাছে ওয়াশিংটন মিশনের প্রথম প্রতিবেদন। ১৭ জুলাই এবং ২৪ জুলাই মুহিতকে আরো দুটি

[২৪২] আবুল মাল আবদুল মুহিতের সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩
[২৪৩] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

প্রতিবেদন পাঠাতে হয়েছিল। তারপর এই কাজটি বাংলাদেশ মিশন গ্রহণ করে এবং ২৪ আগস্ট সেখান থেকে প্রথম প্রতিবেদন প্রেরণ করেন শামসুল কিবরিয়া।[২৪৪]

৩০ জুন এ এম এ মুহিত মুজিবনগর সরকার এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং ২১ জুলাই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে পদত্যাগপত্র পাঠান। ওয়াশিংটনের বাঙালি কূটনীতিক এ এম এ মুহিত ব্যক্তিগত পদত্যাগ সম্পর্কে স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ২১ জুলাই জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্রোহের চিঠি পাঠান। চিঠিতে উল্লেখ করেন, তার অবৈধ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা একটি অসম্মানজনক অবস্থান বলে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ইয়াহিয়াকে বাংলাদেশে গণহত্যা ও অবশ্যম্ভাবী দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করেন। এই চিঠির কিছু অংশ ১৩ আগস্ট *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল 'একজন কূটনীতিবিদের পদত্যাগ: পাকিস্তানের পাপের খতিয়ান'।[২৪৫] এ এম এ মুহিত জানান যে, বন্ধুমহলে সবচেয়ে ভয়ংকর ও ঘৃণিত ব্যক্তি বলে তাঁর সুনাম ছিল। তিনি পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার ঘোষণা দিয়ে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে চিঠি লেখায় অনেকে মন্তব্য করে যে, 'মুহিতকে গুলি করে মারা উচিত'।[২৪৬]

পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর এ এম এ মুহিতের বাসা বেসরকারিভাবে দূতাবাসে পরিণত হয় এবং মুহিত মুজিবনগর সরকারের পক্ষে কাজ শুরু করেন। তবে মুহিতের আনুগত্য প্রকাশের সিদ্ধান্তের খবর সাময়িকভাবে গোপন রাখা হয়। কারণ মুহিতের কিছু সহকর্মীও আনুগত্য প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিলেন এবং তাদের কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল।[২৪৭] ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাসের অন্যান্য বাঙালি কূটনীতিকরা তখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করায় এ এম এ মুহিত জনসমক্ষে কোনো বক্তব্য রাখেননি। তাদের পক্ষ ত্যাগে বিলম্ব হওয়ায় এ এম এ মুহিত নিজেই সিদ্ধান্ত নেন যে, এবার থেকে খোলাখুলিভাবে কথা বলবেন। সিনেটর কেনেডি এ এম এ মুহিতকে আমন্ত্রণ জানান তাঁর পরিবর্তে একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। ২৭ জুলাই এনবিসি টেলিভিশনে 'কমেন্টস' অনুষ্ঠানে এ এম এ মুহিত আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাখ্যা করেন কেন পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেছেন। অনুষ্ঠানটি ১ আগস্ট প্রচারিত হয়।[২৪৮] কিন্তু এ এম এ মুহিত ১৫ জুন তারিখের পরিবর্তে ৩০ জুন দূতাবাস ত্যাগ করা প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন–

> সাত জুন জানলাম যে, পাকিস্তান সরকার দয়াপরবশ হয়ে জুনের শেষে আমার পদ বিলুপ্ত করে দেবেন। তাই আমি আরো পনেরো দিন পাকিস্তানের ভাত সাবাড় করতে স্থির করি। তারা অবশ্যি আরো দয়া প্রদর্শন করে আমাকে পিন্ডিতে শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব হিসাবে নিযুক্তি দেন। তবে পিন্ডি থেকে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি ডেভিড গর্ডন বার্তা পাঠালেন যে, আমি যেন পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব করি, অবশ্যি এই বার্তাটি ছিল একান্ত ব্যক্তিগত।[২৪৯]

---

[২৪৪] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২-১১৩

[২৪৫] *The Washington Post*, 13 August 1971

[২৪৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪

[২৪৭] আবুল মাল আবদুল মুহিতের সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩

[২৪৮] ওই, পৃ. ২৫৪

[২৪৯] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগে কম-বেশি বিলম্ব ঘটেছে। তবে এক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক যেমন কারণ ছিল তেমনি অনেকে পরিবার নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। তাই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়ে যায়। আবার অধিকাংশ কূটনীতিকের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের পরিবারবর্গ অর্থাৎ স্ত্রীদের অনুপ্রেরণায় তারা ভবিষ্যতে কী হবে তা না ভেবেই পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমন কয়েকজন বাঙালি কূটনীতিকের কথা জানা যায়, যাদের স্ত্রীরা পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগে তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। যেমন- এনায়েত করিম, এম এ মুহিত, শামসুল কিবরিয়া ও এ এইচ মাহমুদ আলী প্রমুখ। যাদের প্রত্যেকের স্ত্রীরা মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ২৭ মার্চ এ এম এ মুহিতের বাসায় ওয়াশিংটনের বাঙালি সমাজ সমবেত হলে তিনি ঘোষণা করেন যে, 'পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে এবং আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।' এ এম এ মুহিত যখন এ কথা বলেন তখন তাঁর ছেলেমেয়েরা সবাই ছোট। এমনকি সবচেয়ে ছোট সন্তানটি টিভিতে বাংলাদেশের নাম শুনলে উত্তেজিত হয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। ছোট সন্তানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার কোনো সুযোগ মুহিতের ছিল না। এছাড়া এক মাসের বেশি সময় ধরে দেশের কারো সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ পেয়েছেন। কিন্তু সবকিছুর পরও দূতাবাস ছেড়ে একটি অনিশ্চিত জীবনের পথে পা বাড়ানোর পেছনে একমাত্র পরামর্শদানকারী ছিলেন তাঁর স্ত্রী।[২৫০]

মাহমুদ আলী ছাড়া অন্য কোনো কূটনীতিক সরাসরি বাংলাদেশের পক্ষে অনেক দিন ধরে না আসায় বাঙালি মহলে যথেষ্ট অসন্তোষ গড়ে ওঠে। শিকাগোর ফজলুর রহমান খান এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দূত রেহমান সোবহান বাঙালি কূটনীতিকদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যান। অবশেষে মুজিবনগর সরকার ৫ জুলাই বাঙালি কূটনীতিকদের আনুগত্য পরিবর্তন করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশনামা সব জায়গায় পাঠানো হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে কূটনীতিক সার্ভিসের সদস্য ছাড়া অন্য কারো কাছে পৌঁছেনি। ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কের কূটনীতিকরা মুজিবনগর সরকারের প্রথম আহ্বানেই সাড়া দিয়ে ৪ আগস্ট সবাই একত্রে আনুগত্য পরিবর্তন করেন।[২৫১] অবশ্য তাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ওয়াশিংটনের পাকিস্তানি দূতাবাসে যে সমস্ত বাঙালি কূটনীতিক কর্মরত ছিলেন তাদের সঙ্গে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী দেখা করেন। এ বৈঠকে কেউ কেউ তাঁদের বর্তমান বেতন, সুযোগ-সুবিধাদি যা তাঁরা ভোগ করছেন তা তুলে ধরেন। বাংলাদেশ সরকারে যোগ দিলে বেতন ও সুযোগ-সুবিধাদির কী অবস্থা হবে, বাড়ি যতো বড় বা যে এলাকায় পেয়েছেন, অনুরূপ এলাকা ও তুল্য আয়তনের বাড়ি মিলবে কিনা, এ রকম জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন স্বভাবতই তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই এসেছিল।[২৫২]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার ক্ষেত্রে এসময় কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়। বাঙালি কূটনীতিক এস এ করিম দূতাবাসের কাজে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে গিয়েছিলেন। তিনি নিউইয়র্ক পাকিস্তান মিশনের দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত বাঙালি কর্মকর্তা ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি প্রথম থেকেই এ এইচ

---

[২৫০] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮
[২৫১] সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৭
[২৫২] মফিজ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

মাহমুদ আলী ও এ এম এ মুহিতের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ বজায় রাখতেন। আফ্রিকা সফর শেষ করে ওয়াশিংটনে ফিরে তাঁর সহকর্মীদের জানান যে, পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করার আর কোনো যৌক্তিকতা নেই এবং বাংলাদেশ সরকারের ডাকে সাড়া দিতে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। তিনি বলিষ্ঠভাবে একে একে সকল কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান।[২৫৩] এ এম এ মুহিতের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, ১ আগস্ট রবিবার এস এ করিম রাজনৈতিক কাউন্সেলর শামসুল কিবরিয়ার বাড়িতে আসেন এবং এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত সকল বাঙালি কূটনীতিকরা সমবেত হন। সেখানেই এ এম এ মুহিতকে সভায় যোগ দেওয়ার জন্য বলা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ৪ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিকরা একসঙ্গে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করবেন। কিন্তু এসময় তাদের সামনে সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় এনায়েত করিম। উল্লেখ্য যে, এনায়েত করিম হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু শামসুল কিবরিয়ার বাড়িতে অনুষ্ঠিত সভায় তাঁর পরিবর্তে মিসেস এনায়েত করিম (হুসনা করিম) যোগ দেন। মিসেস এনায়েত করিম সেখানে জানান যে, তাঁর স্বামী হাসপাতালে যাওয়ার পূর্বে আনুগত্য পরিবর্তনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার কোনো পরিবর্তন হবে না। যদি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু অন্যান্যদের মতামত ছিল এনায়েত করিমের স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা মুজিবনগর সরকারকে অবহিত করা প্রয়োজন এবং তাঁর সঠিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।[২৫৪] এনায়েত করিম একসময় বামপন্থি ছাত্র রাজনীতি করে জেলে গিয়েছেন। আর সেখানেই শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগদান করলেও রাজনীতির প্রতি তাঁর স্বভাব সুলভ দুর্বলতা ছিল।[২৫৫] কূটনীতিক এনায়েত করিম এর ব্যাপারে মুজিবনগর সরকারের কাছ থেকে কোনো নির্দেশনা তখনো পাওয়া যায়নি। এনায়েত করিম ওই অবস্থাতেও পাকিস্তানের দূতাবাসে না থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল- 'ইয়াহিয়ার মতো নরপশুর অধীনে চাকরিরত অবস্থায় মরতে চান না। স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবেই মরতে চান।'[২৫৬] পাকিস্তানি হিসেবে তিনি মরতে চান না। সবাই মিলে ঠিক করা হলো পরবর্তী করণীয়।[২৫৭] মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কলকাতায় বাংলাদেশের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ ও পরবর্তীতে মুজিবনগর সরকারের প্রেরিত প্রতিনিধি অধ্যাপক রেহমান সোবহানের আগমন তাদেরকে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। তাই প্রাথমিকভাবে ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাসের সকল বাঙালি কূটনীতিক ও কর্মকর্তাগণ ঐকমত্যে পৌঁছান যে, তারা ১৫ জুন একসাথে দূতাবাস ত্যাগ করবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বাঙালি কূটনীতিক এনায়েত করিম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় তাদেরকে সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয়।[২৫৮] এ সময় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এনায়েত করিমের সঙ্গে বাঙালি কূটনীতিকদের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি এতে সম্মতি প্রদান

---

[২৫৩] আবুল মাল আবদুল মুহিতের সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫
[২৫৪] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২
[২৫৫] জাওয়াদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭
[২৫৬] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮
[২৫৭] আসমা কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
[২৫৮] এ এফ সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

করেন। যার সমর্থন রয়েছে এ এম এ মুহিতের স্মৃতিকথায়। এনায়েত করিম জানান যে, তাঁর অসুস্থতার কারণে অনেক সহকর্মীর মন ভেঙ্গে গিয়েছে। তবে সকলের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে হয়েছে ৪ আগস্ট সবাই পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান। ইতিমধ্যে তাঁকে পাকিস্তানি বাড়ি থেকে স্থানান্তরের সকল প্রস্তুতি তাঁর সহকর্মীরা নিয়েছে। এমনকি তাঁর ব্যাপারে মুজিবনগরের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। এনায়েত করিম অবশ্য এ বিষয়ে ভাববার কোনো অবকাশ না দিয়েই জানিয়ে দেন যে, তাঁর অসুস্থতার কারণে পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। তাঁর স্ত্রী নির্দিষ্ট সংবাদ সম্মেলনে তাঁর পক্ষ থেকে অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে উপস্থিত থাকার কথা জানান।[২৫৯]

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে শামসুল কিবরিয়া পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে নির্দেশ পান যে, তাঁকে কাবুলে মিনিস্টার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শামসুল কিবরিয়ার বক্তব্য ছিল-

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আগা হিলালী একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ হলেও বাঙালিদের আবেগের গভীরতা ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আত্মত্যাগের প্রস্তুতি সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। দূতাবাস ত্যাগ করার পূর্বে, তারই পরামর্শে, আমাকে কাবুল দূতাবাসে মিনিস্টার হিসেবে বদলি করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য কাবুল যাওয়ার পথে পাকিস্তানে আমাকে আটক করা। কারণ তখন পাকিস্তান হয়েই আফগানিস্তান যেতে হতো। কিন্তু আমি এই ষড়যন্ত্রের কথা আঁচ করে কাবুল যেতে অস্বীকার করেছিলাম।[২৬০]

পাকিস্তান সরকারের এরূপ সিদ্ধান্তে সাড়া না দিয়ে শামসুল কিবরিয়া কাবুলে না যাওয়া মনস্থ করেন। তিনি বরং পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ৪ আগস্ট শামসুল কিবরিয়া সহ ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিক ও কর্মচারীরা একযোগে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[২৬১] পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর শাহ এ এম এস কিবরিয়ার মন্তব্য ছিল- 'পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করার পর নিজেকে অনেকটা মুক্ত ও হালকা মনে হলো।'[২৬২] ৪ আগস্ট শাহ এ এম এস কিবরিয়া সপরিবারে মার্কিন সরকারের ইমিগ্রেশন অফিসে গিয়ে কর্মকর্তাদের জানান যে, তিনি দূতাবাস ত্যাগ করেছেন। কর্মকর্তারা তাদের কূটনৈতিক পাসপোর্টের মধ্যে লিখে দিলেন তিনি আপাতত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে পারবেন। তবে কতদিন থাকতে পারবেন সেই বিষয়টি তখন উল্লেখ করা হয়নি।[২৬৩] ৪ আগস্ট ৬ জন কূটনীতিকসহ ১৪ জন বাঙালি পাকিস্তান দূতাবাস পরিত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের ভাষ্য প্রমাণ করে যে আমেরিকায় পাকিস্তানি দূতাবাস সত্যি সত্যি পশ্চিম পাকিস্তানি দূতাবাসে পরিণত হলো। উল্লেখ্য যে, ৪ আগস্ট বাঙালি কূটনীতিকরা যখন ওয়াশিংটনের প্রেসক্লাবে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার ঘোষণা দেয় তার কিছুক্ষণ পর সকাল ১১ টায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন হোয়াইট হাউসে তাঁর চীন উদ্যোগ সম্পর্কে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। এ সংবাদ সম্মেলনে নিক্সন পাকিস্তান সম্পর্কে তাদের তিনটি উদ্যোগের কথা জানান-

---

[২৫৯] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩
[২৬০] *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৩
[২৬১] এ এফ সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২
[২৬২] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯
[২৬৩] ওই, পৃ. ৯৭-৯৮

ক. শরণার্থীদের জন্য এবং বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ ব্যাহত করার জন্য মার্কিন উদ্যোগের বিবরণ দেন।

খ. শরণার্থী এবং বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য মার্কিন উদ্যোগ সফল করার জন্য সেক্রেটারি বিল রজার্স জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে শীগ্রই বৈঠক করবে।

গ. কংগ্রেসের আপত্তির বিষয়ে তার ঘোর আপত্তি জানান।

রিচার্ড নিক্সনের মতে, পশ্চিম পাকিস্তানে সাহায্য অব্যাহত রাখলে সেখানে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ থাকবে এবং এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষ নিরসন ও ভারতে শরণার্থী প্রবাহ রোধ করা যাবে।

ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাসের আনুগত্য পরিবর্তনকারী দলকে সংবাদ সম্মেলনে পরিচয় করিয়ে দেন এ এম এ মুহিত। প্রায় সকলের পরিবার সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তবে সংবাদ সম্মেলনে সকলের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন মিসেস হুসনা করিম। কারণ ইতিমধ্যে সকলের মধ্যে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর স্বামী তখন হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে গুরুতর অসুস্থ। দলের নেতা সৈয়দ আনোয়ারুল করিম সকলের পক্ষ থেকে তাঁর বিবৃতি প্রদান করেন।[২৬৪]
সংবাদ সম্মেলনে বাঙালি কূটনীতিকদের পক্ষ ত্যাগ অনুষ্ঠানের অন্যতম মুখপাত্র এ এম এ মুহিত বলেন-

> . . . he and his colleagues' felf they could no longer remain silent while the Pakistan Government "violates elementary norms of civilized conduct and commits crimes against humanity."
> The group announced that it would shift its allegiance to the "Government of Bangladesh," or "Bengal Nation," which it said represented the "hopes and aspirations of the majority or the people of "what used to be Pakistan." [২৬৫]

ওয়াশিংটনের বাঙালি কূটনীতিকরা দূতাবাস ত্যাগ করার পর টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের দূতাবাস ত্যাগের ঘটনাটি বেশ ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল। ৬ জন বাঙালি কূটনীতিকের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের সংবাদ *নিউ ইয়র্ক টাইমস* ও *ওয়াশিংটন পোস্টে* প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য ওয়াশিংটন দূতাবাস ত্যাগ করার পর বাঙালি কূটনীতিকরা মুজিবনগর সরকারের কাছ থেকে সরকারি সমর্থন পান। তারা জানতে পারেন যে, শিগগিরই ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপন করা হবে এবং দূতাবাসের প্রধান হিসেবে সাংসদ মোস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী (এম আর সিদ্দিকী) ওয়াশিংটনে আসবেন।[২৬৬] উল্লেখ্য যে, ২৩ জুন নিউইয়র্কে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এ কনভেনশনে যুক্তরাষ্ট্রে একটি বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৬৭] আগস্টের প্রথম সপ্তাহে এম আর সিদ্দিকী ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হিসেবে যোগ দেন। এ সময় আনুষ্ঠানিক ভাবে ১২২৩ কানেকটিকাট এভিনিউতে মিশন স্থাপিত হয়। এম আর সিদ্দিকী মিশন প্রধান হিসেবে যোগদানের পর মিশন গতিশীল হয়। তিনি কানাডার টরেন্টো ও যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস সহ বেশ কিছু জায়গায় সম্মেলনে যান। এ সম্মেলনে বিখ্যাত বেতার সাংবাদিক স্ট্যানলি বার্ক ও কানাডীয়

---

[২৬৪] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫
[২৬৫] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ১৯৪
[২৬৬] এ এফ সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২
[২৬৭] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২

কূটনীতিবিদ স্যার হিউ কিনলিসাইড উপস্থিত ছিলেন।[২৬৮] মুজিবনগর সরকারের প্রচেষ্টায় ৪ আগস্ট ওয়াশিংটনে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাস ও নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘ দপ্তরে পাকিস্তান মিশনের মোট ১৫ জন বাঙালি কূটনীতিক একযোগে পদত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। এদের মধ্যে ছিলেন চ্যান্সেরির প্রধান ও মন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন এনায়েত করিম, জাতিসংঘে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের স্থায়ী উপনেতা সৈয়দ আনোয়ারুল করিম। পদত্যাগ করে এসব কূটনীতিকরা মার্কিন সরকারের নিকট অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন জানান এবং মার্কিন সরকার তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর করে।[২৬৯] ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাঙালি কূটনীতিকদের নেতা সৈয়দ আনোয়ারুল করিম বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার পূর্ববঙ্গ সমস্যার অর্থবহ রাজনৈতিক সমাধান করতে রাজি নয় বলে তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন। সম্মেলনে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বর আক্রমণের ফলে পূর্ববঙ্গে হত্যা ও বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম হয়েছে। এরপর বাঙালি অফিসারদের পক্ষে মুখ বুজে থাকা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশকে উপনিবেশে পরিণত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাঙালি অফিসাররা সংগ্রামরত লক্ষ লক্ষ জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছে।[২৭০]

পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর সৈয়দ আনোয়ারুল করিম যে বিবৃতি দেন তা *নিউইয়র্ক টাইমস* এ প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম ছিল Our Moment of Decission. বিবৃতিতে তিনি বলেন- গণতন্ত্র ও জুলুমবাজের মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার এখন সময় এসেছে এবং আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে সমর্থন করার আবেদন জানাচ্ছি যাতে ফ্যাসিবাদ ও উপনিবেশবাদের অপশক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। একটি জাতিকে হত্যা ও ধ্বংস বন্ধের জন্য আমরা বিশ্বের সকল দেশকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে আহ্বান করছি। এই মুহূর্তে পশ্চিম পাকিস্তানকে কোনোরকম অর্থনৈতিক বা সামরিক সাহায্য দানের প্রশ্নই উঠে না। এই রকম সাহায্য শুধু গণহত্যাকেই প্রশয় দিবে। আমরা এদেশের জনগণ ও সংবাদ মাধ্যমকে বাংলাদেশের সংগ্রামে অকুণ্ঠ সমর্থন দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা তো আসলেই তোমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা পাচ্ছি।[২৭১]

ওয়াশিংটনের ১৫ জন বাঙালি কূটনীতিক একযোগে পদত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ এসব কূটনীতিকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন 'জল্লাদ এহিয়া সরকারের থেকে আনুগত্য অস্বীকার করে এই কূটনীতিকগণ বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন।'[২৭২] কূটনীতিকদের অভিনন্দন জানিয়ে খোন্দকার মোশতাক আহমেদের বক্তব্য প্রেস বিজ্ঞপ্তি আকারে মুজিবনগর সরকার থেকে প্রকাশিত হয়-

---

[২৬৮] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩
[২৬৯] শামসুল হুদা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩
[২৭০] *Financial Times* (London), 5 August 1971
[২৭১] *The New York Times*, 5 August 1971
[২৭২] *সোনার বাংলা*, ১৪ আগস্ট ১৯৭১

‘What makes such top-ranking responsible diplomats choose a course of action packed with sacrifice, trial and turmoil should be a question to ponder’, the Minister said.
‘This mass transfer of allegiance to Bangladesh by Bengali diplomats is another clarion call to all others at home and abroad who may still be in the employ of the Government of Pakistan to sever their connections and pledge themselves to save the lives and honour of their own country and compatriots.’
‘With trust in God and democracy, with reverence for human life and dignity, let the people of Bangladesh move forward to take their place in the comity to nations”, Khandaker Moshtaque Ahmed concluded. [২৭৩]

কলকাতা বাংলাদেশ মিশনের প্রধান এম হোসেন আলীও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিকদের পদত্যাগে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন-

I am very pleased at the inspiring news that all the Bengali diplomats posted with the Pakistan missions at New York, and Washington D.C. have joined the war of independence. They have thus broken the shackles of slavery, and exercised the right of independence as free citizens of sovereign Bangladesh.
Their decision reflects one big step towards the fulfilment of the objective that I had on April 18 at the time I raised the Bangladesh flag on this Mission in Calcutta. I had believed then that my Bengali colleagues in the Pakistan Foreign Service would sooner of later come forward to join hands with me to reach the same destiny.
These distinguished diplomats have been my old friends. I welcome them in the family.
I urge all the remaining Bengali diplomats and other officials serving the Government of Pakistan, wherever they are, to cut off all links with the enemy.[২৭৪]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করার পর তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে দিল্লিস্থ বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্রের প্রধান কে এম শিহাবুদ্দিন এক বিবৃতি দেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন-

This mass transfer of allegiance to Bangladesh by Bengali diplomats in the U.S.A and at the U.N. is a step in the right direction. We congratulate them most heartily and welcome them to the fold of the most elevated rank of the freedom fighters.
This has proved again that no Bengali, except under duress, can serve the alien, barbarous government of Islamabad, which has been perpetrating planned genocide on his unarmed, innocent brothers and sisters, and which is at war with his motherland. I am confident this will also set an example to scores of others who are still associated with the barbarous government of Pakistan inside and abroad, to come out to serve their motherland – free Bangladesh.[২৭৫]

---

[২৭৩] Sukumar Biswas edited, *Bangladesh Liberation War Mujibnagar Government Documents 1971*, Dhaka: Mowla Brothers, 2005. p. 73
[২৭৪] *Ibid*, p. 75
[২৭৫] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 121

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান দূতাবাস থেকে বাঙালিদের পদত্যাগের এসব ঘটনাকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান। এ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাস এবং জাতিসংঘে কর্মরত বাঙালিরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করে। এটি ছিল একটি বিশাল কূটনৈতিক অভ্যুত্থান। কারণ এটি ছিল বড় একটি দল এবং এদের মধ্যে ছিলেন পদের দিক থেকে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। বিদ্রোহী এই গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য জাতিসংঘের পাকিস্তান মিশনের উপ স্থায়ী প্রতিনিধি এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এস এ করিম চলে আসেন নিউইয়র্ক থেকে। এই দলটি সকলের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে। একজন বাঙালি শুধু এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না- তিনি এনায়েত করিম। সংবাদ সম্মেলনের মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবুও তিনি রোগশয্যায় থেকেই অন্যান্য বাঙালির সঙ্গে তাঁর একাত্মতা ঘোষণা করেন।[২৭৬]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কূটনীতিকের মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করা ও কিছু কূটনীতিকের বিলম্বে পক্ষ ত্যাগ করেছেন। কূটনীতিবিদদের একটি বড় অংশ এভাবে সরে যাওয়ায় পাকিস্তান সরকারের নৈতিক পরাজয় ঘটে। পাকিস্তান সরকার গোড়া থেকেই দাবি করে আসছিল যে, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম মুসলিম পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করার ভারতীয় ষড়যন্ত্র এবং এতে বাঙালি মুসলমানদের কোনো সমর্থন নেই। আসলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার দুই দিনের মাথায় নয়াদিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের কে এম শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক পদত্যাগ করেন। সেই থেকে শুরু হয় কূটনীতিকদের পক্ষ ত্যাগের হিড়িক। অন্যরা তাঁদের অনুসরণ করেন। অবশ্য অনেকে **১৯৭১** সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে ও নভেম্বরে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেন। যখন তাঁরা নিশ্চিত হন যে, তাঁদের হারানোর কিছু নেই, তখনই তাঁরা পক্ষ ত্যাগ করেন।[২৭৭] কূটনীতিকদের দিক থেকে চিন্তা করলে অনায়াসেই বলা যায় পক্ষ ত্যাগ করে তাঁরা লাভবানই হয়েছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালি পদস্থ কূটনীতিকদের পাশাপাশি এসময় দূতাবাসে কর্মরত অনেক বাঙালি কর্মচারীও পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে। তন্মধ্যে সবার আগে আবদুর রাজ্জাক খানের নাম উল্লেখ করতে হয়। মে মাসের **১১** তারিখ গালাগার সাব কমিটির শুনানি শুরু হয়। প্রথম দিন তাতে বক্তব্য রাখেন চেয়ারম্যান গালাগার এবং সিনেটর কেনেডি। বাংলাদেশের অবস্থা এবং বিশেষ করে শরণার্থী ও ত্রাণ সমস্যার ওপরে ছিল এই শুনানি। এই শুনানিতে অনেকের মধ্যে ওয়াশিংটন দূতাবাসের কর্মচারী আবদুর রাজ্জাক খান উপস্থিত ছিলেন। রাজ্জাক পঞ্চাশ দশকের শেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে লন্ডনে যান। কিন্তু পরে তিনি ব্যারিস্টারি পড়া বাদ দিয়ে আমেরিকায় পাড়ি দেন এবং পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে **১৯৬৪** সালে দূতাবাসে সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার চাকরি নেন। তাঁর সঙ্গে আমেরিকার পাকিস্তানি

---

[২৭৬] রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩
[২৭৭] ফারুক আজিজ খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২-১৪৩

ছাত্রগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১১ মে আবদুর রাজ্জাক খান দূতাবাস থেকে ছুটি নিয়ে গালাগার শুনানিতে যান। কিন্তু পাকিস্তান তখন সর্বত্রই মারমুখো আচরণ প্রকাশ করে। গালাগার শুনানিতে অংশ নেওয়ার সংবাদ পাকিস্তান দূতাবাসে পৌঁছে যায়। শাস্তিস্বরূপ পাকিস্তান দূতাবাস ১৭ মে আবদুর রাজ্জাক খানকে বরখাস্ত করে। আবদুর রাজ্জাক খান বাংলাদেশ লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চাকরিচ্যুত হয়ে তিনি সিআরএল গ্রুপের উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। রেহমান সোবহান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছলে তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র (Bangladesh Information Centre) প্রতিষ্ঠা করা হলে তিনি এতে কাজ করেন। বাংলাদেশ মিশন আগস্ট মাসে স্থাপিত হলে তিনি সেখানে যোগ দেন এবং বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র দফতরে পরে আত্মীভূত হন। কিছুদিন নিউইয়র্ক স্থায়ী মিশনে কাজ করার পর তিনি জাতিসংঘ সদর দফতরে যোগ দেন।[২৭৮] আবদুর রাজ্জাক খানকে বরখাস্তের প্রতিবাদ করেন তিনজন কর্মচারী ফজলুল বারি, মুহিদ আহমদ চৌধুরী ও মোশতাক আহমদ। এতে পাকিস্তান দূতাবাস প্রথমে ফজলুল বারি ও পরে মুহিদ আহমদ চৌধুরীকে বরখাস্ত করে। মোশতাক আহমদ দূতাবাসকে কোনো সুযোগ না দিয়ে ৪ আগস্ট নিজেই আনুগত্য পরিবর্তন করেন। নিউইয়র্কের দুজন কর্মচারী মোহাম্মদ গোফরান এবং জাকিউল হক চৌধুরীকে জুন মাসে কোনো না কোনো অজুহাতে বহিস্কার করা হয়।[২৭৯] এসব স্থানীয় বাঙালি কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগ না দেওয়ায় পাকিস্তান দূতাবাসের প্রধান বাঙালি কূটনীতিকদের দিয়ে তাদের বরখাস্ত আদেশে স্বাক্ষর করাতো। তাদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল Misconduct বা অসদাচরণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে এসময় বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি কর্মরত ছিলেন। তাদের মধ্যে এ এম এ মুহিতের সমপর্যায়ে প্রশাসক ছিলেন সৈয়দ শাহিদ হোসেন, আবুল ওয়াসে মইনি এবং বশির আহমদ। আবদুর রাজ্জাক খানকে পাকিস্তান দূতাবাস থেকে চাকরিচ্যুত করাকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটনের বাঙালি কূটনীতিকদের মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক পরিবেশ তৈরি হয়। গালাগার শুনানিতে অংশ নেওয়ার অপরাধে ১৭ মে পাকিস্তান দূতাবাস আবদুর রাজ্জাক খানকে বহিস্কার করে। দূতাবাসের বাঙালি কর্মচারীরা এক সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, বাঙালিদের মধ্যে কাউকে যদি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয় তাহলে সবাই একযোগে এর প্রতিবাদ করবে এবং সেদিন হবে তাদের আনুগত্য পরিবর্তনের সময়। ১৭ মে তারিখের বিকেলে সবাই আবু রুশদের বাড়িতে সমবেত হন। এখানেই প্রথম সকলের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। কারো মত ছিল যে, রাজ্জাক আক্রান্ত হওয়ায় পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকলেরই দূতাবাস পরিত্যাগ করা উচিত। ভিন্নমত হলো যে রাজ্জাক স্থানীয় কর্মচারী, পুরোপুরি কূটনীতিক নয়। সুতরাং কূটনীতিকদের ওপর আক্রমণ এখনো হয়নি। তাই কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার সময় আসেনি। সিদ্ধান্ত হয় যে, সম্মিলিতভাবে বাঙালিরা কোনো প্রতিবাদ করবে না তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি প্রতিবাদ করে কোনো পদক্ষেপ নেয় তাতে আপত্তি জানাবে না। এ সিদ্ধান্তে দূতাবাসের কয়েকজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী ক্ষুণ্ন হন। তাদের মধ্যে তিনজন ফজলুল বারি, মুহিদ চৌধুরী এবং মোশতাক চৌধুরী এ এম

---

[২৭৮] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১; *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ২০ মে ১৯৭১
[২৭৯] সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৭

এ মুহিতের কাছে যান আলাপ-আলোচনা করার জন্য। তারা জানায় যে, চাকরির তোয়াক্কা তারা করে না কিন্তু তাদের প্রতিবাদ করতে হবে। অবশেষে তাদের নিয়ে এ এম এ মুহিত একটি প্রতিবাদলিপি তৈরি করেন এবং ১৯ মে তা রাষ্ট্রদূতের কাছে দেন। ২৬ মে প্রথমে ফজলুল বারি এবং ৯ জুন মুহিদ চৌধুরী বরখাস্ত হন। মোশতাককে বরখাস্ত করা হয়নি তবে ৪ আগস্ট সে নিজেই পদত্যাগ করে। হিউবার্ট মিচেল নামে একজন অ্যাডভোকেট ফজলুল বারি ও মুহিদকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করেন এবং চাকরির বন্দোবস্ত করে দেন।[২৮০]

জাতিসংঘের সদর দপ্তর আমেরিকায় অবস্থিত এবং পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দূতাবাস ওয়াশিংটনে রয়েছে বলে বৈদেশিক কূটনৈতিক মহলেও মুক্তিযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে একসঙ্গে ১৫ জন বাঙালি কূটনীতিক কর্মকর্তা পদত্যাগ করার নজির কোথাও নেই। যাদের মধ্যে আবার পদস্থ কূটনীতিকের সংখ্যাই বেশি। বিশ্বব্যাপী মুহূর্তের মধ্যেই এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানের সামরিক সরকার শুরু থেকে এমন একটি বিষয় ঘটতে পারে মনে করে সেখানকার অনেক কূটনীতিককে পাকিস্তানে ডেকে পাঠিয়েছিল, আবার অনেককে অন্যস্থানে বদলি করেছিল। কিন্তু তাদের কেউ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এ আদেশ গ্রহণ করেনি। তারা নিজের দেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া শ্রেয় মনে করেন। বাঙালি কর্মচারীরা নিজেদের উদ্যোগেই কূটনীতিকদের পাশাপাশি পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছেন। তবে শুরুর দিকে বাঙালি কূটনীতিক ও কর্মচারীদের মধ্যে যে একটি প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব ছিল সে কথাও জানা যায়। দূতাবাসে যে সকল বাঙালি ছিল তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের এ বিভাজন প্রকাশ্যে নয় মানসিক চিন্তার দিক থেকে। দূতাবাসের সাধারণ কর্মচারীরা মনে করতেন যে, কূটনীতিক মর্যাদার কর্মকর্তারা সঠিকভাবে তাদের সমর্থন করবে না। তাই সবাই নিজের মতো পথ অনুসন্ধান করতে থাকে। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ প্রায়ই ধমক দিয়ে অথবা কড়া ভাষায় কূটনীতিকদের কাছে চিরকুট পাঠাতো।[২৮১] এমন দ্বান্দ্বিক পরিবেশ শুরুতে বিদ্যমান থাকলেও সময়ের পরিক্রমায় তা দূর হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিকদের পথ অনুসরণ করে বাঙালি কর্মচারীরাও তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন।

যুক্তরাজ্য

বাংলাদেশ তথা বিশ্বের অনেক দেশের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম নির্ভরযোগ্য স্থান বলা হয় যুক্তরাজ্যকে। লন্ডনে ভারতের পর বাংলাদেশের বাঙালিদের সংখ্যা বেশি ছিল। যুক্তরাজ্য গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে এবং মানবাধিকার রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তৎকালীন সময়ে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে নানা পেশা ও কর্মে নিয়োজিত ছিল বাঙালিরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো যুক্তরাজ্যের পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিকরাও পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। অন্যান্যদের মতো যুক্তরাজ্যের বাঙালি কূটনীতিকরাও মার্চের শুরু থেকেই বাংলাদেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইট নামে নিরপরাধ মানুষ হত্যার যে ঘৃণ্য কর্ম শুরু করে তা বিশ্ব গণমাধ্যমের কল্যাণে অল্প সময়ের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতে মুজিবনগর সরকার গঠন এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে

[২৮০] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২
[২৮১] *ওই*, পৃ. ৫৫

মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগের কথা জানার পর লন্ডনের বাঙালি কূটনীতিকরা আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধকালীন লন্ডনস্থ বাঙালি দূতাবাসে সাত-আটজন বাঙালি কর্মরত ছিলেন। তবে এদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন লন্ডনের পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমদ। ইউরোপে কর্মরত পাকিস্তানি কূটনীতিকদের মধ্যে মহিউদ্দিন আহমদ সর্বপ্রথম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১ আগস্ট এ্যাকশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ট্রাফালগার স্কোয়ারের জনসভায় যাওয়ার পূর্বে মহিউদ্দিন আহমদ টেলিফোনে বিচারপতি চৌধুরীকে জানান, তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে প্রস্তুত। বিচারপতি চৌধুরী তাঁর প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে গোরিং স্ট্রিটে বাংলাদেশ এ্যাকশন সমিতির অফিসে কথা বলেন। পরে তাঁকে টেলিফোনে সপরিবারে তাঁর বাসায় আসার জন্য বলেন। পাঁচ মিনিট পর মহিউদ্দিন আহমদ তাঁর স্ত্রী সোহেল আখতার পান্নাকে নিয়ে বিচারপতি চৌধুরীর বাসায় উপস্থিত হন। সেখান থেকে তারা দুজন সরাসরি ট্রাফালগার স্কোয়ারে যান। অবশ্য বিচারপতি চৌধুরী ট্রাফালগার স্কোয়ারে যাওয়ার পূর্বে লন্ডন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ফোন করে মহিউদ্দিন আহমদের বাড়ির ওপর সম্ভাব্য হামলা প্রতিহত করতে পুলিশকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। যদিও মহিউদ্দিন আহমদ তাঁর বাড়ি খালি করে চলে এসেছিলেন। কিন্তু বিচারপতি চৌধুরীর আশঙ্কা ছিল মহিউদ্দিন আহমদ আনুগত্য প্রকাশের ঘোষণা দেওয়ার পর তাঁর ও তাঁর বাড়ির ওপর হামলা হতে পারে। পলকানেটের নেতৃত্বাধীন এ্যাকশন বাংলাদেশের উদ্যোগে ১ আগস্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারের সভায় বিচারপতি চৌধুরীর বক্তৃতার পর লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনে নিয়োজিত দ্বিতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমদ বক্তৃতা দেন। জনতার বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মহিউদ্দিন আহমদ ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে তিনি বেঁচে থাকতে চান।[২৮২] তাঁর বক্তব্য সমবেত শ্রোতাদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য যে, মহিউদ্দিন আহমদ সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন তিনি ২৫ মার্চের গণহত্যার সংবাদ জানার পর থেকেই পাকিস্তান সরকারের চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্ত সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে তাঁর চারমাস সময় লেগে যায়। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তাঁর এ ঘোষণাটির ব্যাপারে দুটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে লন্ডনের *ডেইলি টেলিগ্রাফ* পত্রিকা ও বিবিসি। ১০ এপ্রিল বিচারপতি চৌধুরী বিবিসি অফিস থেকে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান শেষে বের হওয়ার পথে লন্ডনের সাংবাদিক সিরাজুর রহমান লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমদ এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। মহিউদ্দিন আহমদ বিচারপতি চৌধুরীকে বলেছিলেন, 'স্যার, আমি কিন্তু নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। আপনারা ডাকলেই আমাকে পাবেন।'[২৮৩] পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মহিউদ্দিন আহমদকে বলেন, 'আপনি তো সরকারি চাকরি করেন আপনি এখানে এসেছেন কেন? আরো বললো আপনার

[২৮২] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪
[২৮৩] গবেষকের সঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মার্চ ২০১৮

তো সাহস কম না। আপনি এভাবে এসেছেন, আমার সাথে কথা বলছেন কেউ দেখে ফেললে আপনার সমস্যা হবে।' কিন্তু প্রত্যুত্তরে মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, 'স্যার আপনি যদি বলেন তাহলে আজকেই আমি পদত্যাগ করবো।' বিচারপতি চৌধুরী মহিউদ্দিন আহমদকে বললেন 'না, আপনি এখন চাকরি ছাড়বেন না। কারণ আমার নিজের অবস্থান কি, আমি কি দায়িত্ব পাবো সেটা আমি এখনও জানি না।'[২৮৪] তখনও মুজিবনগর সরকার গঠন হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেনি। এমনকি লন্ডনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যারা কাজ করছে তাদেরও কোনো সংগঠন গড়ে ওঠেনি। মহিউদ্দিন আহমদ পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পূর্বে লন্ডন স্টিয়ারিং কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাদের কাছে তিনি পাকিস্তান দূতাবাস থেকে বেরিয়ে আসার কথা ব্যক্ত করেছেন। এ ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায় শেখ আবদুল মান্নান এর গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন- মহিউদ্দিন আহমদ স্বেচ্ছায় স্টিয়ারিং কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। পাকিস্তান দূতাবাসের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে– এ ধরনের কোনো প্রতিশ্রুতি স্টিয়ারিং কমিটি তাঁকে দেয়নি। তারা তাঁকে শুধু গোপনীয়তা রক্ষা করতে বলেছে। স্টিয়ারিং কমিটির বক্তব্য ছিল পাকিস্তান হাইকমিশনে তাঁর থাকা প্রয়োজন। তাঁকে উদগ্রীব না হয়ে দেশের জন্য কাজ করে যেতে বলেছে। দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে মহিউদ্দিন আহমদ অজানা পথে পা বাড়ানোর জন্য তৈরি ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে পথ অজানা ছিল না। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছিল তাঁর মানসপটে। ৭ মার্চের ভাষণ তাঁর দেশপ্রেমকে উদ্দীপ্ত করেছিল।[২৮৫]

১ আগস্ট লন্ডনস্থ পাকিস্তান মিশনের দ্বিতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার ঘটনাটি ছিল ইয়াহিয়া খানের পক্ষে একটি বিরাট কূটনীতিক পরাজয়। বিশেষ করে ইউরোপের কোনো দেশে নিযুক্ত কূটনীতিক এর আগে এভাবে চাকরিতে ইস্তফা দেয়নি। বাঙালি কূটনীতিক মহিউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় ইংল্যান্ডের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একটি সভার আয়োজন করে এবং এ সভা উপলক্ষ্যে তারা ৩ আগস্ট একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে-

> Amidst this national hardship, this is an occasion when we feel happy to invite you to attend a meeting arranged in honor of Mr. Mohiuddin Ahmed, a Bengali Diplomat to the Pakistan High Commission in the UK, Who has declared his loyalty and allegiance to the Government of the Peoples Republic of Bangladesh and expressed his desire to serve the people and Government of Bangladesh in any capacity. The meeting is to be held at Conway Hall, 25 Red Lion Square, Holborn, London, on Sunday, 8th August at 2.00 p.m.
>
> Mr. Justice A. S. Chowdhury, Special Representative of the Government of Bangladesh will grace the occasion with his presence. We invite two of your representatives to join us in expressing our admiration for his courageous act.[২৮৬]

---

[২৮৪] গবেষকের সঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মার্চ ২০১৮

[২৮৫] শেখ আবদুল মান্নান, *মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান*, ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ১৯৯৫। পৃ. ৭০

[২৮৬] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬২৪

লন্ডনের মতো স্থানে বাঙালি কূটনীতিক মহিউদ্দিন আহমদ পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করার পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিনি যে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবেন সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন বাঙালি কূটনীতিক শিহাবুদ্দিন-

> The defection of Mohiuddin in that country delighted every heart. We rightly surmised that, with his wide media, official, and diplomatic contacts, he would be able to lobby effectively for British and European support for Bangladesh. Under inspiring leadership of Justice Chowdhury, Mohiuddin played a crucial role in galvanizing the expatriate Bengali community in Britain.[২৮৭]

বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রতিবাদে ১১ আগস্ট লন্ডনের হাইড পার্কের এক জনসভায় পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসে নিযুক্ত অডিট এন্ড একাউন্টস এর ডিরেক্টর লুৎফুল মতিন ও ফজলুল হক চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন করেন।[২৮৮] কিন্তু আবদুল মতিন তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ৫ আগস্ট লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের অডিট এন্ড একাউন্টস এর ডিরেক্টর পদে নিয়োজিত লুৎফুল মতিন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। বিচারপতি চৌধুরীকে লিখিত এক পত্রে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান। পদত্যাগ করার পর সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে লুৎফুল মতিন বলেন, তাঁর মাতৃভূমিকে যারা আক্রমণ করে পৈশাচিকভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তাদের সরকারে কাজ করার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশক্রমে যে কোনো কাজ করার জন্য তিনি সদা তৈরি থাকবেন।[২৮৯] লুৎফুল মতিন শুরু থেকেই বাংলাদেশ ইস্যুতে সকল বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন মহিউদ্দিন আহমদ এর সঙ্গে। কিন্তু আনুষ্ঠানিক পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার কথা প্রথমদিকে তিনি ভাবেননি। কেননা অন্যান্য কূটনীতিকদের মতো তাঁরও পিছুটান ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বসবাসরত পরিবার। যদিও তাঁর স্ত্রী সন্তান লন্ডনে ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কী ঘটছে এ সম্পর্কে তারা খুবই কম জানতেন। কেননা বাংলাদেশ সম্পর্কে জুন পর্যন্ত বিবিসি'তে যে সকল সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল তা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। যে কারণে সঠিক পরিস্থিতি তারা উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। তিনি জানিয়েছেন মূলত তিনটি কারণে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমত, লন্ডনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর আগমন ও প্রবাসে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্ব দান। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁকে আনুগত্য পরিবর্তনে উৎসাহিত করেন। দ্বিতীয়ত, এপ্রিল মাসে মুজিবনগর সরকার গঠনের সংবাদ পান। তিনি আরো সংবাদ পান যে, মুজিবনগর সরকারে যারা যোগ দিয়েছে তাদের মধ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কে ফোর্সের খালেদ মোশাররফ ও প্রধান সচিব নুরুল কাদের খান তিনজনেই তাঁর আত্মীয়। তিনজন আত্মীয়কে মুজিবনগর সরকারে দায়িত্ব পালন করতে দেখেও নিজেও এ সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী হন। সর্বোপরি, ২৫ জুন তিনি ভারত থেকে একটি চিঠি পান। যে চিঠিতে তাঁর ছোট ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ উল্লেখ ছিল। যিনি পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহিদ হন। মূলত তৃতীয় কারণটি তাঁকে আনুগত্য পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। এর পাশাপাশি ছিল বন্ধুসম সহকর্মী মহিউদ্দিন আহমদের

---

[২৮৭] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 120
[২৮৮] সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪০
[২৮৯] ফারুক আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭

উৎসাহ।[২৯০] লুৎফুল মতিনের পদত্যাগ কালে চার জন বাঙালি কূটনীতিক অফিসার লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনে কর্মরত ছিলেন।[২৯১]

মহিউদ্দিন আহমদ ও লুৎফুল মতিন পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের রাজনৈতিক কাউন্সেলর এম এম রেজাউল করিম পদত্যাগ করেন। পাকিস্তানের হাইকমিশনার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইউসুফ এর কাছে লিখিত এক চিঠিতে রেজাউল করিম পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদের কথা জানান। পাকিস্তান সরকারের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে রেজাউল করিম বলেন, He was severing all connection with the Government at Islamabad and declaring allegiance to the Republic of Bangladesh.[২৯২] পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর রেজাউল করিম লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনে যোগ দেন।[২৯৩] উল্লেখ্য যে, রেজাউল করিম ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান বৈদেশিক সার্ভিসে যোগ দেন। পাকিস্তানের কূটনীতিক চাকরি ত্যাগ করে রেজাউল করিম বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা বাংলাদেশে যে অত্যাচার করেছে তার পরে বিবেক নিয়ে তাদের সঙ্গে এবং তাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব ছিল না। পাকিস্তান রাষ্ট্রদূতের কাছে লিখিত চিঠিতে রেজাউল করিম বলেন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত আশা করেছিলেন যে, একটি মীমাংসার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। গত কয়েক মাস তিনি মানসিক পীড়ার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যোগ দিতে পেরে তিনি নিজেকে অনেকটা প্রশান্তি মনে করছেন। রেজাউল করিম বলেন যে, ধ্বংসযজ্ঞের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানও ভেঙ্গে যাচ্ছে।[২৯৪] রেজাউল করিমের পদত্যাগের পর ৮ অক্টোবর *দি গার্ডিয়ান* এর কূটনৈতিক সংবাদদাতা কর্তৃক প্রদত্ত এক সংবাদে বলা হয়, লন্ডনস্থ পাকিস্তানি হাইকমিশনের রাজনৈতিক কাউন্সেলর রেজাউল করিম পদত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান করেছেন। এ পর্যন্ত যেসব বাঙালি অফিসার হাইকমিশন থেকে পদত্যাগ করেছেন তাদের মধ্যে করিম সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পত্রিকাটির সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রেজাউল করিম বলেন, পাকিস্তান সরকারের ভয়ানক নির্বুদ্ধিতা ও অপকর্মের প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেছেন। ২৫ মার্চ পূর্ববঙ্গে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের পর বিদেশে নিয়োজিত অন্যান্য বাঙালি অফিসারদের মতো তিনিও নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন। পাকিস্তানি হত্যাযজ্ঞকে তিনি বর্তমান শতাব্দীর নিষ্ঠুরতম ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। তবে রেজাউল করিমের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ নিয়ে শুরুর দিকে কিছু জটিলতা দেখা দেয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন জুন মাসের প্রথম দিকে তাসাদ্দুক আহমদের সঙ্গে পরামর্শ করে রেজাউল করিমকে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানের জন্য আবদুল মতিন অনুরোধ জানান। অধ্যাপক রেহমান সোবহান লন্ডন যাওয়ার পর এ প্রক্রিয়া জোরদার হয়। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলা পশ্চিম লন্ডনের হল্যান্ড পার্ক টিউব স্টেশনের নির্জন পরিবেশে রেজাউল করিম আবদুল মতিনের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হন। এসময় তাঁকে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার কথা বলা হয়। কিন্তু তিনি কোনো প্রত্যুত্তর করেননি। কিছুদিন পর অধ্যাপক

---

[২৯০] গবেষকের সঙ্গে আকবর লুৎফুল মতিন এর সাক্ষাৎকার, ২৭ এপ্রিল ২০১৯

[২৯১] *The Times* (London), 6 July 1971

[২৯২] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৩৫

[২৯৩] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৩৫

[২৯৪] ফারুক আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০-২০১

রেহমান সোবহানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাসাদ্দুক আহমদ আবদুল মতিনকে জানান যে, রেজাউল করিম বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করতে রাজি হয়েছেন। শিগগিরই লন্ডনের সংবাদপত্রে পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে তাঁর পদত্যাগের সংবাদ প্রকাশিত হবে বলে তারা আশা করেছিলেন।[২৯৫] কিন্তু সে পক্ষ পরিবর্তন ঘটতে অনেকটা বিলম্ব হয়।

১৯৮৬ সালে লন্ডনে এক সাক্ষাৎকারকালে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জানান যে, ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে লুলু বিলকিস বানু রেজাউল করিমকে সঙ্গে নিয়ে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন। তখন আশা করা হয়েছিল, ১ আগস্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারে আয়োজিত গণসমাবেশে রেজাউল করিম বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পরও রেজাউল করিম দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় থাকায় তাঁকে বাংলাদেশ মিশনে যোগদানের অনুমতি না দেওয়ার জন্য বিচারপতি চৌধুরীকে তার সহকর্মীরা অনুরোধ করেছিলেন। বিচারপতি চৌধুরী তাদের কথায় কর্ণপাত না করে রেজাউল করিম যখন পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে চলে আসতে চেয়েছেন তখন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তাঁকে বাংলাদেশ মিশনে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়।[২৯৬] তাজুল মোহাম্মদ জানাচ্ছেন যে, ১ আগস্টের ট্রাফালগার স্কোয়ারের ঘটনার পূর্বেই লন্ডনে একজন বাঙালি পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। ১১ জুলাই ব্রাডফোর্ডে পাকিস্তান দূতাবাসের লেবার এটাচি ফজলুল হক চৌধুরী পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। পরে তিনিও লন্ডন দূতাবাসে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর এই যোগদানের পর লন্ডনে পদত্যাগের ঘটনা প্রায় লাগাতার ভাবে ঘটতে থাকে।[২৯৭]

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রেজাউল করিম ছিলেন লন্ডনস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের নিয়োজিত রাজনৈতিক কাউন্সেলর। বাঙালি অফিসারদের মধ্যে তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং উচ্চতম পদের অধিকারী। স্বভাবতই লন্ডনের প্রবাসী বাঙালিরা আশা করেছিলেন তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে বাংলাদেশের এই দুর্দিনে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু তিনি না আসায় লন্ডনের এ্যাকশন কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। তারা রেজাউল করিমের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করেছেন। তিনি তাদের 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলেননি। তারপর লুলু বিলকিস বানু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর সঙ্গে রেজাউল করিমের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে। রেজাউল করিম বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর মাধ্যমে শেখ আবদুল মান্নানকে জানান- তিনি যে ফ্ল্যাটে থাকেন, তা ছেড়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হবে। যদি ছেড়ে দিতেই হয়, তাহলে পাকিস্তান হাইকমিশনের পদমর্যাদার সমতুল্য সুযোগ-সুবিধা তাঁকে দিতে হবে। কেননা তাঁর মানসম্মানের প্রশ্ন আছে। তাঁর 'সারভেন্ট' থাকা দরকার। গাড়ি আছে, গাড়ি থাকা দরকার। কত টাকা হলে তিনি জীবন ধারণ করতে পারবেন, তা-ও তিনি জানান।[২৯৮]

---

[২৯৫] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪

[২৯৬] *ওই*, পৃ. ১৬৪

[২৯৭] তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১। পৃ. ৬৩

[২৯৮] শেখ আবদুল মান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা হয়। সদস্যদের অধিকাংশই বলেন, যে কোনো মূল্যেই হোক রেজাউল করিমকে তাদের পাওয়া দরকার। এতে শেখ আবদুল মান্নান মনঃক্ষুণ্ণ হলেও তিনি জানান যে, বাংলাদেশের পক্ষে আসার জন্য যে কোনো মূল্য দিতে লন্ডন স্টিয়ারিং কমিটি তৈরি নয়। রেজাউল করিম যদি বাংলাদেশের পক্ষে আসতে চান, তবে তিনি আসতে পারেন। মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেছিলেন রেজাউল করিমের 'ডিফেকশান' বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডন স্টিয়ারিং কমিটিকে জানান যে, ২৫ মার্চ বাংলাদেশ আক্রমণ করার পর পাকিস্তান হাইকমিশন রেজাউল করিমকে মিসরে পাঠিয়েছিল পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করার জন্য। সকলের প্রচেষ্টায় অক্টোবর মাসে রেজাউল করিম বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এত নাটকীয়তার পর রেজাউল করিম বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানের ক্ষেত্রে যে দোদুল্যমানতার পরিচয় দিয়েছেন সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শেখ আবদুল মান্নান বলেছেন- যে সব দাবি-দাওয়া রেজাউল কমির করেছিলেন, তার সবগুলো পূরণ করা সম্ভব হয়নি। তবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পালন করা হয়। যারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত, দেশ স্বাধীন হবে কি হবে না, আমি কোন দিকে থাকবো, আমার অবস্থা কী হবে, আমার পদোন্নতি হবে কিনা, যদি বাংলাদেশ না হয়, তাহলে আমার কী হবে– এই সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে যারা ক্ষতবিক্ষত, তারা 'ডিফেক্ট' না করলেই ভালো করতেন।[২৯৯]

লন্ডনের পাকিস্তান দূতাবাসের রাজনৈতিক কাউন্সেলর রেজাউল করিম পদত্যাগের পরে ডেপুটি হাইকমিশনার সলিমুজ্জামান কী করবেন তা নিয়ে বিভিন্ন কূটনীতিক মিশন ও সংবাদপত্র মহলে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়। অনেকের মতে, কিছুদিন আগে সলিমুজ্জামান যখন পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ছিলেন তখনই পদত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা উচিত ছিল। অনেকে আবার বলাবলি করেছেন যে, সলিমুজ্জামান এখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসলেও তাকে বাংলাদেশ সরকারের গ্রহণ করা উচিত হবে না। উল্লেখ্য যে, সলিমুজ্জামান আন্দোলনের প্রথম থেকেই বাঙালিদের বিরক্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য টেলিফোন তুলে রাখতেন বলে জানা গিয়েছে। ডেপুটি হাইকমিশনার সলিমুজ্জামান একদিন হাইকমিশনার সালমান আলীর কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে, বাঙালিরা তাকে বিরক্ত করছে।[৩০০]

৫ ডিসেম্বর লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের তৃতীয় সচিব আজিজুল হক চৌধুরী পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। আজিজুল হক চৌধুরী ২৫ মার্চের পর থেকে বিভিন্নসূত্রে মুক্তিসংগ্রামে সহযোগিতা করে আসছিলেন। তিনি ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন।[৩০১] ২০ ডিসেম্বর লন্ডনে অবস্থিত পাকিস্তান দুতাবাসে ইকনমিক মিনিস্টার পদে নিয়োজিত এ এফ এম এহসানুল কবীর বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দিয়েছেন বলে ঘোষণা করেন। প্যারী থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে বলা হয়, স্থানীয় পাকিস্তানি দূতাবাসে কমার্শিয়াল কাউন্সেলর পদে

[২৯৯] শেখ আবদুল মান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২-৭৩
[৩০০] ফারুক আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩-২০৪
[৩০১] ফারুক আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮

নিয়োজিত মোসলেহ উদ্দিন আহমদ, ব্রাসেলস এ অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসে সেকেন্ড সেক্রেটারি পদে নিয়োজিত খায়রুল আনাম বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দিয়েছেন।[৩০২]

১ আগস্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারের সভাস্থল থেকে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার ঘোষণা দেওয়ার পর লন্ডনের কূটনীতিক মহল এবং জনগণের মধ্যে কীরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা ব্যক্ত করেছেন খোন্দকার মোশাররফ হোসেন। তিনি বলেন যে- ১ আগস্টের সমাবেশে বিভিন্ন স্তরের ব্রিটিশ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। পাকিস্তান দূতাবাসের একজন দ্বিতীয় সচিব পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ঘোষণা প্রদান সমাবেশটিকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। উক্ত সভায় লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব বাঙালি কূটনীতিক মহিউদ্দিন আহমদ হত্যাকারী পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। এভাবে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হওয়ায় ব্রিটেনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠকদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলন আরো জোরদার হয়। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, মহিউদ্দিন আহমদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিভিন্ন দূতাবাস থেকে বাঙালি কূটনীতিকরা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ সমর্থন করেন।[৩০৩]

লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের হিসাব পরিচালক লুৎফুল মতিন, শিক্ষা অফিসার হাবিবুর রহমান এবং বার্মিংহামস্থ পাকিস্তানের লেবার অফিসের কর্মকর্তা ফজলুল হক চৌধুরী পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশ সংগ্রামে অংশগ্রহণের কথা লন্ডনের সর্বত্র প্রচারিত হয়। যা লন্ডনে অবস্থানরত বাঙালিদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এসময় বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১ আগস্টের সমাবেশে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নকারী দ্বিতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমদসহ উপরোক্ত কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা প্রদানের জন্য লন্ডনের কনওয়ে হলে ৮ আগস্ট এক জনসভার আয়োজন করে। স্থানীয় কনওয়ে হলে পদত্যাগকারী পাকিস্তানি কূটনীতিক ও সরকারি কর্মচারীদের স্বাগত জানানো হয়। বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু দেশের ডাকে যারা সাড়া দিয়েছেন তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে ঘোষণা করেন যে, তাদের ত্যাগ দেশবাসী স্বীকার করবেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পদত্যাগী সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে ঘোষণা করেন যে, যারা পাকিস্তানের চাকরি পরিত্যাগ করে এসেছেন তারা সকলেই স্বেচ্ছার ভিত্তিতে বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে পারবেন।[৩০৪] এ সমাবেশে পাকিস্তান সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের তৎকালীন ডেপুটি ডিরেক্টর (লন্ডনে উচ্চ শিক্ষার জন্য অবস্থানরত) আবদুর রউফ পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য যে, আবদুর রউফ ব্রিটেন মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে বিশেষ করে ছাত্র সংগ্রাম কমিটির পোস্টার ও প্রচারপত্র লেখায় সহযোগিতা করা ছাড়াও স্টিয়ারিং কমিটি থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা' নামক সংবাদ বুলেটিন

---

[৩০২] *The Times* (London), 21 December 1971

[৩০৩] খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে বিলাত-প্রবাসীদের অবদান*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৮। পৃ. ৫১-৫২

[৩০৪] ফারুক আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮-১৭৯

সম্পাদনা করতেন।[৩০৫] বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি ইয়র্কশায়ার শাখা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগকারী বাঙালি কূটনীতিক ও নৌ অফিসারদেরও একটি সংবর্ধনা প্রদান করে। যা ১৫ আগস্ট ব্রাডফোর্ড শহরে অনুষ্ঠিত হয়।[৩০৬] ৯ আগস্ট লন্ডনে এক জনসভায় লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের ফিল্ম ও প্রকাশনা দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর এ কে এম আবদুর রউফ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বলেছেন যে, 'জঙ্গী শাহী বাঙলাদেশের লক্ষ লক্ষ ভাই-বোনদের রক্তে হাত রঞ্জিত করেছে তার সঙ্গে কোনও প্রকার সম্পর্ক রাখাও পাপ।'[৩০৭]

অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে লন্ডনের ইউস্টন এর হালাল মীট গ্রোসারীর উপরতলায় বসে বৈঠক করেন লন্ডনস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের ৩০-৩৫ জন বাঙালি কর্মচারী। এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দূতাবাসে কর্মরত জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি তৈয়ব হোসেন খান। এ বৈঠকে তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এসময়ে ইউরোপে জনমত প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকায় মহিউদ্দিন আহমদের সঙ্গেই তারা যোগাযোগ করেন। তারা তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানালে মহিউদ্দিন আহমদ, শেখ আবদুল মান্নান, সুলতান শরীফ ও মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু সিদ্ধান্ত নেন যে, এতজন মানুষের দায়িত্ব নেওয়া সেই মুহূর্তে বাংলাদেশ মিশনের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা যেখানে আছে সেখানে থেকেই যেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন তার নির্দেশনা দেওয়া হয়। লন্ডনস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের বাঙালি কর্মচারীরা সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের কর্মস্থলে রয়ে যায়।[৩০৮]

ইরাক

মুজিবনগর সরকারের কূটনীতিক প্রচেষ্টায় আগস্ট মাসে ইরাকের পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আবুল ফজল মোহাম্মদ আবুল ফতেহ বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগে যোগ দেন।[৩০৯] ২১ আগস্ট সকালবেলা ইরাকে নিয়োজিত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ টেলিফোনযোগে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি ইরাক থেকে গোপনে লন্ডন চলে এসেছেন। এখান থেকে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করবেন বলে বিচারপতি চৌধুরীকে জানান। সেদিন বিকেলে গোরিং স্ট্রিটের অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আবুল ফতেহ তাঁর সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর লন্ডনে আবুল ফতেহ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন-

> Ever since the West Pakistan army launched its attack on my people I knew I could not continue in my job for more than a few months." "I had hoped that sanity would prevail, but finally, when Sheikh Mujibur Rahman was put on trial I found it was the last straw."

---

[৩০৫] খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২
[৩০৬] *ওই*, পৃ. ৫৩
[৩০৭] *জয়বাংলা*, ১৩ আগস্ট ১৯৭১
[৩০৮] *দৈনিক সংবাদ*, ২২ আগস্ট ১৯৯৩
[৩০৯] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫

My family and I have brought a little money, but not a lot. We are determined to fight for the freedom of our country and I thought London was the best place to do it. I did not tell my children of their journey until half an hour before we started off.[৩১০]

তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তারবার্তা পাঠিয়ে মুজিবনগর সরকারকে জানিয়ে দেয়। ইরাকের রাজধানী বাগদাদ ত্যাগ করার দিন আবুল ফতেহ্ দূতাবাস থেকে বেরিয়ে সরাসরি ব্যাংকে গিয়ে দূতাবাসের একাউন্ট থেকে পঁচিশ হাজার পাউন্ড তুলে নেন। পরবর্তীতে ইরাকের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সহায়তায় উক্ত অর্থ মুজিবনগর সরকারের নিকট পাঠাবার বন্দোবস্ত করেন। কে এম শিহাবুদ্দিনের মতে, রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ ৩৪০০০ ইরাকি দিনার বাগদাদের পাকিস্তান দূতাবাসের ব্যাংক একাউন্ট থেকে তুলে আনেন। তিনি সপরিবারে ইরাক থেকে ট্যাক্সিযোগে ছয়শত মাইল পাড়ি দিয়ে কুয়েত বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের পথে রওয়ানা হন। উল্লেখ্য যে, আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ২০ জন বাঙালি কূটনীতিক অফিসার পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেন। তাদের মধ্যে আবুল ফতেহ ছিলেন সবচেয়ে উচ্চপদস্থ অফিসার। তাই তাঁর লন্ডনে আগমন সংবাদ বিভিন্ন পত্রিকায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। আবুল ফতেহ্ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার কিছুদিন পর ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বলা হয়, আবুল ফতেহ’র বিরুদ্ধে পাকিস্তান হাইকমিশন এক অভিযোগ উত্থাপন করেছে। ইরাকের ব্যাংক থেকে পাকিস্তান সরকারের অর্থ তুলে নিয়ে আসার অভিযোগে আবুল ফতেহ’কে পাকিস্তান সরকারের হাতে অর্পণ করার সরাসরি অনুরোধ আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে তাঁকে জানানো হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আবুল ফতেহ বাংলাদেশ সরকারের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মুজিবনগর যাওয়ার কথা চিন্তা করেন। পাকিস্তান সরকারের এমন মনোভাব টের পাওয়ার পর তিনি অবিলম্বে মুজিবনগর চলে যাওয়া স্থির করেন। অবশ্য যাওয়ার আগে তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৩১১] রাষ্ট্রদূত পদমর্যাদার প্রথম কোনো বাঙালি কূটনীতিক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ায় দিল্লিস্থ বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্রের প্রধান কে এম শিহাবুদ্দিন তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন-

We needed the services of a senior officer of his ability and experience. His defection would provide food for thought to those countries that “still think of a political solution within the framework of Pakistan and are keen on reviving Pakistan which is dead and buried under the blood of hundreds of thousands of martyrs.”[৩১২]

আবুল ফতেহ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সংবাদ *জয়বাংলা* পত্রিকায়ও গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। বাঙালি কূটনীতিক আবুল ফতেহ’র ছেলে আনাতুল ফতেহ তাঁর পিতা কীভাবে ইরাক ছেড়ে লন্ডনে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছেন সে সম্পর্কে বলেন, আবুল ফতেহ ১৯৭০ সালের শেষাবধি পর্যন্ত কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের উপ হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর তিনি বাগদাদের পাকিস্তান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ

[৩১০] *The Sunday Telegraph*, 22 August 1971
[৩১১] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২-১৩৩
[৩১২] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 121

পান। অন্যান্যদের মতো আবুল ফতেহ ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শুরু থেকেই বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ওপর নজর রাখছিলেন। বিশেষ করে ২৬ মার্চ ইয়াহিয়া খানের ভাষণের পর বুঝতে পারেন ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যেকার আলোচনা কোনো সমাধান ছাড়াই সমাপ্ত হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বঙ্গবন্ধুকে দায়ী করা হয়েছে। এমন অবস্থায় আবুল ফতেহ খুব হতাশ হয়ে পড়েন। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি জানতে পারেন যে, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করেছে এবং তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। তিনি আরো জানতে পারেন যে, দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের দুই জন বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক এবং এম হোসেন আলীর নেতৃত্বে কলকাতাস্থ পাকিস্তান মিশনের ৬৫ জন বাঙালি কূটনীতিক ও কর্মকর্তা একযোগে পদত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত কোনো বাঙালি রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনি। এ ঘটনার পর থেকে আবুল ফতেহ নিজেও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিবেন। একটি ইসলামিক দেশে অবস্থান করে এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কতটুকু বিপজ্জনক হবে তা সহজেই বুঝতে পারেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাগদাদে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন কে আর পি সিংহ। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শুরু থেকেই ফোন করে আবুল ফতেহ'র খোঁজ-খবর নিতেন। জুলাই মাসের কোনো এক সন্ধ্যায় হঠাৎ করে মিসেস কে আর পি সিংহ আবুল ফতেহ'র বাসভবনে আসেন। মিসেস কে আর পি সিংহ এর হঠাৎ আগমনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো ধরনের সন্দেহের উদ্রেক না হয় এজন্য মিসেস ফতেহ তাঁর বাসার কাজের লোকদের জানান যে, তিনি (মিসেস কে আর পি সিংহ) সামাজিক যোগাযোগ রক্ষায় আবুল ফতেহ'র সাথে দেখা করতে এসেছেন। সন্ধ্যা সময়টি বেছে নেওয়ার কারণ ছিল- ইরাকের নিরাপত্তা বাহিনীর চোখ এড়িয়ে একজন বাঙালি রাষ্ট্রদূতের বাসায় গেলে যাতে কেউ কোনো ধরনের সন্দেহ না করে। দশ মিনিট স্থায়ী এ সাক্ষাৎকারে মিসেস সিংহ রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ'র কাছে একটি খাম হস্তান্তর করেন। যে খামে মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত চিঠি ছিল। এ চিঠিতে নির্দেশ ছিল বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে ভারতের দূতাবাস। এমনকি তিনি নিজেও তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। চিঠি পাওয়ার পর আবুল ফতেহ চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ তিনি নিজে জানতেন পাকিস্তানের সঙ্গে ইরাকের কূটনীতিক সম্পর্ক খুবই ভালো। এমন অবস্থায় একজন পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত কীভাবে এবং নিরাপদে পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে ইরাক ত্যাগ করবেন।

প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন তাঁর দুই সন্তানকে ইংল্যান্ডের কোনো আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা বলে ইংল্যান্ডে গিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দিবেন। কিন্তু পরে সে চিন্তা নিজেই বাতিল করে দেন। পাকিস্তানের একজন রাষ্ট্রদূত হিসেবে আবুল ফতেহ বাগদাদের অন্যান্য বিদেশি দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন এবং পাকিস্তানের সামরিক শাসন নিয়ে তাদের আলাপেও যোগ দেন। কিন্তু তিনি ইসলামাবাদের প্রয়োজনে সব জায়গায় সব সময় উপস্থিত থাকতেন না। আবুল ফতেহ'র ব্যক্তিগত সহকারী যিনি একজন বাঙালি ছিলেন তিনি অবশ্য কিছুটা সন্দেহ

করেছিলেন যে, সুযোগ পেলেই দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে পারেন। এজন্য তিনি আবুল ফতেহকে একটি দামি কলমসেট উপহার দিয়েছিলেন।

আবুল ফতেহ ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে সকল সময় যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এমনকি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনের সঙ্গেও। তারা রাতের অন্ধকারে আবুল ফতেহ'র বাসভবনের সামনে এসে ফ্লাশলাইটের আলো জ্বালিয়ে সংকেত দিতেন। তারপর নিকটস্থ একটি ছোট পার্কে গিয়ে গোপন আলোচনা শেষ করে ভোর বেলায় ফিরে যেতেন। তাদের মাধ্যমে আবুল ফতেহ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাগদাদ ত্যাগ করার সকল বন্দোবস্ত সম্পন্ন করেন।

ইতিমধ্যে আবুল ফতেহ একটি খারাপ সংবাদ পান। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইরানের রাজধানী তেহরানে আঞ্চলিক মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে একটি বৈঠক আহ্বান করেন যেখানে তুরস্ক, ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যকার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। এ তালিকায় ইরাকের রাষ্ট্রদূত হিসেবে আবুল ফতেহকে যোগ দিতে বলা হয়। তেহরান বৈঠকের সংবাদে ভারতীয়রা ভয় পেয়ে যায় এ ভেবে যে হয়তো আবুল ফতেহ কে সন্দেহ করা হচ্ছে এবং সে আর তেহরান থেকে বাগদাদে ফিরে আসবে না। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ বৈঠক স্থগিত হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাই আবুল ফতেহ তাঁর পরিকল্পনার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন।

আবুল ফতেহ তাঁর অফিসকে জানান যে, তিনি ১৫ আগস্ট সড়ক পথে বাগদাদ থেকে তেহরান যাবেন। যার দূরত্ব ছিল ৭০০ কি.মি.। বাগদাদের পাকিস্তান দূতাবাসের ব্যাংক হিসাব রক্ষিত ছিল কারদাত মারিয়াম নামক এলাকার রাফিদান ব্যাংকে এবং রাষ্ট্রদূত হিসেবে আবুল ফতেহ'র স্বাক্ষরে সকল লেনদেন সম্পন্ন হতো। তিনি ব্যাংক ম্যানেজারকে ফোন করে জানালেন দূতাবাসের কিছু সংস্কারকার্য সম্পন্ন করার প্রয়োজনে তহবিল থেকে টাকা উত্তোলন করা প্রয়োজন এবং তিনি ব্যাংক বন্ধ হওয়ার পূর্বেই ব্যাংকে পৌঁছবেন। ব্যাংক বন্ধ হওয়ার ৪৫ মিনিট পূর্বে তিনি ব্যাংকে যান। তিনি জানতেন যে, ব্যাংকের ম্যানেজার পাকিস্তান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতের জন্য অপেক্ষা করছেন এবং বিলম্বে পৌঁছে দেখেন সেখানে তাঁকে লক্ষ করার মতো কেউ নেই। আবুল ফতেহ ব্যাংক থেকে দূতাবাসের সকল অর্থ বিশেষ করে ২৮০০০ ডলার উত্তোলন করে বাড়িতে চলে আসেন। ব্যাংকের ম্যানেজারও এরকম বড় অংকের টাকা লেনদেনের কারণ সম্পর্কে ইরাকি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেনি। এই অর্থ ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে মুজিবনগর সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দূতাবাসের গাড়ি আবুল ফতেহকে তেহরান নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি ছিল। কিন্তু তিনি জানান যে, তিনি হঠাৎ করে বুকে ব্যথা অনুভব করছেন। তিনি ড্রাইভারকে জানান যে, আগামীকাল বিমানে তেহরান যাবেন কেননা এত লম্বা পথ গাড়িতে ভ্রমণ করতে পারবেন না। মিসেস আবুল ফতেহ তাঁর সন্তানদের জানান যে, তাদের পিতা অসুস্থ তাই শুয়ে আছে। এমনকি বাড়ির দুই জন বাঙালি কাজের লোককে স্থানীয় সিনেমা হলে পাঠানো হয় সিনেমা দেখার জন্য। তারা সিনেমা দেখা শেষ করে পেছনের গেট দিয়ে তাদের কোয়ার্টারে পৌঁছবে। মিসেস আবুল ফতেহ সামনের দরজা তালাবদ্ধ করেন।

অগ্যতা আবুল ফতেহ দম্পতি তাদের সন্তানদের ডেকে জানান যে, তারা আজ সন্ধ্যায় ইরাক ত্যাগ করে লন্ডনে চলে যাবেন। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যায় কিন্তু অনেকবার বাড়ির ফোন বেজে উঠলেও তারা কেউ কোনো ফোন রিসিভ

করেননি। উল্লেখ্য যে, আবুল ফতেহ'র নির্দেশ অনুযায়ী ড্রাইভার অফিসে পৌঁছে প্রথম সচিবকে জানিয়েছেন রাষ্ট্রদূত আগামীকাল বিমানে তেহরান যাবেন এবং তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন। প্রথম সচিবও তড়িৎগতিতে সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন এবং ফোনে আবুল ফতেহ'র সাথে কথা বলার জন্য বারবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ফোন কেউ রিসিভ না করা সত্ত্বেও তিনি আবুল ফতেহ'র বাড়িতে সেই মুহূর্তে আসেননি। আবুল ফতেহ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা মাত্রই একটি ভ্যান গাড়ি এসে উপস্থিত হয়। যেসকল স্যুটকেস জাহাজযোগে লন্ডনে পাঠানো হবে সেগুলো ভ্যান গাড়িতে তোলা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে একটি কালো গাড়ি এসে উপস্থিত হয়। যে গাড়ি তাদেরকে ভারতীয় দূতাবাসে নিয়ে যায়। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ ও তাঁর পরিবারের সম্মানে একটি নৈশভোজের আয়োজন করেন যেখানে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও তাঁর স্ত্রী এবং অন্যান্য ভারতীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

নৈশভোজ শেষে নির্দিষ্ট গাড়িতে আবুল ফতেহ'র পরিবার কুয়েতের সীমান্তের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৬ আগস্ট কুয়েতের সীমানায় পৌঁছেন। ভারতীয় গোয়েন্দাসংস্থার সহায়তায় তারা সহজেই কুয়েত সীমান্ত অতিক্রম করে কুয়েত বিমানবন্দরে পৌঁছেন। কুয়েত বিমানবন্দরে পাকিস্তানি কূটনীতিক পাসপোর্ট থাকার কারণে বিপদের সম্মুখীন যেন না হতে হয় সেজন্যও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার লোকরা ছদ্মনামে অন্য প্যাসেঞ্জার তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে এবং নির্বিঘ্নে বিমাবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ১৬ আগস্ট বিকেলবেলা আবুল ফতেহ কুয়েত হয়ে লন্ডন হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছেন।[৩১৩]

সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*'র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আবুল ফতেহ জানিয়েছেন- ১৯৭১ সালে ইরাকে তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত থাকাকালে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের 'কোড' মেসেজ পান। সেখানে তাঁকে মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার কথা বলা হয়। রাষ্ট্রদূত থাকাকালেই পাকিস্তানের সকল সংবাদ রাখতেন। তখন থেকেই পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করার সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাগদাদ ছেড়ে আসা সহজসাধ্য ছিল না। বাগদাদের ভারতীয় দূতাবাসের লোকদের সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগ ছিল, প্রকাশ্যে অবশ্য তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব ছিল না। দূতাবাসে তখন দু'জন বাঙালি ছিলেন- আবুল ফতেহ ও তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী। ইতিমধ্যে বাগদাদের পাকিস্তান দূতাবাসের পাকিস্তানিরা তাঁর ওপর কড়া নজরদারি শুরু করে। তেহরানে ২২/২৩ আগস্ট পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতদের বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এ বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য ২০ আগস্ট আবুল ফতেহ গাড়ি চালিয়ে তেহরানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিছুদুর যাওয়ার পর অসুস্থতার অজুহাতে ফিরে আসেন। বাগদাদ ছেড়ে কুয়েত আসার জন্য 'এক্সিট ভিসা' এবং কুয়েতের 'রাষ্ট্র ভিসা' প্রয়োজন ছিল। তৎকালীন সময়ে ইরাকের অনেক লোকজন কেনাকাটার জন্য কুয়েত যেতেন। এ ধরনের অজুহাতে আবুল ফতেহ এই ভিসাগুলো যোগাড় করেন। এমনকি ভিসার প্রয়োজনে দু'একজনকে মিথ্যা বলেছেন যে মস্কোতে ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন। ২০ আগস্ট সন্ধ্যায় ভারতীয় দূতাবাসের গাড়িতে বাগদাদ থেকে কুয়েতে যান। ভারতীয় দূতাবাসের লোকেরা আবুল ফতেহ'র জন্য ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের টিকিট বুক করে রেখেছিলেন। ভারতীয় দূতাবাস টিকিট বুকিং করে তাদের পিএ এন্ড দেয়ার পার্টি'র নামে।

---

[৩১৩] The Defection, Anatul Fateh, https://opinion.bdnews24.com/2010/12/29/the-defection/

আবুল ফতেহ আসার পর তাঁর নামে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়। ২১ আগস্ট ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে লন্ডনে পৌঁছেন এবং ২২ আগস্ট মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[৩১৪]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ *জয়বাংলা*'র প্রতিনিধির সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ইরাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় গভীর আনন্দ প্রকাশ করে তাঁকে অভিনন্দন জানান। অভিনন্দন বার্তায় তিনি বলেছেন-

> শুধু বাঙ্গালীরা নয়, বহু সংখ্যক অবাঙ্গালী কূটনীতিকও জল্লাদ ইয়াহিয়ার বাংলাদেশ সম্পর্কিত নৃশংস নীতির সাথে একমত হতে না পারায় তাদের স্থলে সেনা বাহিনীর জেনারেলদের নিয়োগ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বৃটেন, ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে নিযুক্ত পশ্চিম পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতদের বিষয়ে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, 'পশ্চিম পাকিস্তানী যে সব কূটনীতিক ইয়াহিয়ার বাঙ্গলার রক্তে-ভেজা অমানবিক নীতির সাথে একমত হতে না পেরে পদত্যাগ করবেন গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে অভিনন্দন জানাবে।[৩১৫]

ইরাকে নিযুক্ত পাকিস্তানের প্রাক্তন বাঙালি রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ'র পাকিস্তান দূতাবাসের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন বলে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। এ অভিযোগে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ এর নিন্দা জানান। তিনি ইসলামাবাদ চক্রের এই জঘন্য মিথ্যা অভিযোগে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন- আবুল ফতেহ ইসলামাবাদের অর্থ নিয়ে এসে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ পালন করেছেন এবং বাংলাদেশের ন্যায্য প্রাপ্য যথাসময়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আদায় করে নিয়েছেন। এই অর্থ এখন স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে জমা হয়েছে এবং তা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ব্যয় হবে।[৩১৬] এ ব্যাপারে মুজিবনগর সরকার যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তাতে বলা হয়-

> Mr. Fateh is one of those brave and patriotic sons of the soil who have responded to the call of the motherland to rise and protest against the barbarous atrocities being committed by the Pakistani military junta in exterminating the Bengali Nation. In taking away the Pakistan Embassy fund in Iraq, Mr. Fateh has only carried out the orders of the Bangladesh Government and has undertaken a timely exercise of redeeming a portion of the rightful share of Bangladesh in Pakistani funds and properties. This money is now at the disposal of the Bangladesh Government and will be used to strengthen the fight for freedom.[৩১৭]

ইরাকের রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ'র পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগে বাংলাদেশের একজন সাহিত্যিক কত আনন্দিত হয়েছেন তা তাঁর সাহিত্যকর্মে ফুটে ওঠেছে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-

> ওয়াশিংটন দূতাবাস থেকে তেরজন পাকিস্তানি অফিসারের ডিফেক্ট সংবাদের উত্তেজনা পনের দিনে কিছু ঢিমে হয়ে এসেছে, এমন সময় খবর এলো ইরাকের রাষ্ট্রদূত বাগদাদ থেকে লন্ডনে পালিয়ে যেতে পেরেছেন সপরিবারে। . . . ইরাকের রাষ্ট্রদূতের নাম এ এফ এম

---

[৩১৪] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯১

[৩১৫] *জয়বাংলা*, ২৭ আগস্ট ১৯৭১

[৩১৬] *বাংলার বাণী*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

[৩১৭] Sukumar Biswas edited, *ibid*, p. 96

আবুল ফতেহ। কয়েকদিন এ নাম জপমালার মত উচ্চারিত হবে। . . . মাত্র একটি সুটকেস হাতে নিয়ে তিনি নাকি পাকিস্তানি গোলামীর মুখে পদাঘাত করে এসেছেন। পাকিস্তানের দোস্ত ইরাক থেকে নিস্ক্রমণ নিশ্চয় ঝুঁকিপূর্ণ।[৩১৮]

ফিলিপাইনস

বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টায় ফিলিপাইনস এর রাজধানী ম্যানিলায় নিযুক্ত পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নী ১৩ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান করেন। ফিলিপাইনস এর রাজধানী ম্যানিলায় নিয়োজিত রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নী পদত্যাগ করে ম্যানিলায় অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৩১৯] পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর এক সংবাদ সম্মেলনে খুররম খান পন্নী বলেন-

> I hereby disassociate myself from the present, usurper army junta of West Pakistan which claims to be the Government of Pakistan. It has no mandate of the people-it is totally illegitimate and absolutely barbarian. It has no mandate of the people-it has no right to call itself the Government of Pakistan.
>
> Pakistan, as I knew it, lies buried under a mountain of corpses- of innocent men, women and children of Bangladesh. It lies buried under the agony of the eight million refugees whom they have pushed out into India. It lies buried under the mass plunder and rape which the West Pakistani Government is perpetrating there every day.[৩২০]

১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে খুররম খান পন্নী আর্জেন্টিনার পাকিস্তান দূতাবাসে যোগ দেন। ষাটের দশকের শেষে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় তিনি প্রত্যক্ষ করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি ফিলিপাইনস এ পাকিস্তান দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭০ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণ করেন। বিশেষ করে নির্বাচনের পর তিনি বুঝতে পারেন যে, একমাত্র আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বারাই পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করা সম্ভব। তিনি পূর্ব পাকিস্তান ইস্যুতে নিজের করণীয় সম্বন্ধে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান। তারপর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি গভীর দৃষ্টি রাখছিলেন। তিনি নিজে একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন বিধায় এ পরিস্থিতি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি অপেক্ষায় ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে। মার্চ মাসের পর পাকিস্তান সরকার খুররম খান পন্নীকে ইসলামাবাদে ফিরে যাওয়ার জন্য সংবাদ পাঠিয়েছিল। তিনি ইসলামাবাদ ফিরে না গিয়ে তাঁর বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার ঘোষণা দেন। ফিলিপাইনস এর সরকার খুররম খান পন্নীকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয় এবং বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা চালানোর সুযোগ দেয়। মুজিবনগর সরকার খুররম খান পন্নীকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো ও অস্ট্রেলিয়াতে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা চালানোর নির্দেশ দেয়। এজন্য তাঁকে

---

[৩১৮] শওকত ওসমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

[৩১৯] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮২৬; *The Times* (London), 14 September 1971; তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

[৩২০] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৪২

Roving Ambassador বা ঘূর্ণায়মান রাষ্ট্রদূত বলা হয়।[৩২১] অবশ্য পন্নীর পদত্যাগের আভাষ পূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। ম্যানিলায় প্রেসিডেন্ট ফার্ডিনান্ড মারকোসের কাছ থেকে একটি পদক গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে খুররম খান পন্নী ইচ্ছাকৃতভাবে পাকিস্তান সরকার কথাটি একবারও উচ্চারণ করেননি।[৩২২] পাকিস্তানের চাকরি ত্যাগ করার পর পন্নী ম্যানিলায় বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করে সেখানে বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করেন। একজন রাষ্ট্রদূত হিসেবে তাঁর কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁর ছেলে ওয়জিদ পন্নী মন্তব্য করেন-

> It was a tough time for Bangladesh as the majority of the Muslim countries and China did not recognise Bangladesh as an independent nation. They supported Pakistan. Vigorous lobbying was launched to convince this bloc of countries to accept independent Bangladesh. Indonesia, being the largest Muslim country, played an important role in convincing other countries to recognise Bangladesh. KKP used his diplomatic skill to lobby for Bangladesh and to get for the country its due place in the international community.[৩২৩]

নাইজেরিয়া

নাইজেরিয়ার রাজধানী লাগোসে পাকিস্তান হাইকমিশনে নিয়োজিত চ্যান্সেরির কর্মকর্তা মহিউদ্দিন আহমেদ জায়গীরদার ১৩ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করে সপরিবারে লন্ডন পৌঁছেন।[৩২৪] বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের বর্বরতম গণহত্যার প্রতিবাদে ইসলামাবাদের বিদেশস্থ দূতাবাসের মহিউদ্দিন আহমেদ জায়গীরদার ১৩ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনে যোগদান করেন। তিনি লাগোস এবং নাইজেরিয়াস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের চ্যান্সেরি আবার কখনও অস্থায়ী হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[৩২৫] পদত্যাগ করার পর এক সংবাদ বিবৃতিতে তিনি বলেন-

> Many thousands of his East Bengali countrymen had been killed or maimed in the worst tragedy since Hitler. No one with a conscience could be a silent spectator. To assist the junta Government in the sale of a pack of lies was no longer possible on my part.[৩২৬]

মহিউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর লন্ডন মিশনে কাজ করতে এসে বলেন, ‘বাংলাদেশে ইয়াহিয়া সরকার যা করেছে তারপর আর তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যায় না।’[৩২৭]

আর্জেন্টিনা

যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ মিশনের চেষ্টায় আর্জেন্টিনার পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমেন বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন।[৩২৮] আর্জেন্টিনায় পাকিস্তানি দূতাবাসে নিয়োজিত বাঙালি রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমেন ১১ অক্টোবর পদত্যাগ করে

---

[৩২১] *Finacial Express* (Dhaka), 31 October 2009, Posted by Wajid Panni (Son of KK Panni)
[৩২২] *বাংলার বাণী*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
[৩২৩] *Finacial Express* (Dhaka), 31 October 2009, Posted by Wajid Panni (Son of KK Panni)
[৩২৪] *The Times* (London), 14 September 1971
[৩২৫] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮২৬। *বাংলার বাণী*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
[৩২৬] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮২৬
[৩২৭] তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০
[৩২৮] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩

বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। ১৩ অক্টোবর তিনি লন্ডন পৌছে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আবদুল মোমেন বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক চক্র বেআইনিভাবে ক্ষমতাসীন হয়েছে। তারা পূর্ববঙ্গে হত্যা, অত্যাচার ও নিপীড়নের জন্য দায়ী। যাদের আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করা হয়েছে তারা জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আশ্বস্ত বোধ করবে না।[৩২৯] আর্জেন্টিনাস্থ পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে তাঁর পদে ইস্তফা দিয়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তান ছিল। লন্ডন যাবার পূর্বে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। এতে তিনি বলেছেন– প্রকৃতপক্ষে গেরিলা হওয়ার ইচ্ছা তাঁর রয়েছে। তবে এখন তিনি এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যে জনমত প্রচারে কাজ করবেন। পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শোষণ ও আড়াই লাখ মানুষ খুনের ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা আন্দোলনের পক্ষে এখন অধিকতর সহায়ক হবে। তিনি আরো বলেন যে, সন্ত্রাসের রাজত্বকে ঠাণ্ডা করতে সেনাবাহিনী পাঠাতে বাধ্য হয়েছে বলে পশ্চিম পাকিস্তান যে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে তা শুনে যাওয়া আর সম্ভব নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর শতকরা ১০০ জনই পশ্চিম পাকিস্তানি। পূর্ববঙ্গে যে জঘন্য হত্যাকাণ্ড তারা চালিয়েছে তা আড়াল করতে এখন তারা এসব মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে। পূর্ববঙ্গের বিচ্ছিন্নতাকে সফল করে তুলতে ভারত সেনাবাহিনী ও অস্ত্র সরবরাহ করছে বলে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তাকে তিনি মিথ্যা বিবরণ বলে অভিহিত করেন। তিনি লন্ডন থেকে জাতিসংঘে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। সেখানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার চালাবেন।[৩৩০]

নেপাল

নেপালের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত মুস্তাফিজুর রহমান ৩ অক্টোবর কাঠমুণ্ডুতে বাংলাদেশের প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর বাসভবনে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন-

> . . . "bold" decision after six months of "The worst mental agony in my life."
> He said he had communicated his decision to the Nepalese Prime Minister, Mr. K. N. Bisht, from whom he sought permission to stay on in Nepal as the special envoy of the Bangladesh Government till it was liberated, he had also sought the Nepalese Government's protection for himself and his family-wife and two children-from physical, mental or material harm that may be cause by West Pakistanis living in Nepal.[৩৩১]

বাঙালি কূটনীতিক মুস্তাফিজুর রহমান নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী কীর্তিনিধি বিস্থার কাছে লিখিত এক পত্রে উল্লেখ করেন- আমি এমন সরকারের সঙ্গে আর যুক্ত থাকতে পারছি না, যে সরকার গোটা বাঙালি জাতির সামগ্রিক বা আংশিক উচ্ছেদের

[৩২৯] *Morning Star*, 14 October 1971
[৩৩০] *বাংলাদেশ*, ১১ অক্টোবর ১৯৭১
[৩৩১] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৩৫

উদ্দেশ্যে আমার আপন মানুষদের অধিকার, জীবন, স্বাতন্ত্র্য, ধর্মীয় ও চিন্তার স্বাধীনতা এবং সকল ধরনের মৌলিক অধিকার নির্মমভাবে পদদলিত করে চলেছে। আমি তাই পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সরকারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রতি আমার আনুগত্য ঘোষণা করছি।[৩৩২]

নেপালস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের পর তিনজন বাঙালি কর্মচারী ইয়াহিয়া সামরিক সরকারের গণহত্যার প্রতিবাদে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন। এরা সকলেই বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের নেপালে আশ্রয় দেওয়ার জন্য নেপাল সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।[৩৩৩] যে তিনজন বাঙালি কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন তাদের মধ্যে ছিলেন দূতাবাসের ড্রাইভার আব্দুস সাত্তার খান, অফিস অর্ডারী মোহাম্মদ আলী আজম এবং দূতাবাস পিয়ন মোহাম্মদ ইদ্রিস।[৩৩৪]

জাপান

জাপানের পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিক এস. এম. মাসুদ ও কিউ.এম.এ. রহীম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কাজ করেন এবং তাদেরকে জাপান সরকার রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করে।[৩৩৫] রয়টার পরিবেশিত খবরে জানা যায় যে, টোকিওস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের প্রেস এটাচি এস. এম. মাসুদ এবং তৃতীয় সচিব কমর রহীম সপরিবারে বাংলাদেশের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের কারণ বিশ্লেষণ করে তারা বলেন, 'দীর্ঘ সময় ধরিয়া আমরা অভিনয় করিতে পারিনা'।[৩৩৬] বাঙালি কূটনীতিক কমর রহীম তাঁর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন জাপানের পাকিস্তান দূতাবাস থেকে তারা কীভাবে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। জাপান দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত সহ ছয় জন অফিসার কর্মরত ছিলেন। রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোতাহার হোসেন, প্রথম সচিব এ কে এইচ মোর্শেদ (পরবর্তীতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব হয়েছিলেন), মোস্তফা ফারুক ও কমর রহীম এ চারজন ছিলেন কূটনীতিক হিসেবে এবং চারজনই বাঙালি ছিলেন। তথ্য দপ্তরের প্রধান ছিলেন সৈয়দ মো. মাসুদ বা এস এম মাসুদ এবং বাণিজ্য বিভাগের প্রধান ছিলেন একজন পাকিস্তানি। জাপানের পাকিস্তান দূতাবাসের ছয় জন অফিসারদের মধ্যে পাঁচজনেই বাঙালি। এগারো জন স্টাফের মধ্যে ছয় জন ছিলেন বাঙালি। জাপানের পাকিস্তান দূতাবাসে অধিকাংশ ছিলেন বাঙালি। তাই তারা চাইলে কলকাতার মতো দূতাবাস দখল করে পাকিস্তানিদের বের করে দিতে পারতেন। দ্বিতীয় বা তৃতীয় কলকাতা এখানে হয়ে যেতে পারতো। অবশ্য তার আগেই দ্বিতীয় কলকাতা হয়ে যায় দিল্লি। দিল্লিতে বাঙালিরা অবশ্য দূতাবাস ভবন দখল করতে পারেনি। তেমনি জাপানের পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালিরা ইচ্ছে করলেই দখল নিতে পারতেন কিন্তু রাষ্ট্রদূতের কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানের প্রতি অতিমাত্রায় আনুগত্যশীল ছিলেন। শেষ

---

[৩৩২] *জয়বাংলা*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭১
[৩৩৩] মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২
[৩৩৪] *জয়বাংলা*, ১৯ নভেম্বর ১৯৭১
[৩৩৫] Sukumar Biswas, *Japan and the Emergence of Bangladesh*, Dhaka: Agamee Prakashani, 1998. p. 151
[৩৩৬] *বাংলার বাণী*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

পর্যন্তও রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের পক্ষে আসেননি। এমনকি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও আসেননি। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোতাহার হোসেনের সঙ্গে কায়সার মোর্শেদ (ড. কামাল হোসেনের ফার্স্ট কাজিন) এর দ্বন্দ্ব তৈরি হয়ে যায়। কায়সার মোর্শেদ অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কায়সার মোর্শেদ বাংলা বলতে পারতেন না। এজন্য সবাই তাঁকে পাকিস্তান মনোভাবাপন্ন মনে করে ভুল বুঝতো। দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক ফখরুদ্দীন আহমদকে চিঠি লিখে জাপান থেকে বদলি নিয়ে অস্ট্রিয়া চলে যান। এরকম অবস্থায় পাকিস্তানিরা যখন দেখে জাপানের দূতাবাসে বাঙালি সংখ্যা বেশি তাই মোস্তফা ফারুককে প্রথমে ম্যানিলা বদলি করে দেয়। ম্যানিলায় যোগ দেওয়ার কয়েকদিন পর যখন ওরা বুঝতে পারলো ম্যানিলার রাষ্ট্রদূতও বাঙালি তখন তাকে আবার বদলি করে ইন্দোনেশিয়ায় পাঠানো হয়। দূতাবাসে রয়ে যান রাষ্ট্রদূত, কমর রহীম ও তথ্য বিভাগের এস এম মাসুদ। এস এম মাসুদ বেশিরভাগ সময় চাকরি করেছেন পশ্চিম পাকিস্তানে। উনার ছেলে-মেয়েরা পাকিস্তানে লেখাপড়া করেছে। তারা বাড়িতে উর্দু বলতো। তাই কমর রহীম প্রথমে এস এম মাসুদকে ভুল বুঝেছিলেন। এমনকি তারা কখনও এস এম মাসুদ এর সাথে খোলামেলা আলাপ করতে পারতেন না। ফলে তাদের মধ্যে একটি ব্যবধান রয়ে যায়। পরে অবশ্য তা ঠিক হয়ে যায়। একইদিনে কমর রহীম এবং এস এম মাসুদ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। তারপর থেকে এস এম মাসুদের বাসায় বাংলাদেশের অস্থায়ী মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। মোস্তফা ফারুক চলে যাওয়ার আগে ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে সংবাদ আদান-প্রদান করতেন। কিন্তু মোস্তফা ফারুক কখনো বলতেন না ভারতীয় সূত্রে খবর পেয়েছেন। কোথা থেকে যুদ্ধের সংবাদ ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সংবাদ পেতেন তা জিজ্ঞাসা করলেও বলতেন না। মোস্তফা ফারুক চলে যাওয়ার পর ভারতীয়রা যোগাযোগ করতো কমর রহীমের সঙ্গে।

১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে এস এম মাসুদ এর পরিবার, কমর রহীম, ইস্কান্দার চৌধুরী উদ্যোগী হয়ে সমুদ্র সৈকতে পিকনিক করতে যান। সেখানে গিয়ে খোলামেলা আলাপ করেন যে, যা ঘটছে দেশে এখন সময় এসেছে তাদের কেটে পড়ার। কিন্তু তারা নির্দিষ্ট কোনো দিন ঠিক করতে পারেননি। তারা মুজিবনগর সরকারের কাছে তাদের করণীয় জানতে চান। মুজিবনগর সরকার থেকে তাদের বলা হয়, 'দেখো আমরা তোমাদের কাছ থেকে পাবলিসিটি চাই। তোমরা চেষ্টা করবে জাপানে থেকে যেতে। যতদিন না জাপানিরা তোমাদের বের করে দিচ্ছে ততক্ষণ তোমরা জাপানে থাকবে। আর যদি বের করে দেয় তাহলে তোমাদের চয়েস। তোমরা কলকাতায় চলে আসতে পারো অথবা লন্ডনে চলে যেতে পারো।' মুজিবনগর সরকারের এমন উত্তরে তারা কিছুটা চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়েন। কেননা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে হলে তাদের অর্থের প্রয়োজন। এছাড়া এস এম মাসুদ এর পরিবার আছে। এদিক দিয়ে কমর রহীম ছিলেন একা। কিন্তু তাঁর এসময় ভাবনা হয় যে, তিনি তাঁর পরিবারের বড় সন্তান। তাঁর বাবা কয়েক মাস আগে একাডেমিতে প্রশিক্ষণে থাকার সময় মারা গিয়েছেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাঁর ভাই-বোনেরা সবাই কলেজ স্কুল লেভেলের। তাঁর পরিবার তখন নওগাঁতে থাকতো। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের কোনো খোঁজ পাচ্ছিলেন না। এপ্রিল মাসে তাঁর সেজো ভাইয়ের কাছ থেকে চিঠি পান, যে চিঠির ঠিকানা ছিল মুক্তিবাহিনীর কোনো ক্যাম্প। ওই চিঠিতে মুক্তিযুদ্ধে যোগ

দেওয়ার কথা জানায় তাঁর ভাই। তারপর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না থাকায় কমর রহীম বাড়িতে টাকা-পয়সাও পাঠাতে পারছেন না। তিনি তখন ভাবতে লাগলেন যদি পাকিস্তান দূতাবাস ছেড়ে চলে যান তাহলে তাঁর মা তাঁকে নিয়ে চিন্তা করবেন। আবার তিনি নিজেও চিন্তা করবেন পরিবারের কী হলো এই ভেবে। দেশ স্বাধীন হতে কত বছর লাগবে সেটা অনিশ্চিত। আর কোনোদিন দেশে যেতে পারবেন কিনা, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হবে কিনা এসব নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। একসময় কমর রহীম এ ব্যাপারটি নিয়ে এস এম মাসুদ এর সঙ্গে আলাপ করেন। এস এম মাসুদ তাঁকে পরামর্শ দেন একবার বাংলাদেশ থেকে ঘুরে আসতে। প্রয়োজনে তিনি মুজিবনগর সরকারকে জানাবেন। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কী ঘটবে বা পরিবারের লোকজন কোথায় আছে এসব ভেবে কমর রহীম দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে যান। ছুটির ব্যাপারে মাসুদ তাঁকে পরামর্শ দেন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলার জন্য। কমর রহীম একটু দ্বিধান্বিত ছিলেন যে রাষ্ট্রদূত তাঁকে ছুটি দিবে কিনা। কারণ তিনি তাঁর ভাইয়ের চিঠি উনাকে দেখাতে পারছিলেন না। তাঁর ভাই চিঠিটি লিখেছে ভারত থেকে। কমর রহীম রাষ্ট্রদূতকে বলেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মায়ের শেষ চিঠি পেয়েছেন। তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ-খবর জানেন না। এমনকি তিনি যে পরিবারকে টাকা পাঠাতে পারছেন না তা-ও বললেন। অবশ্য কমর রহীমের এক্ষেত্রে দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত মায়ের খোঁজ নেওয়া ও পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগে মায়ের অনুমতি নেওয়া। কমর রহীমের কথায় রাষ্ট্রদূত সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর ছুটি অনুমোদন করে দিলেন। তবে ঠাট্টা করে বললেন, ‘যাও কিন্তু ঐখানে বসে ডিফেক্ট করো না। তাহলে কিন্তু আমার চাকরি থাকবে না। আমি উনাকে বললাম স্যার আমি কথা দিচ্ছি আমি ওখানে কিছু করবো না। আমি আপনার কাছে ফিরে আসবো।’ রাষ্ট্রদূতের অনুমোদনের পর ছুটি মঞ্জুর হতে সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে যায়। কমর রহীম ১ অক্টোবর ছুটিতে এসে বাংলাদেশে বারো দিন অবস্থান করেন। তার মধ্যে তিন ঘন্টা তিনি তাঁর মায়ের সঙ্গে কাটিয়েছেন। ঢাকার ব্যাংকে কিছু টাকা ছিল সেগুলো দুই কাজিনের নামে যৌথ হিসাব খুলে টাকার ব্যবস্থা করে ফিরে যান। যদি তিনি বেঁচে না থাকেন তাহলে যেন তাঁর পরিবার কোনোরকমে চলতে পারে এজন্য তিনি এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অক্টোবর মাসে ১৪/১৫ তারিখ জাপানে ফিরে গিয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, ২২ অক্টোবর তারা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করবেন। এ ব্যাপারটি ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপ করার পর তারা পরামর্শ দেয় যে, ‘তোমরা অক্টোবর মাসে করলে তোমাদের একটা অসুবিধা হবে। বরং তোমরা নভেম্বর মাসের দুই তারিখে করো। নভেম্বরে তোমাদের বেতন ও বাসা ভাড়া নিয়ে নাও। এতে তোমাদের সরকারের এক মাসের লায়াবিলিটি কমবে।’ ২ নভেম্বরে করার আরেকটি কারণ ছিল- ঐদিন জাপানের সম্রাটের গার্ডেন পার্টি ছিল। সেখানে কমর রহীমকে দাওয়াত করেছিল। এমনিতেই জাপানিরা বাংলাদেশের যুদ্ধকে সমর্থন করে না। ওরা মনে করতে পারে সম্রাটের দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করে বাঙালিরা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছে। অগত্যা ২ নভেম্বর সম্রাটের গার্ডেন পার্টি থেকে ফিরে সরাসরি সংবাদ সম্মেলন ডেকে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের কথা ঘোষণা করেন।

মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষীর সঙ্গে তারা যোগাযোগ করেন। কারণ দূতাবাস থেকে অক্টোবর মাসের বেতন তারা নিয়েছেন। তারপর কত দিন চলবে, মুজিবনগর সরকার তাদের জাপানে থাকতে বলেছেন কিন্তু কতদিন

থাকতে হবে তা বলেননি। এছাড়া পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর পরিস্থিতি কী হবে তা-ও ছিল অজানা। কেননা জাপানিরা কী তাদের সেদিন-ই বের করে দিবে কিনা, যদি কলকাতা বা লন্ডন যেতে হয় তাহলে বিমানের টিকিট কেনার জন্য টাকা প্রয়োজন। এসব কিছুর উত্তর জানার জন্য তারা মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পূর্বেই মুজিবনগর সরকার তাদের জন্য একটি তহবিল পাঠায়। তারপরই তারা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন।[৩৩৭] উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার সময় এস এম মাসুদ এর বয়স ছিল ৫৬ বছর এবং ছয় সন্তানের জনক। তিনি ১৯৭০ সালের ১০ নভেম্বর থেকে টোকিওস্থ পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। অপরদিকে ২৯ বছর বয়স্ক কমর রহীম ১৯৭০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর টোকিওস্থ পাকিস্তান দূতাবাসে যোগ দিয়েছিলেন। এই দুইজন বাঙালি কূটনীতিক পদত্যাগ করার পর জাপানের সাংবাদিকদের জানান যে, Because we could no longer bear the terrible repression by the West Pakistan Government in East Bengal.[৩৩৮]

সুইজারল্যান্ড

৩ নভেম্বর *দি টাইমস* এ প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে, সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ন এ অবস্থিত পাকিস্তানি দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব পদে নিয়োজিত ওয়ালিউর রহমান পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। তিনি সুইজারল্যান্ডে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ওয়ালিউর রহমান বলেন, পাকিস্তান সরকার সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে যে, তারা পূর্ব পাকিস্তানে ১৫ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে। তাই এমন সরকারের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক নয়। তিনি জেনেভায় একটি বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র খুলবেন বলে সাংবাদিকদের জানান।[৩৩৯] ৪ নভেম্বর *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন* এ প্রকাশিত এক পত্রে ওয়ালিউর রহমান ব্রাসেলসে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বাংলাদেশ সম্পর্কে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য সমর্থন করেন। Institute of International Relations এ প্রদত্ত এই বক্তৃতায় মিসেস গান্ধী বলেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট দেওয়ার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণকে নিপীড়ন ভোগ করতে হচ্ছে। ওয়ালিউর রহমান বলেন, কূটনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের সামরিক আক্রমণের লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সুযোগ পান। বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কে মিসেস গান্ধী যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা সঠিক বলে ওয়ালিউর রহমান মনে করেন।[৩৪০] বার্নে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসের গোলাম মোস্তফা নামক জনৈক পদস্থ কর্মচারীও পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে সুইস সরকারের নিকট রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন জানান।[৩৪১] ওয়ালিউর রহমান ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন স্ত্রী শাহরুখ রহমান তাঁকে ২৭ মার্চ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে বলেছিলেন। ওয়ালিউর রহমান ১৯৬৮ সালের জুন মাসে তাঁর প্রথম কর্মস্থল ইন্দোনেশিয়ার পাকিস্তান দূতাবাসে যোগ দেন। ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থানকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত

---

[৩৩৭] গবেষকের সঙ্গে কমর রহীম এর সাক্ষাৎকার, ১৯ মার্চ ২০১৮

[৩৩৮] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৫০-৮৫১

[৩৩৯] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৫১

[৩৪০] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮

[৩৪১] *জয়বাংলা*, ২৭ আগস্ট ১৯৭১

হয়ে ঢাকা সেনানিবাসে বন্দি। এসময় ইন্দোনেশিয়ার পাকিস্তান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত প্রায়ই কাজের জন্য ইসলামাবাদে যেতেন। তাই দূতাবাসের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন শামসুল কিবরিয়া। সদ্য যোগ দেওয়া ওয়ালিউর রহমান দূতাবাসের নিরাপত্তার বিষয়টি দেখতেন অর্থাৎ দূতাবাসের অর্থ, সাইফার ইত্যাদি বিষয় তাঁর অধীনে ছিল। উল্লেখ্য যে, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীও ইন্দোনেশিয়ার দূতাবাসে ছিলেন। তারা তিনজন ওয়ালিউর রহমানের বাসায় বসে তাদের কর্মপন্থা স্থির করেন। তাদের পরিকল্পনা ছিল বঙ্গবন্ধুর কিছু হয়ে গেলে তারা পশ্চিম পাকিস্তানিদের বের করে দিয়ে ইন্দোনেশিয়ার দূতাবাস দখল করে নিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ওয়ালিউর রহমানকে সুইজারল্যান্ডে বদলি করায় তাদের সে পরিকল্পনা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। সুইজারল্যান্ডে যাওয়ার পর ওয়ালিউর রহমান বিবিসি'র মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ শুনেছেন। ভাষণটি বাংলায় হলেও বিবিসি থেকে কিছু অংশ ইংরেজিতে প্রচার করা হয়েছিল। সুইজারল্যান্ডের পাকিস্তান দূতাবাসের প্রধান পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবের লোক হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানিদের পছন্দ করতেন না। রাষ্ট্রদূত ২৬ মার্চ প্রচারিত ইয়াহিয়া খানের ভাষণ পছন্দ করেননি তা ওয়ালিউর রহমানকে ডেকে বলেন। কিন্তু ওয়ালিউর রহমান তার কথার কোনো উত্তর দেননি। বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি সংগ্রহ করার জন্য ওয়ালিউর রহমান লন্ডনে তাঁর বাঙালি সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। লন্ডন থেকে পাঠানো হলে তিনি সেটি গোপনে তাঁর বাসায় রেখে দেন। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রীও এসব ব্যাপারে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করতে বলেছিলেন। এসময় সুইজারল্যান্ডের বার্নে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসে আরো দু'জন বাঙালি কর্মরত ছিলেন। একজন রাষ্ট্রদূতের পি.এ হিসেবে জসিম উদ্দিন এবং আরেকজন সাইফার কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ওয়ালিউর রহমান লন্ডনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমদ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান দূতাবাসের রাজনৈতিক কাউন্সেলর শামসুল কিবরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ওয়ালিউর রহমানকে এত তাড়াতাড়ি দূতাবাসের চাকরি ছাড়তে নিষেধ করেন। বরং তাকে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের নির্দেশমতো চাকরি ছাড়তে বলেন। ওয়ালিউর রহমান কেন নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন তার কারণ হিসেবে বলেন-

ক. এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতে মুজিবনগর সরকার মি. লাহিড়ী নামে একজন দূতকে দিয়ে কলকাতা মিশনের আনোয়ারুল করিম চৌধুরীর স্বাক্ষরিত একটি চিঠি পাঠায়। যেখানে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তান দূতাবাসে অবস্থান করে দূতাবাসের অভ্যন্তরীণ সংবাদ মুজিবনগর সরকারের কাছে পাঠানো। চিঠিতে সুইজারল্যান্ডের ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়। যাদের কোড নাম ছিল 'ফ্রেন্ডস'। ওয়ালিউর রহমান কখন পদত্যাগ করবে তা মুজিবনগর সরকার থেকে জানানো হবে। উল্লেখ্য যে, ওয়ালিউর রহমানকে মুজিবনগর সরকারের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ এমনকি চিঠি পাঠাতেও নিষেধ করা হয়। প্রয়োজনে মুজিবনগর সরকার 'ফ্রেন্ডস'দের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে।

খ. মুজিবনগর সরকারের চিঠি পাওয়ার পর ওয়ালিউর রহমান ওয়াশিংটনে শামসুল কিবরিয়াকে ফোন করে তাঁর করণীয় সম্বন্ধে জানতে চান। শামসুল কিবরিয়া তাঁকে জানায় যে, তারা নিজেরা এখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি, শুধুমাত্র পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। শামসুল কিবরিয়া ওয়ালিউর রহমানকে হুট করে কোনো কিছু না করতে নিষেধ করেন।

গ. আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ওয়ালিউর রহমানকে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার কথা বলে মুজিবনগর সরকার। কিন্তু জুলাই মাসে হঠাৎ করে নির্দেশ আসে যে, ২২-২৩ আগস্ট জেনেভায় ইউরোপীয় দেশগুলোর পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতদের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ওয়ালিউর রহমানকে এ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে সেখানকার বিস্তারিত তথ্য মুজিবনগর সরকারকে জানাতে বলা হয়।

ঘ. আগস্ট মাসে আবার মুজিবনগর সরকার থেকে নির্দেশ আসে সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের বৈঠক হবে। সেখানে কী পরিস্থিতি হয় তা দেখে অক্টোবরে পদত্যাগের কথা জানানো হবে।

ঙ. অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ওয়ালিউর রহমানের কাছে 'ফ্রেন্ডস'দের মাধ্যমে বার্তা আসে নভেম্বর মাসে পদত্যাগ করার। তবে বলা হয়, পদত্যাগ যেন ৭ নভেম্বরের পূর্বে হয়। এ বার্তা পাওয়ার পর ওয়ালিউর রহমান ২ নভেম্বর পাকিস্তান সরকারের চাকরি থেকে পদত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[৩৪২]

সুইডেন

মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন করতে ১৯৭১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর নরওয়ে থেকে সুইডেনে পৌঁছান। সুইডেনে নিয়োজিত পাকিস্তানের প্রাক্তন কূটনীতিক অফিসার আবদুর রাজ্জাক বিমানবন্দরে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে স্বাগত জানান। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আবদুর রাজ্জাক বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[৩৪৩] কূটনীতিক হয়েও আবদুর রাজ্জাক অন্যায়ের প্রতিবাদে দুই বার পদত্যাগ করেন। প্রথমবার পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা আরম্ভ করলে কূটনীতিবিদ আবদুর রাজ্জাক পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করে সুইডেনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ শুরু করেন। আবদুর রাজ্জাক ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর স্বাধীনতার মূল্যবোধগুলো বিসর্জন দেওয়ার প্রতিবাদে বাংলাদেশ সরকারের চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। তখন তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, 'এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিপ্লবকে ধ্বংস করা হয়েছে।'[৩৪৪] সুইডেনের স্টকহোমে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসের সিকিউরিটি অফিসার এম শফিউল্লাহ পদত্যাগ করে সুইডিস সরকারের নিকট সপরিবারে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[৩৪৫] বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর তিনি বলেছেন- যে জল্লাদ সরকার সুপরিকল্পিতভাবে আমার জন্মভূমিকে পুড়িয়ে ভস্ম করছে এবং নির্বিচারে বাঙালিদের হত্যা করে চলেছে তাদের সাথে আমি কোনোরূপ সম্পর্ক রাখতে

---

[৩৪২] গবেষকের সঙ্গে ওয়ালিউর রহমান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯

[৩৪৩] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

[৩৪৪] জাওয়াদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯

[৩৪৫] আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮

পারি না। দু'বছর আগে তাঁকে এই দূতাবাসে নিযুক্ত করা হয় কিন্তু সম্প্রতি তাঁকে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ফিরে যেতে বলা হয়। তিনি জানান যে, বাঙালিদের বধ্যভূমি পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি আর ফিরে যাবেন না।[৩৪৬]

মুক্তিযুদ্ধকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি বা অবাঙালি একজন কূটনীতিক সুইডেনের দূতাবাসে কর্মরত ইকবাল আতাহার আলী বাংলাদেশ প্রশ্নে পাকিস্তান সরকারের নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন। ইকবাল আতাহারের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের সংবাদ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে কলকাতার *আনন্দবাজার* পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় যে- সুইডেনে নিযুক্ত পশ্চিম পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত ইকবাল আতাহার তাঁর কাজে ইস্তফা দিয়ে নিঃশব্দে সুইডেন ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সুইডেনের কূটনৈতিক মহল বলেছেন, বাংলাদেশের ব্যাপারে ইয়াহিয়া সরকারের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধই এ পদত্যাগের কারণ। পাকিস্তান দূতাবাসের জনৈক মুখপাত্র রাষ্ট্রদূতের অনুপস্থিতির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তিনি চলে গিয়েছেন।' ইকবার আতাহার সুইডেন ত্যাগ করে ব্রাসেলস-এ চলে গিয়েছেন। কূটনৈতিক মহলের সংবাদে জানা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। তিনি তাঁর বন্ধু বান্ধবদের কাছে বাংলাদেশে সামরিক অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা করেন।[৩৪৭]

বাংলাদেশ প্রশ্নে সুইডেনের পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত ইকবাল আতাহার পদত্যাগ করলে এ ব্যাপারে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রতিক্রিয়া জানতে পারে *আনন্দবাজার* প্রতিনিধি। কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের জনৈক মুখপাত্র বলেন- ইকবাল আতাহার পশ্চিম পাকিস্তানি। ইকবাল আতাহারের পদত্যাগের কারণ বাংলাদেশের ব্যাপারে ইয়াহিয়ার সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ। আতাহারের পদত্যাগে প্রমাণ হলো মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ইয়াহিয়া সরকারের ভিত্তি কতটা দুর্বল। এটি মুক্তি সংগ্রামের আরেক ধাপ অগ্রগতি। আতাহারই প্রথম পশ্চিম পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত যিনি ইয়াহিয়া সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। বাংলাদেশের ওপর জঙ্গি ইয়াহিয়ার সরকার যে বর্বরোচিত অত্যাচার চালাচ্ছে সেকথা স্মরণ করে আতাহারের মতো অন্যান্য পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতেরাও ইয়াহিয়া সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।[৩৪৮]

বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন ইকবাল আতাহার এবং স্টকহোমে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে বহির্বিশ্বে জনমত সৃষ্টির জন্য সক্রিয় ও সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশ প্রশ্নে তাঁর মতের জন্য পাকিস্তান সামরিক সরকার তাঁকে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করেন। কিন্তু চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর পাকিস্তানে ফিরে যাননি। প্রসঙ্গত, দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইকবাল আতাহারকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন এবং তাঁকে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানান। বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ১৯৭২ সালের ২৯ জুন ইকবাল আতাহার ঢাকায় আসেন। উল্লেখ্য যে, ইকবাল আতাহার লক্ষ্ণৌর অধিবাসী। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একজন ঘনিষ্ঠ সহচর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

---

[৩৪৬] *জয়বাংলা*, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
[৩৪৭] *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ২৪ জুলাই ১৯৭১
[৩৪৮] ওই, ২৪ জুলাই ১৯৭১

রহমানের সঙ্গেও তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। প্রধানমন্ত্রীর একজন বিশেষ দূত হিসেবে ইকবাল আতাহার পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো সফর করেন।[৩৪৯]

মিশর

পাকিস্তান সরকারের কায়রোস্থ দূতাবাসের চ্যান্সেরি প্রধান ফজলুল করিম ২৭ অক্টোবর মিশর থেকে লন্ডনে পৌঁছে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা তার দেশের সাত কোটি মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র লিপ্ত রয়েছে বলে তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, পাকিস্তানের সামরিক গোষ্ঠী বাংলাকে চিরদিন পদানত রাখার চেষ্টায় নিয়োজিত। লন্ডনে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে ফজলুল করিম বলেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে সকল সম্পর্কচ্ছেদ করে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করাই তার লক্ষ্য। বাংলাদেশের মানুষের ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছে বিশ্বের ইতিহাসে তার নজির নেই।[৩৫০] বিবৃতিতে ফজলুল করিম বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে দৃঢ়ভাবে ফজলুল করিম বলেন, The Army junta in West Pakistan has taken a calculated move to deprive the 75 million people of Bangladesh of their basic human rights and keep them in perpetual subjugation.[৩৫১] উল্লেখ্য যে, ফজলুল করিম ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন।

বেলজিয়াম

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস এর পাকিস্তান দূতাবাসের ১৯ বছর বয়স্ক সাইফার সহকারী পদে কর্মরত বাঙালি কর্মচারী নায়েবুল হুদা বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। ব্রাসেলস এর মতো গুরুত্বপূর্ণ দূতাবাসের একজন বাঙালি কর্মচারী হওয়ায় তাঁকে ইসলামাবাদে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি ইসলামাবাদে ফিরে না গিয়ে বরং বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাঁর মতে ইসলামাবাদ হচ্ছে বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গোরস্থান।[৩৫২]

স্পেন

স্পেন এর রাজধানী মাদ্রিদে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি অফিস সহকারী আবদুল করিম মণ্ডল বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। আনুগত্য প্রকাশ করার পর এক সংবাদ বিবৃতিতে তিনি বলেন-

> Bengalis in Pakistan missions abroad were being subjected to all sorts of harassment and maltreatment. I was not allowed to do official work and was treated with utmost contempt.[৩৫৩]

---

৩৪৯ *দৈনিক বাংলা*, ১ জুলাই ১৯৭২

৩৫০ ফারুক আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪; মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯

৩৫১ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৫১

৩৫২ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮২৮

৩৫৩ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮২৮

পোল্যান্ড

নটবর সিং ছিলেন ১৯৭১ সালে পোল্যান্ডে ভারতের রাষ্ট্রদূত। তিনি তাঁর এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ওয়ারস'তে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন একজন বাংলাভাষী পূর্ব পাকিস্তানি। গণহত্যার প্রতিবাদে তিনি নভেম্বরে জনসম্মুখে ঘোষণা দেন যে, তিনি আর সরকারের পক্ষে কাজ করবেন না। তিনি নটবর সিংকে জেনেভায় পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ভুট্টোর সভার বিবরণীর অনুলিপি দেন। নটবর সিং নিজে তা ওয়ারস থেকে নয়াদিল্লিতে নিয়ে আসেন এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উপস্থিতিতে মি. কাও-এর কাছে হস্তান্তর করেন। পোল্যান্ডের সেই কূটনীতিক পাকিস্তানে অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়েছিলেন। পোল্যান্ডে তাঁর কোথাও যাবার উপায় ছিল না। ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নটবর সিং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। তৎকালীন পোলিশ সরকার ভারতীয় সরকারের মতো একই অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে সেই পাকিস্তানি বাঙালি রাষ্ট্রদূত তাঁর বাড়ি ও অফিসের গাড়ি ফিরে পান। এতে তিনি তাঁর কাজ করতে পারতেন এবং বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে তাকে তাঁর পদে পুনর্বহাল করা হয়।[৩৫৪]

লেবানন

লেবাননের রাজধানী বৈরুতে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসে সাইফার সহকারী পদে কর্মরত বাঙালি কর্মচারী আবদুল লতিফ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাঁকেও অন্যান্য বাঙালিদের মতো ইসলামাবাদে বদলি করা হয়। কিন্তু তিনি ইসলামাবাদে ফিরে না গিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা শ্রেয় মনে করেন। লেবাননের মতো মুসলিম দেশে বসে পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করা বিপজ্জনক হওয়ায় তিনি লন্ডনে যাওয়া স্থির করেন। আবদুল লতিফ লন্ডনে পৌঁছে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেন।[৩৫৫]

সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুরের পাকিস্তান দূতাবাসের সাইফার সহকারী ৩৯ বছর বয়স্ক আলী আহমদ ৮ নভেম্বর রাতে তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে বিমানযোগে অন্যত্র চলে যান। যাবার আগে তিনি বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা, সংবাদপত্র, সংবাদপত্র প্রতিনিধি ও দূতাবাস কর্তৃপক্ষের নামে ডাকে চিঠি পাঠিয়ে তাদের সকলকে তার আনুগত্য পরিবর্তনের কথা জানান।[৩৫৬] তিনি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের জন্য ইয়াহিয়াকে অভিযুক্ত করে তাকে দুটি পত্র দেন। সিঙ্গাপুরের কার্যকরী পাকিস্তান হাইকমিশনারকে একটি পত্রে তার পদত্যাগের কথা উল্লেখ করেন এবং অপর একটি পত্রে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক সরকারের প্রতি চীনের সমর্থন প্রত্যাখানের জন্য অনুরোধ করেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন দূতাবাস থেকে বহু কূটনীতিক বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করায় পাকিস্তান সরকার কোনো বাঙালি কর্মচারীকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত রাখেনি। তবুও সিঙ্গাপুর দূতাবাসের আলী আহমদকে তাঁর স্বীয় পদে বহাল রাখে। কিন্তু আলী আহমদ সাইফার পদাধিকার বলে পাকিস্তান ও সিঙ্গাপুর সম্পর্কযুক্ত সকল গোপন সংবাদ জানতেন। তিনি হচ্ছেন একমাত্র প্রথম সাইফার অফিসার যিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

---

[৩৫৪] আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬০

[৩৫৫] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮২৮

[৩৫৬] *জয়বাংলা*, ১৯ নভেম্বর ১৯৭১

সিঙ্গাপুরে পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মচারী আলী আহমদ দশ মাস ধরে এ দূতাবাসে কাজ করছিলেন কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাঁর পরিবর্তে একজন পশ্চিম পাকিস্তানিকে এখানে নিয়োগ করতে চেয়েছিল। পাকিস্তান সরকার আলী আহমদকে পশ্চিম পাকিস্তান চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এ আদেশ পাওয়ার পর আলী আহমদ তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তানসহ সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেন।[৩৫৭]

চীন

চীন সরকার মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে একতরফাভাবে পাকিস্তান তথা ইয়াহিয়া খানকে সমর্থন দিতে থাকে। নৈতিক সমর্থনের পাশাপাশি অর্থ ও অস্ত্র দিয়েও বাঙালিদের দমন করতে ইয়াহিয়া খানকে সহযোগিতা করে। তাই চীনে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে এসময় কড়া নজরদারি করা হয়। কূটনীতিক ফখরুদ্দীন আহমদ মুক্তিযুদ্ধকালীন ইসলামাবাদে কর্মরত ছিলেন। তিনি চীনের পাকিস্তান দূতাবাস বিশেষ করে বাঙালি কূটনীতিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতেন। তিনি জানতেন চীনের পাকিস্তান দূতাবাসের কারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করছেন। তাই তিনি তাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করেন। এ চেষ্টার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর বক্তব্যে-

> আমাকে কিছু পূর্ব সতর্কতা নিতে হয়। যারা আমার সঙ্গে একমত হন তাদের মধ্যে ছিলেন জনাব আবুল আহসান ও হুমায়ুন কবির। আমরা সকলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী। নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর জনাব আখতারের ওপরও আমার বিশ্বাস ছিল। পরে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে স্পর্শকাতর এই বিভাগের দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়।[৩৫৮]

অবশ্য আখতার পদচ্যুত হবার আগেই বেইজিং এ নিযুক্ত বাঙালি রাষ্ট্রদূত খাজা মোহাম্মদ কায়সার সম্পর্কে কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন ফখরুদ্দীন আহমদকে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পর জরুরি আলোচনার জন্য কে এম কায়সারকে অবিলম্বে ইসলামাবাদে যাওয়ার জন্য গোপন তারবার্তা পাঠানো হয়। কে এম কায়সার গড়িমসি করে বিষয়টি এড়িয়ে যান। এর আগে ছুটিতে থাকার সময় কে এম কায়সার শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি তাঁর উষ্ণ প্রশংসা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছিলেন। যা অচিরেই সামরিক সরকারের গোচরীভূত হয়। তাই সামরিক জান্তা ২৬ মার্চের হত্যাযজ্ঞের পর তাঁকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং তিনি যাতে পক্ষ ত্যাগ করতে না পারেন তার নিশ্চয়তা বিধান করতে চেয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে কে এম কায়সারের একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। যা পাকিস্তান সরকার জানতো। এর আগে পঞ্চাশের দশকে যখন কে এম কায়সার কাউন্সেলর হিসাবে বেইজিংয়ে কর্মরত ছিলেন সে সময় পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চীন সফরের প্রাথমিক কাজগুলো তিনি দেখভাল করেছিলেন। তাঁর কারণেই চীনে সোহরাওয়ার্দীর এই সফর সম্ভব হয়েছিল। চীনে এটি ছিল পাকিস্তানের উচ্চ পর্যায়ের প্রথম সফর।[৩৫৯] কে এম কায়সার বিপদের আঁচ পেয়ে শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে ইসলামাবাদ ফিরতে তাঁর অক্ষমতার কথা পাকিস্তান সরকারকে জানান। এসময় পাকিস্তান সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুলতান আহমেদ চীনা নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য

---

[৩৫৭] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৫০

[৩৫৮] ফখরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১

[৩৫৯] ওই, পৃ. ৬১-৬২

গোপনে চীন সফর করেন। পররাষ্ট্র সচিবের চীন সফরের সময় কে এম কায়সারকে স্বপদে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে এই সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় যে, চীনের পাকিস্তান দূতাবাসের স্পর্শকাতর বিষয়গুলো দেখাশোনা করবে রাষ্ট্রদূতের অবর্তমানে সামরিক এটাচি।[৩৬০] ম্যানিলায় খুররম খান পন্নী পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করার পর পিকিংয়ে পাকিস্তান দূতাবাসে বাঙালি কূটনীতিক হিসেবে অবশিষ্ট থাকেন কে এম কায়সার। জানা যায় যে, তিনি ইসলামাবাদের ইয়াহিয়া সরকারের কড়া নজরদারিতে ছিলেন। কারণ, ইয়াহিয়ার বাংলাদেশ নীতির প্রতি পিকিং সরকারের সমর্থনের ফলে বাঙালি কূটনীতিক কে এম কায়সার খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়ে যান। তিনি নিজেকে পিকিংয়ের কূটনীতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। ইয়াহিয়া সরকার কে এম কায়সারের গতিবিধির ওপর নজর রাখতেন। এমনকি তাঁকে কোনো কাজে হংকং যেতে দেওয়া হয়নি।[৩৬১] সুইজারল্যান্ডের বাঙালি কূটনীতিক ওয়ালিউর রহমান তাঁর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে চীনের রাষ্ট্রদূত খাজা মোহাম্মদ কায়সার সম্পর্কে বলেন, তিনি বৈবাহিক সূত্রে ঢাকার নবাব পরিবারের জামাতা। পঞ্চাশের দশকে চীনে পাকিস্তান দূতাবাসে কূটনীতিক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৯ সালে একই দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন ধরে চীনে পাকিস্তানের কূটনীতিক হিসেবে কাজ করায় তিনি চীনা বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। কে এম কায়সার ছিলেন পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রদূত যাকে শুধুমাত্র পাকিস্তানিরা নয় বরং পররাষ্ট্র মন্ত্রীরাও সম্মান ও সমীহ করতেন। এমনকি চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কে এম কায়সারের সমর্থন ছিল এবং গোপনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন। তবে পাকিস্তান সরকারের কঠোর নজরদারিতে থাকায় তিনি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে পারেননি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে কে এম কায়সার বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে বার্মায় বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।[৩৬২]

ফ্রান্স

স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি বিশ্বের বিবেকে যে নতুন ভাবধারার সৃষ্টি হয়েছে সে ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান সরকারের ফ্রান্সে নিযুক্ত দুই জন বাঙালি কূটনীতিক মোশারফ হোসেন ও শওকত আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে ফরাসি সরকারের নিকট রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন।[৩৬৩] এ দু'জন কূটনীতিক রেডিও ফ্রান্সকে জানিয়েছেন, পাকিস্তান সরকার তাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। দূতাবাসে দুর্ব্যবহারের জন্য তারা এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[৩৬৪] এ দুজন বাঙালি কূটনীতিকের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের পর মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়-

> Commenting upon the "defection" of the two Bengali officials M/S. Mosharraf Hossain and Shaukat from the Embassy of Pakistan in Paris, a spokesman of the Foreign Office of the

---

[৩৬০] ফখরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

[৩৬১] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *তৃতীয় খণ্ড*, পৃ. ৮২৬; *বাংলার বাণী*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

[৩৬২] গবেষকের সঙ্গে ওয়ালিউর রহমান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯

[৩৬৩] *সোনার বাংলা*, জুলাই ১৯৭১

[৩৬৪] *কালান্তর* (কলকাতা), ৯ জুলাই ১৯৭১

Bangladesh Government has congratulated them for their decision of owing allegiance to Bangladesh Government and said today that we do not call it defcection. This is their choice of freedom from the Fascist warlods of West Pakistan who have enslaved the Bengalis as much in their Embassies abroad in occupied areas of Bangladesh. Ambassadors of Pakistan have impounded the passports of their Bengali Officials, refused or denied their entitlements, and turned them into non-entities. In some instances they have abolished the posts the Bengalis were holding abroad, and transferred them to Islamabad (City of Islam), the Capital of Pakistan for virtual inprisonment.

The Spokeman called upon the Government of France to extend all co-operations to these patriotic sons of Bangladesh. [৩৬৫]

হংকং

হংকং এর পাকিস্তান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত এবং ট্রেড কমিশনার মহীউদ্দিন আহমদ ১৩ আগস্ট বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। আনুগত্য প্রকাশ করার পর দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেছেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ২/৩ মাসের মধ্যেই শেষ হবে। তিনি আরো বলেন, যে সমস্ত দেশের পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতরা যেভাবে দলে দলে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতে এগিয়ে আসছেন তাতে একথা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, অচিরেই বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী বিতাড়িত হবে।[৩৬৬] ম্যানিলাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিক খুররম খান পন্নী পদত্যাগ করার পূর্বে হংকংস্থ পাকিস্তান মিশনের প্রধান মহসীন আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[৩৬৭]

ইন্দোনেশিয়া

জাকার্তার বাঙালি রাষ্ট্রদূত আবুল ফজল শামসুজ্জামান কীভাবে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করবেন তার একটি পরিকল্পনা করেন। ১৭ এপ্রিল আবুল ফজল অফিসে যান প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আনার জন্য। পাশাপাশি চিন্তা করতে থাকেন কখন কীভাবে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করবেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল দূতাবাসে ১২ জন বাঙালি ও তাদের পরিবারের সকল সদস্যসহ একসঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন। যাতে পুরো বিশ্বে একটা সাড়া পড়ে যায়। যেমন সাড়া পড়েছিল কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন ও ওয়াশিংটনে বাঙালি কূটনীতিকরা পদত্যাগ করার সময়। দুতিনজন বাঙালি কূটনীতিকের মনোভাব সুস্পষ্ট ছিল না বলে তখনও তাদেরকে চুপ থাকতে হয়েছে।[৩৬৮]

জাকার্তার বাঙালি কূটনীতিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে নির্দেশনা পাওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে বিলম্ব করেন। কেননা তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করলে বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন। তাই পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে সাহস পাচ্ছিলেন না। আবার অনেকেই বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে নির্দেশনা পেয়েছিলেন যে, পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করলে তাদের ভাতা ও চাকরির নিশ্চয়তা দেওয়া হবে। কিন্তু অনেকেই তা পাননি। যে কারণে এ

---

[৩৬৫] Sukumar Biswas edited, *ibid*, p. 59

[৩৬৬] *বিপ্লবী বাংলাদেশ*, ২৯ আগস্ট ১৯৭১; জয়বাংলা, ২০ আগস্ট ১৯৭১

[৩৬৭] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮২৬ ; *বাংলার বাণী*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

[৩৬৮] আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১-৪২

বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে একটি ভুল বোঝাবুঝি ও মান অভিমানের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। মোস্তফা ফারুক চ্যান্সেরি প্রধান হয়ে এ নির্দেশনা পেয়েছিলেন কিন্তু অপরদিকে কমার্শিয়াল সেক্রেটারি হয়েও আবুল ফজল শামসুজ্জামান এ ধরনের কোনো নির্দেশনা পাননি। তিনি প্রথমদিকে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা আশা করেছিলেন। কিন্তু মুজিবনগর সরকার থেকে সে ধরনের কোনো প্রত্যুত্তর আসেনি। যখন আসে তখন তিনি অনেকটা অভিমানে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে বিলম্ব করেন। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৮ ডিসেম্বর খুররম খান পন্নী ও শামসুল আলম জাকার্তার পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে বললে কূটনীতিক আবুল ফজল শামসুজ্জামান তাতে সাড়া দেননি। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ছিল- ‘এতদিন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের জন্য গোপনে কাজ করেছি, কিন্তু পাকিস্তান পক্ষ গোপনে ত্যাগ করবো না। বরং সাড়া বিশ্বকে জানিয়ে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দ্বিধা দ্বন্দ্বের কারণে তা বিলম্ব হয়ে যায়।’[৩৬৯]

জাকার্তার বাঙালি কূটনীতিক আবুল ফজল শামসুজ্জামান পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগে কোনোরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পেরে জাকার্তার ভারতীয় দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত এন বি মেননকে টেলিফোন করেন। টেলিফোনে তিনি তাঁর করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ জানতে চান। অবশ্য ভারত সরকারের নির্দেশ মোতাবেক বিশ্বের সকল ভারতীয় দূতাবাস পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিকদের সাহায্য সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় জাকার্তার ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তা নীরোদ সিংহ রায়ের কথাবার্তায়। তিনি জানান যে, বাংলাদেশ ব্যাপারে তিনি কোনোদিন রাষ্ট্রদূত এন বি মেননের সঙ্গে কথা বলেননি। যোগাযোগ ছিল শুধু নীরোদ সিংহ রায়ের সঙ্গে। নীরোদ সিং একদিন বলেছিলেন, আবুল ফজলের কাজের কথা সব কিছু এন বি মেনন জানেন। এমনকি তাঁর প্রতি এন বি মেননের শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি বলে দিয়েছেন, যে কোনো সময় কোনো বিপদের আভাস পেলে সপরিবারে গাড়ি নিয়ে এন বি মেননের বাসায় চলে যেতে। তার পরের দায়িত্ব এন বি মেননের।[৩৭০]

২০ ডিসেম্বর আবুল ফজল শামসুজ্জামান জাকার্তায় তাঁর নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করেন। সংবাদ সম্মেলনে ১২ জন বাঙালি পরিবারের সদস্যসহ ৫৩ জন বাঙালির পক্ষ থেকে আবুল ফজল সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন- আমরা বাংলাদেশি। অনেক রক্তের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অপ্রকাশ্যে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি। আজ এই সংবাদ সম্মেলনে জাকার্তা প্রবাসী আমরা ৫৩ জন বাঙালি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমাদের আনুগত্য ঘোষণা করছি। এই সঙ্গে আমরা পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তান দূতাবাসের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করছি। বাংলাদেশ সরকার চাইলে আমরা যে

---

[৩৬৯] আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৪
[৩৭০] ওই, পৃ. ৪৪-৪৫

কোনো সেবাদানে প্রস্তুত আছি। যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের দেশ-বাংলাদেশে ফিরে যেতে না পারি ততদিনের জন্য ইন্দোনেশীয় সরকারের কাছে আমরা রাজনৈতিক আশ্রয় ও নিরাপত্তা কামনা করছি।[৩৭১]

চেকোশ্লোভাকিয়া

মুক্তিযুদ্ধ শেষে ২৮ ডিসেম্বর চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিক বাণিজ্য সচিব নিজামুর রহমান বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। আনুগত্য প্রকাশ করার পর তিনি সাংবাদিকদের জানান যে, তাকে প্রাগে থাকা এবং নতুন সরকারের জন্য কাজ করতে দেওয়ার জন্য তিনি চেকোশ্লোভাক সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।[৩৭২]

বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে পাকিস্তানের দূতাবাসগুলোতে অনেক বাঙালি কর্মকর্তা কাজ করতেন এবং সপরিবারে তাঁরা ওই দেশগুলোতে থাকতেন। তাঁরা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ অবস্থানে ছিলেন। তাঁদের অনেকেই পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। স্বাধীনতার এই উত্তাপ দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তাদের গায়ে লেগেছিল ধীরে ধীরে। তবে অনেকেই শেষ অবধি পাকিস্তান সরকারের চাকরি করে গেছেন।[৩৭৩]

মুক্তিযুদ্ধকালীন সমগ্র বিশ্বে পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিক পদমর্যাদার ৩৮ জন ব্যক্তি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস থেকে বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের যে ধারা শুরু হয়েছিল তা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৫ জন রাষ্ট্রদূত, ৩ জন কাউন্সেলর, ২ জন প্রথম সচিব, ১৪ জন দ্বিতীয় সচিব, ১৩ জন তৃতীয় সচিব পদমর্যাদার বাঙালি কূটনীতিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। তারা কে কোন দেশে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন তার তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হলো।

৩.৬ পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ পরবর্তী বাঙালি কূটনীতিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

মুজিবনগর সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাস নাগাদ বিদেশে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের বড় অংশ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। স্বাভাবিকভাবে তাদের চাকরি ও জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব বর্তায় মুজিবনগর সরকারের ওপর। মুজিবনগর সরকার অবশ্য শুরু থেকেই নির্দেশনা দিয়েছিল যে, বাঙালি কূটনীতিকরা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে চলে আসার পর তাদের নিজ নিজ দেশে বাংলাদেশ মিশনে কাজের নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে, এমনকি তাদের ভাতা প্রদান করা হবে। সে মর্মে মুজিবনগর সরকার কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল। পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিকদের পক্ষ ত্যাগ করার এই নির্দেশ রেহমান সোবহানের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল মে মাসে। কিন্তু অনেক দূতাবাসের কূটনীতিকরা নিজেদের আর্থিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে বিলম্ব করে। তারপরও তারা দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের উচ্চ মর্যাদাশীল চাকরি ত্যাগ করে

---

[৩৭১] আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

[৩৭২] *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১

[৩৭৩] মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭। পৃ. ৯৮

দূতাবাস ছেড়ে বেরিয়ে আসে। বাংলাদেশের জন্য পাকিস্তানের চাকরি ত্যাগ করেছেন তাদেরকে আর্থিক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে সন্দেহ নেই। এই সব কূটনীতিকদের কেবলমাত্র কিছু 'সাবজিসটেন্স এলাউন্স' দেওয়া হতো। বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনীতিকদের মাসোহারা এবং অন্যান্য খরচ বাবদ মুক্তিযুদ্ধকালে ভারত সরকার পাঁচ লাখ পাউন্ড সাহায্য দান করে বলে জানা যায়।[৩৭৪] মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যে সকল বাঙালি কূটনীতিক বাংলাদেশের জন্য কাজ করেছিলেন তাদের যে ভাতা প্রদান করা হয় তা ভারত সরকার বিদেশি মুদ্রায় প্রদান করেন। বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশের জন্য পাকিস্তানের চাকরি ছেড়ে কাজ করতে বলা হলে তখন একজন কূটনীতিক প্রস্তাব করেছিলেন যে, যদি বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন না করতে পারে তবে তাদের যেন ভারতীয় বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে চাকরি দেওয়া হয়।[৩৭৫]

কলকাতা পাকিস্তান দূতাবাসের উপ হাইকমিশনার এম হোসেন আলী পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য ত্যাগের পূর্বে নিজের জীবনযাত্রার অনেক কিছু আগে থেকেই পরিবর্তন করেছিলেন। নিজেদের ব্যক্তিগত টাকা-পয়সা যা হংকং ব্যাংকের কলকাতা শাখায় জমা ছিল তা উত্তোলন করে নেন। যাবতীয় অর্থ নিজের কর্মস্থলে একটি লোহার সিন্দুকে রেখে চাবি নিজের কাছে রাখেন। তাঁর অন্যতম চিন্তা ছিল সদ্য গঠিত মুজিবনগর সরকার হয়তো বাঙালি কূটনীতিক ও কর্মচারীদের বেতন দিতে পারবে না। তাই তাঁর কাছে গচ্ছিত টাকা দিয়ে তাদের বেতন-ভাতা দিতে হবে। তাঁর নিজস্ব সঞ্চয়ের পুরো টাকা সে সময় জমা ছিল রাওয়ালপিণ্ডিতে। নিজের সংসার খরচ চালানোর জন্য বাসার বিলাসদ্রব্যগুলো বিক্রি করে দেন। কেননা পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য পরিবর্তনের পর সংসার কীভাবে চালাবেন সে দুশ্চিন্তা তাঁর ছিল। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের রেডিওগ্রাম ও রেকর্ডগুলোও বিক্রি করে দেন। এমনকি নিজের বাসার চীনা মাটির তৈজসপত্রও বিক্রি করে দিয়েছেন।[৩৭৬] এ সম্পর্কে হোসেন আলী তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন-

> During liberation period, not only did I sacrifice my pay and allowances (admissible as High Commissioner), I even forced my officers & staff to receive much less than they were entitled to. My wife sold our personal belongings radio, refrigerator & even sares to meet our own expenses as the amount. I was getting was totally inadequate. My house became an Open house like a soup kitchen where everyone was welcome all the time.[৩৭৭]

দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেওয়ার পর স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে কী ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন সে সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন-

> It was hot and humid on 8 April in Delhi when we gave the press interview in a tiny, crowded room in the Lodhi Hotel. For little Elora and Farah, it was the first taste of the harash and uncertain life we would have to face for an indefinite period. They found the room temperature unbearable and started repeating in Hindi, "Papa, Mummy, *ghar cholo* (let us go home)!" Our friends and relatives back home who had tuned in to All India Radio and other foreign networks

[৩৭৪] জাওয়াদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯
[৩৭৫] *ওই*, পৃ. ১৮৮
[৩৭৬] *দৈনিক সংবাদ*, ১০ মার্চ ১৯৯৭
[৩৭৭] The Diary of Hossain Ali

to listen to our interview heard their plaintive cries and were deeply disturbed, imagining that we were in the worst possible living conditions.[৩৭৮]

কূটনীতিকের মতো মর্যাদাশীল ও সম্মানজনক চাকরি ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার নজির বিশ্বের ইতিহাসে নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেও যা ঘটেছে তা প্রশংসাযোগ্য। তবে পাকিস্তান সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরে নিয়োজিত পদস্থ বাঙালি কূটনীতিকদের চাকরি ত্যাগ করার পর তাদের সকলের জীবনযাত্রার মান কম-বেশি পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তন কীরূপ হয়েছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায় অধ্যাপক রেহমান সোবহান এর বক্তব্যে। সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে রেহমান সোবহান নিউইয়র্ক যান। সেখানে গিয়ে দেখেন এস এ করিম ও তাঁর স্ত্রী আয়েশা করিম ম্যানহাটনের আপার ইস্ট নাইনটিন এর একটি ছোট অ্যাপার্টমেন্টে উঠেছেন। যা ছিল সাদামাটা। নিউইয়র্ক থেকে তিনি আবার ওয়াশিংটনে গিয়ে ভেবেছিলেন ড. হারুন অর রশিদের বাসায় উঠবেন। কিন্তু গিয়ে দেখেন হারুন তাঁর জার্মান স্ত্রী মার্লিন ও তাদের চার ছেলেকে জার্মানি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে এবং নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। পরে সে ম্যাকলিনে তাঁর শহরতলির বাসা ছেড়ে দিয়ে ওয়াশিংটন শহরের কেন্দ্রে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের উল্টোদিকের একটা ছোট অ্যাপার্টমেন্টে চলে যায়।[৩৭৯] এভাবে বাঙালি কূটনীতিকরা প্রতিনিয়ত তাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন করতে থাকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে।

পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশের প্রতি তাদের আনুগত্যের মূল্য হিসেবে আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় অনেক কিছু কাটছাট করতে হয়েছে। বিশেষ করে পূর্বে যারা কূটনীতিক পদমর্যাদার সঙ্গে সমন্বয় করে অনেক বড় আকারের বাসায় থাকতেন তারা সবাই অপেক্ষাকৃত ছোট বাসায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। লন্ডনে যেসকল বাঙালি কূটনীতিক আনুগত্য পরিবর্তন করেন তারা এক কক্ষের বাসায় ৪-৫ সদস্য নিয়ে থাকতেন। নেপালে একটি দুই বেড রুমের বাড়িতে মিশন প্রধান মুস্তাফিজুল রহমানসহ আরো দুইটি পরিবার বসবাস করেছেন বহুদিন।[৩৮০] প্রতিদিনের সংসারের খরচ নির্বাহের জন্য অনেক কূটনীতিকের স্ত্রী ও সন্তানদেরও চাকরি করতে হয়েছে। সন্তানদের অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াতে হয়েছে। কাউকে আবার নিজের ব্যক্তিগত গাড়ি বিক্রি করে দিয়ে গণপরিবহন বা কম মূল্যের গাড়ি ব্যবহার করতে হয়েছে। তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের পূর্বের সুযোগ-সুবিধাময় জীবনকে তুচ্ছ করে লড়াকু সৈনিক হিসেবে সাধারণ মানুষের কাতারে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন।

ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাঙালি কূটনীতিক এ এম এ মুহিত তাঁর পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার বিলম্বের কারণ হিসেবে দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, দেশের অভ্যন্তরে তাদের পরিবার পরিজনের নিরাপত্তা এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, চাকরি ছাড়ার নিশ্চয়তা কি। তিনি জানতেন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কোনোদিন দেশে ফিরতে পারবেন

---

[৩৭৮] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 92
[৩৭৯] রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৫
[৩৮০] *নবপ্রয়াস*, ১৩৯৪ সংখ্যা

কিনা তারও কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। এ এম এ মুহিত তাদের ওই সময়কার অবস্থাকে একটি ঘটনার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন- ‘আমাদের জীবনটা হবে মারিকিতার জীবন। মারিকিতা আমাদের এক বান্ধবী ছিল। শি উইথড্র হার চেক অ্যামবাসেডর টু ইউএসএ বিফোর দি ওয়ার। হার ফাদার ওয়াজ এ প্রিন্স, কাউন্ট। আফটার দি ওয়ার দে ডিডনট গো টু চেকোশ্লোভাকিয়া। হি সেট অফ কাইন্ড অফ ডিফেক্টেড এন্ড টু পলিটিক্যাল এসাইনাস। তার মেয়েটা থাকে, সে আমাদের বন্ধু, ফাংশন হল সি ইজ এ হোস্টেজ। আমেরিকায় এরকম বহু লোক আছে। আর যেহেতু তারা একসময় ডিপ্লোমেটিক সার্কেলে ছিল সুতরাং তার পার্টিতে লোকজন যায়।’[৩৮১]

এই ঘটনার পাশাপাশি এ এম এ মুহিত তাঁর স্মৃতিকথায় মুক্তিযুদ্ধকালীন অর্থাৎ ২৫ মার্চের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কী পরিমাণ উদ্‌বিগ্ন ছিলেন তা ব্যক্ত করেছেন। সাতাশে মার্চের পরে পাকিস্তান দূতাবাসে থাকলেও এ এম এ মুহিত কাজ করেছেন একান্তই বাংলাদেশের জন্য এবং বাঙালিদের জন্য। তাঁর এই অবস্থান ক্ষেত্র বিশেষে বাঙালিদের কাজে লেগেছে। যেমন প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়ানো, মার্কিন সাহায্যে গম বা সার ক্রয় বন্ধ রাখা, বিশ্বব্যাংকের নানা প্রকল্পে বাংলাদেশের জন্য সুবিধাজনক সিদ্ধান্ত নেওয়া ইত্যাদি। তবে মে মাস থেকে দূতাবাসে কাজ করা খুব অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। ঔপনিবেশিক মাতৃভূমির ক্রীতদাস হিসেবে অথবা পাকিস্তানের দালাল হিসেবে পরিচিতি তাঁর নিজের কাছেই অসহ্য মনে হচ্ছিল। ইতিমধ্যে জনমত গঠনে যারা অবদান রাখতে পারবেন তেমন অনেক মার্কিন নেতা বা কর্মীদের সঙ্গে এ এম এ মুহিতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি মহলের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এমন অবস্থায় পাকিস্তান দূতাবাসের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা বস্তুতই একটি সমস্যা বা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। রাজ্জাক খান ছিলেন তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ। তাঁকে বরখাস্ত করায় তিনি সেদিনই নিজের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন। ওয়াশিংটন দূতাবাসে তারা একটি বড় গোষ্ঠী ছিলেন এবং সবকিছুই একসঙ্গে করতেন। এ এম এ মুহিতের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত তাঁর সহকর্মীরা মেনে নেয়। প্রাথমিকভাবে জুনের প্রথম সপ্তাহে এ এম এ মুহিত দূতাবাস ছাড়ার পরিকল্পনা করেন। তখন সকলের রাস্তা যে আলাদা হবে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এমনকি এ এম এ মুহিত উদ্ভূত অবস্থার জন্য নিজেই প্রস্তুত ছিলেন। অবশ্য পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ পরবর্তী সময়টি এ এম এ মুহিতের মোটেই সুখকর ছিল না। সংসার চালানোর আয় নিয়ে তেমন সমস্যা ছিল না। এ এম এ মুহিতের বন্ধু বিল ম্যাকুলক কয়েকটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাতে বেশ পয়সা পাওয়া যেত। টি. সোয়েজি তাঁর নতুন বাড়িতে এ এম এ মুহিতকে জায়গা দিতে রাজি হয়। কংগ্রেসে তাঁর বন্ধুবান্ধবরা আয়ের নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে যে রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এমনকি এ এম এ মুহিতের বাড়ির মালিক ভাড়া বৃদ্ধি না করার কথা জানিয়ে দেন। তবে তাদের এক বুড়ি প্রতিবেশী তাতে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। বাড়ির মালিক দম্পতি তাদের খোঁজখবর নিতে আসলে তিনি তাকে সরাসরি শাইলক বলে অভিযুক্ত করলেন। তার অভিযোগ কেন তিনি এ এম এ মুহিতকে দুর্দিনে ভাড়া দিচ্ছেন? [৩৮২] স্মৃতিকথায় অন্য এক স্থানে এ

---

[৩৮১] আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৮

[৩৮২] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১-১১২

এম এ মুহিত কূটনীতিক পদমর্যাদা ত্যাগ করতে গিয়ে নিজের সামাজিক মর্যাদাও যে হ্রাস করতে হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। জুন মাসে এ এম এ মুহিত নিজের ব্যক্তিগত গাড়িটি বিক্রির চেষ্টা করতে থাকেন। আগস্ট মাসেই গাড়িটি বিক্রি করে দেন। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কূটনৈতিক লাইসেন্স প্লেটও বিদায় হযে যায়। অনিশ্চিত রোজগারের আশঙ্কায় দামি মার্সেডিজ বেনজ গাড়ি বিক্রি করে একটি ছোট ডজ গাড়ি কেনার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে যে সমস্যাটির সম্মুখীন হন তা হচ্ছে আগে বিনা পয়সায় পার্কিং সুবিধা পেতেন কিন্তু এখন থেকে পার্কিংয়ের জন্য পয়সা দিতে হবে।[৩৮৩]

শামসুল কিবরিয়া পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করার পর তাঁর নিজের অবস্থা কেমন হয়েছিল সে সম্পর্কে বলেন, তাঁর অবস্থা তখন বেশ অনিশ্চিত ছিল। পাসপোর্ট ছিল না, নাগরিকত্ব ছিল না এবং কোনো নিয়মিত আয়ের নিশ্চয়তা ছিল না। আগস্ট মাসের ৪ তারিখ সকালবেলা দুটি সন্তানসহ শামসুল কিবরিয়া ও তাঁর স্ত্রী ওয়াশিংটনের ইমিগ্রেশন অফিসে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের কূটনৈতিক মর্যাদা ত্যাগ করেন। তাদের আমেরিকায় থাকতে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কার্যত তারা এক নাগরিকত্ববিহীন পরিবারেই পরিণত হন।[৩৮৪] আবার আসমা কিবরিয়া (শামসুল কিবরিয়ার স্ত্রী) এর বর্ণনায় পাকিস্তান দূতাবাস থেকে বের হয়ে আসার পর আর্থিক যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তা ফুটে ওঠেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন- দূতাবাস ছাড়ার পরপরই তাদের প্রথম চিন্তা হয়েছিলো কীভাবে কম খরচে ওয়াশিংটনে থাকা যায়। তারা দূতাবাস থেকে দেওয়া সকল ফার্নিচার ফেরত দিয়ে দেন। সস্তা কিছু ফার্নিচার কিনে নেন ও কিছু ফার্নিচার ভাড়া নেন। বাঙালি কূটনীতিকদের কয়েকজনের স্ত্রী চাকরি করার সিদ্ধান্ত নেন। আসমা কিবরিয়া একটি আর্ট স্টোরে সেলস গার্লসের কাজ নেন ও অন্যরা নানা ধরনের চাকরিতে যোগ দেন। তখন তাদের আর কোনো চিন্তা মনে ছিল না। শুধু দেশ কবে স্বাধীন হবে আর কবে তারা স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরতে পারবে এই আশা নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন।[৩৮৫]

পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে বাঙালি কূটনীতিকরা যে অনিশ্চিত জীবনের পথে পা বাড়িয়েছেন তার সমর্থনে বক্তব্য পাওয়া যায় শাহ এ এম এস কিবরিয়ার স্মৃতিকথায়। তিনি লিখেছেন, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনেও মুক্তির সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। কেননা পাকিস্তান দূতাবাসে স্বাভাবিকভাবে চাকরি করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো। পাকিস্তানি হানাদাররা যখন বাংলাদেশে হাজার হাজার বাঙালিকে হত্যা করছে এবং মা-বোনদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করছে, তখন দূতাবাসের নিরাপত্তা ও আরাম-আয়েশ ভোগ করার মতো মনের অবস্থা শামসুল কিবরিয়ার ছিল না। তারা সবাই এক অনিশ্চিত জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়েই দূতাবাস ত্যাগ করেছিলেন। দূতাবাসের স্থানীয় বাঙালি কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তও ছিল প্রশংসনীয়। তারাও কূটনীতিকদের সঙ্গে বিদেশে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন। তখনো তারা জানতেন না মুজিবনগর সরকার তাদের ব্যয়ভার বহন করতে পারবে কি না।[৩৮৬]

---

[৩৮৩] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮
[৩৮৪] *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৩
[৩৮৫] আসমা কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
[৩৮৬] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

দূতাবাস ত্যাগ করে শুধু অনিশ্চিত জীবনের দিকে এগিয়ে যাননি পাশাপাশি প্রত্যেক কূটনীতিকের জীবনযাত্রায়ও এসেছিল পরিবর্তন। এই পরিবর্তন ছিল একের জনের নিকট একের রকম। তবে সবাইকে কম-বেশি বাস্তবতা মেনে নিয়ে জীবনযাত্রাকে সেভাবে পরিচালিত করতে হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে গিয়ে জীবনযাত্রার কেমন পবিবর্তন করতে হয়েছিল সে সম্পর্কে শাহ এ এম এস কিবরিয়া লিখেছেন- 'দূতাবাস ত্যাগ করার ফলে আমাদের জীবনযাত্রার অনেক পরিবর্তন হলো। করমুক্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো রইলো না, গাড়ির ডিপ্লোমেটিক নাম্বার প্লেট বদলাতে হলো। প্রথম এক মাস কোনো অফিস ছিলো না। নিয়মিত অফিসযাত্রায় অভ্যস্থ জীবনে হঠাৎ ছন্দপতন হলো।'[৩৮৭]

শামসুল বারী তাঁর এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন কীভাবে তারা পক্ষ ত্যাগকারী বাঙালি কূটনীতিকদের সহায়তা করেছেন। তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে- তারা শিকাগো থেকে একটি তহবিল দিয়েছিলেন। কেননা শিকাগো গ্রুপটা তহবিল করার পক্ষে কাজ করেছিলেন। যারা পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে চাকরি করতেন তাদেরকে বেরিয়ে আসার জন্য চাপ দেওয়ার পাশাপাশি একই সময়ে তাদের জন্য তহবিল যোগাড় করেছিল। যাতে তারা বেরিয়ে এলে তাদের জীবনধারনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেটা তারা দিতে পারেন। তহবিল সংগ্রহ হতো বিভিন্নভাবে। তবে ছাত্র-ছাত্রীরা এই তহবিলে টাকা পাঠাতো। এই তহবিলের টাকা দিয়ে দূতাবাসে যারা চাকরি করতো তারা বেরিয়ে আসার পর তাদেরকে এখান থেকে মাসে মাসে মাইনে দেওয়া হতো।[৩৮৮]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিক এ আর মতিনউদ্দিন যিনি আবু রুশদ ছদ্মনামে সাহিত্যচর্চা করতেন। পাকিস্তান দূতাবাসে সাংস্কৃতিক বিভাগের এটাচি হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি শওকত ওসমানকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যেখানে ফুটে ওঠেছে তাদের প্রবাস জীবনের দুঃসহ স্মৃতি। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন-

> এখানে আমরাও বড় মনের জ্বালায় আছি। প্রত্যেকে যতটা পারি দেশের মঙ্গলের জন্য পৃথক ও সম্মিলিতভাবে করে যাই। আমাদের প্রত্যেকেরই সন্দেহের চোখে দেখা হয়। ইতিমধ্যে দু'জন বাঙ্গালী অফিসারকে বদলী করা হয়েছে। করিম সাহেব, আমি ও এক বাঙ্গালী অফিসার এখনও অক্ষত আছি। তবে করিম সাহেব বেচারা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আবার হাসপাতালে। এখানে খবরের কাগজে, রেডিও ও টেলিভিশনে আমাদের দেশ সম্বন্ধে খবর বেশ সহানুভূতির সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে ও হচ্ছে। ইউরোপে সহানুভূতি আরো বেশি। জুলুমকে প্রতিরোধের জন্যে দেশের অভ্যন্তরে ও তোমাদের ওখানে কি প্রস্তুতি হচ্ছে জানি না।[৩৮৯]

৯ আগস্ট লেখক শওকত ওসমান ওয়াশিংটন থেকে বন্ধু আবু রুশদের চিঠি পান। তা জুলাই মাসের ২৬ তারিখে লেখা। অর্থাৎ পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার এক সপ্তাহ পূর্বে লেখা এই চিঠিতে নিজের পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন। চিঠিতে আবু রুশদ লিখেছেন- 'আমরাও ভেগে পড়বার কথা ভাবছি। তবে বিদেশে পরিবার নিয়ে আবার অসুবিধায় পড়তে না হয় সেকথাও চিন্তা করি। দোটানায় মন বেজায় বিক্ষুব্ধ। প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রণা। যে পথে আমাদের

[৩৮৭] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯
[৩৮৮] আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৩-৩৮৬
[৩৮৯] শওকত ওসমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

সকলের মঙ্গল নিশ্চিত সে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছি।'[৩৯০] আবু রুশদ মতিনউদ্দিন পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর বন্ধু শওকত ওসমান তাঁকে চিঠি লিখে অভিনন্দন জানান। আবু রুশদ এই চিঠির প্রত্যুত্তরে নিজের বর্তমান অবস্থাও তুলে ধরেন-

> তোমার অভিনন্দনপত্র বেশ কয়েকদিন আগে পেয়েছি। নানা ঝামেলায় উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল বলে কিছু মনে করো না। এখানে বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে উপরের ঠিকানায় মিশন খোলা হয়েছে। আমি ও আমার সহধর্মিনী এখানে কাজ করছি। ভাতা যা পাব চলে যাবে। ওয়াশিংটনে অবশ্য খরচ খুব বেশি। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের অবদান কতটুকু?. . . . রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে এখানে কাগজপত্তর দিয়েছি। এখানে কাজ করার অনুমতি পাওয়া গেছে। . . . এনায়েত করিম সাহেবকে দ্বিতীয়বার হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। দিনদশ হলো বাসায় ফিরেছেন। এখন তার পূর্ণ বিশ্রাম। তবে ভদ্রলোক উৎসাহের আধিক্যে মাঝে মাঝে বেশি কথা বলে ফেলেন।. . . হাজারো অসুবিধা সত্ত্বেও তোমরা কর্মক্ষেত্রে আছো- আমরা কতদূর।[৩৯১]

লন্ডনের পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমদ ১ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন। তিনি যেদিন পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন তার পরের দিন খুব ভোরে দূতাবাসে যান জুলাই মাসের বেতনের চেক উত্তোলন করতে। কিন্তু সেখানে উপস্থিত পাকিস্তানি দূত তাঁর বেতনের ১৩৫ পাউন্ডের চেক কেড়ে নেয়। কেন চেকটি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এজন্য তারা কোনো ধরনের কারণ বলেনি।[৩৯২] দূতাবাসের চাকরি ছাড়ার পর মহিউদ্দিন আহমদ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন যা তাঁর সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন। দূতাবাস ছাড়ার সময় তাঁর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা ছিলেন। ২৩ আগস্ট তাঁর কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। সন্তান জন্মের সময় তাঁর স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন। এরকম ছোটো সন্তানকে যত্নআত্তি করার অভিজ্ঞতা তাদের কারো ছিল না। সদ্যোজাত সন্তানকে লালন-পালন করা তাদের দুজনের জন্যই নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। যা পারিবারিক ভাবে তাদের কাছে বড় চাপও ছিল। তখন মহিউদ্দিন আহমদ এর বন্ধু যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সক্রিয় সভাপতি সুলতান শরীফ ও তাঁর আইরিশ স্ত্রী এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করেন। সন্তান জন্মের পর হাসপাতাল থেকে সুলতান শরীফের বাসায় নিয়ে যান। সন্তান রাতে কাঁদলে তারা বুঝতেন না কেন কাঁদছে। এ ব্যাপারে তাঁদেরকে সুলতান শরীফ দম্পতি পূর্ণ সহযোগিতা করেন। একমাস তাদের বাসায় অবস্থান করেন। মহিউদ্দিন আহমদ যে বাড়িটিতে থাকতেন তার ভাড়া ছিল ২৩ পাউন্ড। সে বাসা তিনি নিজেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁকে বাসা ছাড়তে নিষেধ করেছিলেন। এটা পাকিস্তান হাইকমিশনের কাছে ছিল। ছয় পাউন্ড দিয়ে একটি নতুন বাসা নেন যা ছিল ইটের টালির তৈরি। এ বাসায় থেকে তাঁর মেয়ের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে। সহজেই ঠান্ডা লেগে যেত মেয়ের। কেননা ইটের টালি ঘর গরম করতো না।[৩৯৩] একই দূতাবাসে কর্মরত লুৎফুল মতিন জানিয়েছেন, আনুগত্য পরিবর্তনের পর তাদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পূর্বে যে বড় বাসায় থাকতেন তা ছেড়ে দিয়ে এক কক্ষের বাসায় স্ত্রী সন্তান নিয়ে বসবাস করতেন। সংসার চালানোর জন্য তাঁর স্ত্রী একটি বিস্কুট কারখানায় চাকরি করতেন। আর তিনি বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশানুযায়ী লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশন থেকে ২০ পাউন্ড ভাতা পেতেন। যা দিয়ে সংসার খরচ চালাতেন।[৩৯৪]

---

[৩৯০] শওকত ওসমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

[৩৯১] *ওই*, পৃ. ৭৫

[৩৯২] ফারুক আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬

[৩৯৩] গবেষকের সঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মার্চ ২০১৮

[৩৯৪] গবেষকের সঙ্গে আকবর লুৎফুল মতিন এর সাক্ষাৎকার, ২৭ এপ্রিল ২০১৮

আবার লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের ৩৮ বছর বয়স্ক রাজনৈতিক কাউন্সেলর রেজাউল করিমও আর্থিক ও সামাজিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। তিনি খুব শিগগিরই রাষ্ট্রদূত হিসেবে পদোন্নতি পেতেন যা পাকিস্তানি কূটনীতিক মহলে উচ্চতম মর্যাদা হিসেবে বিবেচিত। তিনি লন্ডনের পাকিস্তান দূতাবাসে চাকরিকালীন ৩৬০০ ডলার বেতন পেতেন। সঙ্গে করমুক্ত জীবনযাত্রা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা। পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর তিনি যে আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছিলেন সে সম্পর্কে বলেছেন-

> he has no idea at this stage how he will manage financially but his wife supports his decision and is confident that they and their two children will be all right. From today Mr. Karim will be reporting to the Bangla Desh mission in London, headed by Mr Justice Chowdhuri.
> As to this sudden drop in income, Mr. Karim told me, "It is not something that I regret, nor was it a dilemma. It was simply the case that I could no longer, with a clear conscience, live the life of a normal diplomat, knowing that terribly wrong things are being done in my country."[৩৯৫]

জাপানের পাকিস্তান দূতাবাস থেকে পক্ষ ত্যাগ করে বাঙালি কূটনীতিক কমর রহীম তাঁর বাসা ছেড়ে দিলেন। তিনি নিজে যেহেতু একা ছিলেন তাই বাসা ভাড়া করবেন কিনা তা নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন। মুজিবনগর সরকার অবশ্য তাঁকে বলেছিল যে ভাড়ায় থাকতেন ওই ভাড়ায় আরেকটা বাসা নিতে। মুজিবনগর সরকার থেকে ওই পরিমাণ ভাড়া দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু কমর রহীম জাপানে পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশনের বাঙালি আবাসিক প্রতিনিধি (Resident Representative) এম এম জোবায়ের এর আমন্ত্রণে তাঁর বাসায় ওঠেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় ওই বাসাতেই ছিলেন।[৩৯৬]

৩.৭ বাঙালি কূটনীতিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর পাকিস্তানিদের অত্যাচার-নির্যাতন

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে পাকিস্তানিরা যেমন বাঙালিদের সঙ্গে বিরূপ আচরণ করতো তেমনি অনেক দূতাবাসে বাঙালিরা পাকিস্তানিদের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকারও হয়েছেন। পক্ষ ত্যাগকারী বাঙালিদের প্রতিনিয়ত তারা বিভিন্নভাবে নাস্তানাবুদ করতে থাকে। নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের দু'জন বাঙালি কূটনীতিকের বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের পর পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বাঙালিদের পক্ষ ত্যাগ রোধ করার জন্য একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিশ্বের যে সকল পাকিস্তান দূতাবাসে বাঙালিদের সংখ্যা বেশি ছিল সেগুলোর ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার মনোযোগী হয়ে ওঠে। কেননা ৬ এপ্রিল নয়াদিল্লির ঘটনার পর পাকিস্তান সরকার বুঝতে পারে যে, এ ধরনের ঘটনা হয়তো এখন নিয়মিত ঘটবে। এজন্য এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রশাসন বিভাগের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব তৎকালীন গবেষণা বিভাগের পরিচালক ফখরুদ্দীন আহমদকে ডেকে কলকাতা দূতাবাসে কর্মরত অপরিহার্য বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি তালিকা তৈরি করতে বলেন এবং যে কোনো মুহূর্তে ফিরে আসার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকার কথা জানিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ফখরুদ্দীন আহমদ এর পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তালিকা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই পাকিস্তান সরকারের এ

---

395 *The Guardian*, 8 October 1971
৩৯৬ গবেষকের সঙ্গে কমর রহীম এর সাক্ষাৎকার, ১৯ মার্চ ২০১৮

সংবাদ বিভিন্ন দূতাবাসে ছড়িয়ে পড়ে।[৩৯৭] যার তাৎক্ষণিক ফলাফল দেখা যায় কলকাতা দূতাবাসে একযোগে ৬৫ জন বাঙালির পক্ষ ত্যাগ ও দূতাবাস দখল। বিদেশে পাকিস্তান দূতাবাসগুলোর প্রাথমিক কাজই ছিল স্বাধীনতাকামী প্রবাসী বাঙালিদের অপহরণ করার চেষ্টা করা। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি দূতাবাসগুলো প্রথমে অঢেল পয়সা খরচ করে বিশ্ব জনমতের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে সফল না হয়ে তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। বিভিন্ন দূতাবাসে পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারা শেষ পর্যন্ত অপহরণ করার ষড়যন্ত্র করে।[৩৯৮] কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলীর স্ত্রী জানিয়েছিলেন, সিডনি শহরে তাদের বড় ছেলে পড়াশোনা করে। হোসেন আলী বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার পাকিস্তানি দূতাবাস হোসেন আলীর ছেলেকে অপহরণ করার নানা ভাবে চেষ্টা করেছিল।[৩৯৯] একই ধরনের কর্মকাণ্ড চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল নয়াদিল্লিতে। কে এম শিহাবুদ্দিন পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য পরিবর্তন করার পর ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর পরামর্শে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে থাকেন। কেননা পাকিস্তান দূতাবাস এ সময় কে এম শিহাবুদ্দিন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অপহরণ করার চেষ্টা করে। তাই তাদেরকে একেক সময় একেক জায়গায় রাত্রি যাপন করতে হয়েছে। অবশ্য এ জন্য দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাস অনেক টাকা খরচ করেছিল।[৪০০] ৬ এপ্রিল বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেওয়ার পর কে এম শিহাবুদ্দিন আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করেন। যদিও তাঁর তখন কোনো অফিস বা অফিস সহায়ক ছিল না। তিনি তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে সাবধানে চলাফেরা করতেন। কেননা পাকিস্তানি গুপ্তচর দ্বারা তাদের অপহরণ করার চক্রান্ত চলেছিল।[৪০১]

শাহ এ এম এস কিবরিয়া লিখেছেন, পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর বাংলাদেশে অবস্থিত তাঁর পরিবারের ওপর নির্যাতন হতে পারে ভেবে তিনি শঙ্কিত ছিলেন। ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ঢাকাস্থ একটি শাখায় তাঁর ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করা ব্যতীত অন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরিবারের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে চিঠিপত্র লেখার ক্ষেত্রেও তারা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতেন।[৪০২]

পাকিস্তান সরকার এক পর্যায়ে সকল দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে একটি নির্দেশ জারি করে। এতে বলা হয়, ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দূতাবাসের সকল বাঙালি কূটনীতিক ও কর্মচারীর পাসপোর্ট তাদের নিজ নিজ দূতাবাস কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে। পাকিস্তান দূতাবাস সমূহে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিক ও কর্মচারীরা যাতে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন করতে না পারে তার জন্য এই পদক্ষেপ। এই ঘোষণার পরপরই পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন একজন গুরুত্বপূর্ণ কূটনীতিক

---

[৩৯৭] ফখরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

[৩৯৮] পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ডেটলাইন ঢাকা*, ঢাকা: বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর পাবলিশিং লিমিটেড, ২০১৮। পৃ. ৩০

[৩৯৯] ওই, পৃ. ৩০

[৪০০] *দৈনিক বাংলা*, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২

[৪০১] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 84

[৪০২] শাহ এ এম এস কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪

মহিউদ্দিন আহমেদ জায়গীরদার।[৪০৩] মহিউদ্দিন আহমদ ছিলেন নাইজেরিয়াস্থ দূতাবাসের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি। যার অবস্থান ছিল রাষ্ট্রদূতের পরেই। রাষ্ট্রদূতের অনুপস্থিতিতেই তিনিই সকল কাজ সম্পাদন করতেন। লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের বাঙালি কর্মচারীগণ ইসলামাবাদের জরুরি নির্দেশ সত্ত্বেও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁদের পাসপোর্ট জমা দেয়নি। কিন্তু তারপরও হাইকমিশন এই সব বিদ্রোহী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা জানা যায়নি। মূলত বৈদেশিক দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কর্মচারীদের বিদ্রোহী আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই ইসলামাবাদ থেকে কর্মচারীদের পাসপোর্ট জমা দেওয়ার জরুরি নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল।[৪০৪]

শামসুল বারী তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, পাকিস্তান সরকারের চেয়েও পাকিস্তানি নাগরিক যারা ছিল তারা বেশি অস্থির করে তুলতো বাঙালিদের। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতেন বলে তাঁর বাড়িতে ফোন করে হুমকি দিত। তাঁর স্ত্রীকে বলতো, 'ওকে কিছু করতে মানা করবেন। ওর কিন্তু জান খাতরা আছে।' আর তারা বিভিন্ন ক্যাম্পাসে গিয়ে বাংলাদেশের আন্দোলনের পক্ষে যেসব পোস্টার লাগানো হতো সেই পোস্টারগুলো পাকিস্তানিরা লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই ছিঁড়ে ফেলতো। এভাবে পাকিস্তানি ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ অসুবিধার সৃষ্টি করতো।[৪০৫] বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিদের মনোভাব কেমন ছিল তা তাদের খিস্তিখেউর দেখলেও বোঝা যায়। তারা বাঙালিদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যে খিস্তি ব্যবহার করতো 'শালা বাঙালীকো হাম দেখা দেঙ্গে।'[৪০৬]

জাকার্তার পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর কূটনীতিক আবুল ফজল শামসুজ্জামানকে তাঁর বাড়িতে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। ভারতের রাষ্ট্রদূত এ ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়ার সরকারের কাছে জানতে চাইলে তারা জানায় যে, কূটনীতিক আবুল ফজলের নিরাপত্তার স্বার্থে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।[৪০৭] কিন্তু আদৌ তা সত্যি ছিল না। বরং পাকিস্তান সরকারের ইন্ধনে ইন্দোনেশিয়ার সরকার এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের একজন বাঙালি কর্মচারী হোসেন আলীকে দূতাবাস ভবনের অভ্যন্তরে মারধরের ঘটনা ঘটে। হোসেন আলী দূতাবাস ভবনের কড়া পাহারা এড়িয়ে পালানোর সময় ধরা পড়েন এবং তাকে হাইকমিশন ভবনের ভেতরে নিয়ে গিয়ে তার ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন শুরু হয়। এমনকি হোসেন আলীর স্ত্রী ও মেয়েরাও এই বর্বরতার হাত থেকে রেহাই পায়নি। দূতাবাসের কড়া পাহারার ব্যূহ ভেদ করে পাকিস্তান হাইকমিশনের ১১ জন বাঙালি কর্মচারী সপরিবারে পালানোর চেষ্টা করার সময় নিরাপত্তা রক্ষীসহ ২২ জন পশ্চিম পাকিস্তানি তাদের ওপর আক্রমণ করে। এই মারামারির সুযোগে ৯ জন কর্মচারী তাদের স্ত্রী-সন্তান নিয়ে কোনো রকমে দূতাবাস থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। মারধরের সময় নিরাপত্তা রক্ষীদের হাত থেকে কয়েকজন সহকর্মীকে রক্ষা করতে গিয়ে মোহাম্মদ ইউনুস নামে দূতাবাসের

---

[৪০৩] গবেষকের সঙ্গে মহিউদ্দিন আহমেদ জায়গীরদার এর টেলিফোনে নেওয়া সাক্ষাৎকার, ১৪ এপ্রিল ২০২০

[৪০৪] *জয়বাংলা*, ২০ আগস্ট ১৯৭১

[৪০৫] আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৪

[৪০৬] আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

[৪০৭] ওই, পৃ. ৫২-৫৪

অন্য একজন কর্মচারী কাঁধে ও পিঠে প্রচণ্ড আঘাত পান। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাঙালি কর্মচারীরা জানায় যে, দূতাবাসের নিরাপত্তা রক্ষীরা লোহার রড, ছুরি ও হকি স্টিক ব্যবহার করে তাদের মারধর করে। তবে নয়াদিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর আশঙ্কা, ভারতে পাকিস্তানি গোয়েন্দা তৎপরতার প্রধান আবদুল গণির ব্যক্তিগত সহকারী হোসেন আলী মারধরের কারণে হয়তো নিহত হয়েছেন। বাংলাদেশ মিশনের প্রতিনিধিরা ও স্থানীয় জনসাধারণ হোসেন আলীর স্ত্রী ও মেয়েদের বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এমনকি কিছু বিদেশি সাংবাদিক আহত বাঙালি কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে দূতাবাস কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয়নি। এই ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যে সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে হাইকমিশন ভবনের ভেতর থেকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। নয়াদিল্লির পাকিস্তান দূতাবাস থেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যারা পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন- সাফিউদ্দিন, মুজাম্মিল হক, নুরুল হক, মোহাম্মদ ইউনুস, ইউনুস মিঞা, খলিল উদ্দিন, শফীউর রহমান, আবদুল হোসেন, আবদুল চৌধুরী, আলিমুদ্দিন ও কুলিমুদ্দিন। বাঙালি কর্মচারীরা দূতাবাস থেকে চলে আসার পর পাকিস্তান হাইকমিশন এদেরকে সরকারিভাবে বহিস্কৃত ঘোষণা করে। পাকিস্তান হাইকমিশনের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা রক্ষীদের দ্বারা বাঙালি কর্মচারীরা যেভাবে মারধরের শিকার ও অপমানিত হয়েছেন তা বিদেশি দূতাবাসের ইতিহাসে নজিরবিহীন।[৪০৮] নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মচারী হোসেন আলী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মুক্তিদানের জন্য মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্টের হস্তক্ষেপ কামনা করে এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। টেলিগ্রামে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম উল্লেখ করেন-

> Eleven Bengalee employees of the Pakistan High Commission in India New Delhi who were virtually prisoners inside the mission premises were coming out of the chancery on November 2 with forty three dependents when West Pakistani employees in presence of senior officers pounced on them with variety of deadly weapons causing serious injuries to many.
>
> Even children and ladies were not spared. Majority of the helpless victims bleeding profusely from wounds were rushed to hospital for emergency medical care. Foreign journalists who had gathered outside Pakistan chancery were kept at bay by flying missiles and stones thrown by West Pakistanis from inside the chancery. Foreign teams televised the incident.
>
> One Bengali employee Mr. Hussain Ali was mercilessly beaten till unconscious and then forcibly detained with wife and three daughters while his two minor sons escaped. His teenage daughter who tried to come out was manhandled beaten and forced inside. The incident was witnessed by foreign news media representatives. Mr. Hussain Ali was the personal assistant to West Pakistani officer in charge military intelligence. As Mr. Hussain Ali has the knowledge of intelligence contacts in India his life may be in danger.
>
> I appeal to your Excellency in the name of humanity and justice to urgently intervene and secure release of Mr. Hussain Ali and his family forms the wrongful detention by the Pakistan envoy, if meanwhile he has not already been murdered. I also appeal to the world body to condemn Pakistan Government for this willful violence on Bangladesh nationals. Crimes of genocide and

---

[৪০৮] *অমর বাংলা*, ৪ নভেম্বর ১৯৭১

against humanity perpetrated in Bangladesh are now being extended into the precincts of diplomatic missions in foreign countries and deserve universal condemnation.[৪০৯]

নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের বাঙালি কর্মচারী গোলাম মোস্তাফাকে মারধর করা হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, গোলাম মোস্তাফা হাইকমিশনের অনুমতি নিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য বাইরে যাবার সময় তাকে বাধা দেওয়া হয়। তাকে বলা হয়, বাইরে যাওয়ার অনুমতি বাতিল করা হয়েছে। এতে গোলাম মোস্তাফা অস্থায়ী হাইকমিশনার আবদুল সাত্তারের সঙ্গে দেখা করেন এবং অনুমতি প্রার্থনা করেন। এসময় আবদুল সাত্তার বাঙালিদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে রেগে গিয়ে গোলাম মোস্তাফাকে শায়েস্তা করার জন্য গোয়েন্দা অফিসার আমেদ জাবেদ শাহকে হুকুম দেন। তার হুকুমে আমেদ জাবেদ এবং সহকারী মহম্মদ ইয়াসিস গোলাম মোস্তাফার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যতক্ষণ না বেহুঁশ হয়ে পড়েন ততক্ষণ পর্যন্ত তারা গোলাম মোস্তাফার ওপর অত্যাচার চালিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, গোলাম মোস্তাফা দূতাবাসের ডিসপেন্সারির একজন কম্পাউন্ডার। এই দূতাবাসে ২২ জন বাঙালি কর্মচারী কর্মরত আছেন। এঁরা পরিবারবর্গ নিয়ে দূতাবাসের অভ্যন্তরেই একরকম বন্দি জীবন কাটাচ্ছে। এমনকি তাঁরা কয়েক মাস পর্যন্ত বেতন পাচ্ছেন না। যার ফলশ্রুতিতে তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে।[৪১০]

এরকম ঘটনা অহরহ নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসে ঘটতে থাকে। ৫ অক্টোবর *বাংলার বাণী* পত্রিকায়ও এ সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করে। এতে উল্লেখ করা হয় যে, নয়াদিল্লির পাকিস্তান দূতাবাস থেকে আরো ৪ জন বাঙালি কর্মচারী সুকৌশলে বের হয়ে যান। পরে তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেন। এই চারজন বাঙালি কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন মফিজুর রহমান (স্টেনোগ্রাফার), এ কে আজাদ (ইউ.ডি সহকারী), মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (এল.ডি. সহকারী) এবং গোলাম মোস্তাফা (ডিসপেনসার)। প্রত্যেকের সঙ্গে তাদের পরিবারের সদস্যরাও পাকিস্তান দূতাবাস থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। উল্লেখযোগ্য যে, নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের উচ্চ পদস্থ বাঙালি কূটনীতিবিদ এবং অন্যান্য কয়েকজন বাঙালি কর্মচারী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের পর থেকেই নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাস প্রকৃতপক্ষে বাঙালিদের জন্য একটি বন্দিশালায় পরিণত হয়। বাঙালি কর্মচারীদের জরুরি প্রয়োজনেও দূতাবাসের বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি। এই সংবাদে আরো প্রকাশ করা হয় যে, পাকিস্তানি সামরিক সরকার নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসে বাঙালি কর্মচারীদের আটক রেখেও কোনোরূপ স্বস্তি পাচ্ছিল না। তাই তারা বাঙালি কর্মচারীদের একটি বাসে করে গোয়েন্দা পাহারা সহকারে ইসলামাবাদে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ এসব বাঙালি কর্মচারীরা রাতের অন্ধকারে নয়াদিল্লির হরিয়ানা সীমান্ত থেকে সুকৌশলে এবং নাটকীয় কায়দায় ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীসহ বাস থেকে নেমে স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্যে মুক্ত হয়ে আসেন। পরে তাঁরা দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁদের ওপর ইয়াহিয়া খানের

[৪০৯] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৪৮-৮৪৯
[৪১০] মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

নয়দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাস কর্তৃপক্ষ যে নির্যাতন চালিয়েছিল তার মর্মান্তিক কাহিনি বর্ণনা করেন।[৪১১] অবশ্য সুকৌশলে পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে তাদের সকলকে সাহায্য করেছিলেন বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক। এই ঘটনার পর পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারের নিকট তাদের লোকদের অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ জানায়। তারা এর জন্য ভারতকে দায়ী করে 'advance planning', 'stage-manageing', 'engineering' বলে মন্তব্য করে।[৪১২] দিল্লিতে পাকিস্তান দূতাবাসের ১০ জন বাঙালি কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গসহ মোট ৩৩ জন ব্যক্তি দূতাবাসের বাইরে বেরিয়ে আসে। তারা অশ্রুসজল চোখে পাকিস্তান দূতাবাসের অভ্যন্তরে পাকিস্তানিদের অত্যাচার নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন। তাদের এই অত্যাচারের হাত থেকে কোনো শিশুও রেহাই পায়নি।[৪১৩] নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা দিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশনের জনৈক ব্রিগেডিয়ার গোলাম হাসানের কাহিনি প্রকাশ করে। পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় যে, গোলাম হাসান লোকটির নামের আগে ব্রিগেডিয়ার দেখে যে কেউ তাকে সামরিক বাহিনীর লোক মনে করতে পারে। আসলে সে পাকিস্তান হাইকমিশনের এটাচি। কয়েক সপ্তাহ আগে দিল্লির পাকিস্তানি হাইকমিশনের বাঙালি কর্মচারীরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে বেরিয়ে আসার সময় হাইকমিশনের পাকিস্তানি কর্মচারীরা তাঁদেরকে নানা ভাবে বাধা দেয়। এমনকি বিভিন্ন প্রলোভনও দেওয়ার চেষ্টা করে। তাসত্ত্বেও বাঙালি কর্মচারীরা ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকারের অধীনে কাজ করবেন না বলে দূতাবাস ছেড়ে চলে আসেন। তখন গোলাম হাসান বাঙালি কর্মচারীদের বলেছিলো, 'মনে রাখবে আমি পাঠান, দরকার হলে তোমাদের গুলী করে মারবো।' এ ঘটনার কিছুদিন পূর্বে বাঙালি কর্মচারী হোসেন আলীকে পাকিস্তান হাইকমিশনে গুম করে দেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তাঁর মুক্তির জন্য বারবার আবেদন করেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। পাকিস্তান হাইকমিশন এই আবেদন এবং বিক্ষোভে কোনোরকম কর্ণপাত করেনি বললেই চলে। পিতার মুক্তির জন্য হোসেন আলীর দুই শিশু পুত্রের প্রার্থনাও এক্ষেত্রে বৃথা গিয়েছে বলে পত্রিকাটিতে মন্তব্য করা হয়। সাপ্তাহিক পত্রিকাটির ভাষ্য বাঙালি কর্মচারী হোসেন আলী পাকিস্তান হাইকমিশনের অভ্যন্তরে বন্দি অবস্থায় রয়েছে। তাঁকে মুক্ত করা এখনো সম্ভব হয়নি। জানা যায় আহত হোসেন আলীর চিকিৎসার জন্য পাকিস্তান দূতাবাস কর্তৃপক্ষকে ইসলামাবাদ থেকে ডাক্তার আনতে হয়েছিল। পাকিস্তান দূতাবাস তাদের সকল গোপন সংবাদ ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভারতীয় ডাক্তার আনতে সাহস পায়নি।[৪১৪]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে প্রতিটি দূতাবাসের বাঙালি কর্মচারীবৃন্দ একে একে দূতাবাস ছেড়ে চলে এসেছেন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। হোসেন আলীর ভাগ্য ও গোলাম হাসানের পাশবিক কীর্তির কথা প্রকাশ হওয়ার পরে একথা অনুমান অমূলক নয় যে, দূতাবাসগুলোতেও পাকিস্তান ত্রাসের

---

[৪১১] *বাংলার বাণী*, ৫ অক্টোবর ১৯৭১
[৪১২] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 129
[৪১৩] মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬
[৪১৪] ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, *বাংলা নামে দেশ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লি., ১৯৭২। পৃ. ৯৪

রাজত্ব কয়েম করেছে। যে সকল বাঙালি বাংলাদেশের সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে নিজেরাই ইচ্ছুক তাঁদেরকে অনেক ক্ষেত্রে জোর করে আটক রাখা হয়েছে।[৪১৫] নয়াদিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশনের ঘটনাই তার প্রমাণ। *বিপ্লবী বাংলাদেশ* পত্রিকায় নয়াদিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশনের জনৈক মুখপাত্রের সূত্র দিয়ে বলা হয় যে, দিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসে আটককৃত হোসেন আলী ও তাঁর পরিবারের মুক্তির সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরবর্তী পন্থা হিসেবে ওই দূতাবাসে শরণার্থীদের জোর পূর্বক প্রবেশ করিয়ে তাদের মুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।[৪১৬] নয়াদিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মচারী ফরিদউদ্দিন আহমদ জানান যে, পাকিস্তান হাইকমিশনার সাজ্জাদ হায়দার ৪ অক্টোবর সকালে তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রহার করে। দূতাবাসের প্রেস উপদেষ্টা এম আই বাটও তাকে মারধর করেন। তারা প্রহার করতে করতে তাকে বলে 'বাঙ্গালী বিশ্বাসঘাতক, হাই কমিশন থেকে বেরিয়ে যাও'।[৪১৭] দিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশনের চ্যান্সেরি হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর ব্যক্তিগত সহকারী ফরিদউদ্দিন আহমদ আরো জানিয়েছেন যে, হাইকমিশনের পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মীরা বাঙালি কর্মীদের ওপর উৎপীড়ন চালায়। তাদের আরো মারধর করা হবে এই আশঙ্কায় তারা সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। হাইকমিশনের অভ্যন্তরে তাদের জীবন অসহনীয় হয়ে ওঠে। প্রতিদিনই তাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে অপমানিত হতে হয়।[৪১৮] নয়াদিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মচারী হোসেন আলী ও তার পরিবারবর্গের মুক্তির সমর্থনে দিল্লির শিশুরাও সমব্যাথী হয়। কয়েক হাজার শিশু পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে হাজির হয়। তাদের দাবি মুরাদ-মুরশেদের মা-বাবা আর বোনদের ছেড়ে দিতে হবে।[৪১৯] বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, দিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসে অন্তত ৩০ জন বাঙালি কর্মীকে ওই দূতাবাসের অভ্যন্তরে কার্যত বন্দি করে রাখা হয়েছে। কলকাতার বাংলাদেশ কূটনীতিক মিশনের সূত্র থেকে *আনন্দবাজার* পত্রিকায় বলা হয় যে, এই ৩০ জন বাঙালি কর্মচারী পরিবার পরিজন নিয়ে চ্যান্সেরির ভিতরেই বাস করতেন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর থেকে নিয়ম করা হয় যে, দিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের সকল কর্মচারীকে চ্যান্সেরির বাইরে যাওয়ার সময় কোথায় তাঁরা যাচ্ছেন, কখন ফিরেছেন সব বিবরণ লিখে যেতে হতো। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ওই বিধিনিষেধ বহাল ছিল। কিন্তু বাঙালি কর্মচারীদের বাইরে বের হতে দেওয়া হতো না। এমনকি তাঁদের সঙ্গে বাইরের কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎকারও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চ্যান্সেরির নিরাপত্তা বিভাগের লোকজন সকল সময় পাহারায় নিযুক্ত থাকতো। অন্যদিকে পাকিস্তানের রোষানলে বা বিরূপ মনোভাবের সম্মুখীন যেন না হতে হয় সেজন্য কলকাতায় অন্যান্য রাষ্ট্রের দূতাবাসগুলো বাংলাদেশ কূটনীতিক মিশনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখা বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি তাঁরা কোনো অনুষ্ঠানেও বাংলাদেশ কূটনীতিক মিশনের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানাতো না।[৪২০]

---

[৪১৫] মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪-১০৫
[৪১৬] *বিপ্লবী বাংলাদেশ*, ১৪ নভেম্বর ১৯৭১
[৪১৭] *জয়বাংলা*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭১
[৪১৮] *ওই*, ২২ অক্টোবর ১৯৭১
[৪১৯] মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২
[৪২০] *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ৩০ এপ্রিল ১৯৭১

পাকিস্তানি দূতাবাসগুলোতে বাঙালিদের ওপর কী ধরনের অত্যাচার নির্যাতন করা হতো তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায় *আনন্দবাজার* পত্রিকায়। পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রথমে বাঙালিদের সন্দেহের চোখে দেখা হতো। ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হতো। বাংলাদেশে ব্যাপক গেরিলা আক্রমণ শুরু হলে এই ব্যঙ্গ বিদ্রুপ শেষ পর্যন্ত বাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বৈরিতায় গিয়ে দাঁড়ায়। সামান্য কোনো কারণেই বাঙালিদের মারধর করা হতো। তাঁদের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এমনকি বাঙালি ড্রাইভাররা গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে, সেই ভয়ে তাঁদের দূতাবাসের গাড়ি পর্যন্ত ধরতে দেওয়া হতো না। অফিসের মধ্যেই বাঙালি কর্মীদের মারধর প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপারে দাঁড়িয়েছিল। বাঙালি কর্মচারীদের সকল ভাতা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং বাঙালি কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য দূতাবাসের গাড়ি দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। দূতাবাসের ভিতরে তাঁদের কোয়ার্টারের কক্ষে নিরাপত্তা রক্ষী দল বসানো হয়। দুই মাস যাবৎ তাঁদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি। এমন কি দূতাবাসের মধ্যে চিকিৎসার জন্য তাঁরা যখন ভারতীয় চিকিৎসকের কাছে যেতেন, তখন তাঁদের সঙ্গে থাকতেন পশ্চিম পাকিস্তানি গোয়েন্দা। জনৈক বাঙালি কর্মচারী সাফিকুর রহমানের স্ত্রী *আনন্দবাজার* পত্রিকাকে জানান যে, ২৫ মার্চের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছে। দুধের জন্য পয়সা দেওয়া সত্ত্বেও গত দুই মাস তাঁরা দুধ পাননি। দূতাবাসের মধ্যে খেলার মাঠে পশ্চিম পাকিস্তানি শিশুরা বড়দের আস্কারা পেয়ে বাঙালি ছেলেমেয়েদের মারধর করতো। বাঙালি কর্মচারীর স্ত্রী সামসুন নাহার জানিয়েছেন, দূতাবাসের মধ্যে বাংলা গান নিষিদ্ধ ছিল।[৪২১]

নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের অভ্যন্তরে এমন কর্মকাণ্ড দিনের পর দিন চলতে থাকে। এজন্য বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাকিস্তান দূতাবাসকে Yahan's slaughter house in India বলে অভিহিত করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়-

> Pakistanis set up yet another unique record of barbarism in a foreign country when they inflicted brutalities on the Bengali employees of their High Commission in New Delhi on November 2, 1971. The Bengali employees along with the members of their families were mercilessly beaten up while they were escaping to freedom and declared allegiance to Bangladesh. Mr. Husain Ali Khan, personal Assistant to Mr. Abdul Ghani, chief intelligence network in India, was forcibly kept inside the High Commission premises and beaten up. It is still unknown if Mr. Husain Ali Khan is alive. . .
>
> Describing the High Commission as "Yahan's slaughter house in India," The wailing and bleeding escapees showed their injuries to pressmen and others outside the High Commission.[৪২২]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একসঙ্গে ১৫ জন বাঙালি কূটনীতিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর দূতাবাসগুলোতে কর্মরত অন্যান্য বাঙালিদের অবস্থা কেমন হয়েছিল তা *জয়বাংলা* পত্রিকা থেকে জানা যায়। পত্রিকায় বলা হয় যে, ইয়াহিয়া সরকারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে জাতিসংঘ ও ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের ১৫ জন সদস্য

---

[৪২১] *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ৮ নভেম্বর ১৯৭১

[৪২২] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৫২

একযোগে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন এবং সবাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। বিদেশি দূতাবাসগুলোতে যে সকল বাঙালি কূটনীতিকরা যে শুধু বিবেকের তাড়নায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছেন তা নয়, বাঙালি হিসেবে তাঁদের সকল সময় নানারকম ভোগান্তি পোহাতে হতো। অর্থাৎ দূতাবাসগুলোতে বাঙালিদের ওপর গতিবিধি ছিল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত, তাঁদের সবাইকে কড়া পাহারায় রাখা হতো। বাঙালি না হয়েও সুইডেনের পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানিদের অন্যায়ের প্রতিবাদস্বরূপ চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তবে চাকরি ছেড়ে দিলেও পাকিস্তানিদের অত্যাচারের শিকার হতে পারেন এই আশঙ্কায় দেশে না ফিরে বেলজিয়ামে আশ্রয় নিয়েছেন। এই সংবাদে ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার কূটনীতিক ক্ষেত্রে যে বড় ধরনের সংকটের মুখে পড়েছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলে- 'একে একে ভেঙ্গে পড়ছে ইয়াহিয়ার বালির বাঁধ। একজন একজন করে ছাড়ছেন পাক আনুগত্য। আন্তর্জাতিক কূটনীতি ক্ষেত্রে যেমন একদিকে ইয়াহিয়া সরকারের ভিৎ ধ্বসে পড়ছে তেমনি অপরদিকে বাংলাদেশের বুনিয়াদ উত্তরোত্তর সুদৃঢ় হচ্ছে।'[৪২৩]

নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল পদ থেকে পদত্যাগ করার পর এ এইচ মাহমুদ আলীর ওপরও পুলিশের মাধ্যমে মানসিকভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছিল তার কথাও জানা যায়। এ এইচ মাহমুদ আলী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণার পর পাকিস্তানিদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে নিউইয়র্কের পুলিশ তাঁর গাড়ির সিডি প্লেট ফেরত দেওয়ার জন্য চিঠি দেয়। এ চিঠির উত্তরে এ এইচ মাহমুদ আলী জানান যে, তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কূটনীতিক। সে হিসেবে সিডি প্লেট রাখার অধিকার তাঁর রয়েছে। প্রত্যুত্তরে পুলিশ তাঁকে জানায় বাংলাদেশ সরকার একটি স্বীকৃত সরকার নয়, তাই তার সিডি প্লেট ফেরত দেওয়া প্রয়োজন। এভাবে ক্রমাগত চিঠি আদান প্রদান চলতে থাকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ এইচ মাহমুদ আলী নিউইয়র্ক বাংলাদেশ মিশনে যোগদান করলে তাঁর গাড়ির সিডি প্লেট বহাল থাকে।[৪২৪] কিন্তু এ বিষয় নিয়ে তাঁকে মানসিকভাবে নিপীড়ন ভোগ করতে হয়েছিল।

লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাস থেকে পদত্যাগ করার পর মহিউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানিদের দ্বারা কোনো ধরনের শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখীন হননি। তাঁর ওপর যেন কোনো ধরনের আক্রমণ না হয় সেজন্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ট্রাফালগার স্কোয়ারে যাওয়ার পূর্বেই লন্ডন ইয়ার্ডে পুলিশকে মহিউদ্দিন আহমদ এর জীবন ও বাসার নিরাপত্তা প্রদান করার কথা বলেছিলেন। তবে মহিউদ্দিন আহমদ তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন- পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পরদিন সোমবার দূতাবাসের একজন বাঙালি কর্মকর্তা এসে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। দূতাবাসে প্রথম এতো বড় একটি ঘটনা ঘটে। ইউরোপে মহিউদ্দিন আহমদ প্রথম প্রকাশ্যে চাকরি ছেড়ে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ ঘটনাটির কারণে দূতাবাসে ছোট আকারের একটি ভূমিকম্প হয়ে যায়। হাইকমিশনার সবাইকে নিয়ে মিটিং করে ওই ভদ্রলোককে মহিউদ্দিন আহমদ এর বাসায় পাঠান। হাইকমিশনারের বক্তব্য ছিল 'মহিউদ্দিন সাহেবকে নিয়ে আসো আমরা সব ভুলে যাবো।'

[৪২৩] *জয়বাংলা*, ৬ আগস্ট ১৯৭১
[৪২৪] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

দূতাবাসের বাঙালি ভদ্রলোক ঘন্টা খানেক তাঁর বাসায় ছিলেন। বাঙালি ভদ্রলোক জানান যে, 'দেখো এগুলো আমার কথা নয়, আমাকে এগুলো বলতে পাঠানো হয়েছে।'[৪২৫]

বিশ্বজুড়ে একের পর এক বাঙালি কূটনীতিকের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগে পাকিস্তান সরকার বেকায়দায় পড়ে যায়। তারপরও যে সকল বাঙালি দূতাবাসগুলোতে রয়ে গিয়েছিল তাদের ওপর নানা ভাবে অত্যাচার নির্যাতন চালাতে থাকে। শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি মানসিক নিপীড়নও শুরু করে পাকিস্তান সরকার। এসময় পাকিস্তান সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে বাঙালি কর্মচারীদের ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করে। এ প্রক্রিয়া জোরদার হয় যখন হংকংস্থ বাঙালি ট্রেড কমিশনার মহীউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন তারপর থেকে। হংকং এ পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলেন ভি কাদের ও একাউটেন্ট ছিলেন আবদুস সাত্তার। তাদের দুই জনকে ইসলামাবাদে ডেকে পাঠানো হয়। এর মধ্যে ব্যাংকের ম্যানেজার ভি কাদের মাত্র এক বৎসর পূর্বে যোগদান করেছিলেন। সাধারণত সাড়ে তিন বৎসরের আগে ব্যাংকের কোনো কর্মচারীকে বদলি করা হয় না। এ প্রসঙ্গে মহীউদ্দিন আহমদ *বাংলার বাণী* পত্রিকাকে জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানের সামরিক সরকার বাঙালি কূটনীতিক ও কর্মচারীদের পক্ষ ত্যাগ বন্ধ করার জন্য দূরপ্রাচ্যের সকল বাঙালি কর্মচারীকে পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করার ষড়যন্ত্র করে। আবার একই প্রক্রিয়া দেখা যায়, ম্যানিলাস্থ পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনস এর স্থানীয় ম্যানেজার ও অন্য দুই জন বাঙালি কর্মচারীর বদলির আদেশ এর মধ্য দিয়ে। বাঙালি কর্মচারীরা যাতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতে না পারেন এজন্যই এই নতুন আদেশ দেওয়া হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।[৪২৬] এ সংক্রান্ত একটি সংবাদ ভারতের *স্টেটসম্যন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যাতে বলা হয়- পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ কূটনীতিক পদে থাকা বাঙালি কর্মকর্তাদের সরিয়ে দিচ্ছে। নিউইয়র্কে পাকিস্তানের কনসাল জেনারেল এম এন আই চৌধুরী, ওয়াশিংটনে রাজনীতিবিষয়ক মিনিস্টার এনায়েত করিম এবং তার সহকারীকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথবা তাদের দায়িত্বে অন্য কোনো পাকিস্তানি কর্মকর্তাকে বসানো হচ্ছে। নেতৃস্থানীয় বাঙালি কূটনীতিকদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি পাকিস্তান দূতাবাস নিশ্চিত না করলেও জানা গেছে, নিউইয়র্ক কনসাল জেনারেলের দায়িত্ব হায়াত মেহেদি নামের একজন পশ্চিম পাকিস্তানি কূটনীতিককে দেওয়া হয়েছে। ওয়াশিংটনে রাজনীতি বিষয়ক মিনিস্টার এনায়েত করিমের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে অটোয়ায় পাকিস্তান দূতাবাসের কাউন্সেলর জাকিকে।[৪২৭]

জাপানের পাকিস্তান দূতাবাসের তৃতীয় সচিব কমর রহীম ও তথ্য অফিসার এস এম মাসুদ পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর জাপানে অবস্থান করতে গিয়ে নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই তা সমাধান হয়। এ ব্যাপারে কমর রহীম তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন- তারা দুই জন পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত ও বাণিজ্য সচিব রয়ে গেলেন। বাঙালি যারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিল তাদেরকে মুজিবনগর সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী দূতাবাসে চাকরিতে বহাল

---

[৪২৫] গবেষকের সঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মার্চ ২০১৮

[৪২৬] *বাংলার বাণী*, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

[৪২৭] *The Statesman* (India), 28 April 1971

থাকতে বলা হয়। তাদের কাছ থেকে দূতাবাসের অভ্যন্তরীণ সকল সংবাদ তারা জানতে পারতেন। জাপানে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ মিশন চালু করা হলে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়।

জাপান সরকার তাদেরকে কীভাবে নিবে এ ব্যাপারটি নিয়ে তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়। কাজেই সংবাদ সম্মেলন শেষ করে তারা দুজনে জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তরে চলে যান। সেখানে গিয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের পরিচালকের সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'আমরা এখন আর পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য স্বীকার করি না, আমরা এখন আমাদের সরকারের আনুগত্য স্বীকার করি। আমরা মুজিবনগর সরকারের এমপ্লয়ী। তোমরা আমাদেরকে আমাদের সরকারের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে গ্রহণ করো।' জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তরের পরিচালক তা না করে বরং তাদের বলেন, তোমরা নিজেরাই বলেছ তোমরা আর পাকিস্তান দূতাবাসে নেই। কাজেই তোমাদের কূটনীতিক পরিচয় সেটাও আর কার্যকর নেই। তোমাদের এখন কী হবে আমরা জানি না। আমরা তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছি না। এ কথা শুনে তারা ঘাবড়ে যান। কেননা পাকিস্তানিরা ছিল মাথা গরম প্রকৃতির। যে কোনো সময় রাস্তায় আক্রমণ করে তাদের মেরে ফেলতে পারে। এ ব্যাপারটি নিয়ে তারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরিচালক তাদের আরো জানায় যে, জাপানের আইনে কোথাও রাজনৈতিক আশ্রয়ের নিয়ম নেই। কাজেই তাদের এখানে কোনো রাজনৈতিক আশ্রয় হবে না। তাদেরকে ৭২ ঘন্টা সময়ের মধ্যে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। পরিচালকের সঙ্গে কথা বলে তারা যখন ফিরে আসছিলেন তখন কমর রহীমের বন্ধু মাকিতা (জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তরে কর্মরত) তাঁর পিছু পিছু লিফট পর্যন্ত আসেন। মাকিতা কমর রহীমকে বলেন যে, 'তোমাকে এত করে নিষেধ করলাম তুমি কথাটা শুনলে না। তুমি ডিফেক্ট করে ফেলেছো এটা তোমার ডিসিশান। তোমার ডিসিশানকে আমি স্যালুট করি। তোমরা যেটা ভালো মনে করো সেটা করো। আমি যদি কিছু করতে পারি সেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে করবো কিন্তু সরকারিভাবে আমরা কিছু করতে পারবো না। তোমাকে ডাইরেক্টর যে বললো তোমার সিকিউরিটি সম্বন্ধে আমরা দায়িত্ব নিব না সেটার জন্য তুমি ঘাবড়ে যেও না। আমরা তোমার সিকিউরিটি ডাবল করে দিয়েছি। আমরা জানি পাকিস্তানিরা তোমাদের ওপর হামলা করতে পারে। কাজেই অলরেডি আমরা সিকিউরিটি জোরদার করে দিয়েছি। তুমি যে এখন এখানে আছো তোমাদের সিকিউরিটি টিম কাছেই আছে। কোনো সময় তুমি আমাদের সিকিউরিটি টিম দেখবে না কিন্তু কখনো তোমার কাছ থেকে তিন মিনিটের বেশি দূরত্বে থাকবে না। তোমার কোনো বিপদ হলে তিন মিনিটের মধ্যে তারা ওখানে হাজির হয়ে যাবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।' মিকিতা ব্যক্তিগতভাবে এসে কমর রহীমকে আশ্বস্ত করে যান।[৪২৮]

৩.৮ বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগে বিশ্ব গণমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া

বিশ্বব্যাপী পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে একের পর এক বাঙালি কূটনীতিকের পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য পরিবর্তনে পাকিস্তান সরকার বেকায়দায় পড়ে যায়। পাকিস্তানের কূটনীতিক সম্পর্ক নিয়েও বিভিন্ন দেশে-বিদেশে প্রশ্নের উদ্রেক হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পক্ষকালের মধ্যে নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের দু'জন বাঙালি কূটনীতিকের বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা একদিকে যেমন পাকিস্তান সরকারকে উদ্‌বিগ্ন করে তেমনি তা বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমেরও দৃষ্টি আকর্ষণ

[৪২৮] গবেষকের সঙ্গে কমর রহীম এর সাক্ষাৎকার, ১৯ মার্চ ২০১৮

করে। কেননা কোনো দেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করে ঔপনিবেশিক দেশের চাকরি থেকে পদত্যাগের ঘটনার নজির বিশ্বে নেই। যেখানে কোনো সরকার গঠিত হয়নি কিংবা বাংলাদেশের ভাগ্য কোন দিকে যাবে তা নিয়েও স্বয়ং ভারত সরকারের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েছে। সেই মুহূর্তে বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করে ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা একটি আলোচিত ঘটনা ছিল। ভারত সরকার ২৫ মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছিলেন। যদিও ২ এপ্রিল আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা কামনা করেন। বাংলাদেশে প্রবাসী সরকার গঠনের সংবাদ শুধুমাত্র ভারত সরকার-ই জানতো। তাই দু'জন বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য পরিবর্তন করতে পারে এমন সংবাদও ভারত সরকারের অজানা ছিল না। তাদের সকল ধরনের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণের পূর্বে নয়াদিল্লির মতো স্থানের পাকিস্তানি দূতাবাসের দু'জন বাঙালি কূটনীতিকের আনুগত্য পরিবর্তন সহজেই বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাশাপাশি ভারত সরকারও উপলব্ধি করতে পারে যে, এমন ঘটনা হয়তো আরো ঘটতে পারে। এজন্য ভারত সরকার বাঙালি কূটনীতিকদের আনুগত্য পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পররাষ্ট্র বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করে। পাশাপাশি বিশ্বের সকল ভারতীয় দূতাবাসকে এ সংক্রান্ত কাজে বাঙালি কূটনীতিকদের সহযোগিতা করার নির্দেশ প্রদান করে। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর নয়াদিল্লির মতো কলকাতার পাকিস্তান দূতাবাসের ৬৫ জন বাঙালির বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ঘটনাও বিশ্ব গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু কলকাতা কিংবা নয়াদিল্লি নয় বিশ্বের সকল সুপ্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমগুলো তখন থেকেই অপেক্ষা করতে থাকে কলকাতা ও নয়াদিল্লির মতো ঘটনা সারা বিশ্বেও ঘটবে। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়জুড়ে তা দেখা গেছে। যেখানে বাঙালি কূটনীতিকরা পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য পরিবর্তন করেছে সে সংক্রান্ত সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের এ অধ্যায়টি নিয়ে শুরু থেকেই গণমাধ্যমের আগ্রহ ছিল অত্যাধিক।

পাকিস্তান কূটনীতিক মিশন থেকে বাঙালিদের আনুগত্য পরিবর্তনের সংবাদ যত বাড়তে থাকে পাকিস্তান সরকারের কাছে তা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সংক্রান্ত সংবাদ ইসলামাবাদে পৌঁছার পর পাকিস্তান সরকার স্পষ্ট বুঝতে পারে কূটনীতিক মিশনে কর্মরত বাঙালিদের বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন রয়েছে। এতে অন্য দেশের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার নিদারুণ বেকায়দার সম্মুখীন হয়। এর ফলে ইসলামাবাদ কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে বাংলাদেশে সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ ও বক্তব্য প্রচারের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তা ঠিকমত প্রচার করতে পারছিল না। এই পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকার যে সকল দূতাবাসে বাঙালিদের সংখ্যা বেশি ছিল সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। যাতে বাঙালি কর্মচারীরা চাকরি ত্যাগ করলেও অন্তত তাদের দূতাবাসের বাড়ি ও সম্পত্তি বেদখল হয়ে না যায়। পাকিস্তান সরকারের অভ্যন্তরীণ এই দুর্বলতার চিত্র সহজেই দৃশ্যমান হচ্ছিল। কিন্তু দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেও সমাধান পাওয়া যাচ্ছিল না।

২৯ অক্টোবর *আনন্দবাজার* পত্রিকা একটি সংবাদ প্রকাশ করে যার শিরোনাম ছিল 'পাক হাইকমিশনে নথি পোড়াবার নির্দেশ'। বিশ্বব্যাপী পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে বাঙালি কূটনীতিকরা পদত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার সময় পাকিস্তান সরকার দূতাবাসগুলোতে সংরক্ষিত সকল নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ জারি করে। এ রকম কাজকে সাধারণত যুদ্ধের ভূমিকা হিসেবেই গণ্য করা হয়। নথিপত্র যাতে অন্যের হস্তগত না হয় তার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পত্রিকার সংবাদে জানা যায় যে, ইতিমধ্যে অনেকগুলো নথিপত্র নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। পত্রিকাটিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, এই কাজ এবং দূতাবাসের বদলির ব্যাপারটি পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের পরিকল্পনাই সমর্থন করে। বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান সাফল্যে পাকিস্তানের দূতাবাসগুলোর পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মীদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে। এখনও যে ক'জন বাঙালি পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কর্মরত আছে তাঁদের সকল গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।[৪২৯] নয়াদিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের দু'জন বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর *আনন্দবাজার* পত্রিকা ৯ এপ্রিল 'পাকিস্তানের মতে ভারতের আশ্রিত কূটনীতিকদ্বয় নিখোঁজ' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। এতে বলা হয়- এই দুই কূটনীতিক নাকি নিখোঁজ। অথচ এই দুই কূটনীতিক আকাশবাণীর স্পটলাইট অনুষ্ঠানে এক সাক্ষাৎকারে তাঁদের বাংলাদেশকে বেছে নেওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। পাকিস্তান হাইকমিশন ভারত সরকারের কাছ থেকে তাঁদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়নি এমন উত্তর আশা করে। আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে এই দুই কূটনীতিক আস্থা প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা যদি দেশের সব নেতাকেই হত্যা করেন, তাহলেও বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করবে। কাউকে মেরে কাউকে গ্রেফতার করে কেউ তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানো রোধ করতে পারবে না।[৪৩০]

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নয়াদিল্লির দু'জন বাঙালি কূটনীতিক সর্বপ্রথম পাকিস্তান সরকারের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এ সংবাদে ভীত হয়ে পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকার বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকরা বাংলাদেশের পক্ষে চলে যেতে পারেন এই আশঙ্কায় পাকিস্তানের গোয়েন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে *আনন্দবাজার* পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশ করা হয়- এখানকার দুজন বাঙালি কূটনীতিকের পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সরকারের অধীনে কাজ করার চেয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ বেছে নেওয়া বেশি শ্রেয় বলে মনে করেন। এই ঘটনার পর পাকিস্তানের সামরিক সরকার বাংলাদেশের পক্ষে আরও অনেক কূটনীতিকের চলে যাবার আশঙ্কা করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই ধরনের ঘটনা এই প্রথম ঘটে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া মারাত্মক। কলকাতার পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছিল। কলকাতার হাইকমিশন অফিসে বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি এবং যে কোনো সময় তাঁরা সেখানে বাংলাদেশের পতাকা তুলতে পারেন। শুধু কলকাতা নয়, বিশ্বের সর্বত্রই বাঙালি কূটনীতিকদের

---

[৪২৯] *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ২৯ অক্টোবর ১৯৭১
[৪৩০] ওই, ৯ এপ্রিল ১৯৭১

প্রতি নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা, পুলিশ ও অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে পাকিস্তানি দূতাবাসগুলোর গোয়েন্দাদের সংগ্রহ করা হয়। এদের অনেকে কূটনীতিকের ছদ্মবেশে দূতাবাসে ও বাইরে অবস্থান করেন।[৪৩১]

এত কড়া নজরদারি সত্ত্বেও কলকাতাস্থ পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। ডেপুটি হাইকমিশনার এম হোসেন আলী এই পাকিস্তানি দূতাবাসকে বাংলাদেশের দূতাবাস বলে ঘোষণা করেন। দূতাবাসের তিনজন অফিসার তাঁকে সমর্থন করেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশে গণহত্যার বিবরণ দিয়ে বলেন, এই দূতাবাস এখন বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারের পক্ষে কাজ করবে। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই এই গণহত্যার নিন্দা করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা আলাদা জাতি। দূতাবাসের নেমপ্লেট বদলে 'বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশন' নামকরণ করা হয়েছে। এই খবর আকাশবাণী, বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা থেকে প্রচার করা হয়েছে।[৪৩২]

ঢাকা ও কলকাতায় ডেপুটি হাইকমিশন ২৬ এপ্রিল বন্ধ হয়। এর আগে প্রাক্তন ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী পাকিস্তান কূটনীতিক মিশনের আনুগত্য অস্বীকার করে বাংলাদেশে কূটনীতিক মিশনের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। এর পর কলকাতায় এসেছিলেন মেহেদী মাসুদ। তিনি প্রথম দিকে জনগণের বিক্ষোভের মুখে কলকাতার বিভিন্ন হোটেলে অবস্থান করেছেন। মেহেদী মাসুদকে পাঠানো হয়েছিল ৯ সার্কাস অ্যাভিনিউয়ের বাংলাদেশ কূটনীতিক মিশনের বাড়িটির দখল নিতে কিন্তু তিনি তা করতে পারেননি। যতদিন ছিলেন অফিস তাঁর সঙ্গেই ঘুরে বেড়িয়েছে।[৪৩৩] মেহেদী মাসুদ আসার পূর্বে কলকাতার *আনন্দবাজার* পত্রিকায় 'কলকাতা দূতাবাস ফেরৎ না পেলে খারাপ হবে' শিরোনামে প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, কলকাতায় প্রাক্তন ডেপুটি হাইকমিশন ভবন যদি অবিলম্বে বেআইনি দখলদারমুক্ত না হলে গুরুতর পরিণামের সৃষ্টি হবে বলে পাকিস্তান ভারতকে হুমকি দিয়েছে। ইসলামাবাদে পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনার বি কে আচার্য্যের বৈঠকের পর পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র এমন মন্তব্য করেন। নয়াদিল্লির সরকারি মহল থেকে জানা যায় যে, ভারতস্থ পাকিস্তানি হাইকমিশনার সাজ্জাদ হায়দারের কাছে এ সম্পর্কে ভারত যে মনোভাব ব্যক্ত করেছে তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারি এ কে রায় পাকিস্তানি হাইকমিশনারকে বলেছিলেন যে, কলকাতাস্থ পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন ভবন দখলের ব্যাপারটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং ভারতের আইন অনুযায়ী ভারত সরকার এসব ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। এ কে রায়ের এই সুস্পষ্ট বিবৃতি সত্ত্বেও রেডিও পাকিস্তান ইসলামাবাদের একজন মুখপাত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলে যে, ভারতীয় হাইকমিশনারকে বলা হয়েছে যে, বেআইনি দখল থেকে ডেপুটি হাইকমিশন ভবনকে মুক্ত করার দায়িত্ব ভারত সরকারের। আগের মতোই পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ভারতীয় হাইকমিশনারকে বলেননি যে, 'পাকিস্তানের প্রাক্তন ডেপুটি হাইকমিশনার মিঃ হোসেন আলি (যিনি বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন) একজন বেআইনী দখলদার।' পাকিস্তানি হাইকমিশনার

---

[৪৩১] *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ৮ এপ্রিল ১৯৭১
[৪৩২] আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯
[৪৩৩] *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ১৩ আগস্ট ১৯৭১

পাকিস্তান সরকারের যে নোটটি দিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছিল যে, ভারত যদি কলকাতায় ডেপুটি হাইকমিশন ভবনটি বেআইনি দখলমুক্ত না করে দেয় তাহলে তাকে 'অমিত্রোচিত কার্য' বলে গণ্য করা হবে। এমনকি পাকিস্তান আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ভারতকে গুরুতর পরিণাম সৃষ্টি হবে বলে হুমকিও দিয়েছে।[৪৩৪]

'কূটনীতির কুটিল লড়াই' শিরোনামে *আনন্দবাজার* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, পাকিস্তান ভারতের কাছে দাবি করেছে দখল হয়ে যাওয়া কলকাতার দূতাবাস তাদের হাতে আবার তুলে দেওয়ার জন্য। এমনকি দূতাবাসের আসবাবপত্র, সাজ-সরঞ্জাম, দলিল-দস্তাবেজ, টাকা-পয়সাও। পাশাপাশি পাকিস্তান দাবি করেছে নতুন যে ডেপুটি হাইকমিশনারকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে তাকে যেন যথাযথ কূটনীতিক মর্যাদা প্রদান করা হয়। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, ইসলামাবাদে খবর গিয়েছে সার্কাস অ্যাভিনিউর বাড়ি থেকে ডাকাতরা (পক্ষ ত্যাগকারী বাঙালিদের পাকিস্তানিরা ডাকাত বলে সম্বোধন করে) পাকিস্তানের সর্বস্ব লুট করেছে। এসব ডাকাতদের শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব ভারত সরকারকে দিয়ে নয়দিল্লি দূতাবাসের মাধ্যমে চিঠি দেয়। যে চিঠির ভাষা ছিল অনেকটা কড়া ও আবার নমনীয়। পাকিস্তান সরকার এ মর্মে ভারতকে শাসিয়ে দেয় যে, ভারত যদি পাকিস্তানের দাবি মতো কাজ না করতে পারে তাহলে ভারতকে তার ফল ভোগ করতে হবে।[৪৩৫]

দি টাইমস ও *দি গার্ডিয়ান* পত্রিকায় গুরুত্ব সহকারে ১ আগস্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারের সভার সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রথমোক্ত পত্রিকায় পাকিস্তান সরকারকে উপেক্ষা করে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে বাঙালি কূটনীতিক মহিউদ্দিন আহমদের বক্তৃতাদানের ছবি প্রকাশিত হয়। ভারতের বাইরে নিয়োজিত বাঙালি কূটনীতিক অফিসারদের মধ্যে মহিউদ্দিন আহমদ সর্বপ্রথম পাকিস্তান দূতাবাস থেকে পদত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[৪৩৬]

মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পূর্বে দিল্লির দু'জন বাঙালি কূটনীতিকের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের সংবাদ জানার পর দি *জাপান টাইমস* পত্রিকায় এ সংক্রান্ত সংবাদে বলা হয়- Two diplomats from the Pakistan High Commission here sought and were granted political asylum by Indian Tuesday night. India officials said early Wednesday.[৪৩৭]

ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে কর্মরত ১৫ জন বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য সম্পর্কিত সংবাদ উল্লেখ করে *দি গার্ডিয়ান* পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়-

> President Yahya Khan may snap his military finger at the fifteen East Pakistani diplomats who have defected in the United States, a man who could say, as he did recently on British television, that he knew East Pakistan better than the East Pakistanis, must have a skull as thick as his skin. Nothing is likely to persuade him. Yet if anything still can, it ought to be the dignified resignations of East Pakistani diplomats. The group that had resigned in Washington and New

[৪৩৪] *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ২৩ এপ্রিল ১৯৭১

[৪৩৫] ওই, ২২ এপ্রিল ১৯৭১

[৪৩৬] শেখ আবদুল মান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

[৪৩৭] M A Mannan and Chowdhury Shairfa Mannan, *International Document of Great Liberation War in Bangladesh (1970-71)*, Vol II, Dhaka: Jatia Gontha Prokash, 2011. p. 131

York is only the most dramatic group to have gone. Others have gone singly. More will undoubtedly go.
There is a powerful witness. Diplomats are normally among the last people to resign. When it happens it commands attention.[৪৩৮]

একই সংবাদ সম্পর্কে ওয়াশিংটনের *দি টাইম* পত্রিকায় উল্লেখ করে- All 15 Bengali officials at the Pakistan Embassy here and at the Pakistan United Nations mission in New York resigned today in protest at the "barbarious actions" of their government "which have turned Bangladesh into a land of death and terror." They asked for politicl asylum in the United States and offered their services to the Bangladesh Government.[৪৩৯]

আমেরিকায় একযোগে সকল কূটনীতিকদের আনুগত্য পরিবর্তন বিশ্ব কূটনীতিক জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। এ নিয়ে মার্কিন পত্রপত্রিকা ও সংবাদ মাধ্যমে আলোচনা হয়। কংগ্রেসও এ ব্যাপারে তাদের বিবৃতি দেয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ৯ আগস্ট *ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান* এ বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য করে যে এটি একটি নাটকীয় ঘটনা এবং প্রতিবাদের একটি বলিষ্ঠ উদাহরণ।[৪৪০]

৭ নভেম্বর লন্ডনের স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা ১২ নভেম্বর পৃথিবীর বিভিন্ন রাজধানীতে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাঙালি কূটনীতিবিদদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অংশগ্রহণের খবর পরিবেশন করে।[৪৪১] ২২ অক্টোবর *জয়বাংলা* পত্রিকায় লেখা হয়- বিভিন্ন পাকিস্তানি দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিক ও দূতাবাসের কর্মচারীরা একে একে পাকিস্তান সামরিক সরকারের মুখে লাথি মেরে বাংলাদেশের 'বৈধ সরকারের' প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করে চলেছেন। সামরিক সরকার নানা রকম নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেও সুবিধা করে উঠতে পারেনি। পাসপোর্ট আটক, মিশনের অভ্যন্তরে নজরবন্দি করে রাখা, বদলির হয়রানি থেকে শুরু করে দৈহিক নির্যাতন নরপশুরা কিছুই বাদ রাখেনি। মানবতার ইতিহাসকে যারা কলঙ্কিত করতে পারে কূটনীতির আদব কায়দাকে তারা যে সম্মান দেখাবে না এ সম্পর্কে কোনো মোহ বাঙালি কর্মীদের অন্তত নেই। যাঁরা জল্লাদ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করেছেন কী কূটনীতিক কী সাধারণ কর্মী তাঁদের বিবৃতির ভাষা এমনকি ধিক্কার জানানোর বিশেষণটি পর্যন্ত প্রায় একই রকমের। স্বাধীনতা সংগ্রামে একাত্মতার কথা ঘোষণায় তাঁরা সকলেই সোচ্চার।[৪৪২]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান দূতাবাসের সকল কূটনীতিক পদত্যাগ করার পর বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এক অভিনন্দন বার্তা *আনন্দবাজার* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়- জল্লাদ ইয়াহিয়া সরকারের কাছ থেকে আনুগত্য অস্বীকার করে এই কূটনীতিকগণ মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে যে স্বার্থত্যাগ করেছেন তা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। যে মানসিক কষ্ট নিয়ে ওই

---

৪৩৮ *The Guardian* (London), 9 August 1971; আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
439 *The Times* (Washington), 5 August 1971
৪৪০ সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৮
৪৪১ আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬
৪৪২ *জয়বাংলা*, ২২ অক্টোবর ১৯৭১

কূটনীতিকগণ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন তা সকলকে স্পর্শ করেছে। ব্যাপক হারে এবং সংঘবদ্ধভাবে তাঁদের বাংলাদেশের প্রতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সরকারের প্রতি এখনও যে সব কর্মচারী রয়েছেন তাঁদের প্রতিও এক উদাত্ত আহ্বান এসেছে। মানবতার পক্ষে আল্লাহ ও গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা জানিয়ে বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার।[৪৪৩]

নিউইয়র্ক টাইমস ও *বাল্টিমোর সান* দুইটি পত্রিকায় ৫ আগস্টে নিউইয়র্কের বাঙালি কূটনীতিকদের পদত্যাগ এবং নিক্সনের পাকিস্তান সমর্থন করে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা নিয়ে তাদের সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পাকিস্তানকে নিন্দা বা তিরস্কার করতে মার্কিন ব্যর্থতার বিপরীতে তুলে ধরা হয় বাঙালিদের কাছে পাকিস্তানের সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্যতা। কূটনীতিকদের মতো নির্ঝঞ্ঝাট লোকেরা পর্যন্ত এই স্বৈরাচারী সামরিক জান্তাকে বর্জন করেছে। দুইটি সম্পাদকীয়তেই অবিলম্বে পাকিস্তানে সকল ধরনের সাহায্য প্রদানে পূর্ণ বিরতি দাবি করা হয়। ৯ আগস্টের *ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান* পত্রিকায়ও এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়- এই আনুগত্য পরিবর্তনের ঘটনা খুবই নাটকীয় এবং এটি হলো একটি শক্তিশালী বিবৃতি ও দৃঢ় পদক্ষেপ। কূটনীতিবিদরা সচরাচর পদত্যাগকারীদের মধ্যে সর্বশেষ এগিয়ে আসেন। কিন্তু যখন এমনটি ঘটে তখন তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৪৪৪]

মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের অন্যতম প্রচেষ্টা ছিল বাংলাদেশের পক্ষে জনমত আদায়। এ জনমত সৃষ্টিতে দুটি পন্থা অবলম্বন করলেও বিদেশে অবস্থানরত তৎকালীন পাকিস্তানের বৈদেশিক কূটনীতিক মিশনের বাঙালি অফিসার ও কর্মচারীগণের তাৎক্ষণিক সমর্থন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। সেদিন বাঙালি কূটনীতিকরা শুধু এমনি সমর্থনই জানায়নি। বরং সদ্য ঘোষিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে এবং যুদ্ধরত বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণে তারা কাজ করেছেন। বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘটনা অনেকে তাৎক্ষণিক বা বিলম্বে করলেও গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে। একের পর এক বাঙালি কূটনীতিকদের আনুগত্য পরিবর্তনের কারণে কূটনীতিতে দারুণভাবে মার খেয়েছিল পাকিস্তান। বিশেষ করে যখন লন্ডন ও ওয়াশিংটনের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাঙালি কূটনীতিকদের পদত্যাগ পাকিস্তান সরকার সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। যার ফলশ্রুতিতে অচিরেই লন্ডনস্থ পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত সালমান আলী ও ওয়াশিংটনের পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আগা শাহ হিলালিকে দূতাবাসের দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। বাঙালি কূটনীতিকদের প্রতি মুজিবনগর সরকারের যে আহ্বান তাতে তারা প্রথমে দ্বিধান্বিত থাকলেও অচিরেই সে দ্বিধা কাটিয়ে ওঠে। কূটনীতিকদের ভয়ের অন্যতম কারণ ছিল কোনো কারণে মুক্তিযুদ্ধ ব্যর্থ হলে তারা দেশহীন বিদ্রোহীতে পরিণত হবেন। তাদের সকলের আত্মীয়-স্বজন দেশে বসবাস করতেন। মা বাবা, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা হওয়ার অনিশ্চয়তা এবং সর্বোপরি আত্মীয়-স্বজনদের ওপর পাকিস্তানিদের হামলার সম্ভাবনার আশঙ্কায় তারা ভীত ছিল। একদিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধা আবার কূটনীতিকদের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী তাদের পরামর্শ দেয় যে,

---

[৪৪৩] *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ৫ আগস্ট ১৯৭১
[৪৪৪] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

কিছুদিন অপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। যাতে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়। আবার কেউ ইসলামাবাদে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কেউবা পরামর্শ দেয় দূতাবাস ছেড়ে কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকরি নিয়ে চুপিসারে সরে যেতে এবং মুক্তিযুদ্ধকে ভুলে যেতে। সবকিছু ছাপিয়ে বাঙালি কূটনীতিকদের কাছে দেশপ্রেম মুখ্য হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বাঙালি কূটনীতিকদের আনুগত্য পরিবর্তন পাকিস্তান সরকারের বৈধতা নিয়ে জটিল প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে শক্তিশালী করে।

অধ্যায় চার

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বাঙালি কূটনীতিকদের কর্মতৎপরতা

ভূমিকা

বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন দ্বি-পাক্ষিক বা বহু পাক্ষিক সমস্যার সমাধান, জাতীয় স্বার্থের অবক্ষয়রোধ এবং জাতীয় স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে একজন কূটনীতিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। কূটনীতিকরা বিভিন্ন দেশের সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দাবি আদায় করতে সক্ষম হন। আবার কখনো দাবি আদায়ে সক্ষম না হলে সে দেশের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে দাবি আদায়ের পথ সুগম করেন। একজন কূটনীতিকের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কেবল সংবাদ আদান-প্রদানের মধ্যেই তার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়। নিজ দেশের স্বার্থ ও সরকারি ভাবমূর্তি যাতে ক্ষুণ্ন না হয় এই বিষয়টির ক্ষেত্রেও কূটনীতিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একজন কূটনীতিক নিজ দেশের বৈদেশিক নীতিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সার্থক ও কার্যকরী করে তোলেন। এছাড়াও নিজের দেশের নীতি ও রাজনৈতিক আদর্শ বিদেশে প্রচার করা এবং সেই নীতি ও আদর্শের পক্ষে বিদেশে জনমত গঠন করার ক্ষেত্রে একজন কূটনীতিক অনন্য ভূমিকা পালন করেন। অর্থাৎ একটি দেশের বিদেশনীতিকে সার্থক ও ফলপ্রসু করার ক্ষেত্রে কূটনীতিকদের ভূমিকা সর্বাধিক।

হোসেন আলীসহ তাঁর ৬৫ জন সহকর্মী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। বিদেশে কলকাতায় প্রথম বাংলাদেশের দূতাবাস স্থাপন করা হয়। এপ্রিল মাস থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধকালে প্রায় ৩৮ জন উচ্চপদস্থ বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। এর বাইরেও দূতাবাসে নিযুক্ত অনেক দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীও পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছেন। সকলেই নিজ অবস্থানে থেকে কূটনীতিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেছেন। পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং বাংলাদেশ মিশনে যোগদান বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়িয়ে দেয়। এসব বাঙালি কূটনীতিকরা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে নিশ্চুপ হয়ে থাকেননি। তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় দুটি আলোচিত বিষয় গণহত্যা ও শরণার্থী সমস্যা বিশ্বের বিভিন্ন সরকার প্রধান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন, বিশ্বের বিভিন্ন পার্লামেন্টে তুলে ধরার জন্য নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সঠিক চিত্র ও পাকিস্তানের অবস্থান তুলে ধরেছেন। এর বাইরে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির পক্ষেও কাজ করেছেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এপ্রিল মাস থেকে বিভিন্ন দেশে দায়িত্বরত বাঙালি কূটনীতিকবৃন্দ অনেকেই পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। যে কোনো দেশের সরকার প্রধান বা সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, বিরোধী দলীয় সদস্য, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা একজন কূটনীতিকের পক্ষে যতটা সহজ ছিল অন্যদের পক্ষে ততটা সহজ ছিল

না। কারণ কূটনীতিকবৃন্দ পূর্ব থেকেই রাষ্ট্রীয় কাজে ওই সব ব্যক্তিদের সঙ্গে কম বেশি পরিচিত ছিলেন। এছাড়াও অন্য দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে মুক্তিযুদ্ধকালীন তাদের মাধ্যমে ঐসব দেশে প্রচারণা চালানো সহজ হয়। বাঙালি কূটনীতিকগণ অন্য দেশের কূটনীতিকদের মাধ্যমে ঐসব দেশের সরকার, বিরোধী দল ও জনগণকে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেন। এছাড়াও বাঙালি কূটনীতিকদের রাজনৈতিক, সিভিল সার্ভিস ও সামরিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক যোগাযোগ ছিল। যার ফলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র অন্য দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসী সরকার ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা সহজ হয়। প্রবাসী সরকারের নির্দেশনা ছাড়াও কূটনীতিকগণ নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে মুক্তিযুদ্ধকালীন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তবে সকল বাঙালি কূটনীতিক যে পাকিস্তান সরকারের চাকরি ছেড়ে এসেছিলেন তা নয়, অনেকে বিভিন্ন কারণে পাকিস্তান সরকারের চাকরি ছাড়তে রাজি হননি। এমনকি অনেককে বিভিন্ন সময়ে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে আহবান করা হলেও তারা সরকারে যোগদান করেননি। আবার অনেকে চাকরি না ছেড়েও দূতাবাসের অভ্যন্তরে থেকে গোপনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন।

আলোচ্য অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী বাঙালি কূটনীতিকদের সামগ্রিক কর্মতৎপরতা বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বব্যাপী জনমত প্রচার, পাকিস্তানের অপপ্রচার রোধ, সভা-সমাবেশ আয়োজন ও বিভিন্ন সভা-সংগঠনে বক্তৃতা দান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে প্রচেষ্টা গ্রহণসহ তহবিল সংগ্রহ থেকে শুরু করে মুজিবনগর সরকারের মুখপাত্র হিসেবে যেসব কাজ করেছেন তার বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হবে।

৪.১ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বাঙালি কূটনীতিকদের কর্মতৎপরতা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের অংশগ্রহণ ছিল বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মুজিবনগর সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের আগস্ট পর্যন্ত পাকিস্তান দূতাবাসে নিযুক্ত বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাত্রা ছিল প্রশংসনীয়। বাঙালি কূটনীতিকরা আনুগত্য প্রকাশ করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করেননি। বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করেন। এসব কাজগুলো করার ক্ষেত্রে কোনো কূটনীতিক এককভাবে করেছেন আবার কখনো দলবদ্ধভাবে সংগঠিত হয়ে করেছেন। কখনো একজন কূটনীতিক একাই অনেকগুলো কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগকারী বাঙালি কূটনীতিকরা যে সকল কাজ করতেন সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এ এম এ মুহিত বলেন-

> আমাদের কর্তব্যের ধারা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকলো না। সর্বতোভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সফল করে তুলতে হবে। তাদের অর্থ সাহায্য দিতে হবে, সর্বোপরি যোগাযোগ ও সম্প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে। সারা বিশ্বে বাংলাদেশের জন্য সমর্থন গড়ে তুলতে হবে, পাকিস্তানকে একঘরে করতে হবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল কূটনীতিবিদদের আনুগত্য ঘোষণা নিয়ে। হারুনের তারবার্তাটিকে মুজিবনগর সরকারের নির্দেশ বলে গ্রহণ করতে আপত্তি উঠলো। পাকিস্তান সরকার আঘাত হানলে তখন না হয় আনুগত্য পরিবর্তন করা যাবে।[১]

[১] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান ১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬। পৃ. ৫৫

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বাঙালি কূটনীতিকরা যেসব কাজ করেছেন প্রাপ্ত উৎসের আলোকে সেগুলো পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো-

৪.১.ক জনমত গঠনে ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাঙালি কূটনীতিকদের অন্যতম কাজ ছিল বাংলাদেশের পক্ষে জনমত প্রচার করা। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এর তিন সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। প্রবাসী সরকার গঠন হওয়ার পর সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত হয় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জনমত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। কেননা শুরু থেকেই পাকিস্তানের সামরিক সরকার মুক্তিযুদ্ধকে অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে ভারতকে এর জন্য দায়ী করে প্রচারণা চালিয়ে আসছিল। যে কারণে প্রবাসী সরকার গঠিত হওয়ার সংবাদ বিশ্ব গণমাধ্যমে স্থান পেলেও বাংলাদেশের ব্যাপারে কোনো দেশের তেমন মনোযোগ লক্ষ করা যায়নি। এজন্য মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের পক্ষে জনমত প্রচার করার জন্য দুটি পন্থা অবলম্বন করে।

প্রথমত: বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বহির্বিশ্বে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গদের দায়িত্ব প্রদান করে। এক্ষেত্রে দুই জন ব্যক্তিকে বাছাই করে। প্রথমজন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী যিনি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং জেনেভা থেকে লন্ডনে এসে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করেছেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের একজন বিচারক হিসেবে বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও ছিলেন সমধিক পরিচিত। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের অল্পকালের মধ্যে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে বলা হলে তিনি তাতে সানন্দে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আবার একজন তরুণ মেধাবী অর্থনীতিবিদ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক রেহমান সোবহানও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অনেক দেশে সুনাম ছিল। অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে ইউরোপের দেশগুলো সফরের জন্য পাঠানো হয়। তাদের দুই জনের ওপর দায়িত্ব ছিল ইউরোপের দেশগুলো সফর করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিবর্গ, সরকার ও বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায় করা।

দ্বিতীয়ত: জনমত প্রচার কর্মতৎপরতা পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকার বিশ্বের পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। এ মর্মে তাদের কাছে আহ্বান জানানো হয়। সে আহ্বানে তাৎক্ষণিকভাবে অনেকেই সাড়া দেয়। আবার অনেকে কিছুটা বিলম্বে হলেও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তাদের প্রত্যেককে অবস্থানকারী দেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়। জনমত প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে সকল কূটনীতিক সমানভাবে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকারী বাঙালি কূটনীতিকরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

জনমত প্রচার কার্যক্রম করতে গিয়ে বাঙালি কূটনীতিকরা কী ধরনের কাজ করতেন তার বর্ণনা রয়েছে এ এম এ মুহিতের সাক্ষাৎকারে। তাদের কার্যক্রমের মধ্যে একটি ছিল বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা। এই কমিউনিটি কয়েক দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশনস (পরবর্তীতে যার নাম ছিল বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা) প্রতিষ্ঠা করে। এর প্রথম সভাপতি মনোনীত করা হয় এনায়েত রহিমকে। আবদুর রাজ্জাক ও মহসিন সিদ্দিকী ছিলেন তারপরে। সরকারে যারা ছিল না তারা সকলেই এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। এমনকি বিশ্বব্যাংকে কর্মরত বাঙালিরাও এর সদস্য ছিলেন। বাঙালি কূটনীতিকদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। কূটনীতিকরা বিভিন্ন সূত্রে যেসব খবর পেতেন তা এ্যাসোসিয়েশনকে সরবরাহ করতেন। কূটনীতিকরা নিজেদের চেষ্টায় বাংলাদেশের পক্ষে বিভিন্ন স্থানে তদবির করতেন। যেমন ১ এপ্রিল এ এম এ মুহিত প্রথম বাঙালি হিসেবে মার্কিন সিনেটে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি সিনেটর হ্যারিস ও সিনেটর কেনেডির সঙ্গে দেখা করেন। তারা দুজন সেদিনই বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন।[২]
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইকনমিক মিনিস্টার পদ থেকে পদত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ শুরু করেন এ এম এ মুহিত। পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করার পর এ এম এ মুহিত ও ড. হারুন-অর-রশিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর কেনেডি, সিনেটের হ্যারিস ও সিনেটর মন্ডেইলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাদের কাছে বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। এজন্য এই সিনেটরগণ কয়েকবার কংগ্রেসে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তারা পাকিস্তানে মার্কিনীদের অব্যাহত সাহায্য প্রদানের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরেন।[৩] উল্লেখ্য, সিনেটর মন্ডেইল বাংলাদেশ সংকট নিয়ে চারবার বক্তৃতা রাখেন যাতে পাকিস্তানের প্রতি তাঁর কোনো সমর্থন ছিল না। সিনেটর কেনেডি কংগ্রেসে প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, মার্কিন সরকার কী হত্যাকাণ্ডের জন্য নিন্দা প্রকাশ করবে না? নিরীহ জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে এবং সহিংসতা রোধে মার্কিন কংগ্রেস কোনো প্রচেষ্টা নেবে না? সিনেটর হ্যারিসও পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য বন্ধের আহ্বান জানান।[৪] এ এম এ মুহিত সিনেটর কেনেডির পূর্বে বিল মেইনের সঙ্গে সাক্ষাতে বিস্তৃত আলোচনার করেন। এরপর সাক্ষাৎ করেন সিনেটর হ্যারিসের সঙ্গে। সিনেটর হ্যারিস এবং তাঁর সহকারী দুজনেই যথার্থ কিছু করার ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন। সিনেটর হ্যারিস মুহিতকে জানান যে, সকল সমস্যা নিয়ে একটি ব্যাপক সমাধানের প্রস্তাব তিনি বিবেচনা করেছেন। এতে পাকিস্তানে অস্ত্র সাহায্য শুধু বন্ধ হবে না, অর্থনৈতিক সাহায্যও বন্ধ রাখা হবে। তিনি আরো জানান যে, সকল বরাদ্দ এবং আরো অতিরিক্ত সাহায্য দিয়ে একটি তহবিল গঠন করে বিধ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তানের পুনর্বাসনের কাজ করা হবে। এছাড়া উদ্ভূত বতর্মান সংকট নিরসনের জন্য আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।[৫] তৎকালীন সময়ে অনেক মার্কিন বিজ্ঞানী বা ডাক্তার ঢাকায় কলেরা গবেষণা ল্যাবরেটরির অর্থাৎ আইসিসিডিআরবি'র (বর্তমান আইসিসিডিআর.বি) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ড. উইলিয়াম গ্রীনো। এ এম এ মুহিত ড. গ্রীনোর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন

---

[২] আবুল মাল আবদুল মুহিত এর সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১*, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭। পৃ. ৩৭১
[৩] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮। পৃ. ১৮০
[৪] আবুল মাল আবদুল মুহিত এর টেলিফোনে নেওয়া সাক্ষাৎকার, ৫ মার্চ ২০১৯
[৫] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

ড. গ্রীনো জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। একই সঙ্গে ওয়াশিংটনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টারের নেতাও ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই এ এম এ মুহিতের প্রচেষ্টায় ড. গ্রীনো বাংলাদেশের পক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাল্টিমোরের জাহাজ থেকে যে সকল নাবিক পালিয়ে আসেন তাদেরকে ড. উইলিয়াম গ্রীনো আশ্রয় দিয়েছিলেন। ১১ এপ্রিল নাবিকদেরকে এ এম এ মুহিতের বাসায় পৌঁছে দেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়ে ড. গ্রীনো বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টারে নিয়োজিত থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন।[৬] বাঙালি কূটনীতিক এ এম এ মুহিত বাংলাদেশের পক্ষে জনমত প্রচারের কাজ শুরু করেছিলেন ৩০ মার্চ। এদিন ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে পূর্ব নির্ধারিত সাউথ এশিয়ান স্টাডি কনফারেন্স (South Asian Study Conference) অনুষ্ঠিত হয়। যা ছিল দক্ষিণ এশিয়ার আগ্রহী রাজনীতি শিক্ষকদের সম্মেলন। এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন পাকিস্তানের অধ্যাপক খালেদ বিন সাঈদ, রাশিদুজ্জামান এবং সাজ্জাদ ইউসুফ। সম্মেলন চলাকালীন ৩১ মার্চ মধ্যাহ্ন বিরতির সময় এ এম এ মুহিত খালেদ বিন সাঈদের সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত হন। আলোচনার বিষয় ছিল বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ।[৭] এর পরপর বাংলাদেশিদের সাহায্যের জন্য এ এম এ মুহিত বিশ্বব্যাংকে যান। ১৯৭১ সালে বেশ কয়েকজন বাঙালি ছাত্র আইডিএ'র ঋণের খরচে বিদেশে প্রশিক্ষণে ছিল। তারা মোমেনশিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পের খরচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও সুইডেনে শিক্ষারত ছিল। বঙ্গবন্ধুর ডাকে বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন তাদের দেশ থেকে মাসোহারা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়নি। টাকা প্রদান করতো বিশ্বব্যাংক কিন্তু টাকা দেওয়ার অনুমোদন আসতো ঢাকা থেকে। এ ব্যাপারে সমাধানের জন্য ১ এপ্রিল এ এম এ মুহিত বিশ্বব্যাংকে যান। বিশ্বব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, এ এম এ মুহিত ঢাকা থেকে অনুমোদন পাওয়ার ব্যবস্থা করবেন এবং সাময়িকভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের মাসোহারা খরচ দেওয়ার জন্য বিশ্বব্যাংককে সুপারিশ করবেন। একই ইস্যুতে ২৬ এপ্রিল বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা বৈঠকে এ এম এ মুহিতের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সুপারিশের ভিত্তিতে সারা বছর শিক্ষার্থীদের মাসোহারা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।[৮]

বাংলাদেশের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ পাকিস্তানি হানাদাররা একেবারে বন্ধ করে রেখেছিল। ভারতীয় সূত্রে কিছু সংবাদ পাওয়া যেত কিন্তু তাতে অত্যুক্তি ছিল খুব বেশি। বাংলাদেশ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহে এ এম এ মুহিত ইউএসএইড (USAID) দফতরে কর্মরত তাঁর বন্ধু টাউনসেন্ড সোয়েজী'র কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। সোয়েজীর মাধ্যমে এ এম এ মুহিত জানতে পারেন যে, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরে ডিসেন্ট চ্যানেলের সুযোগ নিয়ে ৬ এপ্রিল আর্চার ব্লাড ও তাঁর ১৯ জন সহকর্মী বাংলাদেশ সংকটে মার্কিন নমনীয় নীতির প্রতিবাদ করে একটি বাণী প্রেরণ করেন।[৯] ২৭ এপ্রিল এ এম এ মুহিত নিজে উদ্যোগী হয়ে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারা কে ফোন করেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা

---

[৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯-৫০

[৭] ওই, পৃ. ৪০-৪১

[৮] ওই, পৃ. ৪১-৪২

[৯] ওই, পৃ. ৫১

বলা সম্ভব হয়নি। ম্যাকনামারার স্টাফ অফিসার এ এম এ মুহিতকে জানায় যে, ম্যাকনামারার বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। ম্যাকনামারার তাঁকে (এ এম এ মুহিত) দক্ষিণ এশিয় বিভাগের উপ-পরিচালক গ্রেগরি ভোট এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। এম এ মুহিত সে অনুযায়ী গ্রেগরি ভোট এর সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেন। কিন্তু বাংলাদেশ সংকটের আশু সমাধানের কোনো পন্থা পাওয়া যায়নি। তবে গ্রেগরি ভোট এ এম এ মুহিতকে বলেন যে, জাপানকে বাংলাদেশের বিষয়ে আগ্রহী করতে পারলে মার্কিন দুষ্ট প্রভাব থেকে বাংলাদেশ রক্ষা পেতে পারে।[১০] একই দিনে অর্থাৎ ২৭ এপ্রিল এ এম এ মুহিত বন্ধু সোয়োজির সহায়তায় ইউএসএইডের সহকারী প্রশাসক ডোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে দেখা করে এ এম এ মুহিত দুটি বক্তব্য তুলে ধরেন। প্রথমত: পূর্ব পাকিস্তানে সে সময় মার্কিন সাহায্যের অধীন প্রচুর গম আর সার সরবরাহ হতো। বাংলাদেশ তথা ওয়াশিংটনের বাঙালি কূটনীতিকদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান দূতাবাস নির্বিবাদে মালামাল ক্রয় ও জাহাজজাত করছিল। প্রায়ই জাহাজকে মাঝ পথে গন্তব্যস্থল পরিবর্তন করে করাচিতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। বাঙালি কূটনীতিক এ এম এ মুহিতের কাছে মনে হতো বাংলাদেশের ন্যায্য পাওনা পাকিস্তানে এইভাবে স্থানান্তর করা হচ্ছিল। তাই এ এম এ মুহিত সকল সরবরাহ বন্ধ করার আবেদন জানান। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে উর্ধ্বতন মহল থেকে চাপ থাকলেও খুব বেশি ত্রাণ-সামগ্রী পূর্ব পাকিস্তানে সরবরাহ করা হয়নি। এ এম এ মুহিতের আবেদনের প্রেক্ষিতে সিনেটের কেনেডির উদ্যোগে মার্কিন কম্পট্রোলার জেনারেল এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করেন। তাতে দেখা যায় প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলারের সাহায্য ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে অর্ধেকও প্রদান করা হয়নি। এমনকি ২৫ মিলিয়ন ডলারের খাদ্য অনুদানের কাগজপত্রই সম্পাদন করা হয়নি। এ এম এ মুহিতের দ্বিতীয় আবেদন ছিল- এইডের খরচে যে সব বাঙালিরা আমেরিকায় প্রশিক্ষণে ছিলেন তাদের বিষয়ে। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে সোয়েজি অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রলম্বিত করে দিয়েছেন। যাতে শিক্ষার্থীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করা সহজ হয়। কিন্তু বাঙালি কূটনীতিকদের উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেকটি বিষয় কার্যকরী ভাবে সমাধানের জন্য একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ডন ম্যাকডোনাল্ড এই প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে সকল প্রশিক্ষণের মেয়াদ তিন মাসের জন্য বৃদ্ধি করেন।[১১]

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এসময় থেকেই পাকিস্তান বাহিনীর ওপর যৌথ বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। যার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান বাহিনী পিছু হটতে থাকে। ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দুই দিন পর ৮ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনের বাঙালি কূটনীতিক এ এম এ মুহিত সিনেটর স্যাক্সবীর টেলিফোন পান। সিনেটর স্যাক্সবী তাঁকে সিনেটর মাইক গার্টনার এর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তাদের বক্তব্য ছিল বাংলাদেশের নেতৃত্বে যারা আছেন তারা কী একটি স্বাধীন দেশ পরিচালনা করতে পারবে? তারা বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য প্রস্তাব দিতে চায় কিন্তু তার পূর্বে তাকে আশ্বস্ত করতে বলা হয় যে, পাকিস্তানি হত্যাযজ্ঞের পরেও যথেষ্ট উপযুক্ত ব্যক্তি আছেন যারা দেশকে

---

[১০] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১
[১১] *ওই*, পৃ. ৬১-৬২

পরিচালনা করতে পারবেন। তাদের প্রশ্ন ছিল শেখ মুজিবুর রহমান যদি দেশে ফিরেন তাতে অবস্থার কী রকম উন্নতি বা পরিবর্তন হবে? তিনি মুহিতকে জানান যে, ইয়াহিয়া খান তাকে মিথ্যা কথা বলেছেন এবং তাকে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। এখন ইয়াহিয়া খান নিক্সনের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করছেন ও বর্তমান অবস্থায় কোনোমতে পার পেতে চাচ্ছেন। এই অবস্থায় গার্টনার চান যে, বাংলাদেশকে ইয়াহিয়া খান মানতে হবে এবং শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে হবে। তবে তিনি মুহিতকে বলেন বাঙালি নেতৃবৃন্দকে খুব সাবধানতার সঙ্গে দেশ চালাতে হবে। প্রতিশোধ নিতে বিরত থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশকে গড়ে তুলতে মনোযোগী হতে হবে।[১২] সিনেটর গার্টনার এর বক্তব্যের পর এ এম এ মুহিত তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে, দেশ চালানোর মতো যথেষ্ট যোগ্য লোক বাংলাদেশে আছে এবং কোনো ধরনের প্রতিশোধ স্পৃহা নেওয়া হবে না। এম এ মুহিত প্রায়ই ক্যাপিটল হিলে বা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে যেতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতো তিনি পাকিস্তানের হয়ে কাজ করতে গিয়েছেন কিন্তু সেখানে তিনি তাঁর যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের হয়ে কথা বলতেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের রাজনৈতিক কাউন্সেলর শামসুল কিবরিয়া নিজ উদ্যোগে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের পাকিস্তান ডেস্কের ডিরেক্টর ক্র্যাগ বাক্সটারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করার পূর্বে জুন মাসের শেষ দিকে শামসুল কিবরিয়া খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের পাকিস্তান ডেস্কের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাকিস্তানে বদলি করা হয়েছে। পরবর্তীতে বাঙালি কূটনীতিকরা জানতে পারেন যে, পাকিস্তান ডেস্কের ডিরেক্টর ক্র্যাগ বাক্সটার ও অন্য দুই জন সিনিয়র অফিসার সকলেই বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এ কারণে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের পরিবর্তে নতুন লোক নিয়োগ করা হয়। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত রুস ল্যাঙ্গিন ও পিটার কন্সটেবল এর সঙ্গে শামসুল কিবরিয়া যোগাযোগ করেন। তাদের সঙ্গে কথোপকথনে শামসুল কিবরিয়া বুঝতে পারেন যে, এই দু'জন বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল নন। পাকিস্তান ডেস্কের এ দু'জন কর্মকর্তা বাঙালি কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বাঙালি কূটনীতিকরা কী করছেন তা বোঝার চেষ্টা করতেন। কূটনীতিক ভাষায় বলা যায় Channel of Communication বা যোগাযোগের সেতু তৈরি করার চেষ্টা করেছেন।[১৩] বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে ওয়াশিংটনে সফরের সময় বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি গোপন বৈঠকের জন্য মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এ বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, এম আর সিদ্দিকী ও শামসুল কিবরিয়া। গোপন বৈঠকটি হয়েছিল অক্টোবর মাসের শেষের দিকে। শামসুল কিবরিয়া নিজে গাড়ি চালিয়ে ওয়াশিংটনের উপকূলে পিটার কনস্টেবলের বাড়িতে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও এম আর সিদ্দিকীকে নিয়ে যান। এখানে তাদের মধ্যে দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং পূর্ব পাকিস্তানকে কতটুকু স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যায়। তবে এ আলোচনা থেকে শামসুল কিবরিয়া বুঝতে পারেন যে, এতদিনেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব পরিবর্তন হয়নি। তারা তখনও অখণ্ড পাকিস্তানে

[১২] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬

[১৩] এ এফ সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নানা প্রসঙ্গ*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১৮। পৃ. ১০২-১০৩

বিশ্বাসী। তারা বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন এটি বড় করে দেখানোর চেষ্টা করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে কিছু হবে সেটা তাদের কাছে কোনো বড় ব্যাপার ছিল না। তারা মনে করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রাণ বাঁচানোটাই একটা বড় মানবিক কাজ হিসেবে দেখা উচিত। পিটার কনস্টেবল জানান যে, তাদের সরকার এ জন্য চেষ্টা করছেন। এ গোপন বৈঠকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। তবে এ গোপন বৈঠকের পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর সঙ্গী এম আর সিদ্দিকী ও শামসুল কিবরিয়াকে অনুরোধ করেন, তারা যেন এ গোপন বৈঠকের বিষয় বাইরের কারো কাছে প্রকাশ না করেন।[১৪]

মুক্তিযুদ্ধকালীন কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রধান এম হোসেন আলীর সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ দেখা করতে আসতেন। সাক্ষাতের সময় হোসেন আলী তাদের নিকট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য বিস্তারিত তুলে ধরতেন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও সমর্থনের কথা ব্যক্ত করতেন। ২২ এপ্রিল *নিউইয়র্ক টাইমস* এর সাংবাদিক সিডনি শনবার্গ এবং দুই জন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য জন স্টোনহাউস ও ব্রুস ডগলাসম্যান ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের মাধ্যমে হোসেন আলীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন।[১৫] ২৪ এপ্রিল কলকাতার নির্বাচিত মেয়র শ্যাম সুন্দর গুপ্ত ও ডেপুটি মেয়র পান্না লাল দাস বাংলাদেশ দূতাবাসে আসেন হোসেন আলীর সঙ্গে দেখা করতে। তারা বাংলাদেশের প্রতি তাদের সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।[১৬] ২৮ এপ্রিল গেকার ইন্টারন্যাশনালের দুই জন প্রতিনিধি জন লিন্টন ও মিসেস লিন্টন, বিশ্ব ধর্ম সংঘের হোমার জ্যাক ও গান্ধী শান্তি ফাউন্ডেশনের কে রায় চৌধুরী বাংলাদেশ দূতাবাসে হোসেন আলীর সঙ্গে দেখা করেন। তারা সকলে নিজ চোখে শরণার্থীদের অবস্থা দেখার জন্য সীমান্তবর্তী এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার পূর্বে হোসেন আলীর সঙ্গে দেখা করেন। এদের মধ্যে প্রথম দুইজনকে হোসেন আলী করাচি ও লন্ডন ভ্রমণের সময় পশ্চিম পাকিস্তানে বাঙালি সিভিলিয়ানরা কেমন আছে সে সম্পর্কে সুষ্ঠু তদন্ত করতে বলেন।[১৭] একই দিন থাইল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল হোসেন আলীর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি হোসেন আলীকে জানান যে, দিল্লিস্থ থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলকে থাইল্যান্ডে পাঠাতে বলেছেন। এতে থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। এ প্রেক্ষিতে হোসেন আলী মুজিবনগর সরকারকে একটি নোট দেন যেখানে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ থেকে একটি প্রতিনিধি দল থাইল্যান্ডে পাঠানোর বিষয়টি উল্লেখ করেন। অবশ্য প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছিল এবং দিল্লিস্থ রাষ্ট্রদূত তাদের আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিল এমনকি পরবর্তীতে হোসেন আলী দিল্লি ভ্রমণের সময় থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করেছেন। ২৮ এপ্রিল তারিখে হোসেন আলী গোপনে সাক্ষাৎ করেন যুগোশ্লাভিয়ার কনসাল জেনারেল মিলান্দেন বেরোভিক এর সঙ্গে। সাক্ষাতে তিনি জানিয়েছিলেন, যুগোশ্লাভিয়ার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। তিনি বাংলাদেশ সরকার থেকে একটি প্রতিনিধি দল যুগোশ্লাভিয়ায় পাঠাতে

---

[১৪] এ এফ সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩-১০৪
[১৫] The Diary of Hossain Ali
[১৬] The Diary of Hossain Ali
[১৭] The Diary of Hossain Ali

বলেছিলেন। অবশ্য পরে তা মুজিবনগর সরকার থেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে অগ্রগতি না হওয়ায় হোসেন আলী মুজিবনগর সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন একটি প্রতিনিধি দলকে দিল্লিতে যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে পাঠানোর জন্য।

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মি. শাসমল কলকাতা মিশনের প্রধান হোসেন আলীর সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব দেন যে, তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও ইসরায়েল থেকে ১০% টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে অস্ত্র কিনে দিতে পারবেন এবং অস্ত্র সরবরাহ করার পর বাকি টাকা পরিশোধ করা যাবে। তাঁর এ প্রস্তাবে হোসেন আলী জানান যে, তিনি তাঁর সরকারের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত জানাতে পারবেন। কলকাতাস্থ অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার ডগলাস স্টারকি হোসেন আলীর একজন ভালো বন্ধু ছিলেন। তিনি হোসেন আলীর সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটের একটি রেস্টুরেন্টে দেখা করে মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ইস্যুতে তাঁর সরকারকে সঠিক পন্থা গ্রহণে সহায়তা করেছেন। ৮ মে হোসেন আলীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ভারতের প্রাক্তন এমপি ও নেহেরুর সময়কালীন পার্লামেন্টের উপনেতা সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ। তাঁর বয়স ৮০ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। এমনকি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং ত্রিগুনা সেন কী করছেন তা নজর রাখছিলেন। তিনি হোসেন আলীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন একজন স্বাধীন ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকে দিল্লিতে বাংলাদেশের পক্ষে দায়িত্বে ন্যস্ত রাখার জন্য। যাতে ভারত সরকারের সঙ্গে লিয়াঁজো তৈরি করতে পারে। এ লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার থেকে এমএনএ শামসুল হককে দিল্লিতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেখানে সুখী ছিলেন না। বিশেষ করে সেখানে গিয়ে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিজের জাহির করতে থাকেন। এমনকি তিনি রাষ্ট্রদূত হিসেবে ভালো বাড়ি ও টাকা পয়সাও দাবি করতে থাকেন। এমন পরিস্থিতিতে মুজিবনগর সরকার তাঁকে সেখান থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। মে মাসের শুরুর দিকে ব্রিটিশ শ্রমিক দলীয় এমপি ডগলাসম্যান ও নিউজিল্যান্ডের শ্রমিক দলের এমপি ট্রেভর জে. ইয়াং কলকাতায় হোসেন আলীর সঙ্গে দেখা করেন। তারা জানায় যে, তাদের সরকারকে ইসলামাবাদের জন্য সকল ধরনের তহবিল সরবরাহ বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়েছে। তারা আরও জানায় যে, তাদের সরকার শর্তসাপেক্ষে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবছে কিন্তু সবকিছু নির্ভর করছে এই সমস্যার ব্যাপারে জাতিসংঘের আগ্রহের ওপর। ১৪ মে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বৌদ্ধ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ভিক্ষু ধর্মভীর হোসেন আলীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি পরামর্শ দেন যে, বাংলাদেশ থেকে একটি প্রতিনিধি দল বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র যেমন বার্মা, থাইল্যান্ড, নেপাল, শ্রীলঙ্কায় পাঠানোর জন্য। পরবর্তীতে মুজিবনগর সরকার থেকে তাঁকে প্রধান করে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছিল। একই দিন হোসেন আলী কলকাতাস্থ অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার ডগলাস স্টারকি'র সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটের একটি রেস্টুরেন্টে সাক্ষাৎ করেন। স্টারকি হোসেন আলীকে জানান, বাংলাদেশের উচিত নির্দিষ্ট কিছু এলাকা দখল করা এবং বাংলাদেশের সরকার সে অঞ্চল থেকে পরিচালনা করা প্রয়োজন। তাহলে অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট থেকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি পাওয়া সহজ হবে।

২৪ মে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ড. ত্রিগুনা সেন সহ অন্যান্যদের নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে বাংলাদেশের বেতার সম্প্রচার করা যায় কীভাবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা এক কিলোওয়াটের একটি ট্রান্সমিটার চট্টগ্রাম থেকে আগরতলায় নিয়ে আসেন। এটি ছিল শুধুমাত্র ট্রান্সমিটার। কিন্তু এটির সম্প্রচার ক্ষমতা ছিল খুবই কম। তাই বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি আলাদা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার। ভারত সরকার বাংলাদেশকে ৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ট্রান্সমিটার ধার দিয়েছিল। যা নিয়ে কাজ শুরু করার জন্য বাংলাদেশের সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু জামিল চৌধুরী একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা দেওয়ায় তা নিয়ে আলোচনার প্রশ্ন সামনে চলে আসে। তাঁর পরিকল্পনায় ছিল বেতন, অফিসের সুযোগ-সুবিধা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। ভারতের প্রাক্তন মন্ত্রী ড. ত্রিগুনা সেন সহ অন্যান্যদের নিয়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বৈঠকে আলোচনা শেষে ২৫ মে থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রচার শুরু করে।

২৮ মে হোসেন আলী ভারতের বহিঃরাষ্ট্র বিষয়ক পররাষ্ট্র মন্ত্রী অশোক রায়ের সঙ্গে দেখা করেন। সাক্ষাতে তিনি তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে মনোযোগ দিতে বলেন। প্রথমত, বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যুষিত দেশগুলোতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল প্রেরণ, দ্বিতীয়ত, আফগানিস্তানে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল প্রেরণ ও তৃতীয়ত, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মস্কো সফর। বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যুষিত দেশগুলো ও আফগানিস্তানে প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মস্কো সফর বাস্তবায়িত করা হয়নি। ২৯ মে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কারপুরী ঠাকুর হোসেন আলীর সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহায়তার জন্য এক লক্ষ রুপির চেক হস্তান্তর করেন। ২১ জুলাই দিল্লিস্থ ফরাসি দূতাবাসের প্রথম সচিব মি. বুফান্দো কলকাতায় আসেন হোসেন আলীর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি জানান যে, ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ আসন্ন। তিনি আরো জানান যে, বাংলাদেশ অনেক কূটনীতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করছে এবং এর সংযোগ রক্ষার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করা উচিত। ২৬ জুলাই জাপানের এমপি ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিস্ট এর প্রধান কানিচি নিশিমুরা কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে আসেন। তিনি হোসেন আলীকে জানান যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিস্ট একটি প্রস্তাবনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে। ফ্রান্স বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইস্যুতে জুলাই পর্যন্ত নীরবতা পালন করে। ৩১ জুলাই হোসেন আলী ভারতের ফরাসি দূতাবাসের কনসাল জেনারেলের সঙ্গে দেখা করেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে তাকে তথ্য দেন। আগস্ট মাসে হোসেন আলী দিল্লি সফর করেন। এসময় তিনি ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব জি. নারায়ণ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব স্বামীনাথন, পি এন হাকসার, টি এন কাউল, শ্রীলঙ্কার ডেপুটি হাইকমিশনার তিলক রত্নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ৭ আগস্ট পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষী, দিল্লিস্থ বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্রের প্রধান কে এম শিহাবুদ্দিনসহ হোসেন আলী মার্কিন দূতাবাসের কাউন্সেলর মি. স্টুল ও দ্বিতীয় সচিব মি. কিরবি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া তিনি ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এ. বি. মালিকের সঙ্গেও দেখা করেন। ২১ নভেম্বর হোসেন আলী নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব টি এন কাউল, পলিসি প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান ডি পি ধর, প্রধানমন্ত্রীর সচিব পি এন হাকসার,

প্রতিরক্ষা সচিব কে বি লাল ও পররাষ্ট্র দপ্তরের যুগ্ম সচিব জে এন দীক্ষিতের সঙ্গে দেখা করেন। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন।

বাংলাদেশের পক্ষে জনমত প্রচারে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগকারী প্রথম বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন। মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কে এম শিহাবুদ্দিন ২৮ এপ্রিল ফিরে আসেন। এরপর তিনি প্রথম সাক্ষাৎ করেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংয়ের সঙ্গে। তাঁকে মুজিবনগর সরকারের চিঠি হস্তান্তর করেন। যে চিঠিতে ভারতের দিল্লিতে প্রথম বাংলাদেশের মিশন স্থাপনের অনুমতি চাওয়া হয়। তিনি শিহাবুদ্দিনকে জানান যে, তাঁর মন্ত্রণালয়, বিশেষ করে তাঁর অফিস সবসময় তাঁর (শিহাবুদ্দিন) জন্য উন্মুক্ত এবং যে কোনো প্রয়োজনে তাঁর ও উর্ধ্বতন অফিসারদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে।[১৮] এরপর থেকেই শিহাবুদ্দিন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কূটনীতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায় করতে দিল্লিস্থ বিদেশি দূতাবাসগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শিহাবুদ্দিন পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন বিদেশি মিশন বিশেষ করে মার্কিন দূতাবাসের সামনে ডেমোনেস্ট্রনের আয়োজন করেন। যাতে তাদের সরকার অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ রাখে। এছাড়া শিহাবুদ্দিন বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে বিদেশি নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মার্কিন সিনেটর, কংগ্রেসম্যান, আইনসভার সদস্যদের অভ্যর্থনা জানাতেন এবং তাদের কাছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করতেন। ভারতীয় সরকারের সহযোগিতায় তিনি বিদেশি এসব নেতৃবৃন্দদের শরণার্থী শিবির, মুক্তাঞ্চল ও মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যেতেন। যাতে তারা প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে অবগত হতে পারে।[১৯]

কে এম শিহাবুদ্দিন ভারতীয় যেসকল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সার্বক্ষণিক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষা করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন- ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং, মন্ত্রিসভার সদস্য উমা শঙ্কর দীক্ষিত, আই কে কে গুজরাল, মইনুল হক চৌধুরী, মোহাম্মদ শফি কোরেশী, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, ড. ত্রিগুনা সেন এবং প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন। তাঁদের সকলের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন ছিল এবং শিহাবুদ্দিনের সঙ্গে তাঁদের আচরণ ছিল সদয়। জনমত আদায়ের জন্য তাদের সঙ্গে একযোগে শিহাবুদ্দিন বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা করতেন। শিহাবুদ্দিন বিরোধী দল জনসংঘের প্রধান অটল বিহারী বাজপেয়ি, এল কে আদভানি ও এল কে সন্ধির সঙ্গেও যোগাযোগ করেন।[২০] ভারতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদ জে. পি নারায়ণের সঙ্গেও শিহাবুদ্দিন যোগাযোগ করেছেন। ডি পি ধর, পি এন হাকসার ও টি এন কাউল বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার জন্য শিহাবুদ্দিনকে সহযোগিতা করেছেন। টি এন কাউল একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিক হিসেবে শিহাবুদ্দিনকে পরামর্শ দিয়েছেন কীভাবে বাংলাদেশের পক্ষে কার্যকরী কূটনীতিক কর্মতৎপরতা চালানো যায়। ৬ ডিসেম্বর ভারতের স্বীকৃতির দিন কে এম শিহাবুদ্দিনকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে নিয়ে স্বীকৃতির চিঠি তুলে দেওয়া হয়। এ চিঠি হস্তান্তর করার সময় টি এন কাউল বলেছিলেন-

---

[১৮] K M Shehabuddin, *There and Back Again A Diplomat's Tale*, Dakha: UPL, 2006. p. 105
[১৯] *Ibid*, pp. 105-106
[২০] *Ibid*, p. 106

> It is my pleasure to hand over the letter of Indian recognition of Bangladesh to you, the first Bengali diplomat to join the liberation movement.. Please convey our warm greetings to your government, leaders and people.[২১]

ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান ডি পি ধরের সঙ্গে শিহাবুদ্দিন নিয়মিত যোগাযোগ করতেন। কেননা তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিযুক্ত বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রধান উপদেষ্টা। ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষ করে নিরাপত্তা ও কূটনীতিক ক্ষেত্রে তাঁর ওপর বেশি মাত্রায় নির্ভর করতেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বার্তা ডি পি ধর মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছে পাঠাতেন কে এম শিহাবুদ্দিনের মাধ্যমে। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি গঠিত সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ডি পি ধর। যেখানে বাম, ডান ও মধ্যপন্থি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থাকবেন যাতে করে সার্বজনীন সহযোগিতা আসে বাংলাদেশের পক্ষে। এমনকি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডি পি ধর শিহাবুদ্দিনের মাধ্যমে মুজিবনগর সরকারের কাছে বার্তা পাঠান যেন অবিলম্বে ঢাকায় মুজিবনগর সরকারকে স্থানান্তর করা হয়। মিসেস গান্ধী বাংলাদেশ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি ক্ষুদ্র উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডি পি ধর। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন- প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পি এন হাকসার, পররাষ্ট্র সচিব টি এন কাউল, প্রধানমন্ত্রীর অফিসের সচিব পি এন ধর। মন্ত্রিপরিষদের ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী শরণ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াই. বি. চ্যাবন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজ্জীবন রাম।[২২] এদের বাইরে কে এম শিহাবুদ্দিন প্রতিরক্ষা সচিব কে বি লাল, সেনাবাহিনীর চীফ মানেকশ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বেশ কিছু অফিসারের সঙ্গে বিশেষ করে এ কে রায়, কে পি এস মেনন, এস কে সিং, জে এন দীক্ষিত, পিটার সিনাই ও আলফ্রেড ভেজ এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। শিহাবুদ্দিন এস কে সিং ও আলফ্রেড ভেজ এর সঙ্গে সপ্তাহে দুই থেকে তিনদিন দেখা করতেন। এস কে সিং বহিঃপ্রচার বিভাগের পরিচালক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তিনি মুজিবনগর সরকার ও শিহাবুদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারত ও বাংলাদেশ বিরোধী মিথ্যা প্রচারণার জবাব দিতেন। তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিক। তাঁর কূটনীতিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তিনি ভারতীয় ও বিদেশি গণমাধ্যমকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য দিতেন। যাতে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেওয়া কোটি শরণার্থীর প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়।[২৩] দিল্লিস্থ বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র থেকে বিশ্বব্যাপী বাঙালি কূটনীতিকদের নিকট পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের আহ্বান জানানো হয়। এ কাজটি করা হয় ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তা আলফ্রেড ভাজ এর মাধ্যমে।[২৪]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে বাঙালি কূটনীতিককে অস্বস্তিকর অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। যা শিহাবুদ্দিন তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

---

২১ K M Shehabuddin, *ibid*, p. 107
২২ *Ibid*, p. 107
২৩ *Ibid*, pp. 107-108
২৪ *Ibid*, p. 108

> I recall, for example my telephone call to Turbaz, the first secretary at the Afghan embassy. I knew the man well and, in my capacity as head of the Bangladeshi mission, wanted to set up an appointment with his ambassador. His brusque replies depressed me enormously. When I told him that I was calling from the Bangladesh embassy, his immediate retort was "What is Bangladesh?" Embarrassed, I reminded him, "This is your friend Shehabuddin calling. You know me very well.' Again his promt reply was, "I used to know you. I don't know you now."[২৫]

শিহাবুদ্দিন এই ঘটনার কথা দক্ষিণ ইয়েমেনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স আবদুর রহমানকে জানান। তিনি আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে ফোন করে শিহাবুদ্দিনের জন্য সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করে দেন। আফগান কূটনীতিক পাকিস্তান সমর্থক ছিলেন এবং একজন বিদ্রোহী কূটনীতিকের সঙ্গে তিনি কথোপকথনে ইচ্ছুক ছিলেন না। এমনি ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হন শিহাবুদ্দিন আরেকবার। দিল্লিস্থ চীনা দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স এর সঙ্গে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত থাকা অবস্থায় শিহাবুদ্দিনের ভালো সম্পর্ক ছিল। শিহাবুদ্দিন বাংলাদেশ মিশনের পক্ষ থেকে চীনা চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের নিকট একটি ভার্বাল নোট পাঠান। চীনা দূতাবাস এটি না খুলে ফেরত পাঠায় এবং লিখে দেয় "Sender unknown"।[২৬]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বাঙালি কূটনীতিকদের জনমত প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। এক্ষেত্রে যে সকল বাঙালি কূটনীতিক বিজয়ের পরে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন তারা এ কাজটি জোরালো ভাবে করতে শুরু করে। যেমন ইন্দোনেশিয়ার পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগকারী বাঙালি কূটনীতিকরা বেশ কিছু কাজ করেন। এর মধ্যে ছিল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও নেতৃবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ইন্দোনেশিয়ার সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ার চেষ্টা করে। তারা ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদম মালিক, মাসজুমী নেতা মোহাম্মদ নাসের ও শরফুদ্দীন প্রবীরানেগারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যে সব দেশ বাংলাদেশকে আগেই স্বীকৃতি দিয়েছে সেসব দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গেও দেখা করে বাংলাদেশের প্রতি তাদের সরকারের সমর্থন ও সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ জানান। তবে এর মধ্যে বাঙালি কূটনীতিক আবুল ফজল শামসুজ্জামানের সঙ্গে মাসজুমী নেতা মোহাম্মদ নাসের এর যে কথোপকথন হয় তা উল্লেখ করার মতো। ঘন্টাখানেকের মতো মোহাম্মদ নাসেরের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। তিনি বলেন, স্বাধীন না হয়ে বাংলাদেশ ভারতের একটি প্রদেশ হলেই ভালো হতো? অবাক হয়ে আবুল ফজল বলেন, একথা বলছেন কেন? তিনি এর উত্তরে বলেন, ভারতের সাহায্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, ভারতের প্রভাব বাংলাদেশকে চিরদিন প্রভাবান্বিত করবে। তাদের দু'জনের মধ্যে অনেকক্ষণ তর্ক হয়। আবুল ফজল মাসজুমী নেতাকে বলেন যে, বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পর এর স্থান। বাংলাদেশী মুসলমানরা অত্যন্ত ধর্মপরায়ন। এ রকম গোঁড়া মুসলমান পৃথিবীর অন্যত্র খুব কমই আছে। মুসলিম দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আর ছোট দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বাধীন বৈদেশিক নীতি মেনে চলতে হবে। ভারত বাংলাদেশের বিপদের বন্ধু। তাই বলে বাংলাদেশকে ভারতের তাঁবেদার রাষ্ট্র মনে করা ভুল ও অন্যায় হবে। যদি বাংলাদেশ নিয়ে কোনোরকম সন্দেহ থাকে তাহলে সেখানে একটি মুসলিম

---

[২৫] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 116
[২৬] *Ibid*, p. 116

প্রতিনিধি দল পাঠান। তারা নিজের চোখে সব দেখে আসুক। পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের প্রতি আপনাদের কর্তব্য আছে। আবুল ফজলের এই কথার পর কোনো উত্তর খুঁজে পাননি মোহাম্মদ নাসের। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমাদের কর্তব্য আছে। তর্কস্থলে যাই বলে থাকি না কেন বাংলাদেশের প্রতি আমাদের সমর্থন আছে। আশা করি ইন্দোনেশিয়ার সরকার তাড়াতাড়ি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে।[২৭]

ইরাকের পাকিস্তান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য পরিবর্তনের পর মুজিবনগর সরকার তাঁকে ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত হিসেবে আবুল ফতেহ সৌদি আরব, ইরাক, তিউনিসিয়া, মরক্কো, লেবানন, ফিলিপাইনস, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আবুল ফতেহ শুরুতে নিউইয়র্ক যান। সেখানে তাঁর লক্ষ্য ছিল মুসলমান দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করা। বিশেষ করে যে দেশগুলো বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। নিউইয়র্কে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত বারোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ফতেহকে বলেন, আপনারা বিরাট ভুলের মধ্যে গিয়েছেন। আপনারা কখনই দেশ স্বাধীন করতে পারবেন না। বড় বড় দেশগুলোর রাজনৈতিক স্বার্থের যাঁতাকলে পড়বেন। এর উত্তরে ফতেহ তাঁকে বলেন, পৃথিবীর কূটনীতিক ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ সকল যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে ছোট ছোট দেশগুলোর স্বার্থে। পরবর্তীকালে বড় বড় দেশগুলো এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। নিউইয়র্কের ইরাকের রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের সিনিয়র মন্ত্রীর সঙ্গে আবুল ফতেহ'র কথা হয়। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের ঘোর সমর্থক। ইরাকে কুর্দীদের সমস্যা থাকার কারণে তাদের পক্ষে বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন করা সম্ভব ছিল না। যদিও মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ইরাক বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয়। আবুল ফতেহ সাক্ষাতে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে বিভেদ টেনে 'আমরা-ওরা' এভাবে কথা বলেছিলেন। যেটা তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি ফতেহকে বলেন, আমরা-ওরা এ পর্যায়েই আপনার আসা উচিত হয়নি।

তিউনিসিয়ার চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের সঙ্গে আবুল ফতেহ কথা বলেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তিনি জানান, প্রকাশ্যে তিনি কিছু করতে পারবেন না। মরক্কোর প্রতিনিধির সঙ্গে আবুল ফতেহ কথা বলেন। তাদেরও বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের বর্বর হত্যাযজ্ঞের বিপরীতে মানবিক সহানুভূতি ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতি ছিল না। জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে গিয়ে নিউইয়র্কে আবুল ফতেহ জাতিসংঘ লবিতে লেবাননের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রতি মানবিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তবে অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। উপজাতীয় সমস্যার কারণেই লেবানন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করে। ফিলিপাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও বাংলাদেশের প্রতি মানবিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তারাও তাদের উপজাতীয় সমস্যার কারণে লেবাননের মতো নীরব ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রতি ফ্রান্সের কোনো সমর্থন ছিল না। আবুল ফতেহ কৌশলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করেন। আবুল ফতেহ ইচ্ছে করে তাঁকে পাকিস্তানের দূত হিসেবে ভিজিটিং কার্ড পাঠান। দেখা

---

[২৭] আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *জাকার্তায় একাত্তরের ঢেউ*, ঢাকা: ত্রিভুজ প্রকাশনী, ১৯৮৪। পৃ. ৫৪-৫৫

হওয়ার পর আবুল ফতেহ তাঁকে বলেন, আমি এখন আর পাকিস্তানের মঞ্চে নেই। এতে তিনি বলেন, আপনার সঙ্গে আমার যে দেখা হয়েছে তা কাউকে বলবেন না। উল্লেখ্য, ফ্রান্স তখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। কূটনীতিক পর্যায়ে যোগাযোগ করার অর্থ ছিল এক রকমের স্বীকৃতি। সেজন্যই ফরাসি রাষ্ট্রদূত সাক্ষাৎকারের বিষয়টি গোপন রাখতে বলেন।[২৮]
১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার প্রকাশ করে যে, দেশদ্রোহীতার অপরাধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার হবে। এ ব্যাপারে মুজিবনগর সরকারের আহ্বানে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার্থে বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট আহ্বান জানান। কিন্তু সকলের অগোচরে এসময় মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করে। এর প্রক্রিয়া হিসেবে ২৮ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র কনসাল অফিসের রাজনৈতিক কর্মকর্তা মি. পলফ্ মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদের সঙ্গে ৯০ মিনিট স্থায়ী একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনার জন্য মোশতাক আগ্রহ প্রকাশ করেন। বৈঠকের সূত্র ধরে ১৯৭১ সালের ১২ অক্টোবর পলফ্ খোন্দকার মোশতাক আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে আসেন। কিন্তু সেদিন খোন্দকার মোশতাক আহমেদের অনুপস্থিতিতে হাইকমিশনার হোসেন আলীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় এবং এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এ আলোচনায় পলফ্ জানান যে, বাংলাদেশের ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশ প্রতিনিধির সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা করতে রাজি হয়েছেন। পাকিস্তানের মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড এর সঙ্গে এ বিষয়ে ইয়াহিয়া খানের কথা হয়েছে বলে পলফ্ উল্লেখ করেন। হোসেন আলী এ কথা শুনে অনেকটা বিস্মিত হন। পরবর্তীতে তিনি এ সংবাদ মুজিবনগর সরকারকে অবহিত করেন।[২৯]

এ এইচ মাহমুদ আলী, এনামুল হক ও বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী প্রত্যেক দিন জরুরি ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মিসেস মাহমুদ আলী সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণের ব্যাপারে সাহায্য করেন। কয়েকদিনের মধ্যে তারা নরওয়ে, সুইডেন, মিশর, ইরাক, ইরান, জর্ডান, সিরিয়া, লিবিয়া, আলজেরিয়া, সৌদি আরব, ফিলিপাইনস ও আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উল্লেখ্য, এপ্রিলে-মে মাসে মুজিবনগর সরকার ও ভারত সরকার মুসলিম দেশগুলোকে বাংলাদেশে সংঘটিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতা সম্পর্কে অবহিত করে বাঙালির প্রতি সহায়তার আহ্বান জানায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এপ্রিল মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের বাংলাদেশে আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগে পাকিস্তানের ওপর চাপ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে তারবার্তা পাঠান। মুজিবনগর সরকার ২৬-২৮ মে পর্যন্ত বিশেষ দূত আবু সাঈদ চৌধুরীকে নিউইয়র্কে মিশর, জর্ডান, ইরাক, ইরান, লিবিয়া ও সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠকের দায়িত্ব দেন। তিনি এসব দেশের দূতদের সঙ্গে বৈঠক করলেও কোনো ইতিবাচক সাড়া

[২৮] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯১

[২৯] Enayetur Rahman and Joyce L. Rahman, *Bangladesh Liberation War and Nixon White House*, 1971, Dhaka: Pustaka, 2000. p. 224

পাননি।[৩০] মুক্তিযুদ্ধকালীন নরওয়ের রাষ্ট্রদূত মি. হ্যামব্রো জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি রেডক্রসের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। সহানুভূতির সঙ্গে তিনি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও তাঁর সহকর্মীদের বক্তব্য শুনেন। মি. হ্যামব্রোর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এ এইচ মাহমুদ আলী বিচারপতি চৌধুরীর সহযোগী হিসেবে ছিলেন।[৩১] এ সময় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী যে কয়েকদিন নিউইয়র্কে ছিলেন মাহমুদ আলী সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মাহমুদ আলী সকালে বিচারপতি চৌধুরীর কাছে যেতেন এবং সকল কাজ শেষে রাতে তাঁকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বাসায় ফিরে যেতেন। যে কয়েকদিন বিচারপতি চৌধুরী ছিলেন এভাবেই মাহমুদ আলী কাজ করেছেন।[৩২]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায় করার জন্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নরওয়ের রাজধানী স্টকহোমে যান। সেখানে তিনি নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক গুনার মীরডালের সঙ্গে দেখা করেন। সুইডেনের বাঙালি কূটনীতিক আবদুর রাজ্জাক এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন।[৩৩]

অক্টোবর মাসের শেষ দিকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আর্জেন্টিনাস্থ পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমেনকে নিয়ে লন্ডনের একটি হোটেলে মরিশাসের কৃষি মন্ত্রী স্যার আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অবশ্য কয়েকমাস আগে লন্ডনে তাঁর সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীর প্রথম বারের মতো সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে সাক্ষাতে বিচারপতি চৌধুরীকে বলেছিলেন পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদের ব্যাপারে তিনি সম্মতি দিতে পারেন না। দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎকালে বিচারপতি চৌধুরী আবদুল মোমেনকে কথা বলার সুযোগ দেন। আবদুল মোমেন মরিশাস কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে সমর্থনদানের জন্য আবদুর রাজ্জাককে অনুরোধ করেন। আবদুল মোমেনের বক্তব্য শোনার পর আবদুর রাজ্জাক বলেন- 'পাকিস্তান ভেঙ্গে দেওয়া ঠিক হবে না। অতীতের অন্যায় ক্ষমা করে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে।'[৩৪]

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সফর করার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে ট্রেনযোগে ওয়াশিংটন সফরে যান। ৪ আগস্ট স্থানীয় পাকিস্তান দূতাবাস থেকে একযোগে পদত্যাগকারী বাঙালি কূটনীতিকগণ রেলওয়ে স্টেশনে প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানান। ওয়াশিংটনে নিয়োজিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম আর সিদ্দিকী প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সম্মানার্থে একটি সান্ধ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে দু'একটি দেশের দূতাবাস ছাড়া অন্য সকল দূতাবাসের প্রতিনিধিরা অনুপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের উচ্চপদস্থ অফিসার মি. কনস্টেবলের সঙ্গেও বাংলাদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আলোচনাকালে তিনি বলেন, পাকিস্তান সরকার ও মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। এই বৈঠকে শেখ মুজিবের যোগদান সম্পর্কে বিচারপতি চৌধুরীর এক প্রশ্নের জবাবে মি. কনস্টেবল বলেন, এই পর্যায়ে

[৩০] এএস এম সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৫। পৃ. ৬১৭

[৩১] আবদুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী*, ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৭। পৃ. ৬৩

[৩২] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, ঢাকা: ইউপিএল, সপ্তম মুদ্রণ ২০১৬। পৃ. ৪১

[৩৩] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

[৩৪] ওই, পৃ. ১৭৪

অংশ না নিয়ে শেখ মুজিব পরবর্তী আলোচনায় যোগদান করতে পারেন। বিচারপতি চৌধুরী তৎক্ষণাৎ আসন থেকে ওঠে তাঁর ফেল্ট হ্যাট ও ওভারকোট হাতে তুলে নিয়ে বলেন, শেখ মুজিব ছাড়া অন্য কারও পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে আলোচনা করার অধিকার নেই।[৩৫]

ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলো সফর করেন। তাঁর এই সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থী ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি। ওয়াশিংটনে ইন্দিরা গান্ধী পৌঁছেন ৪ নভেম্বর। এখানে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। ইন্দিরার সঙ্গে নিক্সনের উত্তেজনাপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং কিসিঞ্জারের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, নিক্সন ইন্দিরাকে that woman বলে সম্বোধন করেন। তবে পরবর্তীকালে রিচার্ড নিক্সন ও তার মন্ত্রিসভার এক সহকর্মীর মধ্যেকার টেলিফোনের কথোপকথন প্রকাশিত হয়। যার মূল বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। সেখানে নিক্সন ইন্দিরা গান্ধীকে ইসরায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গোল্ডমেয়ারের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তুলনা করেন। ৬ নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধী কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন- I am congratulated on my great majority. But it was nothing compared to the majority which Sheikh Mujibur Rahman gained in the election in Pakistna.[৩৬] অবশ্য ৫ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠক শেষে বাংলাদেশে মিশনের সবাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ব্লেয়ার হাউসে দেখা করেন। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগকারী বাঙালি কূটনীতিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারে ইন্দিরা গান্ধী বাঙালি কূটনীতিকদের কিছু বলেননি। কিন্তু তাদের সবাইকে উৎসাহ দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের কাজ ও সাহসের জন্য ধন্যবাদ দিয়েছেন।[৩৭] তাদের সঙ্গে সেদিন এনায়েত করিমও ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এনায়েত করিম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়ার পর সেদিনই প্রথম বাংলাদেশ মিশনে এসেছিলেন। এসেই তিনি সকলের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান।[৩৮]

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সুইজারল্যান্ডের বার্নে পাকিস্তান দূতাবাসে নিযুক্ত দ্বিতীয় সচিব ওয়ালিউর রহমান তাঁর করণীয় সম্বন্ধে জানার জন্য মুজিবনগর সরকার, লন্ডনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও ওয়াশিংটনে শামসুল কিবরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শামসুল কিবরিয়া ওয়ালিউর রহমানকে কিছুদিন অপেক্ষা করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে বলেন। তিনি ওয়ালিউর রহমানকে বাংলাদেশের পক্ষে গোপনে কাজ করতে বলেন। বিশেষ করে সুইজারল্যান্ডের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও বন্ধুদের কাছে বাংলাদেশের ব্যাপারে কথা বলতে বলেন। সুইজারল্যান্ডের ডেপুটি মিনিস্টার এর সঙ্গে ওয়ালিউর রহমানের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ওয়ালিউর রহমান তাঁর সঙ্গে দেখা করে বঙ্গবন্ধুর ওপর

---

[৩৫] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১

[৩৬] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আশফাক হোসেন, আন্তর্জাতিক দলিলপত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৩৩-৩৪, বর্ষ ১৪১৭-১৯। পৃ. ১৮৬-২১১

[৩৭] এ এফ সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬

[৩৮] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬

পাকিস্তানিরা যেন কোনো ধরনের শারীরিক নির্যাতন না চালায় তার অনুরোধ করতে বলেন। সুইজারল্যান্ডের ডেপুটি মিনিস্টার ওয়ালিউর রহমানকে জানান যে, তারা ইতিমধ্যে পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে জানিয়েছে। তিনি ওয়ালিউর রহমানকে আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি অব সুইজারল্যান্ড বা আইসিআরসি'র প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। এসময় ওয়ালিউর রহমান তাঁকে জানান যে, তিনি তখনও পাকিস্তান সরকারের চাকরিতে আছেন। তাই তাঁর পক্ষে আইসিআরসি'র প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করা কষ্টকর হবে। একথার পর তিনি ওয়ালিউর রহমানকে পরদিন তাঁর অফিসে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেন। একই সঙ্গে ভাইস প্রেসিডেন্ট তাঁর অফিসে আইসিআরসি'র প্রেসিডেন্টকেও আমন্ত্রণ জানান। পরদিন ওয়ালিউর রহমান আইসিআরসি'র প্রেসিডেন্টের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে কথা বলেন। আইসিআরসি'র প্রেসিডেন্ট ওয়ালিউর রহমানকে জানান যে, তিনি সব কিছু জানেন। তিনি ওয়ালিউর রহমানকে এ-ও জানালেন যে, বঙ্গবন্ধু মিয়ানওয়ালি কারাগারে বন্দি আছেন এবং আইসিআরসি'র প্রতিনিধি সেখানে গিয়েছিল কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি।[৩৯]

সুইজারল্যান্ডে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি হিসেবে ওয়ালিউর রহমান এসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করার পর ওয়ালিউর রহমান সুইস ইমিগ্রেশনে কূটনীতিক পাসপোর্ট জমা দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতেন। কূটনীতিক পাসপোর্ট জমা দেওয়ার পর সুইস ইনটেলিজেন্সের চীফ ওয়ালিউর রহমানকে জানান যে, তিনি সুইজারল্যান্ডে বাংলাদেশের পক্ষে ঘরোয়াভাবে কাজ করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে যেতে পারবেন। কিন্তু কোনো ধরনের রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে পারবেন না। তারা তাঁকে প্রয়োজনে ফ্রান্সে গিয়ে রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়ার কথা বলেন। সুইস ইনটেলিজেন্সের নির্দেশ মোতাবেক ওয়ালিউর রহমান কোনো ধরনের রাজনৈতিক অধিকার না থাকায় তিনি তাঁর বাড়িতে বিভিন্ন বিদেশি ব্যক্তিবর্গ এবং সুইস সরকারের উচ্চ পদস্থ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানাতেন। নিজের বাড়িতে বসে মিটিং করতেন। এসময় সুইস পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এসব লেখার জন্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করতেন ওয়ালিউর রহমান। এছাড়া সুইজারল্যান্ডের রেডিও-টেলিভিশনের সাংবাদিকদের বাংলাদেশের ওপর লিখতে বলতেন। দুই দিন পর পর ওয়ালিউর রহমান এসব সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।[৪০]

জাপানের পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিকরা বিশেষ করে এস এম মাসুদ ও কমর রহীম বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের পূর্বে প্রকাশ্যে তেমন কোনো কাজ করতে পারতেন না। আনুগত্য পরিবর্তন করার পর তারা প্রকাশ্যে কাজ শুরু করেন। তারা জাপান সরকারকে অনুরোধ জানায় বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। যদিও তারা জানতেন জাপান সরকার সহজে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে না। উল্লেখ্য যে, আনুগত্য পরিবর্তন করার পর কূটনীতিক

---

[৩৯] গবেষকের সঙ্গে ওয়ালিউর রহমান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯

[৪০] গবেষকের সঙ্গে ওয়ালিউর রহমান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯

পাসপোর্ট জমা দিয়ে বাঙালি কূটনীতিকরা জাপান সরকারের সঙ্গে লিয়াঁজো স্থাপন করে তাদের নির্দেশ মতো কাজ করতেন। বাঙালি কূটনীতিকরা জাপানে কী করছেন তা প্রতিনিয়ত জাপান সরকারকে অবহিত করতে হতো। আনুগত্য পরিবর্তন করার পর জাপান সরকার বাঙালি কূটনীতিকদের ৭২ ঘন্টা সময় দেয় জাপান ত্যাগ করার জন্য। কিন্তু মুজিবনগর সরকার থেকে নির্দেশ ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত জাপান সরকার জোরপূর্বক দেশ থেকে বহিস্কার না করে ততক্ষণ জাপানে অবস্থান করা। জাপান সরকারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তারা সে দেশেই অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। এ ব্যাপারে তারা জাপানি বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের মতামত গ্রহণ করেন। বাঙালি কূটনীতিকদের জাপানি বন্ধুরা জাপান ত্যাগ না করে বরং কী ঘটে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করার পরামর্শ দেয়। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ৭২ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরে জাপান সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে টেলিফোনে ৭২ ঘন্টার মধ্যে কেন দেশ ত্যাগ করেনি তা জানতে চায়। এর উত্তরে বাঙালি কূটনীতিক কমর রহীম জানান যে, দেশত্যাগে বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি ব্যতীত তারা জাপান ত্যাগ করতে পারবেন না। জাপান সরকার জানায় যে, তারা বাংলাদেশ সরকারকে মানে না। কিন্তু কমর রহীম জানান যে, তিনি তাঁর সরকারকে মানেন এবং সরকারের অনুমতি ব্যতীত কোথাও যেতে পারবেন না। এরপর জাপান সরকার তাদেরকে আরো দুই দিন সময় দেয়। পাঁচদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের জাপানি বন্ধুরা জাপান সরকারের বিরুদ্ধে রিট করার জন্য আইনজীবী নিয়ে আসেন। এই রিটের ফলে জাপান সরকার বাঙালি কূটনীতিকদের আর বের করে দিতে পারবে না। কিন্তু আইনজীবী জানান যে, যেহেতু জাপানের আইনে কোনো রাজনৈতিক আশ্রয় নেই তাই রিটে হয়তো তারা হেরে যাবেন। তবে রিটের কারণে এ বিচার প্রক্রিয়া দুই বছর পর্যন্ত স্থগিত হয়ে যাবে। এ দুই বছর বাঙালি কূটনীতিকরা নিশ্চিন্তে জাপানে অবস্থান করতে পারবে। কিন্তু দুই বছরের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে তখন তাদেরকে জাপান ছেড়ে চলে যেতে হবে। বাঙালি কূটনীতিকরা এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে রিট করার প্রস্তুতি নেন। অচিরেই এ সংবাদ জাপান সরকার জেনে যায়। জাপানের বৈদেশিক দপ্তরের পরিচালক বাঙালি কূটনীতিকদের ডেকে রিট করতে নিষেধ করেন। কেননা রিট করা মাত্র তার পক্ষে জনমত তৈরি হয়ে যাবে। বৈদেশিক দপ্তরের পরিচালক জানায় যে, তারা বাঙালি কূটনীতিকদের বের করে দিবে না। বরং তাদেরকে জাপানে অবস্থানের জন্য প্রথম পর্যায়ে ৬০ দিন মেয়াদ দেওয়া হবে। সেটি শেষ হলে আবার ৬০ দিন দেওয়া হবে। এভাবে করে তাদের মেয়াদ চলতে থাকবে যতদিন বাংলাদেশ সরকারকে জাপান স্বীকৃতি না দেয়। ৬০ দিন মেয়াদ বৃদ্ধিতে কূটনীতিকদের মৌখিক অঙ্গীকার করতে হয় যে, তারা কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগ দিবে না। কেননা পাকিস্তান জাপানের বন্ধু রাষ্ট্র, পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের কূটনীতিক সম্পর্ক আছে ও জাপানে পাকিস্তানের দূতাবাস আছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধচলাকালীন জাপানের বন্ধুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাবলিসিটি তারা করতে দিবে না। মৌখিকভাবে অঙ্গীকার করলেও বাঙালি কূটনীতিকরা জাপানে অবস্থানকালীন সরাসরি রাজনীতি করেননি। তবে তাদের জাপানি বন্ধুদের দিয়ে ডেমোনেস্ট্রশন, মানববন্ধন, বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন এসব কার্যক্রম চালিয়ে গিয়েছেন। যার অনেকগুলো অনুষ্ঠানে তারা সরাসরি যোগ দিয়েছেন। এতে পাকিস্তানের বাঙালি রাষ্ট্রদূত বৈদেশিক দপ্তরে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। বৈদেশিক দপ্তর অফিস কূটনীতিকদের ডেকে রাজনীতি করার কারণ

জানতে চায়। এতে তারা বলে তারা নিজেরা কিছু করেনি। জাপানিরা প্রতিবাদ মিছিল করেছে, তারা শুধু দেখতে গিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের পক্ষে জাপানি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বর্ণনা কূটনীতিকরা মুজিবনগর সরকারকে জানাতেন। কূটনীতিকরা জাপানের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। জাপানের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের দিয়ে বাংলাদেশ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় লেখানোর চেষ্টা করতেন। জাপানের সবচেয়ে বড় পত্রিকা *আশাই শিম্বুন* মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে অনেকগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। বাঙালি কূটনীতিকরা সম্পাদকীয় লেখার জন্য পত্রিকাগুলোতে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আসতেন বিশেষ করে পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কী ধরনের অন্যায় করছে, কীভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে, কত লোক মারা যাচ্ছে, বাংলাদেশের কী পরিমাণ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ইত্যাদি তথ্য দেওয়া হতো। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে সম্পাদকীয় বিষয় কী হবে তা-ও বলে দিতেন। বাঙালি কূটনীতিকরা জাপানের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সেভাবে যোগাযোগ করতে পারেননি। কারণ তাদের রাজনৈতিক দল সরকার বিরোধী হলেও বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে তারা সকলে ছিল একমত। সরকারের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলতো না। কাজেই জাপানের বিরোধী দলের কাছে গিয়েও কূটনীতিকরা কোনো সমর্থন পাওয়ার আশা করেননি। বরং তারা কমিউনিস্টদের সমর্থন পান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিকসহ অন্যান্য বুদ্ধিজীবী সবাই বাংলাদেশের পক্ষে ছিল। বিশেষ করে অধ্যাপক ড. দারা পঁচিশে মার্চের পর এপ্রিলের শুরুতেই জাপান বেঙ্গল ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি (Japan Bengal Friendship Society) নাম দিয়ে একটি সংগঠন তৈরি করেন। তাঁর সঙ্গে কমর রহীম ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য প্রথম থেকেই বাঙালি কূটনীতিকরা কথা বলেছেন। জাপানিদের তারা বলতেন, পাকিস্তানিদের সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতা করতে হলেও বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া কেউ তা করতে পারবে না। কাজেই পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি আরো জটিল হয়ে ওঠবে। যে কোনো ধরনের জটিল পরিস্থিতির যেন উদ্রেক না হয় সেজন্য বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে হবে। কূটনীতিকরা জাপানিদের দিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে আন্দোলন সংগঠিত করতেন যাতে তা পুরো জাপানে ছড়িয়ে পড়ে। কেননা বাঙালি কূটনীতিকদের টোকিও'র বাইরে যাওয়া নিষেধাজ্ঞা ছিল। উল্লেখ্য যে, নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফিলিপাইনস এর প্রাক্তন বাঙালি রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নী টোকিওতে আসেন। খুররম খান পন্নী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জাপান সরকারকে চিঠি লিখেন।[৪১]

৪.১.খ সভা-সমাবেশ, র‍্যালির আয়োজন ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা

সত্তরের দশকে নিউইয়র্কে পাকিস্তান লীগ নামে সমিতি ছিল। পাকিস্তান লীগের সদস্যরা পূর্ব পাকিস্তান লীগ নামে তাদের সমিতিকে নতুন করে চাঙ্গা করার চেষ্টা করে। যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করা। ১৯৭১ সালের মার্চের শেষে আরেক দফা নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা (Bangladesh League of America)। বাংলাদেশ লীগ তাদের সহকর্মী ও বুদ্ধিদাতা হিসেবে পান ডা. খন্দকার আলমগীর, সৈয়দ

[৪১] গবেষকের সঙ্গে কমর রহীম এর সাক্ষাৎকার, ১৯ মার্চ ২০১৮

আনোয়ারুল করিম (জাতিসংঘ পাকিস্তান স্থায়ী মিশনের উপপ্রধান) এবং আবুল হাসান মাহমুদ আলী (নিউইয়র্ক পাকিস্তান কনসুলেট জেনারেলের ভাইস কনসাল)। পূর্ব পাকিস্তান লীগ ২১ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় বাঙালিদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করে। ২১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান লীগের সভায় যোগ দেওয়ার জন্য ওয়াশিংটন দূতাবাসের ইকনমিক মিনিস্টার এ এম এ মুহিত ও ড. হারুন-অর-রশিদ নিউইয়র্ক যান। নিউইয়র্কে বাঙালিরা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সংগঠিত। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মধ্যে চলমান সংলাপ নিয়ে নিউইয়র্কের বাঙালিরা খুব আশাবাদী ছিলেন না। তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়াই সমীচীন মনে করেন। তারা সমগ্র আমেরিকার বাঙালিদের সংগঠনের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং ওয়াশিংটনকে একটি নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে আহ্বান জানান। এ সভায় বাঙালি কূটনীতিকদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এস এ করিম ছিলেন এর প্রধান উপদেষ্টা ও নিউইয়র্কের ভাইস কনসাল এ এইচ মাহমুদ আলী ছিলেন এই সংগঠনের একজন সক্রিয় কর্মী।[৪২] এ সভার পর ২৩ মার্চ সবাই কূটনীতিক এনায়েত করিমের বাড়িতে সমবেত হয়। এইদিন বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা এবং একটি কেক বানিয়ে নিয়ে আসেন মিসেস আসমা কিবরিয়া। এখানে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা পরিচালনার জন্য একটি সমিতি গঠন করা হয়। এর সভাপতি মনোনীত করা হয় এনায়েত করিমকে এবং সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয় হারুন-অর-রশিদকে।[৪৩] মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পর অর্থাৎ ২৭ মার্চ বিকেলে ওয়াশিংটনের সকল বাঙালি সমাজ এ এম এ মুহিতের বাসায় উপস্থিত হয়। এ সংবাদ যারা পেয়েছেন তারা নিজ উদ্যোগী হয়ে সভায় যোগ দিয়েছেন। এ এম এ মুহিতের মতে, পরিবার পরিজন নিয়ে সেখানে প্রায় ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। সকল বাঙালি কূটনীতিকের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসহ সবাই উপস্থিত হয়। সকলের অভিন্ন দাবি পাকিস্তানি ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিবাদ করতে হবে এবং একে প্রতিহত করার কথা ভাবতে হবে। উদ্যোক্তা হিসেবে এ এম এ মুহিত এ সভায় বলেন- 'আমরা এখন আর পাকিস্তানী নই এবং পাকিস্তানী হায়েনাদের শায়েস্তা করা আমাদের কর্তব্য। প্রবাসে আমরা জনমত গড়ে তুলতে পারি। আমাদের দেশে ত্রাণকার্য এবং যুদ্ধ উদ্যোগের সাহায্য করতে পারি এবং পাকিস্তানকে সর্বতোভাবে অপদস্থ করতে পারি।'[৪৪] সভায় তাক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, মার্কিন ও আন্তর্জাতিক নেতাদের কাছে বার্তা পাঠানো হবে। আরো ঠিক হয় যে, ২৯ মার্চ, সোমবার কংগ্রেসের সিঁড়িতে, বিশ্বব্যাংক ও মুদ্রা তহবিলের সামনে এবং মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে শোভাযাত্রা হবে। পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে কিনা সে বিষয়েও আলাপ-আলোচনা করা হয় তবে তাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দূতাবাসে কর্মরত বাঙালিরা কী দূতাবাস পরিত্যাগ করবেন কিনা তা নিয়েও আলোচনা হয়। এই সভায় একজন বাঙালির পাকিস্তানি স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই সব আলোচনায় খুব স্বস্তি বোধ করছিলেন না। পরবর্তীতে বাঙালি কূটনীতিকরা জানতে পারেন যে, পাকিস্তানি ভদ্রমহিলা সভার বিবরণী এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার পুরো বিষয় পাকিস্তান দূতাবাসে পৌঁছে দেন। তারপরও ওই ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে কূটনীতিকদের সভায় আসতেন কিন্তু তারা

---

[৪২] A M A Muhith, *American Response to Bangladesh Liberation War*, Dhaka: UPL, 1996. p. 388

[৪৩] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৪

[৪৪] ওই, পৃ. ৩৬

কখনো তাঁকে আসতে নিষেধ করেননি। কেননা বাঙালি কূটনীতিকরা জানতেন আমেরিকার মুক্ত মাটিতে এই সব গোয়েন্দাগিরির কোনোই মূল্য নেই। ২৯ মার্চের বিক্ষোভের জন্য কূটনীতিকদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়। এ বিক্ষোভ সমাবেশ সফল করে তোলার জন্য তারা কিছু কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।[৪৫] যেমন-

ক. আমেরিকার সর্বত্র খবর পৌঁছানো। এক্ষেত্রে ঠিক করা হয়, যার যেখানে যোগাযোগ আছে তিনিই সেখানে খবর পৌঁছে দিবেন এবং দলে দলে র‍্যালিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাবেন। এতে উদ্যোক্তা ব্যক্তিরা তাৎক্ষণিকভাবে টেলিফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফজলুল বারি এ কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

খ. বাইরে থেকে যারা বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দিতে আসবেন তারা উদ্যোক্তা যে কোনো ব্যক্তির বাসায় রাত্রিযাপন করতে পারবেন। তাই তাদের বিভিন্ন ঠিকানা বলে দেওয়া হয়।

গ. র‍্যালির জন্য পুলিশের কাছ থেকে অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। এ দায়িত্ব নিজে থেকেই গ্রহণ করেন ফজলুল বারি[৪৬] এবং মাহবুব আলী।

ঘ. চতুর্থ কাজ ছিল বিক্ষোভ সমাবেশ উপলক্ষ্যে স্লোগান, ফেস্টুন, পোস্টার ইত্যাদি তৈরি করা। এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এনায়েত রহিম।

ঙ. সর্বশেষ কর্মপন্থা ছিল বিক্ষোভ সমাবেশের জন্য দাবিনামা বা আপিল প্রস্তুত করা। এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এ এম এ মুহিত ও হারুন-অর-রশিদ।

পাকিস্তান দূতাবাসের কর্মচারী গউসুদ্দিন আহমদ ২৭ মার্চই সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি সোমবারের অর্থাৎ ২৯ তারিখের র‍্যালিতে যোগ দিবেন। তিনি ভালো করে জানতেন যে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন স্বরূপ র‍্যালিতে অংশগ্রহণের অপরাধে পাকিস্তান দূতাবাস তাঁকে শাস্তি প্রদান করবে। গউসুদ্দিন ২৯ তারিখের র‍্যালিতে অংশ নেন। এসময় দূতাবাসে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি ছিলেন বাঙালি। তাকেই গউসের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাষ্ট্রদূত আগা হিলালি নির্দেশ দেন। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি রাষ্ট্রদূতকে জানান যে, গউস হত্যাযজ্ঞের খবরে বিচলিত হয়ে হুজুগের বশে র‍্যালিতে অংশ নিয়েছে এবং এর জন্য সে অনুতপ্ত। এই রকম একটি ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁকে সাবধান করে এবারের মতো ক্ষমা করে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু গউস বুঝে শুনে র‍্যালিতে যোগ দেয় এবং এই ধরনের ব্যাখ্যা দিতে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। এ ঘটনা এ এম এ মুহিতকে জানিয়ে গউস বলেন, একাউন্ট্যান্টের চাকরির জন্য সে মোটেই চিন্তিত না এবং সে ক্ষমা চাইতেও রাজি নয়। ১ এপ্রিল গউসুদ্দিন আহমদকে দূতাবাসের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এ এম এ মুহিতের ভাষায়- 'আমেরিকায় বাঙালিদের উপর পাকিস্তানী আক্রমণের প্রথম শিকার হন গউসুদ্দিন আহমদ।'[৪৭]

---

[৪৫] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭

[৪৬] পড়াশোনা করতে আমেরিকায় আসা সুনামগঞ্জ জেলার লোক এই ফজলুল বারী ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসে একটি ছোটখাট চাকরিও তাঁর ছিল। দ্রষ্টব্য: তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১। পৃ. ১৬৭

[৪৭] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫

২ মে নিউইয়র্কের ১৪৫ ব্লিকার স্ট্রিটে বাংলাদেশ লীগের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় জানানো হয় যে, নিউইয়র্কে নিযুক্ত পাকিস্তানি ভাইস কনসাল এ এইচ মাহমুদ আলীকে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রদান করেছে বাংলাদেশ সরকার। এ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ এইচ মাহমুদ আলী মিশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন।[৪৮]

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় বাঙালি কূটনীতিকদের উদ্যোগেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার জন্য 'আমরা' নামে একটি সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ২৮ মার্চ বিকেলে জাকার্তার পাকিস্তান দূতাবাসে নিযুক্ত অনেক বাঙালি কূটনীতিক আবুল ফজল শামসুজ্জামানের বাসায় সমবেত হন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কূটনীতিক আবুল ফজলের সেকশনের সিদ্দিক আহমেদ ও একরাম আলী, প্রেস সেকশনের নুরুল ইসলাম, ডিফেন্স সেকশনের রুহুল আমিন, আইপেকের সানাউল্লাহ এবং প্রেস কাউন্সেলর আবেদীন। সানাউল্লাহকে কিছুদিন পূর্বে ইসলামাবাদে বদলি করা হয়েছিল। কিন্তু দেশের জটিল পরিস্থিতি দেখে তিনি পশ্চিম পাকিস্তান যেতে সাহস পাচ্ছিলেন না। সানাউল্লাহ সজোরে মুক্তিযুদ্ধের জন্য কিছু করা উচিত বলে রায় দেন। নুরুল ইসলাম ও রুহুল আমিন মতামত ব্যক্ত করে বলেন, প্রকাশ্যে না হলেও গোপনে কাজ করতে হবে। একরাম আলী ও সিদ্দিক আহমদ এর মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও কোনো মন্তব্য করেননি। ওই বৈঠকে যুদ্ধ কৌশল বিশ্লেষণ করে আবেদীন বলেন, এ যুদ্ধে বাঙালির জয় অসম্ভব। কেননা আমেরিকা, চীন পাকিস্তানকে সমর্থন দিবে। রাশিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মৌখিক সমর্থন দিলেও সক্রিয় সাহায্য করবে না। এছাড়া নানা সমস্যায় জর্জরিত ভারত কতটুকু করতে পারবে তা নিয়েও তাদের মধ্যে সন্দেহ ছিল। তার মতে, বাঙালির জন্য এ যুদ্ধ আত্মঘাতী হবে। আবেদীনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আবুল ফজল বলেন, 'যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এখন আপোষ সম্ভব নয়। এ অবস্থায় পিছিয়ে আসলে জাতি হিসেবে ধ্বংস অনিবার্য। বাঁচতে চাইলে সংগ্রাম করতে হবে। তাছাড়া বাংলাদেশ স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।' এদেরকে নিয়ে আবুল ফজল শামসুজ্জামান বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে গোপনে কাজ করার জন্য 'আমরা দল' গঠন করেন।[৪৯] পাকিস্তান সম্পর্কে প্রাথমিক আবেগ ও সমবেদনা কাটিয়ে এপ্রিল মাস থেকে জাকার্তা সরকার সতর্কতার সঙ্গে মন্তব্য করে এবং বিবৃতি দেয়। এ সুযোগে এপ্রিল মাস থেকেই ইন্দোনেশিয়ার বেশ কিছু সাময়িকী, পত্রিকা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে বাংলাদেশ সমস্যাকে তুলে ধরে। ১৫ এপ্রিল জনপ্রিয় *জাকার্তা টাইমস*, *ইন্দোনেশিয়া অবজারভার* বিভিন্ন প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ প্রকাশ করে যাতে বাংলাদেশের গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, বাঙালি দাবির যৌক্তিকতা ফুটে ওঠে। Is Islam Dead শিরোনামে *জাকার্তা টাইমসের* আবেগপ্রবণ নিবন্ধের শেষে মুসলিম বিশ্বের কাছে আবেদন জানানো হয় যে-

> Muslims States should act quickly and see that good muslims Organization should also not be silent spectators in the present situation in East Pakistan but should do whatever is possible within their limited strength to stop the genocide and restore peace in the region.[৫০]

---

[৪৮] আবু সাইয়িদ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা কূটনৈতিক যুদ্ধ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪। পৃ. ১৫০

[৪৯] আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৪

[৫০] *The Djakarta Times*, 15 April 1971

অবশ্য এগুলো রচনা, প্রচারের নেপথ্যে কাজ করেছে জাকার্তার পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংগঠন 'আমরা'। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ইন্দোনেশিয়ায় জনমত সৃষ্টি, গণমাধ্যমে তথ্য সরবরাহ, মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে ইন্দোনেশিয়ায় মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে এ সংগঠন অসামান্য অবদান রাখে।

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে বাঙালি কূটনীতিক আবদুর রাজ্জাক খান জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে একটি গণস্বাক্ষর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এতে বেশ কিছু সংখ্যক স্বনামধন্য লেখক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী অংশগ্রহণ করেন। এমনকি অনেক সংসদ সদস্যও এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। গণস্বাক্ষর কার্যক্রমে সুইডেনের সর্বস্তরের জনগণ বাংলাদেশের প্রতি তাদের সহানুভূতি ব্যক্ত করেন। স্টকহোমের বাইরে জোনকোপিং (Jonkoping) নামক স্থানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়। সুইডেনের পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয় শহর উপসলাতেও (Uposala) বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করা হয়। বাঙালি কূটনীতিক মুজিবনগর সরকারকে আরো জানিয়েছে যে, সুইডেনে বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি গঠন করা হয়েছে যাতে সুইডেনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ সংযুক্ত রয়েছেন। বিশেষ করে সুইডেনের প্রখ্যাত সাংবাদিক থমাস হ্যামারবুর্গ (Thomas Hammarborg) বাংলাদেশের পক্ষে সাধারণ মানুষের জনমত আদায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কাজ করছেন।[৫১]

১৭ অক্টোবর পাটনাতে All-India Anti Communal Convention এর একটি র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়। পাটনার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিহারের গভর্নরের এডিসি কারপুনী ঠাকুর র‌্যালিতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বাঙালি কূটনীতিক হোসেন আলীকে আমন্ত্রণ জানান। হোসেন আলী সেখানে ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক বিষয় তুলে ধরে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা তিনি নিজেই লিখেছিলেন। তাই যা বলতে চেয়েছেন বলে নিজের মনে সন্তুষ্টি ছিল। এছাড়া হোসেন আলী ১৮ অক্টোবর বিহার রিলিফ কমিটি আয়োজিত সভায়ও বক্তৃতা করেন। ১৯ অক্টোবর হোসেন আলী বিহারের গভর্নরের নিকট মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের গরম কাপড় কেনার জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়ে একটি চিঠি লিখেন। ২৪ অক্টোবর হোসেন আলী নেতাজী সুভাষ বসুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ৩১ অক্টোবর হোসেন আলী ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি আয়োজিত বাংলাদেশ ইস্যু কনভেনশনে যোগ দেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বক্তৃতা প্রদান করেন।

৪.১.গ সভা-সমাবেশে বক্তৃতা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়, গণহত্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য উপস্থাপন, বঙ্গবন্ধুর বন্দি ও সর্বোপরি ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীর মানবেতর জীবন এসব বিষয়ে জনমত গড়ে তুলতে বাঙালি কূটনীতিকরা শুরু থেকেই সচেষ্ট ছিলেন। কৌশলগত কারণে অনেক বাঙালি কূটনীতিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বিলম্ব করলেও গোপনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন। বিশেষ করে এই কাজগুলো সম্পন্ন করার ব্যাপারে সবাই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম ছিল বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে

---

[৫১] Sukumar Biswas edited, *Bangladesh Liberation War Mujibnagar Government Documents 1971*, Dhaka: Mowla Brothers, 2005. p. 24

বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলা এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ও বাস্তব চিত্র তুলে ধরা। এক্ষেত্রে সাধারণত নেতৃস্থানীয় বাঙালি কূটনীতিকরা বেশি জোরালো ভূমিকা পালন করেছেন। তবে এদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন এম এ মুহিত, সৈয়দ আনোয়ারুল করিম, এনায়েত করিম, শামসুল কিবরিয়া, মহিউদ্দিন আহমদ, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, কে এম শিহাবুদ্দিন, এম হোসেন আলী প্রমুখ।

২০ মে বেহালা রোটারি ক্লাব আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলী বলেছেন বাংলাদেশ পাকিস্তানি সৈন্য মুক্ত হলেই শরণার্থীরা সেখানে ফিরে যাবেন। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্ট বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য যে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তা থেকেই বাংলাদেশের অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বোঝা যায়। হোসেন আলী তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতার কথা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছেন- ভারত যদিও বাংলাদেশে অস্ত্র দেয়নি, তবু তার সাহায্য ও নৈতিক সমর্থন তাদের প্রেরণা দিয়েছে। ভারত সরকার লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে মানব প্রেমের যে প্রমাণ দিয়েছেন তা তুলনাহীন। বাংলাদেশের মানুষ জানে, তাদের দুঃসময়ে অন্তত একটি আশ্রয়ের স্থান আছে এবং তা হল ভারত।[৫২] ১৫ জুলাই ভারত সরকারের ফিল্ম ও প্রচারণা বিভাগ আয়োজিত 'Bangladesh- a challenge to the World conscience' শিরোনাম তিনদিন ব্যাপী একটি সিম্পোজিয়াম ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বাংলাদেশের কলকাতা দূতাবাসের প্রধান হোসেন আলী এই সিম্পোজিয়ামে যোগ দেন এবং সিম্পোজিয়ামের উদ্‌বোধন ঘোষণা করেন। ২০ জুলাই হোসেন আলী কলকাতার একটি জনসভায় যোগ দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তথাকথিত বিচার বন্ধের দাবি জানান। এ জনসভায় শ্রোতাদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি সম্বলিত শ্লোগান উচ্চারিত হয়। ২৮ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠন এর উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারভাঙ্গা হলে দিনটিকে 'মুজিব মুক্তি দিবস' পালন করে। এই দিন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে একশত'রও বেশি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে ইয়াহিয়া খানকে টেলিগ্রাম করে শেখ মুজিবের তাৎক্ষণিক ও শর্তহীন মুক্তি দাবি করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সভায় হোসেন আলী বক্তৃতা করেন। হোসেন আলী বক্তৃতায় বলেন, শুধুমাত্র ইয়াহিয়া খানকে টেলিগ্রাম করলে হবে না, তাকে কাগজের ঝুড়িতে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে প্রতিরোধ করার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকটও টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। কলকাতায় নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো আয়োজিত এক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে বাংলাদেশ মিশন প্রধান হোসেন আলী বলেন- ভারতের স্বাধীনতার জন্য নেতাজী যে যুদ্ধ করেছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমান সেই পথেই বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন শুরু করেছেন। নেতাজীর ঐতিহাসিক অভিযান বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণার উৎস। বাংলাদেশের মুক্তিকামীদের ওপর যে বর্বর অভিযান ও আক্রমণ চলেছে, ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার উৎপীড়নকেও তা হার মানিয়েছে। সারা ভারতের মুক্তির জন্য নেতাজী যে স্বাধীনতার মশাল জ্বেলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু তারই এক অংশ বহন করেছেন এবং এই মুক্তি মশাল বাংলাদেশের মানুষ শেষদিন

---

[৫২] *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

পর্যন্ত বহন করবে।[৫৩] ১৭ অক্টোবর পাটনায় আয়োজিত সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কনভেনশন উপলক্ষ্যে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলী বলেছেন- পাকিস্তান সামরিক জান্তার হাত থেকে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ মুক্ত না করা পর্যন্ত সাড়ে সাত কোটি বাঙালি সংগ্রাম করে যাবে। আমাদের দেশ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা পাকিস্তানি সেনাদের খতম করতে সংগ্রাম চালিয়ে যাব। আমরা একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং এই লক্ষ্য নিয়েই আমরা সংগ্রাম পরিচালনা করে চলেছি।[৫৪] ২৫ নভেম্বর হোসেন আলী শিলং এ একটি জনসভায় বক্তৃতা করেন। এখানে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ১০ মিনিট বক্তৃতা করেন। ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর একটি জনসভায় হোসেন আলী বক্তৃতা করেন। জনসভায় তিনি বলেন-

> 'The Ganges, Bhagirathi and Brahmaputra have today met the Padma, Jamuna and Meghna. Standing on the sea shore of this great meeting of hearts we could state it loud & clear that the Bangladesh of Mujib was today an independent & soverign state. The ties of friendship which have been sacrificed by the blood of the Indians would never be broken. The radiant sun which was so long dimmed by the thunder cloud was now dazzling again. At this auspicious hour of the liberation of our country, I would, I said, like to convey our sincere appreciation to the people of India and specially, to their great leader, Mrs. Indira Gandhi. I told them that we would be going back to Bangladesh in a few days' time and so would all our 10 million refugees. But all of us would leave behind a piece of our heart. 'We would never get back the lives we have lost, but what we have got in return we would cherish with the blood or our heart.'[৫৫]

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিক আনুষ্ঠানিক ভাবে কূটনীতিক ফ্রন্টে যুদ্ধ শুরু করেন। এ যুদ্ধের অংশ হিসেবে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে সভা-সমাবেশ ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে বক্তৃতা দিয়েছেন। ২ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অন্ধ্র প্রদেশ উর্দু পিরিওডিক্যালস সংগঠন আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে বক্তব্য রাখেন কে এম শিহাবুদ্দিন। এ সিম্পোজিয়ামে সভাপতিত্ব করেন মইনুল হক চৌধুরী। এই সিম্পোজিয়ামে শিহাবুদ্দিন বলেন-

> Yahya Khan should face an international tribunal for his crimes of genocide, rape, and arson in Bangladesh. I appealed to Muslims everywhere to condemn the un-Islamic and heinous misdeeds of the Yahya Khan regime in Bangladesh on the grounds that Islam did not sanction such killings.[৫৬]

এই সিম্পোজিয়ামে বাংলাদেশের পক্ষে একটি প্রস্তাব তৈরি করা হয়। যেখানে শিহাবুদ্দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি উত্থাপন করেন। সিম্পোজিয়ামের সংবাদ সকল ভারতীয় পত্রিকায় গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। সিম্পোজিয়ামে বঙ্গবন্ধুর বিচার ও মুক্তি সম্পর্কে শিহাবুদ্দিন বলেন-

---

[৫৩] *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
[৫৪] *কালান্তর* (কলকাতা), ১৮ অক্টোবর ১৯৭১
[৫৫] The Diary of Hossain Ali
[৫৬] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 109

> The military junta had not authority to try the president of a sovereign state and that any such trial would be illegal and against all international canons . . . the people of Bangladesh would not forgive anyone who harmed their undisputed leader.[৫৭]

বাংলাদেশের পক্ষে জনমত ও সমর্থন গড়ে তোলার জন্য কে এম শিহাবুদ্দিন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন এবং বিভিন্ন জনসমাবেশে বক্তৃতা দিয়েছেন। অধিকাংশ লোক ইংরেজি বুঝতে সক্ষম না হওয়ায় তিনি হিন্দিতে বক্তৃতা দিতেন। তিনি স্থানীয় অনেক রাজনীতিবিদ ও পেশাদার সংগঠনের সঙ্গেও দেখা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল মুক্তিবাহিনীর জন্য ভারতের সর্বাত্মক সহযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য ভারতের কার্যকর কূটনীতিক উদ্যোগ। এসব বক্তৃতার মধ্যে একটি প্রশ্ন প্রায়ই শিহাবুদ্দিন কে সম্মুখীন হতে হয়েছে যা ভারতীয় রাজনৈতিক দল জনসংঘের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ করতেন। তাদের প্রশ্ন ছিল পূর্ব পাকিস্তান কেন দ্বি-জাতি তত্ত্ব অস্বীকার করছে যার মূল ভিত্তি ছিল ভারত ভাগ এবং পাকিস্তানের সৃষ্টি। এখন বাঙালিরা কেন অসাম্প্রদায়িক ভারতের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। এর উত্তরে শিহাবুদ্দিন বলেছেন- We were fighting for our nationhood and our liberation, not to remain or become part of any other state.[৫৮]

কে এম শিহাবুদ্দিন ভারতের লোকসভার ৯ আগস্টের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। যেখানে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের ব্যাপারে ভারতের উদ্‌বেগ নিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন।[৫৯] (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

দিল্লিস্থ বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্রের প্রধান হিসেবে কে এম শিহাবুদ্দিন মাঝে মাঝে সভার আয়োজন করতেন। এসব সভায় বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং ভারতের কর্তৃপক্ষ ও গণমাধ্যমের লোকজন উপস্থিত থাকতেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম সংসদীয় দলের প্রতিনিধি দিল্লিতে আসেন মে মাসে। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন ফণীভূষণ মজুমদার, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও বেগম নুরজাহান মুরশিদ। এই প্রতিনিধি দল ভারতের সংসদ অধিবেশন চলাকালীন বক্তব্য রাখার সময় ভারতের অনেক সংসদ সদস্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। পাকিস্তানি গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, ধর্ষণ ও লুটপাট সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরায় মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ভারতে ও বিদেশে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরিতে সহায়ক হয়েছিল।[৬০]

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর ৬ এপ্রিল পাকিস্তান দূতাবাসের অর্থনৈতিক কাউন্সেলর এ এম এ মুহিত ওয়াশিংটনের শহরতলী এলাকায় জর্জ মেসন কলেজে এক আলোচনায় বক্তৃতা প্রদানের আমন্ত্রণ পান। কিন্তু সেই মুহূর্তে এ এম এ মুহিতের মানসিক অবস্থা ভালো না থাকায় তিনি তা বাতিল করার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এ কলেজে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করলে তিনি আর বাতিল করেননি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে এ এম এ মুহিত বক্তৃতা করেন। মার্কিন পত্রপত্রিকায় পাকিস্তানি আক্রমণের যে বর্ণনা এতদিন ধরে জেনে আসছিলেন তা-ও তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। বক্তব্য অনুষ্ঠানটি সকাল দশটায় শুরু হয়ে দুপুর পর্যন্ত চলেছে। বক্তৃতা

---

[৫৭] K M Shehabuddin, *ibid*, pp. 109-110
[৫৮] *Ibid*, p. 110
[৫৯] *Ibid*, p. 111
[৬০] *Ibid*, p. 113

শেষে অনেকেই এ এম এ মুহিতকে দুটি প্রশ্ন করেন। প্রথমত- তিনি কী তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কোনো খবর জানেন এবং দ্বিতীয়ত- তারা কী কোনো উপায়ে দুস্থদের জন্য অর্থ সাহায্য দিতে পারে? দুইটি প্রশ্নে মুহিতের উত্তর ছিল নেতিবাচক।[৬১] ২৭ আগস্ট লস এঞ্জেলসে বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশনের সভায় বক্তৃতা করেন এম আর সিদ্দিকী ও এ এম এ মুহিত। এরপর তারা ডেভিস ক্যাম্পাস, সানফ্রান্সিসকোতে সভা ও সংবাদ সম্মেলন, ডেনভারে বক্তৃতা করেন। ১২-১৩ সেপ্টেম্বর পিটসবার্গে লাট্রোর বেনেডিক্টাইন কলেজে বিল ম্যাকুলক এক বক্তৃতার আয়োজন করেন। এখানে বাঙালি কূটনীতিক এ এম এ মুহিত বক্তৃতা করেন। ১৭ সেপ্টেম্বর ফিলাডেলফিয়া ডেলাওয়ার উপত্যকার বাংলাদেশ লীগ ও ফ্রেন্ডস অব ইস্ট বেঙ্গলের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক নৈশভোজেও এ এম এ মুহিত বক্তৃতা করেন। বক্তব্যের বিষয় ছিল ছয়দফার উদ্ভব এবং মুক্তিযুদ্ধের সূচনা। ২৩ সেপ্টেম্বর কোঅপারেটিভ ফোরাম নামে একটি সংস্থার উদ্যোগে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তান সংকট নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বাঙালি কূটনীতিক এ এম এ মুহিত ও আবু রুশদ বক্তৃতা করেন। ওয়াশিংটনের কেনেডি স্কুলের মাসিক বৈঠকে বক্তা হিসেবে এ এম এ মুহিতকে আমন্ত্রণ জানান ড. জনসন। ৭ অক্টোবর জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় পাকিস্তানের বিভক্তি ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইয়াহিয়ার উপাখ্যান বিষয়ে বক্তৃতা করেন এ এম এ মুহিত। ১৩ অক্টোবর নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রুকলিন ক্যাম্পাসে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। ফকির শাহাবুদ্দিনের নির্দেশে এ এম এ মুহিত ও ফণীভূষণ মজুমদার সে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। একই সময়ে ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও গীর্জা কাউন্সিলের উদ্যোগে একটি টিচইন প্রোগ্রামের সমাপনী নৈশভোজে বাংলাদেশের খাদ্য সংকট নিয়ে বক্তৃতা করেন এ এম এ মুহিত। ২০ অক্টোবর ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পাবলিক বক্তৃতায় পাকিস্তানিদের দ্বারা ধ্বংস, হত্যাযজ্ঞ ও বাঙালি বিতাড়ন নিয়ে বক্তৃতা করেন এ এম এ মুহিত। ২১ অক্টোবর রেডিও টেলিভিশনের প্রোগ্রামে বক্তৃতা করেন। ২৬ অক্টোবর ওয়াশিংটনের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়েও এ এম এ মুহিত বক্তৃতা করেন। এ অনুষ্ঠানে সকলের প্রশ্ন ছিল পাকিস্তান কী সত্যি সত্যি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে?[৬২] ১১ নভেম্বর এম এ মুহিত ওয়াশিংটনের বাল্টিমোরের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের এডভান্সড স্টাডিজ সেন্টারে এশিয়ার সংকট নিয়ে বক্তৃতা করেন।[৬৩] ২ ডিসেম্বর এম এ মুহিত ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বার এসোসিয়েশনে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল বাংলাদেশ সংকট কী উপমহাদেশীয় যুদ্ধে পরিণত হবে?[৬৪] ৬-১০ ডিসেম্বর আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স ইন্সটিটিউট (World Affairs Institute) চারদিনের একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল বিশ্বে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা। সেখানে ৭ ডিসেম্বর এ এম এ মুহিত পাকিস্তানে সামরিক একনায়কতন্ত্র শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন।[৬৫]

---

[৬১] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫
[৬২] ওই, পৃ. ১৪২-১৪৫
[৬৩] ওই, পৃ. ১৬৮
[৬৪] ওই, পৃ. ১৭৫
[৬৫] ওই, পৃ. ১৭৬

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হাইকমিশনার এম আর সিদ্দিকী বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ ও বক্তৃতা অব্যাহত রাখেন। টরেন্টোতে একটি সম্মেলনে এম আর সিদ্দিকীর সঙ্গে এ এম এ মুহিত রিসোর্স পারসন হিসেবে যোগ দেন। শামসুল কিবরিয়া এবং আবু রুশদও মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতেন। এছাড়া আবু রুশদ দৈনিক পত্রিকায়ও চিঠি ছাপাতেন।[৬৬]

এমআইটি'র রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ইথেল ডি লা সোলাপুল বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতাদানের জন্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানায়। এ আমন্ত্রণে বিচারপতি চৌধুরী ও এ এইচ মাহমুদ আলী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অতিথি হিসেবে সেখানে যান। তাদের কাছ থেকে মি. সোলাপুল ও অন্যান্য বিভাগের শিক্ষকরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে অকাট্য যুক্তি ও তথ্য সংগ্রহ করেন।[৬৭]

১২ ডিসেম্বর বিকেলে লন্ডনের হাইড পার্কে একটি গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে প্রায় পনেরো হাজার বাঙালি সমবেত হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বীকৃতি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করে। এ গণসমাবেশে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা রেজাউল করিম। সমাবেশ শেষে বাঙালিরা মিছিল সহকারে ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের অনুরোধ সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানানো হয়। *দি গার্ডিয়ান* পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে এই মিছিলকে Victory Parade বলে অভিহিত করা হয়।[৬৮]

২৪ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সলিডারিটি ক্যাম্পেইনের উদ্যোগে ইংল্যান্ডের সেন্ট অ্যালবান্সে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বাংলাদেশ মিশনের রাজনৈতিক সেক্রেটারি মহিউদ্দিন আহমদ বক্তৃতা করেন।[৬৯] ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী লন্ডন সফর করেন। তাঁর লন্ডন অবস্থানকালে ৩০ অক্টোবর স্টিয়ারিং কমিটির উদ্যোগে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবিতে হাইডপার্কে একটি সমাবেশ ও গণমিছিলের আয়োজন করা হয়। এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, আর্জেন্টিনার সাবেক রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমেন, লন্ডনের বাঙালি কূটনীতিক রেজাউল করিম। এ সমাবেশে বক্তাগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সরকার ও জনগণের সমর্থন এবং উদ্‌বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতির জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে শীঘ্রই স্বীকৃতি দানের জন্য আহ্বান জানান।[৭০] ৬ নভেম্বর ইউনাইটেড এ্যাকশন বাংলাদেশ এর উদ্যোগে কনওয়ে হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বক্তৃতা করেন স্থানীয় বাংলাদেশ মিশনের এম এম রেজাউল করিম ও আর্জেন্টিনাস্থ পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমেন।[৭১] ২৭ নভেম্বর লন্ডনের কনওয়ে হলে United Action Bangladesh আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে

---

[৬৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯
[৬৭] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০
[৬৮] *ওই*, পৃ. ২০৪-২০৫
[৬৯] ফারুক আহমদ, *সাপ্তাহিক জনমত মুক্তিযুদ্ধের অনন্য দলিল*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৬। পৃ. ১৮৯
[৭০] খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে বিলাত-প্রবাসীদের অবদান*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৮। পৃ. ৬২
[৭১] ফারুক আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫

বাংলাদেশ মিশনের রাজনৈতিক সেক্রেটারি এম এম রেজাউল করিম নিউইয়র্ক থেকে প্রেরিত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বাণীর কথা উল্লেখ করেন। দেশের যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিচারপতি চৌধুরী ইংল্যান্ড থেকে দেশে কিছু চিকিৎসক পাঠাবার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন বলে রেজাউল করিম প্রকাশ করেন। এ সমাবেশে আরো বক্তব্য প্রদান করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ আর মল্লিক ও বাংলাদেশের এমপিএ ফকির শাহাবুদ্দিন।[৭২]

সুইজারল্যান্ডের পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিক ওয়ালিউর রহমান বার্নে বেশ কয়েকটি সমাবেশে যোগ দিয়েছেন, বক্তৃতা করেছেন। সুইস পার্লামেন্টের সামনে একটি সমাবেশ হয়েছিল। সে সমাবেশে প্রায় দশ হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। এ সমাবেশে ওয়ালিউর রহমান বক্তৃতা করেছেন।[৭৩] পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য পরিবর্তনের দুইদিন পর অর্থাৎ ৪ নভেম্বর সুইজারল্যান্ডে কিশোর-কিশোরীদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ওয়ালিউর রহমানকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ওয়ালিউর রহমান কিশোর-কিশোরীদের সমাবেশে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চিত্র তুলে ধরে বক্তৃতা করেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে এরকম একটি সমাবেশ আয়োজন করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান।[৭৪]

৪.১.ঘ গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদান

কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রধান হিসেবে এম হোসেন আলী শুরু থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ে গণমাধ্যমকে অবহিত করতেন। তিনি ২০ এপ্রিল বিদেশি গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। যেখানে নিজস্ব মূল্যায়নে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির চিত্র সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। হোসেন আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর পাকিস্তান সরকার অভিযোগ উত্থাপন করে যে, কলকাতাস্থ দূতাবাসের সকল বাঙালিদের জোরপূর্বক আটকে রেখে তাদের আনুগত্য আদায় করা হয়েছে। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও পাকিস্তান কূটনীতিক ষড়যন্ত্র শুরু করে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সুইজারল্যান্ড সরকারের মধ্যস্থতায় দুই পক্ষকে মুখোমুখি বসিয়ে সঠিক বিষয়টি জানার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৮ এপ্রিল সাক্ষাৎকারের তারিখ নির্ধারিত হয়। এম হোসেন আলীসহ ৬৫ জন বাঙালির সাক্ষাৎকার পর্বে অংশ নেন সুইস, পাকিস্তান ও ভারতের প্রতিনিধি। সকল বাঙালি একবাক্যে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের নেতিবাচক মন্তব্য প্রকাশ করে। সাক্ষাৎকার পর্বের পর হোসেন আলী বিশ্ববাসীকে পাকিস্তানের মিথ্যাচার ও তাদের উত্তর জানিয়ে দেওয়ার জন্য সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে হোসেন আলী বলেন-

> I said that the Pakistan allegation regarding the question of the Bengali members of the former Pak. Mission in Calcutta was as ‘lie’. Each member of my staff, I said, categorically answered ‘No’.[৭৫]

---

[৭২] ফারুক আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯-২২০

[৭৩] গবেষকের সঙ্গে ওয়ালিউর রহমান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯

[৭৪] গবেষকের সঙ্গে ওয়ালিউর রহমান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯

[৭৫] The Diary of Hossain Ali

২১ সেপ্টেম্বর কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান এম হোসেন আলী ভারতের *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। এই সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার প্রশ্নে বলেন-

> . . . there could be no negotiations for a political settlement on the Bangladesh issue before complete withdrawal of West Pakistani troops & relese of Sheikh Mujibur Rahman. I also asserted that after a million people have been killed & 9 million had suffered so much, it was impossible to restore the status quo ante. 'We will not accept any shady deal,'[৭৬]

আগস্ট মাসে অধ্যাপক এ আর মল্লিক, অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সঙ্গে দিল্লিস্থ বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্রের প্রধান কে এম শিহাবুদ্দিন দিল্লি প্রেসক্লাবে ভারত ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন। যেখানে অধ্যাপক মল্লিক ও আনিসুজ্জামান পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার সংবাদ তুলে ধরেন।[৭৭] ৭ সেপ্টেম্বর দিল্লির প্রেসক্লাবে এক ভাষণে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান কে এম শিহাবুদ্দিন বলেছেন যে, বাংলাদেশের শতকরা আশি ভাগ এখন গেরিলাদের হাতে। হানাদাররা ক্রমশ তাদের গর্ত ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ করছে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্যে এখন চাপ সৃষ্টি করা উচিত। বঙ্গবন্ধুর নিঃশর্ত মুক্তি, সৈন্য প্রত্যাহার দাবির কথাও তিনি ব্যক্ত করেন।[৭৮] তবে এর পূর্বে ৩ জুলাই নয়াদিল্লির বাংলাদেশ মিশনের প্রেস এটাচি হিসেবে আমজাদুল হক এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। এ বক্তৃতায় আমজাদুল হক বলেন-

> . . . Switched over his allegiance to the Bangladesh Government three months ago recalled that the Prime Minister of Bangladesh Government, Mr. Tajuddin Ahmed at the time of installation of his Government said that Pakistan was dead and burried under a mountain of corpses. The statement he issued on the tortuous negotiations which led to the declaration of independence of Bangladesh supports Mr. Ahmed's conclusion. It is a story of treachery, duplicity, negation of democracy throughout on the part of Yahya, Bhutto and their agents of West Pakistan military regime. At no time throughout the negotiations there was any intention on their part to preserve the unity of Pakistan on the basis of respect for democratic rights. It was planned genocide, planned destruction of democracy and planned suppression of peoples will.
> There has rarely been such cold-blooded murder of democracy. But Bangladesh, built of the blood of thousands of martyrs, can never be undone by the Timurs of West Pakistan. It has come to stay. There is no power which can undo it. . .[৭৯]

অবশ্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ৬ এপ্রিল আনুগত্য প্রকাশ করার সময় আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন কে এম শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক। তাঁদের এই সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল দিল্লির নিজামউদ্দিন এলাকায় অবস্থিত লোদী হোটেলে। এখানে তাঁরা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার কারণ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী হবে তা ভারতীয় ও

---

[৭৬] The Diary of Hossain Ali
[৭৭] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 114
[৭৮] শওকত ওসমান, ১৯৭১ *স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর*, ঢাকা: বিউটি বুক হাউস, ১৯৯২। পৃ. ৭৩-৭৪
[৭৯] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পুনর্মুদ্রণ ২০১১। পৃ. ৭৫০-৭৫২

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কাছে ব্যক্ত করেন। ৮ এপ্রিল ভারতীয় টেলিভিশন নেটওয়ার্ক দূরদর্শনে সাক্ষাৎকার আকারে শিহাবুদ্দিনের বক্তব্য প্রচারিত হয়েছিল। পরদিন তা সকল গণমাধ্যমে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। দিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের একজন দ্বিতীয় সচিব ও অপরজন প্রেস এটাচি হিসেবে কর্মরত থাকায় ভারতের অনেক গণমাধ্যম এবং ভারতে অবস্থিত বিদেশি অনেক গণমাধ্যমের সঙ্গে এই দুই জনের ভালো যোগাযোগ ছিল। এছাড়াও সাংবাদিক মহলে তাদেরকে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে সহায়তা করেছেন ভারতীয় সাংবাদিক দিলীপ মুখার্জী। শিহাবুদ্দিন সহজেই ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমের অফিসে যাতায়াত করতে পারতেন। বিশেষ করে ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআই, ইউএনআই, সর্ব ভারতীয় রেডিও, ভারতীয় টেলিভিশন দূরদর্শন ছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে। বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী শিহাবুদ্দিনের বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে এসব গণমাধ্যম প্রচার করতো। এছাড়া এসব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক, কূটনীতিক প্রতিনিধি, সিনিয়র রিপোর্টার ও কলাম লেখকরাও শিহাবুদ্দিনের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্যের ব্যাপারে যোগাযোগ করতেন। এমনকি তাদের নিজস্ব অনুসন্ধানে বাংলাদেশ সম্পর্কিত কোনো নতুন তথ্য জানলে তারা এটি শিহাবুদ্দিনকে জানাতেন। এসব সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন *ইন্ডিয়ান টাইমস* এর দিলীপ মুখার্জী, ইন্দার মালহোত্রা ও সুভাষ চক্রবর্তী, *মেইনস্ট্রিম* পত্রিকার নিখিল চক্রবর্তী, *আসাম ট্রিবিউনের* জে এন দেব, *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে*র রঞ্জিত রায়, সুনীল বসু, *আনন্দবাজার পত্রিকা*র সুকুমার দত্ত, *অমৃতবাজারে*র হাজেন দাস ও *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে*র পৃথ্বিশ চক্রবর্তী।[৮০] এছাড়াও কে এম শিহাবুদ্দিন গণমাধ্যমকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রেস রিলিজ দিতেন। এসব প্রেস রিলিজে উল্লেখ থাকতো পাকিস্তানিদের অপপ্রচার সম্পর্কে তথ্য, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত গণহত্যা বন্ধে আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা।[৮১]

মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নিউইয়র্ক যান। সেখানে পৌঁছার পর নিউইয়র্ক এর বাংলাদেশ মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এ এইচ মাহমুদ আলী বিচারপতি চৌধুরীকে তরুণ আইনজীবী রিচার্ড জিফের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। রিচার্ড জিফ বিচারপতি চৌধুরীর কয়েকটি টিভি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। এই সাক্ষাৎকারগুলো যথাসময়ে প্রচারিত হয়।[৮২] নিউইয়র্ক পৌঁছার পরদিন মাহমুদ আলী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে জাতিসংঘে অবস্থিত আন্তর্জাতিক প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ডা. যোগেন্দ্র কুমার ব্যানার্জীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। মি. ব্যানার্জী বিচারপতি চৌধুরী ও মাহমুদ আলীকে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অবস্থিত তাঁর অফিসে নিয়ে যান। তিনি সেদিনই কয়েকজন আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান সাংবাদিকের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। *নিউইয়র্ক টাইমস* এর সংবাদদাতা বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারের এক কলামব্যাপী বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইউরোপ ও অন্যান্য মহাদেশের কয়েকজন সাংবাদিকও তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।[৮৩]

---

[৮০] K M Shehabuddin, *ibid*, pp. 108-109
[৮১] *Ibid*, pp. 105-106
[৮২] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
[৮৩] *ওই*, পৃ. ৬৩-৬৪

ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং বা এনবিসি এর কমেন্টস এবং ক্রনোলগ প্রোগ্রামে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষ প্রচার হয়। ২৭ জুলাই কমেন্টস প্রোগ্রামে এ এম এ মুহিত আধাঘন্টাব্যাপী Why I Quit শিরোনামে বক্তব্য রাখেন এবং তা ১ আগস্ট প্রচার করা হয়। ক্রনোলগ ছিল ২৬ নভেম্বরে বাংলাদেশ সংকটের ওপর দুই ঘন্টাব্যাপী একটি প্রোগ্রাম।[৮৪] ২ আগস্ট পিবিএস-এর ওয়াশিংটন নিউজ কনফারেন্সে এ এম এ মুহিত বক্তৃতা করেন। একইদিন কানাডীয় রেডিওতেও বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল ইয়াহিয়া সরকারের অবৈধতা এবং বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ। ১২ আগস্ট ওয়াশিংটনের ফক্স টেলিভিশনের পেনোরোমা শোতে বাংলাদেশের ওপর খোলামেলা আলোচনার জন্য এ এম এ মুহিতকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ এম এ মুহিত এই আলোচনায় দুই দেশের বৈষম্য, চিন্তাভাবনার ভিন্ন ধারা, ভাষার প্রার্থক্য এবং গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে কথা বলেন। এ আলোচনায় এ এম এ মুহিতকে প্রশ্ন করা হয়েছিল পাকিস্তানিরা বা রাষ্ট্রদূত কী বাঙালিদের ওপর অত্যাচার করছেন? এর উত্তরে এ এম এ মুহিত বলেছিলেন- বৈষম্যমূলক ব্যবহার নিঃসন্দেহে উপলদ্ধি করা যেত কিন্তু বিষয়টি ছিল আরো ব্যাপক ও গুরুতর। পাকিস্তান একটা জাতিকে হত্যা ও একটি দেশকে ধ্বংসে লিপ্ত ছিল। সেখানে সকল বাঙালিই ছিল নিষ্পেষিত ও পদদলিত। সুতরাং ওয়াশিংটনে বাঙালি কূটনীতিকরা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সহাবস্থান করছে কি না সে প্রশ্ন ছিল নিতান্ত গৌণ।[৮৫]

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বেই নিজ উদ্যোগে বাংলাদেশের সমর্থনে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে সাক্ষাৎকারের জন্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বিচারপতি চৌধুরী ছিলেন ইউরোপে মুজিবনগর সরকারের নিয়োজিত একমাত্র মুখপাত্র। তাই সংবাদ মাধ্যমগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলার জন্য বিচারপতি চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানায়। মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে বিচারপতি চৌধুরী ইউরোপ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে জনমত প্রচারের কাজের সময় ইংল্যান্ডে বাংলাদেশের মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করেন বাঙালি কূটনীতিক এম এম রেজাউল করিম। তিনি ছিলেন লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। যদিও তিনি বাংলাদেশের সরকারের প্রতি আনুগত্য পরিবর্তনে কিছুটা বিলম্ব করেন। কিন্তু বিচারপতি চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একজন সিনিয়র অফিসার হিসেবে যে কাজ করেছেন তা ছিল প্রশংসনীয়। বিচারপতি চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে তিনি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারকালে পাকিস্তানের সমর্থক ব্যারিস্টার আব্বাস আলীকে যেভাবে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে মোকাবিলা করেছেন তা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনে সহায়ক হয়েছে।[৮৬]

দিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ইতালির এক টেলিভিশনকে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। এতে তিনি বলেন যে, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিলে বাংলাদেশ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান এখনো

---

[৮৪] সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০২। পৃ. ৩৬৯

[৮৫] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১

[৮৬] শেখ আবদুল মান্নান, *মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান*, ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ১৯৯৫। পৃ.৭৩

সম্ভব। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের নীতি হচ্ছে শান্তি। দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বলেন, 'পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশ সম্ভব নয়।' ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্টকে পাকিস্তান-ভারত সফরে আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বলেন, ইয়াহিয়া খান এখন শান্তির কথা বলছেন। কারণ ভারতের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়ার পরিকল্পিত হঠকারিতা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এখন তিনি বুঝতে পারছেন এতে তার নিজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। বাঙালিরা স্বাধীনতা অর্জনে ওয়াদাবদ্ধ। এরই জন্য বাঙালিরা লড়াই করছে এবং বাঙালিরা পাকিস্তান বাহিনীকে লাথি মেরে বাংলাদেশ থেকে তাড়াবে। সাক্ষাৎকারে মুক্তিবাহিনীর সংগঠন সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি অধিবাসীর মধ্য থেকে মুক্তিবাহিনীর লোক সংগ্রহ করা হয়। এখন পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর মুক্তিবাহিনীর চরম আঘাত হানার মতো ক্ষমতা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্ত অঞ্চলে মুক্তিবাহিনী ট্রেনিং নিচ্ছে এবং মুক্তিবাহিনীর সদস্য সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। এমনকি প্রচুর সংখ্যক যুবক মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার অপেক্ষায় আছে। শরণার্থীদের মধ্য থেকে মুক্তিবাহিনীর লোক সংগ্রহ করা হয় কি না এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বাঙালিমাত্রেই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে উদগ্রীব। বাঙালিরা সবাই মুক্তিবাহিনীর সদস্য।[৮৭] হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী অক্টোবর মাসে ভারতের অল ইন্ডিয়া রেডিও টেলিভিশনের এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলেন। এই অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মোহাম্মদ আইয়ুব ও ইন্সটিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ এনালাইসিস এর পরিচালক কে. সুব্রাহ্মানিয়াম। এ অনুষ্ঠানে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা ঘটনাচক্রে বাংলাদেশকে হারানোটা মেনে নিতে পারে, তবে দেশের জনগণকে শান্ত রাখতে তারা কাশ্মীর হস্তাগত করার চেষ্টা চালাবে। ভারত তাদের ভূখণ্ড দখল করে নিবে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বর্তমানে এই দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। তাই তারা ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছে। বাংলাদেশের জনগণের মনোবল খুবই জোরালো ও প্রশংসনীয়। এজন্য তারা উৎরে গেছে। তাদের দৃঢ় আস্থা রয়েছে যে চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের মনোবল দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, বাংলাদেশকে তারা হারাতে যাচ্ছে। সেখানকার শাসকদের জনগণ টিকিয়ে রেখেছে, তাদের কাছে এই বিষয়টির কী ব্যাখ্যা দিবে তা নিয়ে উদ্‌বিগ্ন। কোনো এক পর্যায়ে বাংলাদেশে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়লে তারা সেখানে আটকা পড়ে থাকতে চাইবে না। সেখান থেকে তারা বেরিয়ে আসবে তবে কাশ্মীরের জন্য এগিয়ে যাবে। বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশের কাশ্মীর বিনিময় করার ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানে বিস্তর আলাপ আলোচনা হচ্ছে।[৮৮]

৪.১.৬ প্রতিবেদন তৈরি, প্রচারপত্র, পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশের ওপর প্রথম প্রতিবেদন তৈরি করেন বিশ্বব্যাংকের একটি সমর্থক গোষ্ঠী। এদের মধ্যে ছিলেন হার্ভাডের মহিউদ্দিন আলমগীর, অধ্যাপক স্টিফেন মার্গলিন ও ড. রিচার্ড টেবর্স। হার্ভাডের তিন বিশিষ্ট অধ্যাপক ডীন রবার্ট মেসন, রবার্ট ডর্ফম্যান ও স্টিফেন মার্গলিন প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের ওপর

---

[৮৭] *জয়বাংলা*, ৫ নভেম্বর ১৯৭১

[৮৮] ফজলুল কাদের কাদেরী, অনুবাদ দাউদ হোসেন, *বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস*, ঢাকা: সংঘ প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮। পৃ. ৩০৮-৩০৯

প্রতিবেদন তৈরি করেন। এই প্রতিবেদনে তারা পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দেন যে, দুই অংশের বিচ্ছেদ অপরিহার্য এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সকলের জন্য মঙ্গলজনক। এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে মার্কিন জনমত গঠনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।[৮৯] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ যে, আই. পি. এম. কারগিল (I. P. M. Cargil) এর নেতৃত্বে গঠিত ১০ সদস্যের বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল ১৯৭১ সালের জুন মাসের শুরুতে ১২ দিনের সফরে পূর্ব পাকিস্তান যায়। এ দলে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের দুজন কর্মকর্তা অর্থনীতিবিদ ডগলাস এইচ কীয়ার (Douglas H. Keare) এবং আবাসিক প্রতিনিধি সিংগিমিটসু কুরিয়ামা (Shingemitsu Kuriyama) যুক্ত হন। দলটি বিশ্বব্যাংকের জন্য একটি যৌথ প্রতিবেদন প্রস্তত করা ছাড়াও প্রত্যেক সদস্য তাদের ব্যক্তিগত প্রতিবেদন জমা দেন। এগুলো বিশ্লেষণ করার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের করুণ চিত্র ফুটে ওঠে। হত্যা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, নৈরাজ্যের খণ্ড খণ্ড চিত্র এসব প্রতিবেদনসমূহে প্রকাশিত হলে বিশ্বজুড়ে সচেতন মহলে সাড়া জাগায়। কারণ পশ্চিমা বিশ্বের সুশীল সমাজ ও সরকারসমূহের কাছে মাঠ পর্যায় থেকে পাঠানো বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তাদের এসব প্রতিবেদনের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তা হেনডিরক ভ্যান ডের হেইজডেন বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা, নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক দুদর্শাকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মাই লাই এর ভয়ানক মানবিক দুর্দশার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর ভাষ্য হলো- I asked them to show me a shop where food was being sold; it was in that ninety minutes impossible to find one. Kushtia, as someone told me, is the My Lai of the West Pakistan Army. অংশগ্রহণকারী সদস্যদের ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, পূর্ব বাংলার নগর ও বন্দরের কোনো কিছুই যেন ঠিকমত কাজ করছিল না। ফলে পশ্চিমা বিশ্বের পর্যবেক্ষকদের কাছে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার প্রতারণা ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রকৃত চিত্র সহজেই ধরা পড়ে। পাকিস্তান সরকারের এসব অস্বাভাবিক সব কর্মকাণ্ডের স্বরূপ ও ফলাফল সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে বলা হয়েছে- The farmers are not coming to the cities, and nobody goes out. Thousands of farmers have fled. Everything is abnormal there, and it was a shattering experience.[৯০]

ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সামগ্রিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য উদগ্রীব হয়ে তারা একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারা তাদের প্রতিনিধি হিসেবে একজন ব্যক্তিকে কলকাতায় পাঠানো স্থির করে। সে মোতাবেক সবাই মিলে চাঁদা তুলে হারুন-অর-রশিদকে কলকাতায় পাঠায়। হারুন-অর-রশিদ ওয়াশিংটন ত্যাগ করার পূর্বে তারা ৫ এপ্রিল একটি বেনামী সার্কুলার তৈরি করেন এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে বাঙালিদের ঠিকানা যোগাড় করে এটি পাঠানো হয়। এই সার্কুলারগুলো পাঠানোর ব্যবস্থা করেন বাঙালি কূটনীতিক সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী। তিনি সার্কুলারগুলো পাঠানোর জন্য প্রায় ৯০ জনের একটি তালিকা তৈরি করেন। সার্কুলারে বাঙালিদের কর্তব্য কী হতে পারে সে সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া

---

[৮৯] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

[৯০] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: *আশফাক হোসেন*, আন্তর্জাতিক দলিলপত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৩৩-৩৪, বর্ষ ১৪১৭-১৯। পৃ. ১৮৬-২১১

হয়। প্রথমত: সর্বত্র বাংলাদেশ লীগ গঠন করতে হবে এবং পারতপক্ষে এই সব সমিতির সভাপতি হবেন বাঙালি মার্কিন নাগরিক। তাদের প্রধান কাজ হবে জনমত গঠন করা এবং বাংলাদেশ সম্বন্ধে সঠিক খবর দেওয়া। সমিতির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হবে নিউইয়র্ক লীগ যারা পূর্ব পাকিস্তান নামটিকে বাংলাদেশ লীগ নামে পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা ইতিমধ্যে নিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যের জন্য চাঁদা আদায়ের কথা বলা হয়। আমেরিকার সকল নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার বা কংগ্রেসের নেতাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারত, বার্মা এবং শ্রীলঙ্কার ওপর চাপ প্রয়োগ এবং এ দেশিয় লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। বাংলাদেশে হত্যাকাণ্ডের কিছু বিবরণ এতে দেওয়া হয়। সার্কুলারে যোগাযোগ করার জন্য ঠিকানা দেওয়া হয় ৩১১৭, সাত নং স্ট্রিট, নর্থ ইস্ট, ওয়াশিংটন ডি.সি ২০২১৭।[৯১] ২৬ এপ্রিল সার্কুলারের দ্বিতীয় সংখ্যা বিতরণ করা হয়। এতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের খবর দেওয়া হয়। কলকাতা থেকে প্রাপ্ত খবর পরিবেশন করা হয় এবং চাঁদা আদায়ের প্রতি জোর দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ মতো প্রয়োজন মেটানোর জন্য তহবিল সংগ্রহ করে হাতে রাখতে বলা হয়। এই সার্কুলারে মুজিবনগর সরকারের অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়- বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগরে অবস্থিত। মুজিবনগর কিন্তু একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নয়। বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা যেখানে সমবেত হয় সেখানেই হয় তখনকার মুজিবনগর। এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে পাকিস্তানের বিমানবাহিনী মুজিবনগরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে না দিতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিমান হামলা প্রতিহত করার ক্ষমতা হয় ততদিন ভ্রাম্যমান মুজিবনগরই হলো সরকারের সদর দফতর।[৯২]

১ জুন সর্বশেষ সার্কুলার প্রকাশ করা হয়। এ সার্কুলারে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের অনেক খবর দেওয়া হয় এবং এর প্রধান সূত্র ছিল পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন। ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত আগা হিলালির ব্যক্তিগত কর্মকর্তা সোলায়মান দূতাবাসে রাষ্ট্রদূতের দফতরে কাজে থাকাকালীন নিয়মিতভাবে গোপন প্রতিবেদনের নকল বাঙালি কূটনীতিকদের পৌঁছে দিতেন। এই প্রতিবেদনে বস্তুতই সত্য কথা লিপিবদ্ধ থাকতো।[৯৩]

বাংলাদেশের খাদ্য সংকট এক মারাত্মক আকার ধারণ করে। ১৯৭০-১৯৭১ সালে শুধু ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য এ ঘাটতির হিসাব ছিল ২৩ লক্ষ টন। ১৯৭০ সালের জুলাইতে মজুদ ছিল মাত্র ৬ লাখ টন। ১৯৭১ সালের জুন পর্যন্ত মোট আমদানি হয় ১১ লাখ টন যার প্রায় ২ লাখ টন অন্যত্র খালাস করতে হয়। আবার ১৯৭১-১৯৭২ সালের হিসেবে দেখা যায় যে, খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি হবে ৩০ শতাংশ। এতো ঘাটতি কিন্তু আমদানির ক্ষমতা সীমিত। মাসে ২ লাখ টন খালাস করতে বেগ পেতে হয়। এই সমস্যার উপরে ছিল আরো দুটি সংকট। প্রথম, মানুষের রোজগার না থাকায় খাবার ক্রয়ে অর্থের সংকট। দ্বিতীয়, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী খাদ্যকে গণদমনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এর জন্য প্রয়োজন ছিল খাদ্য বিতরণে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ এবং মুজিবনগর সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ। এ এম এ মুহিত এই বিষয়ে বিশ্বব্যাংক, ইউএসএইড এবং জাতিসংঘের কৃষি সংস্থা থেকে সঠিক খবর সংগ্রহ করতে সমর্থ হন

[৯১] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪
[৯২] ওই, পৃ. ৬২
[৯৩] ওই, পৃ. ৬২

এবং পাকিস্তানের কাগজপত্রও হস্তগত করেন। গোটা খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে মুজিবনগর সরকার এবং সিনেট শরণার্থী সাবকমিটি ও বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্রের জন্য এ এম এ মুহিত কয়েকটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। সিনেট শরণার্থী সাবকমিটি ৩০ অক্টোবর ও ৪ নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশ সমস্যার ওপর তৃতীয় শুনানির ব্যবস্থা করে। এই শুনানির প্রতিবেদনে এ এম এ মুহিতের বিশ্লেষণ পরিশিষ্ট হিসেবে স্থান পায়।[৯৪] এ এম এ মুহিত যে সকল প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন তার মধ্যে ছিল বাংলাদেশ কেন স্বায়ত্তশাসন চায়, মুক্তিযুদ্ধে ভবিষ্যৎ ও প্রত্যাশা, সমঝোতার সম্ভাবনা, পাকিস্তান সরকার কেন বাংলাদেশে কোনো ত্রাণকার্য বাস্তবায়ন করতে পারবে না। তবে এ এম এ মুহিতের বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিবেদন তৈরির কাজ শুরু করেন মার্চ-এপ্রিল মাসে। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের অর্থনীতি সংকটপূর্ণ হয়ে পড়ে। এ সংকট মোচনের জন্য বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য আদায়ের জন্য মার্চ মাসে পাকিস্তান সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা আজিজ আলী ওয়াশিংটনে আসেন। এ সংবাদ পাওয়ার পর এ এম এ মুহিত *ইভিনিং স্টারের* জর্জ শারমানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। উল্লেখ্য, শারমান অর্থনৈতিক বিষয়ে রিপোর্ট করেন। এ এম এ মুহিত জর্জ শারমানকে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু জর্জ জানান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে একটি সমঝোতা করার জন্য চাপ দিচ্ছে এবং সাময়িকভাবে পাকিস্তানকে নতুন করে কোনো সাহায্য প্রদান করা হবে না। কিন্তু জর্জ শারমান পরদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে সন্তুষ্ট করার জন্য পাকিস্তান সংকট নিয়ে বিশদ বিবরণ সংবলিত রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং আজিজ আলীর মিশন সম্পর্কেও রিপোর্টে উল্লেখ করেন। তার এ রিপোর্টের মূল শিরোনাম ছিল US Trying to Force Pakistan Accord. এ রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকার রন কোভেন ও *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার বেন গুয়েলস দু'জনই এ এম এ মুহিতকে জর্জ শারমানের রিপোর্টের পাল্টা জবাব লিখিত আকারে দিতে বলেন। তাদের কথায় এ এম এ মুহিত পাকিস্তানের দেউলিয়াপনা শীর্ষক প্রতিবেদন তৈরি করেন। এপ্রিল মাসে এরকম আরো কয়েকটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। যেগুলোর কোনোটি ছিল সাময়িক কোনো বিষয় নিয়ে আবার কোনোটি ছিল দীর্ঘমেয়াদী গুরুত্বের বিষয় নিয়ে। সামরিক বাহিনীর উন্মত্ত কর্মকাণ্ড, বাংলাদেশ অর্থনীতির ভবিষ্যৎ, পাকিস্তানের রাজনৈতিক দর্শন ও আচরণ শীর্ষক প্রতিবেদন তৈরি করেন এ এম এ মুহিত।[৯৫] সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হলে আবারো বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা শুরু হয়ে যায়। এ সময় বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্রের অনুরোধে এ এম এ মুহিত পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সাহায্য স্থগিত রাখার যৌক্তিকতা শিরোনামে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। কিন্তু রেহমান সোবহান এ প্রতিবেদনকে নতুন করে সাজিয়ে তৈরি করেন পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সাহায্যদাতাদের জন্য কৌশল। এ প্রতিবেদন বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র থেকে প্রকাশ করা হয় এবং বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভায় এটি প্রচার করা হয়।[৯৬]

---

[৯৪] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১-১৪২
[৯৫] ওই, পৃ. ৫৭-৫৮
[৯৬] ওই, পৃ .১৪২

এ এম এ মুহিত এবং হারুন-অর-রশিদের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন দফতরে প্রেরণের জন্য স্মারকলিপি তৈরি করা। নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন গিয়ে এসব কাজে সহায়তা করেছেন এস এ করিম।[৯৭] ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ মিশন থেকে বাংলাদেশ নিউজ বুলেটিন প্রকাশ করা হতো। শামসুল কিবরিয়া আমেরিকান সিনেটর চার্চ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের নিউজ লেটারগুলো বিনা পয়সায় সব জায়গায় পাঠাতেন।[৯৮]

কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে জাকার্তার 'আমরা' সংগঠন মাঝে মাঝে প্রচারপত্র পেতেন এবং তা স্থানীয় খবরের কাগজে সরবরাহ করতেন। আবুল ফজল শামসুজ্জামান Pakistan, Its Birth and Death শিরোনামে একটি লেখা রচনা করেন। এর ব্যাপক প্রচারার্থে যে সকল কার্যক্রম করেন তা স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন- 'নুরুল ইসলাম একটা ডুপ্লিকেটিং মেশিন যোগাড় করেছিলেন। মেশিনটা আমার বাসার স্টোররুমে রাখা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় প্রচারপত্র সেখান থেকে গোপনে ছাপিয়ে স্থানীয় সংবাদপত্র, রাজনৈতিক নেতা, বিশেষ করে মাসজুমী নেতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এর কপি অবগতির জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়।'[৯৯]

হাইকমিশনার হোসেন আলী আবুল ফজলের প্রচারপত্র পাওয়ার পর যে চিঠি দিয়েছিলেন তার ভাষ্য ছিল-

> I am very happy to notice the keen interest you have been taking in our fight for freedom. The paper's chronological narration of the events of Bangladesh has projected our cause in an effective manner. The brevity and the clarity of approach with which you have completed the paper is commendable. It will bring the readers alive to the most tragic tale of the century and will contribute to rousing the moribund conscience of mankind. I fully appreciated what you have been doing for us.[১০০]

৪.১.চ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলনে যোগদান

বাঙালি কূটনীতিকরা বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এ এম এ মুহিত এপ্রিল মাসে ইন্টেলস্যাট (INTELSAT) নামে একটি সম্মেলনে যোগ দেন। এটি ছিল আসন্ন স্যাটেলাইট টেলিযোগাযোগ বিপ্লবের নিয়ম কানুন নির্ধারণের জন্য। প্রথম সম্মেলনে পাকিস্তান দলের নেতৃত্ব দেন পোস্ট মাস্টার জেনারেল ওবায়েদ মোহাম্মদ। তিনি একজন উর্দুভাষী বাঙালি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এ এম এ মুহিত এই সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি মুহিতকে দলের নেতা মনোনীত করতেন। এ সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন মার্কিন প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত ওয়াশবার্ন। ১৪ এপ্রিলের অধিবেশনে তুর্কী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এ এম এ মুহিতের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। তুরস্ক পাকিস্তানের ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ। ওই দেশে তারা পাকিস্তানিদের বলে ভাই বা কারদেশ আর মার্কিনীদের বলে বন্ধু বা অর্কেদাশ। ভ্রাতৃত্বের সুযোগ নিয়ে এ এম এ মুহিত তুরস্ককে পাকিস্তানে তাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য অনুরোধ করেন। এম এ মুহিত তাঁকে বলে যে তুরস্ক পাকিস্তানকে সৈন্য ও রসদ সরবরাহের জন্য বিমান সাহায্য দিয়েছে। যা ভ্রাতৃসুলভ কাজ

---

[৯৭] আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮
[৯৮] এ এফ সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫
[৯৯] আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯
[১০০] *ওই*, পৃ. ৩৯

হয়নি। কারণ এই সাহায্য পেয়ে পাকিস্তানিরা বাঙালিদের হত্যা করছে। এ ঘটনার পর ১৯ এপ্রিল মিনিস্টার বশির এম এ মুহিতকে একান্তে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তুরস্কের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাঁর কোনো ধরনের তর্ক হয়েছে কিনা। এম এ মুহিত জানতে পারেন যে, তুরস্কের রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগা হিলালির কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মুহিত খুব আবেগপ্রবণ এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে খুবই বিচলিত। এতে হিলালি নির্দেশ দেন মুহিত যেন সম্মেলনে না গিয়ে দূতাবাসে অবস্থান করে। এর প্রতিবাদে মুহিত উত্তর দেয় যে- সাহায্য, বাণিজ্য বিষয়ে এবং বিশ্বব্যাংক ও মুদ্রা তহবিলে অনেক কাজ করতে হয়। তাই দূতাবাসে বেশি সময় থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এর উত্তরে মিনিস্টার বশির সমাধান দেন যে, লাঞ্চ পর্যন্ত মুহিত দূতাবাসে থাকবেন। লাঞ্চের পর বেরিয়ে চারটা পর্যন্ত অন্যান্য কাজ শেষ করবেন এবং পাঁচটার পর যা খুশি তা করতে পারবেন।[১০১]

পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বাঙালি কূটনীতিক এ এম এ মুহিতের সম্মেলনে যোগদান বন্ধ করলেও তিনি এ সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইরানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন আর্দেশির জাহেদী। ইরান ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের ভালো বন্ধু। এ বিবেচনা করে এ এম এ মুহিত ইরানের রাষ্ট্রদূতকে ইরানের শাহকে দিয়ে বাংলাদেশের ব্যাপারে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইরান শেষ পর্যন্ত কাজটি করেনি। অবশ্য পরবর্তীতে এ এম এ মুহিত বুঝতে পারেন যে, এটি ছিল তাঁর একটি ভুল পদক্ষেপ। কেননা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতা ও হত্যাযজ্ঞ ততদিনে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে, কোনো রকমের মধ্যস্থতা করার সুযোগ ছিল না।[১০২]

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ওয়াশিংটনের শেরাটন হোটেলে বিশ্বব্যাংক আইএফএম এর বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও রেহমান সোবহান এবং এ এম এ মুহিত উপস্থিত হয়ে পাকিস্তানকে কোনো রকম সাহায্য প্রদান না করার জন্য লবি অব্যাহত রেখে সফলতা এনেছিলেন।[১০৩] ড. নুরুল ইসলামও তাদের সঙ্গে যোগ দেন।[১০৪] ২৯ এপ্রিল American Society for International Law এর বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্টেটলার হিল্টন হোটেলে। বাঙালি কূটনীতিক এ এম এ মুহিতকে এ সম্মেলনে যোগদানের আহ্বান জানান ডেল ডিহান। সেখানে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিডন গটলিবের সঙ্গে এ এম এ মুহিতের সাক্ষাৎ হয়। তিনি এ এম এ মুহিতের কাছে বাংলাদেশের বিস্তারিত সংবাদ জানতে চান। তাঁর মতে পাকিস্তান বাংলাদেশে যা করছে তা আন্তর্জাতিক জেনোসাইড কনভেনশন অনুযায়ী অপরাধ এবং এ জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা জরুরি।[১০৫]

১০-১২ নভেম্বর বাংলাদেশ ইস্যুতে ওয়াশিংটনে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে মার্কিন প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে একটি মতবিনিময়ের আয়োজন করে। World Conference of Religion for Peace এর প্রধান ড. হোমার জ্যাক এতে সভাপতিত্ব করেন। সিনেটর কেনেডি এ

[১০১] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮-৫৯
[১০২] *ওই*, পৃ. ৫৯
[১০৩] রেহমান সোবহান, *আমার সমালোচক আমার বন্ধু*, ঢাকা: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, ২০০৭। পৃ. ৭২-৭৩
[১০৪] সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭০
[১০৫] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-৬০

সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন। এ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের পাকিস্তান ডেস্কের পরিচালক ব্রুস লেইনগেন, শিকাগোর অধ্যাপক এডওয়ার্ড ডিমক, ভারত ও পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত কংগ্রেসম্যান ফ্রিলিংহাউসেন এবং বাংলাদেশ মিশনের এনায়েত করিম। পাকিস্তান মিশনের মুজাহিদ হোসেন বাংলাদেশ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আপত্তি জানিয়ে সম্মেলন বয়কট করেন। এ সম্মেলনে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।[১০৬] সম্মেলনের পূর্বে নিউইয়র্কের World Conference of Religion for Peace এর প্রধান ড. হোমার জ্যাক, জাতিসংঘ করেসপন্ডেন্টস এসোসিয়েশনের (UN Correspondents Association) সভাপতি ড. জয়ন্ত ভট্টাচার্য ও ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস (International Commission of Jurists) এর জন সালজবুর্গ এই তিন ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক নিউইয়র্কে বাঙালিদের সকল রকম সহায়তা করেন। মার্চ-এপ্রিলেই মাহমুদ আলীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগের সময় থেকেই তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।[১০৭]

জেদ্দা সম্মেলন চলাকালে ২৬ জুন নয়াদিল্লির বাংলাদেশের কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন সম্মেলনের সদস্যদের বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বান জানান। বাঙালির ওপর পাকিস্তানি সামরিক জান্তার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ তুলে ধরে তিনি বলেন-

> The question of living together with Pakistan brothers, who have shed the blood of millions of our innocent people and who have disrupted our economy, does not arise. I emphasize again that Pakistan is dead and burried under the bodies of martyers.[১০৮]

বাংলাদেশ সংকট নিয়ে আগস্ট মাসে কানাডার টরন্টো শহরে অক্সফামের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ আগস্ট এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিবিদ ও জাতিসংঘের একজন আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল স্যার হিউ কিনলী। এই সম্মেলনে বাংলাদেশ দলের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী (এম আর সিদ্দিকী), এস এ করিম ও এ এম এ মুহিত। দুই দিনের এ সম্মেলন Torento Declaration of Concern ঘোষণা করে। এই ঘোষণায় পাকিস্তানে সব রকম সাহায্য বন্ধ রাখার আবেদন জানানো হয়। সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান দাবি করা হয় এবং শেখ মুজিবের মুক্তি ও জীবনের নিশ্চয়তা চাওয়া হয়।[১০৯] টরন্টো সম্মেলনে এ এম এ মুহিত বাংলাদেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সম্মেলন শেষে যে ঘোষণা দেওয়া হয় তাতে এম আর সিদ্দিকী ও এ এম এ মুহিত স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকেন। কেননা তাদের মতে ঘোষণাটি আরো শক্তিশালী হতে পারতো এবং সমস্যা সমাধানে আরো জোরালে ভূমিকা পালন করতে পারতো। টরন্টো ঘোষণায় বাংলাদেশে সংঘটিত হত্যা বন্ধের আহ্বান জানানো হয়। একটি রাজনৈতিক সমঝোতার প্রেক্ষাপটেই বর্তমান সংকট সমাধান সম্ভব। কিন্তু পূর্ব

---

[১০৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮

[১০৭] সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৬

[১০৮] *Hindustan Standard* (India) 27 June 1971; আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুসলিম বিশ্ব*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৪। পৃ. ২১-২২

[১০৯] সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭০-৩৭১

পাকিস্তানের জনগণের সম্মতি ছাড়া কোনোরকম স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়। এ ঘোষণায় শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন বন্ধ রাখতে বলা হয় এবং সাবধান করে বলা হয় যে, তাঁকে হত্যা করা হলে বর্তমান সংকটের সমাধান সুদূরপরাহত হবে।[১১০]

টরন্টো সম্মেলন পাঁচটি দাবি উত্থাপন করার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। পাঁচটি দাবি ছিল-

ক.পাকিস্তানে সকল সামরিক সাহায্য সরবরাহ বন্ধ করা,

খ. পাকিস্তানে সকল ধরনের অর্থনৈতিক সাহায্য স্থগিত রাখা,

গ. পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘের অধীনে জরুরি দুর্ভিক্ষ নিরোধ ত্রাণকার্যক্রম পরিচালনা করা ও এজন্য সকল সম্পদ সরবরাহ করা,

ঘ. ভারতে শরণার্থীদের দেখাশোনার অর্থনৈতিক বোঝা আন্তর্জাতিকভাবে বহন করা এবং

ঙ. শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষার জন্য বিশ্ববিবেকের হস্তক্ষেপ।[১১১]

এ সম্মেলন শেষে তারা কুইবেক প্রদেশেও যান এবং সেখানকার বাংলাদেশ এসোসিয়েশন আয়োজিত মন্ট্রিলের এক সভায় যোগদান করেন।

ভারতীয় মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন জমিয়ৎ উল উলেমা। এ সংগঠন আগস্ট মাসের শেষ দিকে কলকাতায় একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সম্মেলনে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলী এক বাণীতে বলেন যে, ইয়াহিয়া এবং তার তাঁবেদার শুধু ইসলামের মৌল শিক্ষাই অমান্য করেনি-ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়েছে।[১১২]

১৯৭১ সালের ২২-২৩ আগস্ট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের তৎকালীন ইনটেলিজেন্স ও কো অর্ডিনেশন চিফ জেনারেল ওমর জেনেভাতে পাকিস্তানে সকল রাষ্ট্রদূতদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও চীনের রাষ্ট্রদূতদের আগমন। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন খাজা মোহাম্মদ কায়সার। কেননা খাজা মোহাম্মদ কায়সার তৎকালীন চীনের পাকিস্তান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োজিত ছিলেন। চীনের ওপর অনেক ভরসা ছিল জেনারেল ওমরের। এর মাঝে ভুট্টো বলে দিয়েছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে চীনের মাধ্যমে রক্ষা করা হবে। তাঁর ভাষায় এটাকে তিনি বলতে চাইলেন Strategic Balance বা কৌশলগত ভারসাম্য। চীন ইতিমধ্যে ভুট্টোকে জানিয়ে দেয় যে, তারা বড় আকারে কোনোভাবে পিনসার মুভমেন্ট করবে না। কারণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা রাশিয়ার পারমানবিক শক্তি প্রয়োগের ভয় করছিলেন। সম্মেলনে আগত সকল রাষ্ট্রদূতরা একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার কথা বলেন। তাদের মতে কোনো মিলিটারি উপায়ে বর্তমান সংকটের সমাধান হবে না। জেনারেল ওমর তাদের মূল্যায়নে খুশি হননি। বিশেষ করে চীনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত খাজা কায়সার এ সম্মেলনে

---

[১১০] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

[১১১] ওই, পৃ. ১৩৭

[১১২] মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ১৩নং সেক্টর*, ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১২। পৃ. ২২-২৩

বলেন, সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন পাকিস্তানের পক্ষে বেশি কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। পূর্ব পাকিস্তানে যেভাবে মুক্তিযুদ্ধ দানা বেঁধে ওঠছে তাতে চীনের নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নতুন করে চিন্তা করছেন। চীন পাকিস্তানের ৯২ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের এই যুদ্ধকে পিপলস ওয়ার হিসেবে দেখছে। চীনের মতে পাকিস্তান বাংলাদেশে যা করছে তা গণহত্যা এবং চীন এ গণহত্যাকে সমর্থন করে না। এ সম্মেলনে অন্যান্য রাষ্ট্রদূতদের মতো খাজা মোহাম্মদ কায়সারও রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। জেনেভার ওই সম্মেলনে মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে উপস্থিত ছিলেন বার্নে নিযুক্ত বাঙালি কূটনীতিক ওয়ালিউর রহমান। তাঁর মতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে জেনারেল গোলাম ওমর খাজা মোহাম্মদ কায়সারের মতামত জানতে চাইলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। ওয়ালিউর রহমান তাঁর চোখে মুখে নিশ্চিত পরাজয়ের সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পান। ওয়ালিউর রহমান সম্মেলনের আগে ও পরে খাজা মোহাম্মদ কায়সারের সঙ্গেও দেখা করে চীনের মনোভাব জানার চেষ্টা করেন। খাজা মোহাম্মদ কায়সার কূটনীতিক ওয়ালিউর রহমানকে জানান যে, চীন পাকিস্তানকে সাহায্য করছে না, করবেও না। প্রথমে চীন পাকিস্তানকে এই যুদ্ধে সাহায্য করেছিল বিশেষ করে মার্চ থেকে মে পর্যন্ত অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিমান দিয়ে। কিন্তু চীন ক্রমান্বয়ে সে সাহায্য বন্ধ করে দেয়। সম্মেলন শেষে ওয়ালিউর রহমান বিস্তারিত রিপোর্ট জেনেভা থেকে জরুরি সার্ভিসের মাধ্যমে শামসুল কিবরিয়ার ওয়াশিংটনের বাসার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন।[১১৩] জেনেভা এই সম্মেলনের কথার সমর্থন পাওয়া যায় ইকবাল আখুন্দ এর স্মৃতিকথায়। এ সম্মেলনে কী হয়েছিল বেলগ্রেডে নিযুক্ত পাকিস্তানি কূটনীতিক হিসেবে তিনি লিখেছেন-

> A meeting of Pakistani envoys in the major countries was held in Geneva, chaired jointly by Foreign Secretary Sultan Muhammad Khan and General Ghulam Umar, who was one of Yahya Khan's close confidents and advisers, to consider why Pakistan's image in the world media was so bad. We were asked in a reproving tone, 'What are our ambassadors doing about it?' The ambassadors in turn asked to be told exactly what was going on in East Pakistan and some ventured to answer back, 'What do your expert the image to reflect but the reality'. But such was the state of self-delusion in Islamabad that in the month of May, the foreign office was telling Yahya Khan in a 'summary for the President' that in the world there was 'overwhelming diplomatic support for our endeavor to put down the secessionists'. In fact Pakistan name was by now in such bad odour that according to a report from our high commission in Delhi at a dinner party the wife of a foreign newsman had her place changed when she found herself seated next to a Pakistani First Secretary.[১১৪]

১২ সেপ্টেম্বর দিল্লির মারলেনকার মিলনায়তনে অল ইন্ডিয়া সম্মেলনে বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন যোগ দেন। এ সম্মেলনে কে এম শিহাবুদ্দিন সকল মুসলিম দেশগুলোর নিকট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন দেওয়ার আহ্বান জানান।[১১৫] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনের জন্য দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন শেষে

---

[১১৩] গবেষকের সঙ্গে ওয়ালিউর রহমান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯

[১১৪] Iqbal Akhund, *Memoirs of A Bystander A Life in Diplomacy*, New York: Oxford University Press, 1997. pp. 191-192

[১১৫] The Diary of Hossain Ali

৩৬টি দেশের প্রতিনিধি কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনে আসেন। তাদেরকে আপ্যায়ন করেন বাংলাদেশ মিশনের প্রধান এম হোসেন আলী। তারা সকলে জানান, নিজ দেশে ও জাতিসংঘে তারা বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো দাবি উত্থাপন করবেন।[১১৬]

৪.১.ছ জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব

মুজিবনগর সরকার ১৯৭১ সালের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৬তম অধিবেশনে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাতে মনস্থির করে। তখনও জাতিসংঘে কোনো মুক্তি আন্দোলনের প্রতিনিধিদের গ্রহণের রীতি প্রতিষ্ঠা পায়নি। অবশ্য সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টা ডি পি ধর মুজিবনগরে এসে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল পাঠাবার ব্যাপারে আলোচনা করেন। মুজিবনগর সরকারের উদ্দেশ্য ছিল- এই সম্মেলনে আগত জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিদের প্রভাবিত করা। বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতিসংঘ তার সনদের নানা ধারায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতো। যেমন- মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ব্যাহত হয়। বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘিত হয় এবং বস্তুতপক্ষে গণহত্যা সংঘটিত হয়। বাংলাদেশের সমস্যা বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করে ও বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে রাখে। জাতিসংঘ এর যে কোনো বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে পাকিস্তান ও তাকে সহযোগিতাকারী দেশগুলোর বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে পারতো। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষিতে বিভক্ত বিশ্বে তা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের কার্যসূচি কী হবে সে সম্পর্কে *বাংলার বাণী* পত্রিকায় বলা হয়- বাংলাদেশ সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিযুক্তির প্রস্তাব, জল্লাদ ইয়াহিয়া কর্তৃক সুকৌশলে বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্বজনমত বিভ্রান্ত করার প্রয়াস এবং আপসের জন্য বিভিন্ন দেশের নিকট মধ্যস্থতার তদবির করার জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল নিউইয়র্কে যাচ্ছেন। এই প্রতিনিধি দল জাতিসংঘকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই কথা জানিয়ে দিবেন যে, বাংলার জনগণ ও সরকারের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক বাহিনী প্রেরণের চেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে পাকিস্তানি হানাদারদের সাহায্য করা। তাই এমন অবস্থার উদ্ভব হলে মুক্তিযোদ্ধারা জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদের বিরুদ্ধেও চরম ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হতে পারেন। প্রতিনিধি দল জাতিসংঘকে সুস্পষ্টভাবে আরও জানিয়ে দিবেন যে, একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনাশর্তে মুক্তিদান, বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দান, হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং জঙ্গি বর্বরতায় ক্ষতিগ্রস্থদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দানের পর বিবেচনা করা হতে পারে জঙ্গি সামরিক সরকারের সঙ্গে কোনো আপস মীমাংসার প্রশ্ন আলোচনা করা যায় কিনা।[১১৭] প্রাসঙ্গিক হওয়ায় একটি বিষয় উল্লেখ যে, প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় ১৯৭১ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ছিল মুজিবনগরের অসহায় মানুষ। ফলে জাতিসংঘ ও মুজিবনগর সরকারের মধ্যে সরাসরি কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হলেও মুজিবনগরের মানুষের সঙ্গে এ বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের একটি গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ জাতিসংঘ কাগজে কলমে

---

[১১৬] The Diary of Hossain Ali

[১১৭] *বাংলার বাণী*, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

বাংলাদেশ সংকট বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও বাস্তবে তা অস্বীকার করতে পারেনি। যদিও বাংলাদেশ সংকটের রাজনৈতিক সমাধান প্রশ্নে জাতিসংঘ কার্যত কিছুই করতে পারেনি।[১১৮]

১৯৭১ সালের জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন শুরু হয় ১৪ সেপ্টেম্বর। মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদ প্রথমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিবেন তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ। কিন্তু জানা যায় যে, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং কলকাতার মার্কিন কনসাল জেনারেলের দফতর এ বিষয়ে তৎপর। তখন এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়। মুজিবনগর সরকার আরো জানতে পারে যে, এ ধরনের সমঝোতার প্রস্তাব ছিল একান্তই খোন্দকার মোশতাক আহমেদের এবং তাতে মুজিবনগর সরকারের কোনো সম্মতি বা নির্দেশ ছিল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নিঃশর্ত মুক্তি ছাড়া কোনোভাবেই সমঝোতা বিবেচ্য বিষয় ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত খোন্দকার মোশতাক আহমেদকে বাদ দিয়ে ১৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জাতিসংঘে প্রেরণ করে। এই দলের নেতৃত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় লন্ডনে অবস্থানরত বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে। জাতিসংঘে বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করার কথা একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানানোর ব্যবস্থা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বাঙালি কূটনীতিক আবুল ফতেহ। ২১ সেপ্টেম্বর মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে লন্ডনে অবস্থানরত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে জানানো হয় যে, সাধারণ পরিষদের বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার জন্য ১৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ছিলেন-

ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সাংসদ আবদুস সামাদ আজাদ

সাংসদ ফণীভূষণ মজুমদার

সাংসদ সিরাজুল হক

প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ডাঃ আসাবুল হক

প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ

প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ড. মফিজ চৌধুরী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক (এ আর মল্লিক)

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান

রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ

রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নী

আমেরিকায় বাংলাদেশ মিশন প্রধান সাংসদ মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী (এম আর সিদ্দিকী)

[১১৮] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আশফাক হোসেন, মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘ, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৩-২৪, বর্ষ ১৪০২-০৪। পৃ. ৬১-৯১

সৈয়দ আনওয়ারুল করিম

আবুল মাল আবদুল মুহিত

দলনেতার সুপারিশে তার সহকারী হিসেবে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ওয়াশিংটন মিশনের আবুল হাসান মাহমুদ আলীকে।[১১৯] উল্লেখ্য যে, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আখতারুজ্জামান বাবু তখন আমেরিকায় ছিলেন। তিনিও ওয়াশিংটনে এসে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যুক্ত হন। তবে তাঁকে যথারীতি প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্তির নির্দেশ দিতে মুজিবনগর সরকার রাজি হয়নি। জানা যায় যে, প্রতিনিধি দল গঠন উচ্চতম রাজনৈতিক স্তরে নির্ধারিত হয় এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাকের কিছু বিতর্কমূলক উদ্যোগের কারণে প্রতিনিধি দল গঠনে তাকে কোনো ভূমিকা রাখতে দেওয়া হয়নি। তবে প্রতিনিধি দলের নিয়োগপত্র এবং সে সঙ্গে পাকিস্তান দল সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ, ১৯৭০-১৯৭১ এর নির্বাচনে বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা ও আরো কিছু সরকারি কাগজপত্র সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে এম এ মুহিতের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের অধিবেশনের পূর্বে মুজিবনগর সরকার থেকে এম এ মুহিতকে একটি নির্দেশ পাঠানো হয়। সেপ্টেম্বর মাসে এ কাজটি এম এ মুহিত সম্পন্ন করেন এবং কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। পাকিস্তান সরকার ১৯৭১ সালের জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় যে প্রতিনিধি দল পাঠায় তার মধ্যে ৬ জন বেসরকারি সদস্য ছিলেন। যারা সবাই বাঙালি হয়েও বাংলাদেশ বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। এছাড়া একজন সরকারি কর্মকর্তাও ছিলেন বাঙালি। পাকিস্তানের ইতিহাসে এতো বাঙালি সদস্য কোনোদিন জাতিসংঘের সভায় যোগ দেয়নি। সরকারি কর্মকর্তা ইউসুফ জে আহমদ সম্পর্কে কূটনৈতিক মহল ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু এম এ মুহিতের ওপর দায়িত্ব বর্তায় ৬ জন বেসরকারি বাঙালি সদস্যদের সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করা। এরা ছিলেন মাহমুদ আলী, শাহ আজিজুর রহমান, জুলমত আলী, এ টি সাদী, ড. ফাতেমা সাদেক এবং মিসেস রাজিয়া ফয়েজ। এম এ মুহিত তাদের যে জীবনবৃত্তান্ত ও চরিত্র অংকন করেছিলেন তা ছিল বস্তুনিষ্ঠ।[১২০]

২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের এক বৈঠকে সচিব হিসেবে এ এম এ মুহিতকে মনোনীত করা হয়েছিল। বিশ্বব্যাংক ও অর্থ তহবিলের বার্ষিক সভায় (২৭ সেপ্টেম্বর-২ অক্টোবর) যোগ দিতে এ এম এ মুহিত ওয়াশিংটন অবস্থান করার সময় তাঁর পরিবর্তে ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ দলের সচিব হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। শাহাবুদ্দিন আহমদ প্রতিদিন কে কার সঙ্গে দেখা করছেন বা করবেন, কোন প্রতিনিধি দল কী বক্তব্য রাখছে, কোথায় কোন সদস্যকে কী কাজে যেতে হবে এই সব বিষয়ে সযত্নে তদারকি করতেন। কে বাংলাদেশ সম্বন্ধে সাধারণ পরিষদে কী বক্তব্য রাখছে তিনি তার খোঁজ রাখতেন এবং সকল বিবৃতির একটি ধারাবাহিক সংগ্রহ তিনি প্রকাশ করতেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল তাঁদের বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে মিশ্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। আবার কেউ তাদের কথা

---

[১১৯] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৯২

[১২০] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০

শুনতেই চাননি। অন্যদিকে কিছু দেশের প্রতিনিধিরা অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের কথা শুনেছেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩০। কিন্তু সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ বিষয় আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও ৫৭টি দেশ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।[১২১] বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের যে সকল সদস্য মুজিবনগর সরকার ও কলকাতা থেকে জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন তাদের যাত্রা সহজ ছিল না। জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য বাঙালি প্রতিনিধি দলটিকে প্রথমে নয়াদিল্লিতে যেতে হয়েছিল। কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিতে হবে দিল্লিস্থ মার্কিন দূতাবাস থেকে। অবশ্য কলকাতা থাকাকালেই তারা জানতে পেরেছিলেন তাদের ভিসা দেওয়া হবে না। অনেকের ধারণা ছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার যেহেতু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দিচ্ছে না তাই বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে ভিসা না দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এ নিয়ে প্রতিনিধি দলটির মধ্যে উদ্‌বেগও ছিল। নির্দিষ্ট দিনে ভিসার জন্য প্রথমে যারা দূতাবাসের অভ্যন্তরে গিয়েছিলেন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন। তারপর যান বাঙালি কূটনীতিক খুররম খান পন্নী। তিনি বের হয়ে বলেন, ভিসা পাওয়া যাবে। খুররম খান পন্নীর বয়ানে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়-

> আমরা যাচ্ছি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে জাতিসংঘে। ঘটনাক্রমে দপ্তর ন্যুয়র্কে, আমেরিকায়; তাই আমাদের ভিসা দরকার, নইলে মার্কিন মুল্লুকে যাওয়ার কোন প্রয়োজন হতো না আমাদের। মানতে হবে, অকাট্য যুক্তি। খুররম খাঁ পন্নী অভিজ্ঞ কূটকৌশলী বটে। যাই হোক হয় পন্নীর যুক্তি বলে, অথবা আন্তর্জাতিক কোন সমঝোতার ফলে, আমরা সবাই ভিসা পেয়ে গেলাম। পেয়ে গেলাম অর্থাৎ, পরের দিন পেয়েছিলাম। মধ্যবর্তী সময়টাতে, আমাদের অনুমান, দিল্লী ও ওয়াশিংটনে আলোচনা হওয়ার ফলে দিল্লীর মার্কিন ভিসা আপিস ক্লিয়ারেন্স পেয়ে গেছে।[১২২]

নিউইয়র্কের জাতিসংঘের ভবনের বিপরীত দিকে অবস্থিত চার্চ সেন্টারের একটি হলরুমে ১ অক্টোবর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও তাঁর সহকর্মীরা সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যাখ্যা করেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। কেননা বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার কৌতুহলবশত বিপুলসংখ্যক সাংবাদিক সংবাদ সম্মেলনে আসেন। বিচারপতি চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন একটি রাজনৈতিক দলের সভাপতি, সংসদের আটজন নির্বাচিত সদস্য, দুই জন রাষ্ট্রদূত, দুই জন ভাইস চ্যান্সেলর, একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং কয়েকজন অভিজ্ঞ কূটনীতিক। তারা সহজেই সম্মেলনে যোগদানকারী সাংবাদিকদের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। এই সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোতে কোনো ধরনের আপস সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা বলেন, We have reached a point of no return. বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের জন্য তিনটি পূর্বশর্তের কথা বলা হয়। এগুলো হলো-

ক. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি,

---

[১২১] মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ভিন্ন দলিলপত্র*, ঢাকাঃ অনন্যা; ২০২১। পৃ. ২৫

[১২২] মফিজ চৌধুরী, *বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায়*, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯১। পৃ. ৪৯-৫০

খ. শেখ মুজিবুর রহমানের অবিলম্বে মুক্তিদান,

গ. ইয়াহিয়া খানের হানাদার বাহিনীকে বাংলার মাটি থেকে অবিলম্বে অপসারণ।

দুই অঞ্চলের ভাষা, অভ্যাস, চিন্তাধারা, আদর্শ ও সংস্কৃতির ভিন্নতার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা বলেন, জাতিসংঘের সংজ্ঞায় আমরা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি। এ প্রসঙ্গে তিনি জাতিসংঘের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন- 'প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার জাতিসংঘের সনদে ঘোষিত হয়েছে। একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে সেই ধারা অনুসারে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। জাতিসংঘের কর্তব্য ইয়াহিয়া খানের নিষ্ঠুর নিপীড়নের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসা। আমরা গণহত্যা বন্ধ করার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানাই। আমরা বিশ্বাস করি, জাতিসংঘ মানবাধিকার লঙ্ঘন, ঔপনিবেশিকতা, সামাজিক বৈষম্যের অবসান ঘটাবে বাংলাদেশে।'[১২৩]

সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে জানতে পারেন উপস্থিত সাংবাদিকরা। উপমহাদেশে বিদ্যমান সংকটের মূল স্নায়ুকেন্দ্র যে বাংলাদেশ ও তার মানুষ- এটাই সাংবাদিকেরা বাঙালি নেতা ও কূটনীতিকদের কাছ থেকে জানতে পারেন। সংবাদ সম্মেলনে রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তর দেন আবদুস সামাদ আজাদ।[১২৪] এই সম্মেলনের বিবরণ আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছিল। বিচারপতি চৌধুরীর সাংবাদিক সম্মেলনের বিবরণ প্রচারিত হওয়ার পর আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষ থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু জরুরি কিছু কার্য সম্পাদনের জন্য বিচারপতি চৌধুরীকে কয়েকদিনের জন্য লন্ডনে যেতে হওয়ায় তিনি এসব আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি। তাছাড়া ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাঙালি কূটনীতিকরাও বিচারপতি চৌধূরীকে ওয়াশিংটন সফরের আমন্ত্রণ জানান। লন্ডন থেকে ফিরে এসে বিচারপতি চৌধুরী ওয়াশিংটন সফর করেন এবং মার্কিন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে বক্তৃতা প্রদান করেন।[১২৫] এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে জাতিসংঘ সাংবাদিক সমিতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার ব্যানার্জী ছিলেন তৎকালীন জাতিসংঘ সাংবাদিক সমিতির সভাপতি এবং এ এইচ মাহমুদ আলীর সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ছিল। প্রতিনিধি দলের সদস্য আবদুস সামাদ আজাদ এবং মোজাফফর আহমেদ অচিরেই মুজিবনগর ফিরে যান। দলের বাকি সদস্যরা শুধু নিউইয়র্কে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখেননি। এর পাশাপাশি ওয়াশিংটন সফর করেন এবং আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে ভ্রমণ করে তাদের বক্তৃতা বিবৃতি তুলে ধরেন। এ সময় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে আমেরিকাতে সাহায্য করেছিলেন ফারুকুল ইসলাম (অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের ভাই), মাহবুব হোসেন, জামশেদ রেজা খান, আবদুর রাজ্জাক খান, ফজলুল বারি। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নানা সমিতি বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিতে যান। অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং সৈয়দ আবদুস সুলতানের জন্য আমন্ত্রণ আসতো সবচেয়ে বেশি। অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বক্তৃতা বিবৃতি

---

[১২৩] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০

[১২৪] আশফাক হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জন্ম ও জাতিসংঘ*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১২। পৃ. ১২২

[১২৫] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২

দিয়েছেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে সবসময় নিউইয়র্ক অবস্থান করতে হতো। জাতিসংঘ এবং আমেরিকার সর্বত্র বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে ছিল নিদারুন আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠা। উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের লম্বা আলোচ্যসূচিতে বাংলাদেশ বিষয়টি স্থান পায়নি। পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে এ বিষয়টিকে চিহ্নিত করে আলোচ্যসূচির বাইরে রাখা হয়।

জাতিসংঘে প্রেরিত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলটি বেলমন্ট প্লাজা এবং পিকউইক আর্মস নামের দুইটি হোটেলে অবস্থান করতো। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর জন্য একটি সুইট নেওয়া হয় যেখানে ছিল প্রতিনিধি দলের দফতর। বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারদর্শী ছিলেন ড. মফিজ চৌধুরী। রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নী ও আবুল ফতেহ তাদের কূটনীতিক পরিচয়ের সূত্র ধরে বিভিন্ন জনের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতেন। চিলির অর্থমন্ত্রীর দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নীর সহযোগী হয়ে এম এ মুহিত চিলির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল আশা করেছিল যে, চিলির বিপ্লবী সরকার বাংলাদেশের জন্য বিশেষ বক্তব্য রাখবে। তাদের এ আশার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নী এক সময় চিলিতে পাকিস্তানের কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং চিলির সরকারের সঙ্গে তাঁর ভালো জানাশোনা ছিল। এ প্রতিনিধি দলের সদস্য এ এম এ মুহিত ও ফণীভূষণ মজুমদারকে ব্রুকলিন কলেজের এক র‍্যালিতে বক্তৃতার জন্য আহ্বান জানানো হয়। তাদের উভয়ের বক্তৃতা জ্বালাময়ী বক্তৃতায় রূপ নেয় এবং বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ ইস্যু জনমনে গভীর প্রভাব ফেলে। কেননা ব্রুকলিন কলেজে তাদের যেদিন বক্তৃতার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল সেদিন ছিল ১৩ অক্টোবর। তার পূর্বের দিন ১২ অক্টোবর জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তরের আরেকটি নীল নকশা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান বারো কোটি পাকিস্তানিকে ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান জানান। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইয়াহিয়া খান গ্রীক রাজাদের মতো সংবিধান বিশারদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ইয়াহিয়া খান জানান যে, তিনি ২০ ডিসেম্বর একটি সংবিধান উপহার দিবেন এবং ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন নির্বাচন সম্পন্ন হবে। ২৭ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসবে এবং সংবিধান অনুমোদন করবে। এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে সেনা শাসনের অবসান হবে। বাঙালি কূটনীতিক এম এ মুহিত ইয়াহিয়া খানের এ ঘোষণাকে উন্মাদের হুংকার বলে অভিহিত করেছেন।[১২৬] কেননা ইয়াহিয়া খানের ১২ অক্টোবরের ঘোষণাটি ছিল সম্পূর্ণ উস্কানিমূলক। ইয়াহিয়া খানের ঘোষণাটির পরপর ১৪ অক্টোবর জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নিকট আরেকটি সংবাদ পৌছে। ১৪ তারিখ রাতে আবদুল মোনায়েম খানকে মুক্তিযোদ্ধারা হত্যা করে। সংবাদটি শোকের হলেও তা বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের কাছে ছিল যুদ্ধের সাফল্যের একটি নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক মন্তব্য করেছেন যে, ‘যুদ্ধ মানুষের পাশবিক বৃত্তিতে কিভাবে জাগিয়ে দেয়। সমাজের উঁচু স্তরের একজন শত্রুপক্ষের সদস্যকে হত্যা কি সহজভাবেই না আমরা মেনে নিলাম।’[১২৭]

---

[১২৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮
[১২৭] *ওই*, পৃ. ১৫৯

১৬ অক্টোবর বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য ওয়াশিংটনে পৌঁছেন। প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটনে বাঙালি সমাজের সঙ্গে মিলিত হয়। কংগ্রেসের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে তারা সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটনের লাফায়েত পার্কের সিউয়ার সিটি র‍্যালিতে অংশ নেন এবং বাংলাদেশের জন্য আয়োজিত প্রার্থনা সভায় যোগ দেন। ফিলাডেলফিয়ার ফ্রেন্ডস অব ইস্ট বেঙ্গল সমিতি ও ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে লাফায়েত পার্কে শরণার্থীদের অনুরূপ ডামি শরণার্থী আশ্রয় কেন্দ্র সাজানো হয়। যা ছিল বাংলাদেশের জন্য সাহায্য ও সমর্থন আদায়ের একটি নাটকীয় পন্থা। সিনেটর পার্সীর সঙ্গে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সাক্ষাৎ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। সিনেটর পার্সী প্রেসিডেন্ট নিক্সনের খুব কাছের লোক ছিলেন। তাই তিনি নিক্সনের বরাত দিয়ে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে জানান যে, শেখ মুজিব জীবিত এবং তার প্রাণহানি হবে না।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সোভিয়েত প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক প্রস্তাব করেন যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধিকে প্রকাশিত লিখিত বক্তব্য বিলি করতে দেওয়া হোক অথবা তাকে সকলের সামনে বলার সুযোগ করে দেওয়া হোক। পোল্যান্ডের প্রতিনিধি কুলাগা মালিককে সমর্থন করেন। এর পক্ষে ভারতীয় প্রতিনিধি সমর সেন যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন যে, যারা ভুক্তভোগী তাদের বক্তব্য না শুনে পরিষদের সদস্যরা কী নিয়ে আলোচনা করবে। জ্যাকব মালিকের প্রস্তাব শুরুর দিকে অনেকেই মেনে নিয়েছিল কিন্তু না মানার সংখ্যাও ছিল। এমন অবস্থায় চীনের প্রতিনিধি মন্তব্য করেন যে, বিদ্রোহীদের কোনো স্থান এখানে হবে না।[১২৮] তবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধি দলের নেতা শরণ সিং ও পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতা মাহমুদ আলী প্রচণ্ড বাক বিতণ্ডায় লিপ্ত হন। এই বাকযুদ্ধ দুই দেশের রাষ্ট্রদূত সমর সেন ও আগা হিলালিও অব্যাহত রাখেন। ভারতের প্রতিনিধি দলের নেতা শরণ সিং এর বক্তৃতা করার সময় পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতা মাহমুদ আলী ত্রিশ মিনিটের বক্তৃতায় দশ মিনিট বাধা দেন। মাহমুদ আলীর বক্তৃতার পর তার জবাবে বক্তব্য দেন ভারতের রাষ্ট্রদূত সমর সেন। সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের বক্তব্য ছিল- পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছে তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত হস্তক্ষেপ করছে। কিছু শরণার্থী ভারতে গিয়েছে কিন্তু তাদের সংখ্যা ভারত সরকার অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করছে। এসব শরণার্থীরা যাতে ফেরত না আসতে পারে তাতে ভারত বাধা দিচ্ছে। পাকিস্তানের এ ধরনের বক্তব্যের পর তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে শরণার্থীদের সাহায্যের কথা বলে। কিন্তু উরুগুয়ে, ক্যামেরুন, রুমানিয়া মানবাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের কথা তুলে ধরে। উন্নত বিশ্বের দেশ অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মতো অবস্থান নেয়। কিন্তু অন্যান্য উন্নত দেশ এবং কতিপয় তৃতীয় বিশ্বের দেশ রাজনৈতিক সমাধানের কথা জোরালোভাবে উপস্থাপন করে। মুসলমান প্রধান দেশগুলোর মধ্যে ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র, আফগানিস্তান এবং ইরান ছিল বাংলাদেশের প্রতি সামান্য নমনীয়। ফ্রান্স, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, জ্যামাইকা তাদের ক্ষোভ ও শঙ্কা প্রকাশ করে। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ জাতিসংঘ দফতর ও সম্মেলন এলাকায় বিচরণ করতো জাতিসংঘ সাংবাদিক সমিতি

---

[১২৮] মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

ও ভারতীয় মিশনের সহযোগিতায়। এ সময় পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগকারী বাঙালি কূটনীতিক সৈয়দ আনোয়ারুল করিম (এস এ করিম) কে পাকিস্তানিরা হেয় করতে চেয়েছিল। তারা মনে করেছিল এস এ করিম পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করলেও পাকিস্তানি কূটনীতিক পরিচয় পত্র ব্যবহার করে জাতিসংঘে অবাধ যাতায়াত করছে। এ ব্যাপারে তারা নালিশ করেও কোনো কিছু করতে পারেনি।[১২৯] বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের কর্মতৎপরতায় জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি নাখোশ হন এবং জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে নালিশ করেন যে, 'বাঙালি ব্যক্তিরা' জাতিসংঘ ভবনে লবি করছেন। তিনি তাদের জাতিসংঘ ভবন থেকে বহিস্কারের দাবি উত্থাপন করেন।[১৩০]

ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যৌথ বাহিনীর অগ্রসর হতে থাকে। ৪ ডিসেম্বর সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদে এ নিয়ে খসড়া প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল বাংলাদেশ ইস্যুতে বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক পক্ষের কোনো প্রস্তাব গৃহীত হলে অপর পক্ষ তা ভেটো দিচ্ছে। আবার বিরোধীপক্ষরা ভারতকে সরাসরি দোষারোপও করছিল না। কিন্তু চীনের প্রতিনিধি হুয়াং হুয়া ৫ ডিসেম্বর ঘোষণা করেন যে, ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে উপমহাদেশের শান্তি বিঘ্নিত করছে। তিনি আরো বলেন যে, ভারত তথাকথিত বাংলাদেশ গঠন করে পাকিস্তানকে বিভক্ত করতে চাইছে। তার এ বক্তব্য যে মিথ্যা সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। উল্লেখ্য যে, ৩ ডিসেম্বর ইন্দিরা গান্ধী কলকাতার জনসভায় বক্তব্য দেওয়ার সময় সংবাদ পান যে, পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান আক্রমণ করেছে। জনসভা শেষে তিনি দিল্লি ফিরে যান। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিষদে ১৪ ডিসেম্বর একটি খসড়া ও ১৬ ডিসেম্বর একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। এছাড়া ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড, সিরিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নও খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করে। নিরাপত্তা পরিষদে পোল্যান্ড প্রস্তাব করে যে-

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর।

খ. এ কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৭২ ঘন্টার জন্য যুদ্ধ বিরতি।

গ. এটি কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান বাহিনী ও সিভিলিয়ানদেরকেও স্থানান্তর।

ঘ. ৭২ ঘন্টায় এটি সম্পন্ন হওয়ার পর যুদ্ধ বিরতি স্থায়ী হবে।

১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রতিনিধি জুলফিকার আলী ভুট্টো পোল্যান্ডের এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে অধিবেশনস্থল ত্যাগ করেন।[১৩১]

এখানে উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসছে এ কথা জানার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদের তৎকালীন সভাপতি সিয়েরালিওনের আই বি টেইলার কামারা'র কাছে লেখা এক চিঠিতে অনুরোধ জানালেন তাদেরকে যেন পরিষদের সামনে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেওয়া হয়। বিচারপতি চৌধুরী তাঁর

---

[১২৯] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: M. A. Muhith, *Emergence of Bangladesh*, Dhaka: Bangladesh Books International Ltd, 1st edition 1978, pp. 270-277; আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫-১৬১; আশফাক হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১২৯

[১৩০] *Pakistan Observer*, 2 October 1971

[১৩১] মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫-২৬

এ চিঠিতে লিখেন- ‘এ পর্যন্ত গণমাধ্যমে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু জাতিসংঘ আজ পর্যন্ত সে সমস্যার মূলে আলো ফেলতে পারেনি। তার চেয়েও বড় কথা, এই সমস্যার কেন্দ্রে যারা অর্থাৎ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ, তাদের কথা শোনার প্রয়োজন মনে করেনি। বাংলাদেশের মানুষের কথা সরাসরি তাদের কাছ থেকে না শোনা পর্যন্ত পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমি আপনাকে আগেই অনুরোধ করেছি পরিষদের সামনে আমাদের দেশের জনগণের পক্ষে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ দেওয়ার জন্য। এখন যেহেতু পরিষদ (এই প্রশ্নে) মিলিত হতে যাচ্ছে, আমি আমার সেই অনুরোধ পুনরায় রাখছি।’[১৩২]
নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক শুরু হওয়ার আগেই সে চিঠির কপি নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্যের কাছে বিলি করা হয়। ৪ ডিসেম্বর শনিবার বিকেল পাঁচটায় নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক শুরু হয়। পরিষদের সদস্য না হলেও ভারত ও পাকিস্তান বৈঠকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পায়, কারণ সমস্যার কেন্দ্রে ছিল এই দুটি দেশ। ১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে পাকিস্তান একটি প্রস্তাব দেয়। তাদের প্রস্তাব ছিল বিষয়টি নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নেওয়া। পাকিস্তানিরা পশ্চিমে চলে যাবে, ভারতীয়রাও বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাবে। বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দরা ও পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ঠিক করবে এবং পাকিস্তান তার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করবে শেখ মুজিবকে নিউইয়র্কে পাঠিয়ে। নিরাপত্তা পরিষদে শেখ মুজিবুর রহমান এ ধরনের মীমাংসা উপস্থাপন করবেন। এ ধরনের প্রস্তাবে আমেরিকার বাংলাদেশ মিশনের বাঙালি কূটনীতিকদের প্রতিক্রিয়া ছিল-

> আমি আমাদের মিশন প্রধান সিদ্দিকী সাহেবকে জানালাম এবং তিনি আমার বাসায় মাহবুবের সংগে সম্ভবত আলাপও করলেন। আমরা বললাম যে, বিষয়টি আমরা নিউইয়র্কে আমাদের প্রতিনিধিদের নেতা বিচারপতি চৌধুরীকে জানাবো। সংগে সংগে এও বললাম যে, যুদ্ধের যে অবস্থা এই উদ্যোগের সুযোগই হয়তো মিলবে না। বিচারপতি এ রকম প্রস্তাব সম্বন্ধে ইতিমধ্যে অবহিত ছিলেন এবং তিনি বিনা দ্বিধায় এক কথায় নাকচ করে দিলেন। আমাদের দৌড় এখানেই শেষ হলো।[১৩৩]

১৬ ডিসেম্বর পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বসে। অধিবেশনের সভাপতি ঘোষণা করেন যে, ইতালি, জাপান, সিরিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যান্ডের মোট পাঁচটি প্রস্তাবের ওপর আলোচনা ও ভোট গ্রহণ করা হবে। ইতিমধ্যে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান বাহিনী ঢাকায় যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং ভারত একতরফাভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছে। অবশ্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ইন্দিরা গান্ধীকে লিখেছিলেন, পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ বিরতি না করে যতটুকু সম্ভব দখল করে নিতে। না হলে ভবিষ্যতে পাকিস্তান একই ধরনের আচরণ করবে। ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন অব্যাহত ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাশ হয় যে, দু’পক্ষের যুদ্ধ বিরতির আহ্বান ও জেনেভা কনভেনশন মেনে চলা।[১৩৪] সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যান্ড এই ভোটে অংশ নেয়নি। ১৬ ডিসেম্বর এর পর বাংলাদেশকে বিশ্বের অনেক দেশ স্বীকৃতি দিতে শুরু করে।

---

[১৩২] হাসান ফেরদৌস, *মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত বন্ধুরা*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩। পৃ. ১৪৩
[১৩৩] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮
[১৩৪] মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-২৭

৪.১.জ মিশন পরিচালনা কার্যক্রম

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত প্রচারে পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করা বাঙালির কূটনীতিকদের পাশাপাশি কাজ করেছেন মুজিবনগর সরকার প্রেরিত কূটনীতিক পদমর্যাদার প্রতিনিধিরা। তবে বিশ্বব্যাপী পাকিস্তান দূতাবাসগুলো থেকে একের পর এক বাঙালি কূটনীতিকের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে মুজিবনগর সরকারের অত্যাবশ্যকীয় কাজ হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা করা। দুটি কারণে মিশন প্রতিষ্ঠা জরুরি হয়ে পড়ে। প্রথমত: বাঙালি কূটনীতিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশ সম্পর্কে বহির্বিশ্বকে সঠিক তথ্য দেওয়া। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্বে সাতটি মিশন প্রতিষ্ঠা করে। এগুলো ছিল- ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, লন্ডন, নয়াদিল্লি, কলকাতা, স্টকহোম ও হংকং। প্রতিটি মিশন গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানানো হয় যে, ৮ম মিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায়।[১৩৫]

১৮ এপ্রিল কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাস বাংলাদেশের হস্তগত হওয়ায় এ কাজটি তরান্বিত হয়। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম মিশন। এ মিশন হয়ে পড়ে বাঙালিদের সকল কর্মের মূল কেন্দ্র বিন্দু। একদিকে যেমন প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো তেমনি বাংলাদেশ সরকারের বহিঃপ্রচার বিভাগের কাজগুলোও বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হতো। মুজিবনগর সরকার থেকে যে সকল প্রতিনিধি দল বিদেশে প্রেরণ করা হতো তাদের কাগজপত্র প্রস্তুত করা থেকে সবকিছুই ব্যবস্থা করতেন কলকাতা মিশনের প্রধান হোসেন আলী।[১৩৬] মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্বের সকল বাঙালিদের কাছে এ মর্মে সংবাদ প্রকাশ করা হয় যে, ২৯ জুলাই থেকে বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট চালু হয়েছে। কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলী বাংলাদেশ মিশনে বাংলাদেশের ডাকটিকিটগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শন করেন। উল্লেখ্য যে, প্রথম দফায় বাংলাদেশ সরকার ৮ রকমের ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে।[১৩৭] কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন আনোয়ারুল করিম চৌধুরী। মুজিবনগর সরকারের বৈদেশিক দপ্তর থেকে যোগাযোগ করার জন্য যেসকল নোটিশ আসতো সেগুলোতে স্বাক্ষর থাকতো আনোয়ারুল করিম চৌধুরীর।[১৩৮] (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

কলকাতার পর ভারতের রাজধানী দিল্লিতে সবচেয়ে বেশি বাঙালি কর্মরত ছিলেন। তারা মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই একসঙ্গে পাকিস্তান দূতাবাস থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। দিল্লি দূতাবাসে কর্মরত বাঙালিরা চাইলে সেখানে নিয়োজিত পাকিস্তানিদের বের করে দিয়ে দূতাবাস ভবন দখলে নিতে পারতেন। কিন্তু সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও আনুগত্য পরিবর্তনে অনুকূল পরিবেশ না থাকায় সে উদ্যোগ সম্ভব হয়নি। ৩০ আগস্ট নয়াদিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ মিশন। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে

---

[১৩৫] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭২৩

[১৩৬] মাহমুদ শাহ কোরেশী, *মুক্তিযুদ্ধের মিশন আমার জীবন*, ঢাকা: সূচয়িনী পাবলিশার্স, ২০১৭। পৃ. ৯২

[১৩৭] ফারুক আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯

[১৩৮] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 98

পাঠ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ দূতাবাসের যাত্রা শুরু হয়। এর অবস্থান ছিল দক্ষিণ দিল্লির আবাসিক এলাকা আনন্দ নিকেতন এর একটি ভাড়া করা বাংলোতে। আনুষ্ঠানিকভাবে সেখানে বাঙালিদের কাজ করার সুবিধে হলো। প্রাথমিকভাবে এই মিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে এম শিহাবুদ্দিন। আমজাদুল হক দূতাবাসের তথ্যসংক্রান্ত দায়িত্বে নিয়োজিত হন। অক্টোবর মাসে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে দিল্লির মিশন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[১৩৯] দিল্লি মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌বোধনের সময় এর প্রধান কে এম শিহাবুদ্দিন বলেন-

> the Government of India which had extended full sympathy and support to "our nascent State will soon recognize Bangladesh and its legally constituted Government" "We consider this occasion historic because from this moment, the Bangladesh flag will fly in Delhi in full glory and splendor proclaiming to the world the defeat of the aggressor and the ultimate victory of the aggressed."[১৪০]

মিশনগুলোতে বাংলাদেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত হতো। দিল্লিতে ১৪-১৬ আগস্ট '৭১ আয়োজিত বাংলাদেশ প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সেমিনার উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মিশনে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হতো। যেখানে দিল্লি বা কলকাতা মিশনের কূটনীতিক পদমর্যাদার ব্যক্তিরাও উপস্থিত থাকতেন। ১৯৭১ সালের ২০ জুলাই দিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশনে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে কূটনীতিক রফিকুল ইসলাম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি এ সভায় সভাপতিত্ব করেন।[১৪১] বিবিসির মতে বিদেশে এটি চতুর্থ বাংলাদেশ মিশন। তৃতীয় মিশন ওয়াশিংটনে স্থাপিত হয়েছে।[১৪২]

কলকাতার পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয় ইংল্যান্ডে ও তৃতীয় মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ২৭ আগস্ট বেলা তিনটায় বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ও ইংল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নটিংহিলগেটের নিকট ২৪নং প্রেমব্রিজ গার্ডেনে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ মিশনের উদ্‌বোধন ঘোষণা করেন। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, পাকিস্তান দূতাবাস থেকে পদত্যাগকারী বাঙালি কূটনীতিকগণ ও অন্যান্য প্রতিনিধিসহ প্রায় ২০০ অতিথি উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে সকাল ১১টায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, রেডিও টেলিভিশনের সাংবাদিকদের জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রায় শতাধিক সাংবাদিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।[১৪৩] উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের ৪ আগস্ট ভেনেজুয়েলা প্রবাসী বাঙালি ড. এম আলম খন্দকারকে এক চিঠিতে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠার কথা জানান। এ চিঠিতে বিচারপতি চৌধুরী লিখেছেন- We are setting up a Bangladesh Mission shortly and things will get better organized and letters will be more promptly attended to then.[১৪৪] বাংলাদেশ

---

[১৩৯] আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭। পৃ. ১৫২
[১৪০] *The Hindustan Times* (New Delhi), 31 August 1971
[১৪১] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯৩
[১৪২] আবদুল হক, *লেখকের রোজনামচা চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ১৯৫৩-১৯৯৩*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৬। পৃ. ২৪৮
[১৪৩] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬০৫
[১৪৪] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৮৯

মিশন প্রতিষ্ঠার পূর্বে লন্ডনস্থ স্টিয়ারিং কমিটি মুজিবনগর সরকারের কাছে সম্মতি চেয়ে চিঠি দেয়। সে চিঠির প্রত্যুত্তরে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বিশেষ সহকারী রহমত আলী অর্থাৎ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম মিশন প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে নীতিগত সিদ্ধান্ত জানিয়ে এক চিঠি দেয়। এ চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন-

> The Govt. has no objection on principle with regard to opening of Bangladesh Centre or Bangladesh Mission in England. We are sending necessary instructions and advise to Mr. Justice Chowdhury and his Steering Committee. This indeed will help to exchange our news and views. I personally feel that the need is too great for such an office and if this be agreed by the Steering Committee, certainly we will welcome such effort. . .
> With regard to the philatelic, the designs have been approved. If you have other designs in hand please go ahead and send them for our approval. There is no harm in having more. With regard to publications, our Calcutta Mission has not been able to publish any news bulletin as yet. We every much look towards our London office for bringing out a good publication immediately, at least in form of a News Bulletin.[১৪৫]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি বড় অর্জন। তবে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি নিউইয়র্কের বাঙালিরা পাকিস্তান কনসাল জেনারেলের অফিসটি দখল করে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন এবং তারা সেই অফিসে অবস্থান নিতে থাকেন। এই অফিসে এ এইচ মাহমুদ আলী কর্মরত ছিলেন। বাঙালিরা এই অফিসটিকে বাংলাদেশের সম্পত্তি বলে দাবি করেন। মার্কিন পুলিশ কনসাল জেনারেলের মতামত জানতে চান। কনসাল জেনারেল ছিলেন একজন বাঙালি এবং তিনি তখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করায় কোনো মন্তব্য করেননি। এতে পুলিশ অফিসটিকে পাকিস্তানের অফিস হিসেবেই গণ্য করে। নিউইয়র্কের এ ঘটনার সময় সে শহরে উপস্থিত হন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। তাঁকে নিউইয়র্কের বাঙালিরা জানান যে, কনসাল জেনারেল এই অফিসকে বাংলাদেশের অফিস বলে ঘোষণা করলে তারা এটিকে পুনর্দখল করবেন। উল্লেখ্য যে, বাড়িটি ছিল পাকিস্তান সরকারের নিজস্ব।[১৪৬] তাই বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নিজস্ব কোনো মতামত ব্যক্ত করেননি। একইসময়ে অধ্যাপক রেহমান সোবহানও মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৭১ সালের মে মাসে ওয়াশিংটনে পৌঁছেন। রেহমান সোবহান ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কের বাঙালি কূটনীতিকদের নিয়ে একটি বাংলাদেশ মিশন স্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্যোগী হন। প্রাথমিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, মাসিক ১৫-২০ হাজার ডলারে একটি মিশন স্থাপন করা হবে। যেখানে সকল বাঙালি কূটনীতিকরা যোগ দিবে। এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ওঠা বিভিন্ন বাঙালি সমিতিগুলোও আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু অর্থের নিয়মিত ব্যবস্থা করা না যাওয়ায় তা ততটা সহজ হয়ে ওঠেনি। উল্লেখ্য যে, এসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে দুটি মিশন প্রতিষ্ঠা নিয়ে অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বক্তব্য পাওয়া যায়। অধ্যাপক রেহমান সোবহানের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি মিশন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এজন্য

---

[১৪৫] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬১০
[১৪৬] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

প্রতি মাসে আনুমানিক ৫ হাজার ডলার খরচ হবে যা স্বেচ্ছাসেবকদের অনুদানে পাওয়া যেতে পারে। মিশন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ লীগের পক্ষ থেকে একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এই মিশনগুলো বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন এমনকি কমিটি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যকার লিয়াঁজো প্রতিষ্ঠার কাজ করবে। এর বাইরে মিশনের কাজ হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট, হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের পক্ষে তদবির করা। অন্যদিকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বক্তব্য ছিল তহবিল পাওয়া গেলে দুটি মিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে। তাঁর মতে এ মিশনগুলোর কাজ হবে সকল সম্ভাব্য সূত্র থেকে পাকিস্তানের সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ করা।[১৪৭] ইতিপূর্বে নিউইয়র্কে এ এইচ মাহমুদ আলীর মিশনের জন্য দুই হাজার ডলার আদায়ের প্রতিশ্রুতি কোনোভাবেই ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। শিকাগোর ফজলুর রহমান খানও এ ব্যাপারে তৎপর ছিলেন, তারপরও বেশিদূর অগ্রগতি হয়নি। মে মাসের শেষ সপ্তাহে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নিউইয়র্কে আসেন। বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন এস এ করিম ও এ এইচ মাহমুদ আলী। স্থপতি ফজলুর রহমান খান ও অধ্যাপক রেহমান সোবহানও নিউইয়র্কে আসেন বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে। সকলের উদ্দেশ্য অভিন্ন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ওয়াশিংটনে একটি মিশন স্থাপন করা। ৬ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল সমিতিগুলো শিকাগোতে এক সভায় মিলিত হয়। এ সভায় বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা নিয়ে আলোচনা হয়। সবাই জানতেন মিশন প্রতিষ্ঠার খরচ অনেক তারপরও উপস্থিত সকল সমিতির প্রধানরা নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে দুটো মিশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ সভায় এ এম এ মুহিত বলেন, ৫ মে থেকে মাহমুদ আলী নিউইয়র্কে মিশন পরিচালনা করছেন এবং বিভিন্ন সময় প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মিশন পরিচালনার জন্য তাঁকে তখন পর্যন্ত কোনো অর্থ দেওয়া হয়নি। তাই দুই মিশনের ধারণা অবাস্তব। শেষ পর্যন্ত আগস্টের শেষে **১২২৩** কানেকটিকাট এভিনিউতে বাংলাদেশ মিশন স্থাপিত হয়। মার্কিন আইন অনুযায়ী এটি হয় একটি নিবন্ধিত বিদেশি এজেন্ট। এই মিশনের প্রধান কাজ হয় মুজিবনগরের সঙ্গে যোগাযোগ, আমেরিকায় বাঙালি ও অন্যান্য বন্ধু গোষ্ঠীকে উৎসাহ প্রদান, বাংলাদেশ সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ, প্রচার ও জনমত গঠন এবং বিশেষ করে কংগ্রেসে উত্থাপিত সংশোধনী বা প্রস্তাবাবলীর জন্য তদবির করা। ৩ সেপ্টেম্বর থেকে মিশন একটি সাপ্তাহিক সংবাদ বুলেটিন প্রকাশ করতে থাকে। এই প্রকাশনার দায়িত্বে ছিলেন আবু রুশদ এবং তাঁর সহকারী ছিলেন শেখ রুস্তম আলী। বাংলাদেশ মিশনের সদস্যরা সর্বত্র আলোচনা সভা, সংবাদ সম্মেলন, টেলিভিশন প্রোগ্রাম, র‍্যালি, টিচ ইন ইত্যাদি কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকে। তবে অন্যতম প্রধান কাজ ছিল কংগ্রেসে ও ওয়াশিংটনের নানা মহলে বাংলাদেশের পক্ষে তদবির করা।[১৪৮]

ওয়াশিংটনে যে মিশন স্থাপন করা হয় তার কাজে প্রথম থেকে প্রধান ব্যক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন শামসুল কিবরিয়া। এনায়েত করিম দ্বিতীয়বার হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় ও নিউইয়র্ক থেকে আনোয়ারুল করিম সবসময় উপস্থিত হতে না পারায় পাকিস্তান দূতাবাসের প্রাক্তন রাজনৈতিক কাউন্সেলর হিসেবে শামসুল কিবরিয়াকে মিশন স্থাপনের

---

[১৪৭] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৪

[১৪৮] সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৮

গতানুগতিক অথচ প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাজ বিশেষ করে বাড়ি ভাড়া, ফার্নিচার ক্রয় থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ করতে হয়েছে। বাংলাদেশ মিশন কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে শামসুল কিবরিয়ার বক্তব্য উদ্ধৃত করছি-

> মিশন স্থাপন করা বেশ কঠিন ছিল। এটা আমি আপনাদেরকে বলছি এজন্যে যে আমাদেরকে তখন একটা বাড়ি ভাড়া করার জন্য যে বেশ বেগ পেতে হয়েছে, আমি এখন চিন্তা করলে সেটা বেশ ইমোশনালি স্মরণ করি। বেশ কয়েকটি জায়গাতে আমরা ভাড়া করার জন্য বাড়ি দেখেছি। কিন্তু বাড়ির মালিক যখনই শুনেছে কি কারণে কারা বাড়ি নিচ্ছেন, তখনই আমাদের রিফিউজ করেছেন। এক জায়গাতে আমরা সব ঠিক করেছিলাম কিন্তু শেষ মুহূর্তে বললো যে, আমরা রেবেলদেরকে বাড়ি ভাড়া দেব না। শেষ পর্যন্ত কানেক্টিকাট এভিনিউতে যখন একটা বাড়ি ভাড়া ঠিক করলাম সেটাও একই অবস্থায় শেষ মুহূর্তে আমাদের রিফিউজ করা হলো। আমরা এরপর বললাম প্রয়োজনে আমরা ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত আছি। একটা ব্যাংক থেকে লিখিত গ্যারান্টি যখন দিলাম যে ব্যাংক দায়ী থাকবে এত মাসের ভাড়া দেয়ার জন্যে, তখন লিজ সই করে আমরা একটা মিশন স্থাপন করতে পারলাম। সেই মিশন স্থাপন করার ফলে এটা বাংলাদেশ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিণত হলো এবং সেই যে স্থানটিতে আমরা বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপন করেছিলাম সেখানে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও প্রায় দেড় বছরের মতো সে স্থানে দূতাবাস ছিল।[১৪৯]

ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশনের জন্য বাড়ি খুঁজে পেতে কী পরিমাণ বেগ পেতে হয়েছে সে সম্পর্কে শাহ এ এম এস কিবরিয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা রয়েছে তাঁর স্মৃতিকথায়। তিনি লিখেছেন, মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি এম আর সিদ্দিকী ওয়াশিংটনে আসার পর অফিসের জন্য তারা বাড়ি খুঁজতে শুরু করেন। জর্জ টাউনে একটি বাড়ি পাওয়ার পর সবকিছু চূড়ান্ত হওয়ার পর বাড়ির মালিক জানান যে, তিনি তাদের বাড়ি ভাড়া দিবেন না। পরে আরেকটি বাড়ি খুঁজতে গিয়েও একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। তারা বুঝতে পারেন যে, কোনো বাড়ির মালিক একটি সংগ্রামী আন্দোলনের অফিস হিসেবে তাদেরকে বাড়ি ভাড়া দিবে না। এমনকি তারা যে বাড়ি ভাড়ার টাকা দিতে পারবে এমন ধারনাও তাদের ছিল না। অবশেষে একটি বাড়ির মালিককে ভাড়া দেওয়ার নিশ্চিতি হিসেবে ব্যাংকের গ্যারান্টি দেওয়ার পর বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়।[১৫০] অন্য আরেকটি সাক্ষাৎকারে শামসুল কিবরিয়া ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশনের কার্যক্রম কীভাবে শুরু করেছেন সে সম্পর্কে বলেছেন- সংগ্রামের শুরু থেকেই আমেরিকার গণমাধ্যম বাংলাদেশের নির্যাতিত মানুষের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। বাঙালি কূটনীতিক ও প্রবাসী বাঙালিদের জন্য এই সমর্থনের মূল্য ছিল অপরিসীম। সরকার বিরূপ হলেও কূটনীতিকরা জানতেন আমেরিকার সচেতন নরনারী ও সংবাদ মাধ্যম এবং বিশেষত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। এ বিষয়ে ওয়াশিংটনের বাঙালি কূটনীতিকরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। দূতাবাস ত্যাগ করার অল্প কিছুদিন পরই বাঙালি কূটনীতিকরা বাংলাদেশ মিশন নাম দিয়ে একটি অফিস স্থাপন করেন। দূতাবাসের মর্যাদা এই মিশনের ছিল না কিন্তু সবাই জানতো বাঙালি কূটনীতিকরা মুজিবনগর সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। স্বাভাবিকভাবেই সংবাদ মাধ্যমগুলো মুক্তিযুদ্ধের নানা বিষয়ে বাঙালি কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার বাঙালি কূটনীতিকরা করেছেন। বাংলাদেশ মিশন থেকে একটি সাপ্তাহিক বুলেটিন প্রকাশ করা হতো। এই বুলেটিন ছাপানোর এবং বিতরণ করার জন্য পোস্টাল স্ট্যাম্প এর খরচ বহন করার সামর্থ্য তখন বাঙালি

[১৪৯] এ এফ সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪-১০৫

[১৫০] শাহ এ এস এম কিবরিয়া, *পেছন ফিরে দেখা*, ঢাকা: ইউপিএল, ২০০৬। পৃ. ৯৯-১০০

কূটনীতিকদের ছিল না। কিন্তু এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বুলেটিনের প্রকাশনা ও বিতরণ এক সপ্তাহের জন্যও বন্ধ থাকেনি।[১৫১]

উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠার ব্যয় বহন করতে ভারত সরকারকে রাজি করায় মুজিবনগর সরকার।[১৫২] তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি মিশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এ এইচ মাহমুদ আলী। ৬ জুন বাংলাদেশ লীগের সভা হয়। এতে এম এ মুহিত নিউইয়র্ক বাংলাদেশ লীগের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। এ সভায় একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা এবং দূতাবাসের কর্মচারীদের আনুগত্য পরিবর্তন নিয়ে। দূতাবাসের কর্মচারীদের অবস্থান সম্বন্ধে এম এ মুহিত বলেন- যারা দূতাবাসে কাজ করবে তাদের ঔপনিবেশিক সরকারের অনুগত ভৃত্য হিসেবে বিবেচনা করে দেশের শত্রু মনে করা হবে। সারা দেশ যদি বিদ্রোহী হয়ে থাকে, এদের দখলকারীদের প্রতি আনুগত্যে কিছু যাবে আসবে না। দূতাবাসের কর্মচারীরা আন্দোলনে যোগ দিলে উত্তম কিন্তু তাদের যদি অসুবিধা থাকে তার জন্য মুষড়ে পড়ার কারণ নেই বা তা নিয়ে অনবরত সময়ক্ষেপণের প্রয়োজনীয়তা নেই।[১৫৩]

মিশনের অধিকাংশ সদস্যকেই দফতরের বাইরে বেশি ঘোরাফেরা করতে হতো। কংগ্রেসে লবিং, বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্রে কাজ, বাইরে জনসংযোগ, সংবাদপত্রের দফতরে অথবা সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ এসব কাজে সকলকেই হতে হয় গতিশীল। দফতর পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব নেন শামসুল কিবরিয়া আর তাকে সাহায্য করতেন সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী, আতাউর রহমান চৌধুরী, শরফুল আলম, আফতাবুদ্দিন আহমদ, মজিবুল হক ও আবু সোলায়মান। আফতাবুদ্দিন দফতরেই দৈনিক ১৮/২০ ঘন্টা বা তারও বেশি সময় কাটাতেন। এমনকি গোসলখানা দেখাশোনার কাজও তিনি নিজে করতেন। শেখ রুস্তম আলী কিছুদিনের মধ্যেই একটি সাপ্তাহিকী প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ৩ সেপ্টেম্বরে প্রথম বুলেটিন প্রকাশিত হয এবং ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৮টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এরপর বুলেটিনটি হয় পাক্ষিক এবং মে মাসের পাঁচ তারিখ মিশনটি দূতাবাসে উন্নীত হলে এই প্রকাশনা বন্ধ হয়। এই প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেন আবু রুশদ এবং এর মান নিঃসন্দেহে উঁচু অবস্থানে ছিল। আবদুর রাজ্জাক এবং ফজলুল বারি সব সময় কংগ্রেসে অথবা সংবাদ মাধ্যমের কাজগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সদস্যরাও কংগ্রেসে ব্যস্ত থাকতেন বেশি এবং তাই তথ্য কেন্দ্রের সঙ্গেই বেশি সম্পৃক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে এ এম এ মুহিতকে সকল মহলে বিশেষ করে কংগ্রেস, তথ্য কেন্দ্র, সংবাদ মাধ্যম, বিশ্বব্যাংক, ইউএসএইড এবং কৃষিসংস্থা, সংগঠিত সুশীল সমাজ এবং মিশন দফতরে-কিছু না কিছু সময় প্রতিদিন ব্যস্ত সময় কাটাতে হতো।[১৫৪]

সময়ের পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে মুজিবনগর সরকার কাঠামোর কাজ বিস্তৃত হতে থাকে। প্রায় ৫৫ জন প্রাক্তন সিভিল সার্ভিসের লোক মুজিবনগর সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোতে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ছিল। তাদের অনেকের পদমর্যাদা

---

[১৫১] *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৩

[১৫২] রেহমান সোবহান, *উতল রোমন্থন পূর্ণতার সেই দিনগুলো*, ভারত: সেইজ পাবলিকেশন্স, ২০১৮। পৃ. ৩৫০

[১৫৩] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬

[১৫৪] *ওই*, পৃ. ১২৮

ছিল যুগ্ম সচিব পর্যায়ের। মে মাসের দিকে আরো কিছু সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা কলকাতায় আসেন। তাদের নির্দিষ্ট তেমন কোনো কাজ ছিল না। যদিও তারা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করে কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। তাদের অনেকেই কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে হোসেন আলীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর কাছে সাহায্য চান। হোসেন আলী তাদেরকে দূতাবাসে কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করতে বলেন। এতে তারা সম্মত হলে হোসেন আলী তাদের জন্য দূতাবাসের একটি বড় কক্ষ চেয়ার, টেবিল, স্টেশনারীসহ সচিবালয়ের কাজ পরিচালনার জন্য ব্যবস্থা করেন। হোসেন আলীর উদ্দেশ্য ছিল এখানে কাজের মাধ্যমে তারা যেন বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো তৈরির একটি সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন। পরবর্তীতে তাদের সকলকে ফার্নিচার ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সহ ৮ থিয়েটার রোডে স্থানান্তর করা হয়। এভাবে দূতাবাসের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে হোসেন আলী নিজে যেমন কাজ করেছেন তেমনি সিভিল সার্ভিসের অনেককে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন।

৪.১.ঝ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তহবিল সংগ্রহ

মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য ১০ কোটি রুপি প্রদান করে। এ অর্থের ভিত্তিতেই সরকার পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ ফান্ড নামে আলাদা একটি তহবিল গঠন করা হয়। যেখানে শরণার্থীদের জন্য আসা সাহায্যের অর্থ জমা রাখা হতো এবং সেখান থেকে বিতরণ করা হতো। মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহ ও সামগ্রিক সরকার পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকারের টাকার প্রয়োজন ছিল। এ টাকা বিভিন্ন ভাবে বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে জমা হতো। বিশেষ করে যেসকল বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করেছেন তারা দূতাবাস ত্যাগ করার পূর্বেই পাকিস্তানের দূতাবাস পরিচালনার জন্য যে অর্থ ব্যাংকে জমা ছিল তা উঠিয়ে নেন এবং পরবর্তীতে তা মুজিবনগর সরকারের কাছে হস্তান্তর করেন। এক্ষেত্রে এম হোসেন আলী, আবুল ফতেহ'র নাম উল্লেখযোগ্য। আবার অনেক কূটনীতিক বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য নিজেরাই তহবিল গঠন করতেন। তহবিল সংগ্রহের জন্য তারা পোস্টার, লিফলেট, পত্রিকা ছাপাতেন। আবার কেউ বাংলাদেশ সরকারের মনোগ্রাম ব্যবহার করে টাই, টাইক্লিপ, টুপি, ব্যাজ তৈরি করে বিক্রিত অর্থ বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে পাঠাতেন। এছাড়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা প্রশাসক হিসেবে যারা দায়িত্বে ছিলেন তারাও নিজের কর্মস্থল ত্যাগ করার পূর্বে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের টাকা নিয়ে আসতেন এবং মুজিবনগর সরকারকে দিয়ে দিতেন। এভাবেই প্রতিনিয়ত মুজিবনগর সরকারের তহবিল গড়ে ওঠে। সরাসরি কোনো অর্থ মুজিবনগর সরকারে নেওয়া হতো না। অর্থমন্ত্রী হিসেবে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর নামে যে তহবিল ছিল তার মাধ্যমে এসব টাকার জমা-খরচ নির্বাহ করা হতো।[১৫৫] ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে অনেক এ্যাকশন কমিটি গঠিত হয়। এসব এ্যাকশন কমিটি প্রধানত দুটি কাজ সম্পন্ন করতো। প্রথমত: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা এবং দ্বিতীয়ত: মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে তহবিল সংগ্রহ। বিভিন্ন সংগঠনের সংঘবদ্ধ উদ্যোগ ছাড়াও ইউরোপের অনেক ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে অর্থ সাহায্য করতে

[১৫৫] শামসুল হুদা চৌধুরী, *একাত্তরের রণাঙ্গন*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২। পৃ. ৩১৭

আগ্রহ প্রকাশ করে। এ প্রয়োজন থেকে ইংল্যান্ডে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর উদ্যোগে বাংলাদেশ ফান্ড নামে তহবিল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ফান্ডের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ একজন চাটার্ড একাউটেন্ট কাজী মুজিবুর রহমান এসিএ কে অডিটর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। তিনি লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনের অডিট ও একাউন্টস ডিভিশনের পরিচালক এম এ লুৎফুল মতিনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ফান্ডের একটি অডিট রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। উক্ত রিপোর্টটি ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রিত অবস্থায় প্রকাশ করা হয়।[১৫৬] মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন দেশে তহবিল সংগ্রহ করে বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রেরণ করা হতো। জাপানে অবস্থানরত বাঙালি কূটনীতিকদের প্রচেষ্টায় জাপানের বাঙালিদের উদ্যোগে গঠিত Bangladesh Solidarity Front গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে কানসাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সেতসুরেই তরুসীমার নেতৃত্বে এই সংগঠন গড়ে ওঠে এবং তাদের সংগৃহিত তহবিলের অর্থ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের জন্য গরম কাপড়, গুড়ো দুধ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করে বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রেরণ করে। সরকার এগুলো মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করে।[১৫৭] জাপানের বাঙালি কূটনীতিকরা নিজেরা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তহবিল সংগ্রহ করতেন না। জাপানিরা তহবিল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের কথা না বলে ১৯৭০ সালে সৃষ্ট ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ ও ভারতে আশ্রয় নেওয়া এক কোটি শরণার্থীর সাহায্যের জন্য তহবিল গঠন করতো। জাপানিরা ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে রেডক্রসের মাধ্যমে পাঠাতো। জাপানিরা বাঙালি কূটনীতিকদের জিজ্ঞেস করতো কী পাঠাবে, কোথায় পাঠাবে। ওই সুযোগে মুজিবনগর সরকারের অনুরোধে কূটনীতিকরা Duel Function Material অর্থাৎ যৌথভাবে বন্টন করার জন্য সংগ্রহকৃত ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বেশ কিছু জিনিস পাঠাতেন। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কিছু সোয়েটার, গরম কাপড় পাঠাতেন। শরণার্থীদের নামে ভিন্ন প্যাকেটে চিহ্নিত করে মুক্তিবাহিনীর জন্য কাপড় পাঠাতেন। বাঙালি কূটনীতিকরা মুক্তিবাহিনীর জন্য ওয়াকিটকিও পাঠাতেন। জাপানি আইনে এটি রপ্তানি করা বেআইনি নয় কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে পাঠানো বেআইনি। এজন্য কূটনীতিকরা ওয়াকিটকিগুলো শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের জন্য প্রয়োজন বলে পাঠাতেন। এর বাইরে বাঙালি কূটনীতিকরা নিজেদের মধ্যে, জাপানে অবস্থানরত বাঙালি ও যেসব জাপানি তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে একটা তহবিল গঠন করার চেষ্টা করেন। তারা একটা ব্যাজ তৈরি করেন যাতে বাংলাদেশের লাল সবুজ ও সোনালী রংয়ের মানচিত্র খচিত ছিল। এটি তৈরি করতে তাদের ৫০ ইয়েন খরচ হতো। কূটনীতিকরা সে ব্যাজ ৩০০/৪০০ ইয়েন করে বিক্রি করতো এবং বলে দিতো যে যতটা পারে কিনে নিয়ে জাপানিদের বিনামূল্যে বিতরণ করতে। বিক্রিলব্ধ অর্থ পরে বাঙালি কূটনীতিকদের কাছে পাঠিয়ে দিতো। এ ব্যাজ বিক্রি করেও তারা কিছু তহবিল গঠন করেছিলেন। পরবর্তীতে এই ব্যাজের নমুনা যেসব দেশে বাংলাদেশের মিশন খোলা হয়েছিল সেখানে পাঠিয়ে দেন। এর বাইরে বিভিন্ন স্থান থেকে এই ব্যাজের জন্য তাদের কাছে অনুরোধ আসতে থাকে। জাপানের বাঙালি কূটনীতিকরা এই ব্যাজ সুইডেন, লন্ডনেও

[১৫৬] খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

[১৫৭] Nurul Islam, *Making of a Nation Bangladesh An Economist Tale*, Dhaka: UPL, 2001. p.139

পাঠিয়েছিলেন। প্রথমদিকে বাঙালি কূটনীতিকদের আনুগত্য পরিবর্তনে বিলম্ব ও পরবর্তীতে জাপান সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা প্রকাশ্যে এসব কাজ করতে পারতেন না। এসব কাজে যেসব বাঙালি সহায়তা করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন- ইস্কান্দার চৌধুরী, এস এ জালাল (১৯৭২ সালে জাপানের বাংলাদেশ দূতাবাসে আত্মীভূত হন), তৎকালীন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডিরত ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজের শিক্ষক ড. আমিনুল ইসলাম, ড. নুরুজ্জামান (পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের ডিরেক্টর জেনারেল ফিশারিজ)।[১৫৮]

বাংলাদেশ আন্দোলনের জন্য কাজ করতে গিয়ে জাকার্তার পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালিরা অর্থ সংকটের সম্মুখীন হন। বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠন ও প্রচার কাজের জন্য তাদের অফিস, টাইপ রাইটার, সাইক্লোস্টাইল মেশিন প্রয়োজন হয়। কিন্তু এসব কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাদের ছিল না। বিদ্যমান অর্থ সংকট কাটানোর জন্য প্রথমদিকে তারা মুজিবনগর সরকারের কাছে চিঠি প্রেরণ করেন। কিন্তু মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের আর্থিক সাহায্য না পেয়ে নিজেরাই একটি ফান্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে মোতাবেক ফান্ড গঠনের জন্য তারা নিজেদের মধ্যে থেকে চাঁদা তুলেন। প্রাথমিকভাবে তাদের তহবিলে অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬১০ ডলার। আবুল ফজল শামসুজ্জামান নিজে ২৯২ ডলার চাঁদা দেন। সিদ্দিক আহমদ ৮৮ ডলার, আবদুল হালিম সরকার ৭৬ ডলার, রুহুল আমিন ৪১ ডলার, মাহমুদ হোসেন ৩৪ ডলার এবং আবদুল মালেক ৫ ডলার চাঁদা দিয়েছিলেন। শেষের দিকে মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ তাদের দলে যোগ দিলে তিনি চাঁদা দেন ৮৫ ডলার। এ ফান্ড থেকে তারা কিছু ডলার কলকাতার মিশনে পাঠান বাংলাদেশ ফান্ডে। তহবিলের টাকা খরচ করে তারা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সমর্থনের জন্য বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জাতিসংঘের নিকট টেলিগ্রাম পাঠান। ১৪০ ডলার খরচ করে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৯০টি নতুন গরম কাপড় কিনে পাঠান।[১৫৯]

সুইজারল্যান্ডের পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব ওয়ালিউর রহমান বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর সুইস পার্লামেন্টের সামনে কিশোর-কিশোরীদের একটি সমাবেশে যোগ দেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে এ সমাবেশ থেকে প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন ফ্রাঁ সংগ্রহ করা হয়। যা পরবর্তীতে সুইজারল্যান্ডের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মাধ্যমে বাংলাদেশে সাহায্য হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। ইউরোপে সবাই এমনকি সুইজারল্যাণ্ডের বাচ্চা শিশুরাও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম জানতো। এ সভা থেকে যে তহবিল সংগ্রহ করা হয় তা একটি ছেলে ও একটি মেয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে ওয়ালিউর রহমানকে বলেন, তারা শেখ মুজিবের দেশে এ টাকা পাঠাতে চান। কেননা তারা শেখ মুজিবের জন্য এই টাকা পাঠাচ্ছে। তারা ওয়ালিউর রহমানের কাছে এই টাকাটা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে যাবে কিনা জানতে চান।[১৬০]

---

[১৫৮] গবেষকের সঙ্গে কমর রহীম এর সাক্ষাৎকার, ১৯ মার্চ ২০১৮
[১৫৯] আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
[১৬০] গবেষকের সঙ্গে ওয়ালিউর রহমান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯

কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের উপ হাইকমিশনার এম হোসেন আলী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করার পর মিশনের যে তহবিল ছিল তা নিজের হস্তগত করেন। পরবর্তীতে তহবিলের পুরো টাকা তুলে দিয়েছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের হাতে।[১৬১] ১৭ এপ্রিল সকালে হোসেন আলী মিশনের ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত সাত লাখ টাকার মধ্যে চার লাখ টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নেন এবং বাকি টাকা নিজের ব্যক্তিগত হিসাবে স্থানান্তর করেন।[১৬২] অন্য এক সূত্রে জানা যায়, পাকিস্তানের বৈদেশিক দফতরের তরফ থেকে হোসেন আলী স্থানীয় ন্যাশনাল এন্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাংকে ৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা জমা রেখেছিলেন। মুজিবনগর সরকার তাঁকে ওই টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নেওয়ার পরামর্শ দেয়। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সন্দেহ এড়াতে নিজস্ব চেকে ১ লাখ টাকা করে পুরো টাকাটাই ব্যাংক থেকে উঠিয়ে নেন।[১৬৩] একই ধরনের কাজ করেন ইরাকে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ। তিনি ইরাক ত্যাগ করার পূর্বে দূতাবাসের হিসাবে রক্ষিত ২৫০০০ ডলার (মতান্তরে ২৮০০০ ডলার) ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে ইরাকের ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে মুজিবনগর সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন। যেটি ছিল মুজিবনগর সরকারের প্রথম বৈদেশিক আয়। অবশ্য কলকাতাস্থ বাঙালি কূটনীতিক তাঁর ডায়েরিতে বাংলাদেশের জন্য প্রারম্ভিক পর্যায়ের কীভাবে তহবিল সংগ্রহ হতো বা মানুষ কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার জন্য টাকা-পয়সা দিতেন সে সসম্পর্কে লিখেছেন-

> From now on we started receiving donations and gifts in cash & kind every day from morning till evenings, sometimes late at night. The rear balcony of the Mission premises used to be all the time filled up. Sometimes to the roof, with commodities of various kinds. Small boys & girls, teachers of primary school & even ordinary poor people would come & hand over money or material.
>
> The articles must have been valued at not less than Indian Rupees 1 million over the months the cash donations were to the extent of over Indian Rupees 1.6 million.
>
> At the initial stage when there were thousands of visitors in the Mission & we were not properly organized, people would thrust money into my hands & sometimes into my pockets. They would ask me to use the money to run the Mission, thinking that we had no money.
>
> Soon after we introduced a system of printed receipts, but at the same time, along with the receipts, we would also issue letters of thanks.

এসময় হোসেন আলী সিদ্ধান্ত নেন যে, কলকাতাস্থ দূতাবাসে সংগৃহিত ও জমাকৃত সকল অর্থ মুজিবনগর সরকারের হাতে তুলে দিবেন। কিন্তু তাঁর এ সিদ্ধান্তে বাঙালি সহকর্মীরা ভেটো দেয়। তাদের যুক্তি ছিল এই অর্থ মুজিবনগর সরকারের হাতে তুলে দিলে তা অপব্যবহার হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, মুক্তিযুদ্ধকালীন কলকাতাস্থ দূতাবাসে মুজিবনগর সরকারের নামে একটি তহবিল গঠন করা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা অর্থ এখানে জমা হতো। যা দূতাবাসের প্রধান হিসেবে ত্রাণ, সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর নির্ধারিত স্বাক্ষর সহ স্লিপের মাধ্যমে টাকা দেওয়া হতো। মুজিবনগর

---

[১৬১] শামসুল হুদা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭

[১৬২] P.V. Rajgopal edited, *The British the Bandics the Bordermen From the Diaries and Articles of K.F. Rustamji*, Delhi: Wisdom Tree, 2009. pp. 309-312

[১৬৩] *দৈনিক সংবাদ*, ১০ মার্চ ১৯৯৭

সরকার শপথ গ্রহণ করার একমাস পর ২০ মে সন্ধ্যায় বাংলাদেশ দূতাবাস ভবনে দুটি ট্রাক আসে। বাংলাদেশের ভেতরে কয়েকটি ব্যাংকের ভল্ট ভেঙ্গে এ দুটো ট্রাকে করে টাকা নিয়ে আসা হয়েছিল। মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলী এবং অর্থসচিব আসাদুজ্জামান জানান, এই টাকা দূতাবাসের ভেতরেই নিরাপদ থাকবে। হোসেন আলী লোহার গ্রিল ও দরজা দ্বারা সুরক্ষিত দুটো ঘরে এগুলো রাখার ব্যবস্থা করে বলেন যে, এই টাকা কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা সরকারই ঠিক করবে। ওই সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্টেট ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের বেশিরভাগ শাখা থেকে অনেকেই টাকা নিয়ে এসেছিলেন।[১৬৪] যার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। বিশেষ করে ঝিনাইদহ মহকুমা প্রশাসক ওয়ালিউল ইসলাম সেখানকার ন্যাশনাল ব্যাংকের ম্যানেজারের সহায়তায় কিছু টাকা নিয়ে এসেছিলেন। আরো দু'একজন সরকারি কর্মচারী কিছু কিছু করে টাকা নিয়ে এসেছিলেন। এগুলো ছিল মুজিবনগর সরকারের একমাত্র আয়। বগুড়া থেকে বেসরকারি উদ্যোগে প্রচুর টাকা আসার সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এক নগণ্য অংশ মাত্র সরকারি তহবিলে জমা হয়েছিল।[১৬৫] খোন্দকার আসাদুজ্জামান মুজিবনগরে অর্থ সচিবের দায়িত্ব যে রকম সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন তা নিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

৪.১.ঞ পাকিস্তান সরকারের মিথ্যা প্রচারণা ও জাতিসংঘের কার্যক্রমের প্রতিবাদ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি এই আন্দোলনকে বায়াফ্রার মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে চিত্রায়িত করতে চেয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্ব থেকেই পাকিস্তান সরকার তাদের পক্ষে বিশ্ব সমর্থন আদায় ও বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সমগ্র বিশ্বের চোখে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে পরিণত করার জন্য একের পর এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে। তাদের এসব ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সময় তাদের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের বিদেশে পাঠায়। সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে যাদেরকে বিদেশে পাঠাতো তাদের মূল কাজ ছিল বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য প্রচার করা। প্রতিনিধি হিসেবে যাদেরকে পাকিস্তান সরকার পাঠাতো তারা সকলেই ছিলেন এসব কাজে সিদ্ধহস্ত। পাকিস্তান সরকারের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নিজেও তাঁর অনেক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে মিথ্যাচার বক্তব্য দিয়েছেন। যা ছিল একান্তই তার মনগড়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাপ্তাহিক পত্রিকা *নিউজউইক* এর প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সীমা অতিক্রম না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর শেখ মুজিবকে মুক্তিদান এবং পূর্ব বাংলা থেকে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের প্রস্তাব সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন- 'শেখ মুজিব পূর্ব বাংলায় ফিরে গেলে তার নিজের লোকজন তাকে মেরে ফেলবে। তাদের দুর্ভোগের জন্য শেখ মুজিব দায়ী বলে তারা মনে করে। তাকে এখন মুক্তি দেওয়ার প্রশ্ন অবান্তর। দু বছর যাবৎ অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে তার সঙ্গে আলোচনার পর শেখ মুজিব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ছয় ব্যাটালিয়ন সৈন্য এবং পুলিশবাহিনী ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এর মোট ৬০ হাজার সশস্ত্র সদস্য তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। পুনরায় তার সঙ্গে আলোচনা শুরু করা ইয়াহিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। খেয়ালখুশি মত

---

[১৬৪] মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ যুদ্ধদিনের কথা* ১৯৭১, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭। পৃ. ৯৮-৯৯
[১৬৫] বি বি বিশ্বাস, *একাত্তরে মুজিবনগর*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪। পৃ. ৪৫

তাকে সে মুক্তিদানের অনুমতি দিতে পারে না। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তবে জাতীয় দাবি হিসেবে তা উত্থাপন করা হলে সে তা মেনে নিবে।'[১৬৬]

কে এম শিহাবুদ্দিন দিল্লিতে অবস্থান করে পাকিস্তানের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। বিশেষ করে নির্বাচিত বাঙালি জনপ্রতিনিধিদের ব্যাপারে পাকিস্তানের মিথ্যাচারের প্রতিবাদ জানান তিনি। ১৯৭১ সালের ৭ আগস্ট পাকিস্তান সরকার পাকিস্তান রেডিও'র মাধ্যমে প্রচার করে যে, আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ৮৮ জন সংসদ সদস্য জাতীয় পরিষদ থেকে তাদের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তারা এ-ও প্রচার করতে থাকে যে, এই ৮৮ জন সংসদ সদস্যকে ভারতে আটকে রাখা হয়েছে। তাই তারা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারছে না। ইয়াহিয়া সরকারের এ ধরনের প্রচারণার সঙ্গে ভুট্টোও তাল মিলিয়ে বক্তব্য দিতে থাকে। এমন অবস্থায় কে এম শিহাবুদ্দিন জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত অনেক সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। তারা ইয়াহিয়া সরকারের এমন ঘৃণ্য কাজের প্রতি তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা এ প্রচারণার বিরুদ্ধে বলেন-

> They unequivocally condemned the Pakistani propaganda against them and said that they would fight until their death for the complete liberation of Bangaladesh. They firmly stated that they would never go back to Pakistan, which was dead for them.[১৬৭]

এমন অবস্থায় কে এম শিহাবুদ্দিন ১৯ আগস্ট বাংলাদেশ সরকারের নিকট একটি চিঠি লিখেন এই মর্মে যে, অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের সকল নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে একটি সভা করার জন্য। যা অনুষ্ঠিত হবে ভারতে অথবা মুক্তাঞ্চলে। এর মাধ্যমে তাদের দিয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করে সকলকে জানানো হবে যে, পাকিস্তান সরকার যে প্রচারণা করছে তা সর্বৈব মিথ্যা। এ চিঠিতে শিহাবুদ্দিন আরো উল্লেখ করেন যে, শুধু রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করলে হবে না, পাকিস্তান সরকারের অপপ্রচারের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হবে। ভারত সরকারও পাকিস্তানের হীন মানসিকতাসম্পন্ন অপপ্রচারের ব্যাপারেও হতাশা ব্যক্ত করে এবং বলে যে, বাংলাদেশ সরকার কার্যকরীভাবে এটি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পাকিস্তান সরকারের মিথ্যা অপপ্রচারের জবাব দিতে মুজিবনগর সরকারের পক্ষে কে এম শিহাবুদ্দিন একটি সংবাদ বিবৃতি প্রদান করেন। যা ভারতীয় গণমাধ্যমে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে তিনি বলেন-

> It is preposterous on the part of Mr. Bhutto who has connived at and abetted the planned genocide, arson and looting being perpetrated in Bangladesh by General Yahya Khan and his military junta to say that India has kept several MNAs and MPAs as hostage. It is common knowledge that these MNAs and MPAs along with millions of others had to come to safety in India to escape death at the hands of Islamabad's predatory hordes. I can state clearly that many of them were working in liberated areas and none of them will be going back to occupied areas until Yahya's barbarous foreces are completely driven out from those areas.

---

[১৬৬] *Newsweek*, 1 November 1971; আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫
[১৬৭] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 112

I take this opportunity to urge upon the international community to ensure the safety and release of our people in West Pakistan who have been kept as hostage by Gen. Yahya Khan (for exchange against Pakistani prisoners of war).[১৬৮]

পাকিস্তান সরকারের এমন ধরনের মিথ্যা প্রচারণার পাশাপাশি এসময় কিছু ঘটনা ও একটি বিবৃতি নিয়ে বাংলাদেশ সরকার বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপ-উপাচার্য ভারতের অল ইন্ডিয়া রেডিওতে বিবৃতি দেন যে, তিনি বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের ব্যক্তি। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসমাগমে তিনি পরামর্শ দেন যে, বর্তমান সংকটের সমাধান প্রকৃতঅর্থেই পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যেই সম্ভব যদি পাকিস্তান কনফেডারেশন ব্যবস্থা হারাতে চায়। এ সংবাদে কে এম শিহাবুদ্দিন হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অল ইন্ডিয়া রেডিও'র মহাপরিচালক এ কে সেনকে টেলিফোন করে এসব মিথ্যাচার ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদনহীন বিবৃতি প্রচার বন্ধ করার অনুরোধ করেন। শিহাবুদ্দিন এ বিষয়টি মুজিবনগর সরকারকে অবহিত করেন যাতে ওই অধ্যাপকের ভ্রমণের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। পাশাপাশি কোনো বিবৃতি দেওয়ার পূর্বে মুজিবনগর সরকারকে সে সম্পর্কে অবগত করার নির্দেশ প্রদান করতে বলেন।[১৬৯]

১৯৭১ সালের মে মাসে পাকিস্তান সরকার *দৈনিক ডন* পত্রিকার নাসিম আহমদ ও *ক্রিশ্চিয়ান সাইন্স মনিটরের*র কুতুবুদ্দিন আজিজকে ওয়াশিংটনে পাঠায়। এরা পাকিস্তান দূতাবাসের জনসংযোগ কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু প্রকাশ্যে স্বাধীন সাংবাদিক হিসেবে ভুয়া পরিচয় দিতেন। ১২ মে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি অধ্যাপক রেহমান সোবহান ওয়াশিংটনে যে সংবাদ সম্মেলন করেন সেখানে তারা উভয়ে হাজির হন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সংবাদ সম্মেলনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। কিন্তু অবস্থা সুবিধের না হওয়ায় তারা সটকে পড়েন। এ সময় মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিং করতেন। পাকিস্তানি এই দুই জন সাংবাদিক স্টেট ডিপার্টমেন্টের সংবাদ ব্রিফিং এ যেতেন। তারা এমনভাবে তত্ত্বকথা শোনাতেন যেন তারা অনেক উচ্চমার্গীয় জ্ঞানের অধিকারী। বাঙালি কর্মচারী আবদুর রাজ্জাক খানের সঙ্গে এরা তর্কে লিপ্ত হন। সংবাদ ব্রিফিং এ রাজ্জাকের উপস্থিতি নিয়ে নাসিম আহমদ প্রশ্ন করলে রাজ্জাক জনসমক্ষে বলে দেন, নাসিম কোনো সাংবাদিক নয়, সে দূতাবাসের একজন কর্মচারী। সাংবাদিক না হওয়ায় সে সংবাদ ব্রিফিং এ উপস্থিত হতে পারে না।[১৭০]

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে পাকিস্তান সরকার একপেশে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে ধোঁকা দেওয়ার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তা দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে সকল মহলকে বাংলাদেশের ব্যাপারে মনোযোগী করে তোলে। দুটি ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়াতে। পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অভ্যন্তরীণ সংকট এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক এ অভিমত প্রকাশ করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য তিনটি জাপানি জাহাজ বোঝাই চাল অশান্ত পরিস্থিতির কারণে চট্টগ্রাম থেকে ফিরে আসে। পাকিস্তান সরকার জাহাজের চাল করাচিতে খালাস করতে বললে জাহাজ

[১৬৮] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 113
[১৬৯] *Ibid*, pp. 114-115
[১৭০] আবুল মাল আবদুল মুহিতের টেলিফোনে নেওয়া সাক্ষাৎকার, ৫ মার্চ ২০১৯

কর্তৃপক্ষ তা অস্বীকার করে। অবশ্য পরে তা জাকার্তায় এসে খালাস করে।[১৭১] এর মাধ্যমে এতোদিনের পাকিস্তান সরকারের তথ্য সন্ত্রাস ফাঁস হয়ে যায়। একইসময় আরেকটি ঘটনা ঘটে ইন্দোনেশিয়াতে। পাকিস্তানি বাহিনীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ ছাত্র জাকার্তায় পাকিস্তানি দূতাবাসে ৭ এপ্রিল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সামরিক শাসনাধীনে মিছিল নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এ বিক্ষোভ সমাবেশ ঘটানোর অভিযোগে দু'জন ছাত্রনেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ছাত্ররা দাবি করে যে, তাদের বিক্ষোভ কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয় বরং বাংলাদেশের ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি সংহতি ও সমবেদনা প্রকাশ মাত্র।[১৭২] মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ইসরায়েলকে নিয়েও পাকিস্তান সরকার মিথ্যাচার করে। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই ইসরায়েল ও পার্লামেন্ট নেসেট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানায়। বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের জন্য ইসরায়েলের রেডক্রস কাপড়, খাদ্য পাঠানোর ঘোষণা দেয়।[১৭৩] প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এ সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেও পাকিস্তান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ইসরায়েল সমর্থনের অপপ্রচার চালায়।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরী পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ সফর করে লন্ডন পৌঁছেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাবার জন্য তাঁকে এবং গণতন্ত্রী দলের নেতা মাহমুদ আলীকে বিদেশে পাঠানো হয়। ইউরোপের দেশগুলো সফর করে হামিদুল হক চৌধুরী বাংলাদেশ সম্পর্কে যেসব কথা বলেন তার মূল বক্তব্য ছিল- শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তা চায় না। বিগত নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে তারা পাকিস্তান ধ্বংস করার ম্যান্ডেট তাকে দেয়নি। মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ও সাহস আওয়ামী লীগের নেই। বাঙালিদের সাহসের অভাব সম্পর্কে তিনি ফেনিয়ে ফাপিয়ে গল্প বললেন। পতেঙ্গায় বিমানবন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ার দখলকারী বাঙালি সৈন্যরা নাকি পাঠান সৈন্যদের দেখে হাতের বন্দুক ছুড়ে ফেলে স্যালুট দিয়ে দাঁড়ায়। ব্যঙ্গ করে তিনি বললেন, এদের দিয়ে শেখ মুজিব যুদ্ধ করবে! তিনি বললেন, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ ভারতের হাতের পুতুল মাত্র। ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তান দখল করে তাহলে মুসলমানরা এক হাজার বছর ধরে হিন্দুদের গোলাম হয়ে থাকবে।[১৭৪]

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ভারত চেয়েছিল বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধ এবং সেখান থেকে চলে আসা শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ।[১৭৫] কিন্তু পাকিস্তান শরণার্থী প্রশ্নে জাতিসংঘের জড়িত হওয়ার বিষয়টিকে মেনে নিতে চায়নি এবং এ ধরনের যেকোনো উদ্যোগকে পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল বলে মনে করে।[১৭৬] কিন্তু মে মাসের মাঝামাঝি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শে ইয়াহিয়া খান জাতিসংঘের যাবতীয় উদ্যোগ মেনে নিতে সম্মত হন। এ সময়

---

[১৭১] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৯

[১৭২] *Hindustan Times* (India) 4 May 1972

[১৭৩] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করণে বঙ্গবন্ধুর অবদান', *মাসিক অগ্রপথিক*, আগস্ট ১৯৯৭, পৃ. ৩৮

[১৭৪] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫

[১৭৫] Robert Jackson, *South Asian Crisis*, Delhi: Vikas Publishing House, 1987. pp. 60-61

[১৭৬] Hasan Zahir, *The Separation of East Pakistan: The Rise and Revolution of Bengali Muslim Nationlism*, Dhaka: UPL, 1994. pp. 251-253

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মুসলিম দেশগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তান জাতিসংঘের বিভিন্ন ফোরামে কূটনীতিক তৎপরতায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। পাকিস্তান আশা করেছিল এতে হয়তো জাতিসংঘের চাপে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন দান করতে বিরত থাকবে। পাশাপাশি পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের যে 'কল্পনাপ্রসূত' তালিকা তারা তৈরি করেছে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় তাদের প্রত্যাবর্তন করানো সম্ভব হবে।[১৭৭] কিন্তু ভারত অচিরেই পাকিস্তানের এই উদ্দেশ্যটি বুঝতে পারে। ফলে ভারত জাতিসংঘের মানবিক উদ্যোগের আড়ালে রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণের তীব্র বিরোধিতা করে।[১৭৮] জাতিসংঘের মহাসচিব এ সময় কিছুটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিপূরক ভূমিকা পালন করেন। গণহত্যা বন্ধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিক কার্যত নীরব থাকলেও ১৯ জুলাই প্রস্তাব করেন যে, শরণার্থী সমস্যার সমাধানে ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা হোক। এতে মুজিবনগর সরকার ও ভারত সরকারের বিরোধিতার ফলে জাতিসংঘের কর্মকর্তারা শরণার্থী সংস্থার পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাবটি বাতিল করে দেয়।[১৭৯]

প্রস্তাবটি নাকচ হওয়ার পূর্বেই অবশ্য ভারতে আশ্রয় নেওয়া উদ্‌বাস্তুদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য জাতিসংঘ ৫০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়। শরণার্থী সংক্রান্ত হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খাঁ এ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। প্রতিনিধি দলটি ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন শেষে ২৪ জুন ওয়াশিংটনে জাতিসংঘ উদ্‌বাস্তু হাইকমিশনার সদরুদ্দিন আগা খান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্সের সঙ্গে এক বৈঠকে উদ্‌বাস্তু প্রশ্নে ভারতের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। তাদের এ সমালোচনার জবাবে পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি নিয়ে মুজিবনগর সরকারের প্রতিক্রিয়া জানায় কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের হাইকমিশনার হোসেন আলী। এম হোসেন আলী মুজিবনগর সরকারের পক্ষে প্রবল ঘৃণার সঙ্গে উথান্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, উদ্‌বাস্তু আগমন বন্ধ করতে হলে সামরিক হামলা বন্ধ করতে হবে এবং আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলী এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করেন কেন এই পর্যবেক্ষক? কী তাঁদের উদ্দেশ্য? হোসেন আলীর অভিযোগ বাংলাদেশে যখন ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনী ব্যাপকহারে তান্ডবলীলা চালিয়েছে তখন জাতিসংঘ ঘুমিয়ে ছিল। পর্যবেক্ষকদের পাকিস্তান সেনানিবাসগুলোতে গিয়ে অপহৃতা মেয়েদের খোঁজ করতে বলেন। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো তরুণীদের খোঁজ নেওয়ার কথা বলেন। যেসব ঘর পুড়েছে, যেসব জায়গায় লুটপাট হয়েছে সেগুলোর অবস্থা দেখা উচিত। তাদের দেখা উচিত কত রক্ত বাংলায় ঝরেছে। কত লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে। হোসেন আলী সাংবাদিকদের বলেন যে, পর্যবেক্ষক দল নাকি ভারত থেকে শরণার্থীদের নিরাপদে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করবেন। কিন্তু সকলেই জানেন, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সরকার না হলে বাংলাদেশে শরণার্থীরা ফিরে যাবেন না। হোসেন আলী সাংবাদিকদের জানান যে, 'পর্যবেক্ষক যেতে হলে পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়া উচিত যাতে সেখান থেকে বাংলাদেশে আরও মানুষ হত্যা করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠানো না হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের

---

[১৭৭] Robert Jackson, *ibid*, p. 66

[১৭৮] *Ibid*, p. 61

[১৭৯] *জয়বাংলা*, ৩০ জুলাই ১৯৭১

বিমান ঘাঁটিতে ও বন্দরে তাঁদের বসিয়ে আরও অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠানো বন্ধ করা দরকার। গণতন্ত্র, মানবতা ও সভ্যতার প্রশ্নে আপস নেই বলে পশ্চিম পাকিস্তানে আজ পর্যবেক্ষক পাঠানো অনিবার্য হয়ে পড়েছে।[১৮০] মুক্তিবাহিনীর একজন মুখপাত্র কলকাতার একটি পত্রিকাকে জানান, বাংলাদেশের মাটিতে জাতিসংঘ কোনো পর্যবেক্ষক নিয়োগ করলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে না। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে জাতিসংঘের দ্বন্দ্ব বাধছে, তা টের পেয়ে উথান্টের নির্দেশে পরে নিউইয়র্কে বাঙালি কূটনীতিকদের সঙ্গে একটি সমঝোতা বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়।[১৮১]

পাকিস্তান দূতাবাস লন্ডনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের তৎপরতা দমিয়ে রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেও ২/৪ জনকে দিয়ে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা চালাতে শুরু করে। ২৭ জুন বার্মিংহামের সভায়ও তারা বাঙালি স্বার্থবিরোধী একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাসহ এক যুবককে পাঠায়। সে পত্রিকা বিলি করতে শুরু করলে আন্দোলনকারী জনতা তাকে নাজেহাল করে। শেষপর্যন্ত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর হস্তক্ষেপে সে রেহাই পায়। এর আগে লন্ডন এ্যাকশন কমিটির এক সভায় এই পত্রিকা পুড়িয়ে পাকিস্তান দূতাবাসের ন্যক্কারজনক কাজের প্রতিবাদ জানানো হয়।[১৮২]

নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের প্রাক্তন উপদেষ্টা হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ১২ অক্টোবরের বক্তৃতা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, "বেহায়া" নতুন কিছু বলেননি। গণহত্যার জন্য যে ব্যক্তি দায়ী তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য সত্যই ইচ্ছুক–এই কথাটা বিশ্ববাসীকে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছেন। তিনি তার নির্লজ্জ ভাষণে একবারও বলেননি যে, তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা উল্লেখ করেননি। বিশ্ববাসী দেখতে পারে যে, "বেহায়া খান" বাংলাদেশের ব্যাপারকে ভারত-পাকিস্তান সমস্যা বলে উল্লেখ করে ভারতের জনগণকে এই ব্যাপারে জড়িয়ে এবং তাদের নিন্দা করে বাংলাদেশে তিনি যে অপকর্ম করেছেন তা ঢাকবার চেষ্টা করছেন।[১৮৩] ২১ অক্টোবর দিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বলেছেন, স্বাধীন বাংলার ভিত্তিতেই বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান সম্ভব। বাংলাদেশের মানুষ শান্তিকামী কিন্তু তারা এক পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে সমাধানে আর আসতে পারে না। ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্টের পাকিস্তান-ভারত উপমহাদেশে আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ২৫ মার্চে কেন ইয়াহিয়া খান উথান্টকে আমন্ত্রণ করেননি। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বলেছেন এ সমস্যা বাংলাদেশের মানুষ ও পাকিস্তান সামরিক জান্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি কোনো পাকিস্তান ভারত সমস্যা নয়।[১৮৪] বাঙালি কর্মচারী হোসেন আলীর মুক্তির দাবিতে নয়াদিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী পাকিস্তান হাইকমিশনার সাজ্জাদ হায়দারের কাছে ৪৮ ঘন্টা মেয়াদি এক চরমপত্র প্রদান করেন। এই চরমপত্রে পাকিস্তান হাইকমিশনের বাঙালি কর্মচারী হোসেন আলীর মুক্তির দাবি পূরণ করা না হলে বাংলাদেশ মিশন পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে হুশিয়ারি দেওয়া হয়।[১৮৫]

---

[১৮০] *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ২৮ জুলাই ১৯৭১
[১৮১] হাসান ফেরদৌস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২
[১৮২] তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮-৫৯
[১৮৩] *বাংলাদেশ*, ১১ অক্টোবর ১৯৭১
[১৮৪] হাসিনা আহমেদ সংকলন ও সম্পাদনা, *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫। পৃ. ২৬৫-২৬৬
[১৮৫] *অমর বাংলা*, ৪ নভেম্বর ১৯৭১

১৬ আগস্ট জার্মানির মিউনিখে একটি পত্রিকায় বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু মিথ্যা অভিযোগের কথা প্রকাশিত হয়। এর প্রত্যুত্তরে দিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশনের কূটনীতিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কে এম শিহাবুদ্দিন প্রতিবাদ জানান। তিনি প্রতিবাদ লিপিতে উল্লেখ করেন যে, ইয়াহিয়া খানের দখলদারী সৈন্যদের সঙ্গে বাংলাদেশের জনসাধারণ নিজেরাই যুদ্ধ করছে। তারা কারো সাহায্য নিচ্ছে না। ভারত বাংলাদেশের প্রতি নৈতিক ও মানবিক সমর্থন জানাচ্ছে এজন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে। এই পত্রিকাটি পাকিস্তানের হাতের পুতুলের মতো কাজ করে। ভারত নয়, পাকিস্তানই এই উপমহাদেশে তিনবার আক্রমণ করেছে।[১৮৬] পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদের সদস্যদের ভারত সরকার জামিন হিসেবে রেখেছে বলে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো অভিযোগ করেন। এই অভিযোগের জবাবে দিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশনের কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন সেই অভিযোগকে অদ্ভুত বলে বর্ণনা করেছেন। শিহাবুদ্দিন বলেন- ভুট্টোর পক্ষে এই অভিযোগ করা খুবই অদ্ভুত। যেহেতু তিনি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে এবং সাহায্য করে বাংলাদেশে সুপরিকল্পিতভাবে গণহত্যা, লুট ও অগ্নিসংযোগ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং এখন বলছেন ভারত বাংলাদেশের প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের জামিন হিসেবে আটকে রেখেছে।[১৮৭]

পাকিস্তান সরকারের মিথ্যা অপপ্রচার ছড়িয়ে দিতে তাদের মনোনীত প্রতিনিধিরা যে কার্যকর ভূমিকা পালন করতো তা সহজেই অনুমেয়। এমনকি পাকিস্তান সরকারের অনেক প্রতিনিধি মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে দেখা করে সমঝোতার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। এরকম একটি ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। বেলমন্ট প্লাজার সভাকক্ষে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সংক্ষিপ্ত বৈঠকে খুররম খান পন্নী জানান যে, শাহ আজিজুর রহমানের সঙ্গে তাঁর হঠাৎ দেখা হয়েছে। তিনি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু সে বেলমন্ট প্লাজা হোটেলে আসতে রাজি নয়। সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানটি হবে একটি রেস্তোঁরায়। বিচারপতি চৌধুরী সেখানে গেলে তাঁর সঙ্গে গোপনে শাহ আজিজ কথা বলবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কোনো মন্তব্য করেননি। তাঁর সহকর্মীরা সবাই বুঝতে পারেন যে, এটি শাহ আজিজুর রহমানের দুরভিসন্ধি। তারা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা কর্তৃক পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্যকে বাঙালি বলে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া গোপনে সাক্ষাৎ করা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর জন্য নিরাপদ নয়।[১৮৮] উল্লেখ্য যে, বিচারপতি চৌধুরীকে একা চলাফেরা করতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নিষেধাজ্ঞা ছিল। পাকিস্তান সরকার এরকম প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে থাকে। নিজেদের প্রেরিত প্রতিনিধিদের দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমঝোতার আলোচনা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা ভিন্ন কৌশল বেছে নেয়। এক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার তার মিত্র দেশগুলোর মাধ্যমে সমঝোতার প্রস্তাব করে। জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দল নিউইয়র্কে উপস্থিত হলে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বিচারপতি আবু

---

[১৮৬] *আনন্দবাজার* (কলকাতা), ২৭ আগস্ট ১৯৭১
[১৮৭] *কালান্তর* (কলকাতা), ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
[১৮৮] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬

সাঈদ চৌধুরীকে জানান যে, জাতিসংঘে নিযুক্ত শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। ইতিমধ্যে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে শ্রীলঙ্কা পাকিস্তানের সমর্থক। দু'দিন পরে বিচারপতি চৌধুরী এ এইচ মাহমুদ আলীকে সঙ্গে করে জাতিসংঘ ভবনের কফি রুমে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে যান। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূত বিচারপতি চৌধুরীর কাছে পাকিস্তানের সঙ্গে আপস করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবের শর্ত উল্লেখ করে একটি সংক্ষিপ্ত লিপিও তিনি বিচারপতি চৌধুরীর নিকট পেশ করেন। বিচারপতি চৌধুরী কোনো প্রত্যুত্তর না করে মাহমুদ আলীকে নিয়ে কফি রুম থেকে বেরিয়ে যান। তারা উভয়ে জে কে ব্যানার্জীর রুমে গিয়ে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূতের প্রস্তাবের কথা বলেন। বিচারপতি চৌধুরী প্রস্তাবের কাগজটি ছিড়ে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেন। তিনি বলেন, মুজিবনগরে এই লিপি পাঠানো হলে স্বাধীনতা আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্থ হতো। এই লিপির সংবাদ নিশ্চয় ফাঁস হয়ে যেতো। তার ফলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে আপসের আলোচনা করছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়তো। এই গুজবের ফলে মুক্তিযোদ্ধারা ও যারা স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলতো।[১৮৯]
মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় জুড়ে পাকিস্তান সরকারের এরকম বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত ছিল। পাকিস্তানের সাপ্তাহিক *স্পটলাইট* পত্রিকার ভাষ্য, বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতার পাকিস্তান দূতাবাসের মাধ্যমে চার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।[১৯০] আবার *হিন্দুস্থান টাইমস* পত্রিকার সূত্রে জানা যায় যে, পাকিস্তান বিদেশে অবস্থিত তার দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালিয়েছে।[১৯১]

মুক্তিযুদ্ধকালীন বিদেশে পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে সন্দেহের বশে বা কখনো জিঘাংসা মনোবৃত্তির কারণে পাকিস্তানিরা বাঙালি কর্মচারীদের ওপর শারীরিক অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে কখনো বাঙালি কর্মচারী এমনকি কূটনীতিকদের বরখাস্ত করেছে। পাকিস্তানিদের এমন কার্যকলাপেও বাঙালি পদস্থ কূটনীতিকরা চুপ থাকেননি। বরং তারা এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে এমনি এক প্রতিবাদ লিপিতে বাঙালি কর্মচারী মুহিদ চৌধুরী ও মোশতাক আহমদ লিখেন-

> This attitude of denigration toward the Bengali by the Government of Pakistan was further evidenced by the Summary, unjustified firing of Mr. A. R. Khan. an Assistant Education officer in the Embassy on 17th of May 1971 for his having attended the hearings of the United States House of Representatives Foreign Affairs Sub-committee of Asian and Pacific Affairs regarding the East Pakistan situation on May 11, 1971. The session attended by Mr. Khan Open to all members of the public and Mr. Khan was there only as a spectator. He made no statement of any nature nor was his presence especially notable. The same session was also attended by Mr. Akram Zaki, a Counsellor of the Embassy of Pakistan along with other West Pakistanis.
> The Embassy's seizure of this occurrence as a pretext to Mr. Khan for alleged "misconduct" make explicitly obvious the intention of the Government of Pakistan to extend its persecution of Bengalis even to those employed by that Government here in the United States.

---
[১৮৯] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬
[১৯০] *দৈনিক বাংলা*, ২৭ আগস্ট ১৯৭৪
[১৯১] *Hindustan Times* (India) 25 August 1972

> We consider it both humiliating and discriminating that a Bengali employee should be fired while his compatriots from West Pakistan are not penalized for the same offence, if that indeed is an offence.[১৯২]

৪.১.ট মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্ব থেকে পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালিরা বাংলাদেশের সংবাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। এসময়ই বিশ্ব গণমাধ্যমের সূত্রে তারা জানতে পারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা বেশিরভাগই ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় সমবেত হয়েছে এবং ১৭ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে একটি প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়েছে। যে সরকারের নাম দেওয়া হয়েছে মুজিবনগর সরকার। এ সংবাদ বাঙালি কূটনীতিকদের মনে আশার আলো সঞ্চার করে। কেননা ২৫ মার্চের পর থেকে যেসকল কূটনীতিক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন তারা কীভাবে কী করবেন তা স্থির করতে পারছিলেন না। মার্কিন মুল্লুকের বাঙালি সমাজ ২৯ মার্চেই বাঙালি কূটনীতিকদের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তারা সবাই পাকিস্তান দূতাবাস ছেড়ে বাংলাদেশের কাজে নেমে পড়বেন। বাংলাদেশের জন্য যে সকলের কাজ করতে হবে সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমত ছিল না, তবে কীভাবে তা করা যাবে সে সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণার অভাব ছিল। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যে খবর তারা পাচ্ছিলেন তাতে দেখা যাচ্ছিল, বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধের জন্য স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে ওঠেছে কিন্তু তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এবং কেন্দ্রীয় কোনো পরিচালনা নীতি নেই। কোথাও নেতৃত্ব দিচ্ছেন রাজনৈতিক নেতা, অন্যত্র প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি, আবার কোথাও কোনো বাহিনীর সেনাপতি। অধীর আগ্রহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাঙালিরা অপেক্ষা করছিলেন একটি সরকার ঘোষণার জন্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তার এক সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ভারতে গিয়ে বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। এই উদ্যোগের জন্য উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবকও পাওয়া যায়। ড. হারুন-অর-রশিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালিদের প্রতিনিধি হিসেবে কলকাতায় গিয়ে বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, প্রতিরোধের শক্তি ও গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালিদের করণীয় সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে আসবেন। বাঙালি কূটনীতিক আতাউর রহমান চৌধুরী হারুন-অর-রশিদের কলকাতায় যাওয়ার বিমানের যাতায়াত খরচ অগ্রিম দেন। পরে এ এম এ মুহিত সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলে সে টাকা দিয়ে দেন। হারুন-অর-রশিদ ৩ এপ্রিল দিল্লির পথে ওয়াশিংটন ত্যাগ করেন। ওই দিনই খবর পাওয়া যায় যে, একটি সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং তারাই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করবেন।[১৯৩] মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর হারুন-অর-রশিদ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করেন। এমনকি কলকাতার বাংলাদেশ মিশন প্রধান হোসেন আলীর সঙ্গেও দেখা করেন। ২০ এপ্রিল কলকাতা থেকে হারুন-অর-রশিদ এ এম এ মুহিতকে তারবার্তা পাঠিয়ে জানান যে, ‘নয় সার্কাস এভেন্যুতে বাংলাদেশ মিশনে

---

[১৯২] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৭০১
[১৯৩] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২-৫৩

বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা পাঠান। তারপর নিয়ুক্তির হুকুম যাবে। অন্যখানে যেসব বাঙালি কূটনীতিবিদ আছেন তাদের সংগেও যোগাযোগ করুন।'[১৯৪] তবে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পরপরই বিশ্বের পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকরা স্বপ্রণোদিত হয়ে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। নয়াদিল্লির দুই জন বাঙালি কূটনীতিকের বাংলাদেশ সরকার গঠনের পূর্বে পাকিস্তানের চাকরি ত্যাগ ও ১৮ এপ্রিল কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের ৬৫ জন বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে আনুগত্য প্রকাশ দু'দিক দিয়ে গতি সঞ্চার করে। মুজিবনগর সরকার তাদের বহিঃপ্রচারের ব্যাপারে উদ্যোগী হয় এবং বাঙালি কূটনীতিকরাও পরিকল্পনা করতে থাকে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করবে। মুজিবনগর সরকার অধ্যাপক রেহমান সোবহানের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিকদের কাছে বার্তা পাঠায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দেয় জুন মাসে। তারপর থেকেই সমগ্র বিশ্বের পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিকরা মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে এবং সরকার থেকেও তাদের সম্ভাব্য পদত্যাগের সময় ও পদত্যাগের পূর্বে করণীয় কাজ সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

সেপ্টেম্বর মাসে মুজিবনগর সরকার একটি পরিকল্পনা বোর্ড গঠন করেন। এর সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী। আলমগীর মহিউদ্দিন এই পুনর্গঠন কার্যক্রম প্রণয়নের কাজ হাতে নেন। ড. নুরুল ইসলাম, হারুন-অর-রশিদ এবং এ এম এ মুহিত উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। এ এম এ মুহিত ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চেই Economy of Bengal নামে কয়েকটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। যেখানে বাঙালিদের অবস্থান এবং একটি সার্বভৌম অর্থনীতির সমস্যা ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়।[১৯৫]

৬ সেপ্টেম্বর আর্জেন্টিনাস্থ পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমেন ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ মিশনের প্রধান এম আর সিদ্দিকীকে একটি চিঠি লিখেন। চিঠিতে তিনি চারটি বিষয়ে তথ্য চেয়ে পাঠান। প্রথম, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র; দ্বিতীয়, পাকিস্তানের পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে গণতন্ত্রের ধ্বংসকাহিনী; তৃতীয়, পাঞ্জাবের সামরিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে সারা দেশ নিয়ন্ত্রণের কাহিনী এবং সর্বশেষ বাংলাদেশে পাকিস্তানি গণহত্যার চিত্র। একই চিঠিতে তিনি আরো জানান যে, খুব শীঘ্রই তিনি বাংলাদেশের প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করবেন এবং এই তথ্যগুলো তাঁর বাড়ির ঠিকানায় দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। এম আর সিদ্দিকী এই চিঠিটি এ এম এ মুহিতকে দেন যাতে এই সব তথ্য সন্নিবেশিত করে আবদুল মোমেনকে পাঠানো হয়। এ এম এ মুহিত চিঠির উত্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি প্রতিবেদন তৈরি করেন যথা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শোষণ, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গঠন ও গোষ্ঠীগত বিভাজন এবং পাকিস্তানের ইতিহাসে গণতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিক দুর্ভোগের কাহিনি।[১৯৬]

---

[১৯৪] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪
[১৯৫] ওই, পৃ. ৬৪
[১৯৬] ওই, পৃ. ১৪০

৪.১.ঠ মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধিদের সহচর হিসেবে ভূমিকা পালন

বিশ্বব্যাপী পাকিস্তান দূতাবাস থেকে বেরিয়ে আসা বাঙালি কূটনীতিকরা মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়ে কোনো না কোনোভাবে মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধিদের সহচর হিসেবে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন আবদুস সামাদ আজাদ ও কে এম শিহাবুদ্দিন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে একসঙ্গে কাজ করেছেন। ভারতের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও দিল্লিস্থ কূটনীতিক মহলের সঙ্গে আবদুস সামাদ আজাদকে পরিচয় করিয়ে দেন কে এম শিহাবুদ্দিন। ১৯৭১ সালের মে মাসে বুদাপেস্টের শান্তি সম্মেলন থেকে ফিরে এসে আবদুস সামাদ আজাদ মুজিবনগর যাওয়ার পূর্বে দিল্লিতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। শান্তি সম্মেলনে আরও যোগ দিয়েছিলেন দেওয়ান মাহবুব আলী ও ডা. সারোয়ার আলী। আবদুস সামাদ আজাদকে দেখার জন্য শিহাবুদ্দিন জনপথ হোটেলে যান। তারা উভয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁর (আজাদ) দিল্লি উপস্থিতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কিছু সুবিধা অর্জন করার চেষ্টা করা হবে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আবদুস সামাদ আজাদের প্রথম সংবাদ বিবৃতিটি দিল্লির গণমাধ্যমে প্রচার করার জন্য কাজ করেন শিহাবুদ্দিন। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও গণমাধ্যম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারে।[১৯৭] এছাড়াও বাঙালি কূটনীতিকরা কখনো কখনো মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। বিশেষ করে পাকিস্তান দূতাবাসসমূহের কোনো বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করলে মুজিবনগর সরকারের একজন মুখপাত্র হিসেবে তারা তাদের সহকর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে সংবাদ বিবৃতি দিতেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় দিল্লি তথ্য কেন্দ্রের প্রধান কে এম শিহাবুদ্দিন লন্ডনস্থ বাঙালি কূটনীতিক মহিউদ্দিন আহমদ ও ইরাকি রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিকরা পাকিস্তান সরকারে চাকরি ত্যাগ করায় তিনি তাদের অভিনন্দন জানিয়ে সংবাদ বিবৃতি দেন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া পঁচিশে মার্চের রাতের ঘটনা জানার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জেনেভা থেকে লন্ডন চলে আসেন। লন্ডন এয়ারপোর্টে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে তাঁর বড় ছেলে আবুল আহসান চৌধুরী (কায়সার) ও লন্ডনের পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান অভ্যর্থনা জানান। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিমানবন্দরে আনতে যাওয়ার অপরাধে ও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করায় তিন সপ্তাহ পরে হাবিবুর রহমানের চাকরি চলে যায়। হাবিবুর রহমান ২৭ মার্চ বিচারপতি চৌধুরীকে তাঁর গাড়িতে করে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়ে যান। এ সংবাদ জানার পর পাকিস্তান দূতাবাস তাঁর ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ২৭ এপ্রিল পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত প্রবীণ কর্মকর্তা হাবিবুর রহমানকে বিনা নোটিশে পদচ্যুত করা হয়। তিনি সাত বছর যাবৎ উক্ত পদে নিয়োজিত ছিলেন।[১৯৮] উল্লেখ্য যে, ৩ মার্চ লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান সরকারের চাকরি তোয়াক্কা না করে এসময় হাবিবুর রহমান বিক্ষোভকারী বাঙালি ছাত্রদের শীতের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের

---

[১৯৭] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 103

[১৯৮] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

অফিসে এনে চা পান করিয়েছিলেন। এ কাজের মধ্য দিয়ে তিনি পাকিস্তানের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা প্রদর্শন করেছেন। এমনকি লন্ডনে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর বাসভবনে।[১৯৯]

মুক্তিযুদ্ধকালীন বহির্বিশ্বকে বাংলাদেশের সঠিক চিত্র জানানোর জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আবদুস সামাদ আজাদকে পাঠানো হয়। একই সঙ্গে বিদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি দূতাবাসগুলোতে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যোগদানে উৎসাহিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে আবদুস সামাদ আজাদকে সহায়তা করার জন্য মুজিবনগর থেকে স্টকহোমের বাঙালি কূটনীতিক আবদুর রাজ্জাককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়।[২০০]

২৪ মে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নিউইয়র্ক যান। সেখানে পূর্ব থেকেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংগঠকের কাজ করেন এ এইচ মাহমুদ আলী, স্থপতি ফজলুর রহমান খান, এ এম এ মুহিত ও হারুন-অর-রশিদ প্রমুখ। নিউইয়র্ক বিমান বন্দরে প্রায় দু'শ বাঙালি সহকর্মীদের নিয়ে এ এইচ মাহমুদ আলী বিচারপতি চৌধুরীকে অভ্যর্থনা জানান। বিচারপতি চৌধুরী নিউইয়র্কে কর্মব্যস্ত সময় কাটান। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে টেলিফোনে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন এ এইচ মাহমুদ আলীর স্ত্রী শাহীন মাহমুদ আলী। তাঁর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা ছিল সুপরিকল্পিত। একজন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ চলাকালীন তিনি অন্য একজন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতেন। পূর্বের সাক্ষাৎ শেষে প্রতিনিধি দল বাইরে আসার পর তাদের জন্য নির্ধারিত সময়ে পরবর্তী সাক্ষাৎকারের কথা বলে দিতেন। মাহমুদ আলী নিজে গাড়ি চালিয়ে আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিভিন্ন দূতাবাসে নিয়ে যান। বাঙালি কূটনীতিকরা মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিদের কীভাবে সহযোগিতা করতো তার একটি বর্ণনা দিয়েছেন হায়দার আলী খান-

> আবু সাঈদ চৌধুরী নিউইয়র্কে থাকার সময় মাহমুদ ভাই ও শাহীন ভাবি তার এবং তার সহকর্মীদের কেমন আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছিলেন আমি তার নীরব সাক্ষী। মাহমুদ ভাই তো প্রায় সব সময়ই জাস্টিস চৌধুরীর সঙ্গে থাকতেন। নিউ ইয়র্কে আবু সাঈদ চৌধুরী নওরয়ে থেকে শুরু করে সৌদি আরব পর্যন্ত অনেক দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করেন। এত অল্প সময়ে তার পক্ষে এতজন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করা যে সম্ভব হয়েছিল, আমি বলব তা মাহমুদ ভাই, শাহীন ভাবি ও তাদের অন্য সহকর্মীদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতার ফলে।[২০১]

বিচারপতি চৌধুরী ওয়াশিংটন আসার পর এ এম এ মুহিত ও হারুন-অর-রশিদ তাঁর কাছে বাংলাদেশ সমিতির কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দেন।[২০২] ৭ সেপ্টেম্বর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নরওয়ে থেকে সুইডেনে যান। সুইডেনে নিয়োজিত পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত আব্দুর রাজ্জাক বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।[২০৩] নেপালের পাকিস্তান দূতাবাসে

[১৯৯] ফেরদৌস রহমান, *প্রবাসে মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা: শাপলা প্রকাশনী, ২০০৯। পৃ. ৪৭

[২০০] The Diary of Hossain Ali

[২০১] হায়দার আলী খান, *মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি প্রবাসে আলোর গান*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, পৃ. ১০২

[২০২] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১; আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

[২০৩] আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২

কর্মরত দু'জন বাঙালি কূটনীতিক মোস্তাফিজুর রহমান সিএসপি ও মোখলেছ উদ্দিন সিএসপি গোপনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে সহায়তা করেন।[২০৪]

বাংলাদেশ মিশনের আবদুর রাজ্জাক খান, শরফুল আলম ও ফজলুল বারি অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সার্বক্ষণিক সহচর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ করে রাজ্জাক ১৭ মে দূতাবাস থেকে বরখাস্ত হবার পর রেহমান সোবহানের একান্ত সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২০৫]

৪.১.ড মুজিবনগর সরকারের মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা পালন

পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগকারী বাঙালি কূটনীতিকরা ক্ষেত্র বিশেষে মুজিবনগর সরকারের মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। কলকাতাস্থ বাঙালি কূটনীতিক এম হোসেন আলী ২৭ এপ্রিল জানতে পারেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের মার্কিন কনসুলেট অফিসের কনসাল এ এইচ মাহমুদ আলী ২৬ এপ্রিল পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। তাঁকে ইসলামাবাদ বদলি করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেখানে না গিয়ে প্রতিবাদস্বরূপ পাকিস্তান সরকারের চাকরি ছেড়ে দেন। ভারতের বাইরে তিনি প্রথম বাঙালি কূটনীতিক হয়ে এ কাজটি করায় হোসেন আলী মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানান। মাহমুদ আলীর পক্ষ ত্যাগে হোসেন আলী তাঁর খুশির অভিব্যক্তি ডায়েরিতে লিখেছেন- We are now happy that a nucleaus for our movement in USA can now be set up with Mahmood Ali as Centre.[২০৬]

মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা পালন অন্যান্য বাঙালি কূটনীতিকরাও পালন করেছেন। আবুল ফতেহ ৩৪০০০ ইরাকি দিনার বাগদাদের পাকিস্তান দূতাবাসের ব্যাংক একাউন্ট থেকে তুলে নিয়ে আসেন। এ সংবাদ জানার পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি বিবৃতি দেন। যা কে এম শিহাবুদ্দিন দিল্লিস্থ বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাস ও মিশনগুলোতে সরবরাহ করেন। যাতে বিদেশি সরকারগুলো বুঝতে পারে একজন বাঙালি কূটনীতিক দেশের জন্য কী করতে পারে। এর পেছনে আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল- পাকিস্তান সরকার এটি নিয়ে যাতে কোনো ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার চালাতে না পারে তা বিদেশি সরকার প্রধানদের জানানো। কিন্তু ইয়াহিয়া সরকার অচিরেই আবুল ফতেহ'র নামে মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করে তাঁকে বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন করতে চেয়েছিল। যাতে সে কোনো দেশে ভ্রমণ বা কোনো সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পারে।[২০৭]

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ মুজিবনগর থেকে দিল্লি আসেন অনেকগুলো সতর্কবাতা সংবলিত চিঠি নিয়ে। এগুলোর মধ্য থেকে একটি চিঠি ২৬ সেপ্টেম্বর মুজিবনগর সরকারের পক্ষে কে এম শিহাবুদ্দিন দিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের কাউন্সেলর হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর কাছে পৌঁছে দেন। বাকি চিঠিগুলো কে এম শিহাবুদ্দিন ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের আলফ্রেড ভাজের মাধ্যমে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভারতীয় দূতাবাসগুলোতে পাঠান। উল্লেখ্য যে, এসব চিঠি কখনো কূটনীতিকদের সরাসরি পাঠানো হয়নি। কেননা যদি কোনো

---

[২০৪] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭; আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

[২০৫] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯; রেহমান সোবহান, *উতল রোমন্থন পূর্ণতার সেই দিনগুলো*, পৃ. ৩৫১

[২০৬] The Diary of Hossain Ali

[২০৭] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 122

কারণে এসব চিঠি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের হস্তগত হয় তাহলে বাঙালি কূটনীতিকদের পক্ষ ত্যাগের আগেই তাদের ওপর বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বা তাদের বন্দি করা হবে। এমনকি তাদেরকে পাকিস্তানে পাঠানো হতে পারে।[২০৮] আবার পক্ষ ত্যাগকারী এসব বাঙালি কূটনীতিকরা মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হয়ে লিয়াঁজো রক্ষার কাজও করতেন। কে এম শিহাবুদ্দিন ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ এবং সামরিক অফিসারদের সঙ্গে বাংলাদেশের পক্ষে কলকাতা মিশনের প্রধান হোসেন আলী, পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষী ও প্রতিরক্ষা সচিব আবদুস সামাদের জন্য মিটিং এর সময় নির্ধারণে সহায়তা করেছেন। এমনকি বিদেশি কূটনীতিক মহলের সঙ্গেও যোগাযোগের সংযোগ করে দিতেন শিহাবুদ্দিন। আবার অনেক বিদেশি মিশনে তাদের প্রবেশ সহজ হতো না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকরা বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতেন এবং আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতেন। কে এম শিহাবুদ্দিনের প্রচেষ্টায় দিল্লিস্থ সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কয়েক দফা ফলপ্রসু আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু অক্টোবর মাসে জে এন দীক্ষিতের অফিসে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত সরাসরি মাহবুবুল আলম চাষীর সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করেন।[২০৯] উল্লেখ্য যে, এসময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিবের যোগসাজশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠনের আলাপ-আলোচনার কথা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ আর মল্লিক কলকাতায় পৌঁছে সদ্য শপথ গ্রহণ করা মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে কাজ শুরু করেন। এসময় বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস কলকাতা অফিস থেকে তাঁকে সংবাদ দেওয়া হয় যে, অবিলম্বে আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার জন্য। কারণ জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারেন যে, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের হয়ে কাজ করার পক্ষে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। অধ্যাপক এ আর মল্লিক বিচারপতি চৌধুরীকে জানান যে, তিনি পাকিস্তান সরকারের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন। তিনি বিচারপতি চৌধুরীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করেন। অধ্যাপক মল্লিক এ সংক্রান্ত বার্তাটি কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রধান এম হোসেন আলীর কাছে প্রেরণ করেন। এম হোসেন আলী এই বার্তাটি বিচারপতি চৌধুরীর কাছে প্রেরণ করেন। এর কয়েকদিন পরেই বিচারপতি চৌধুরী পাকিস্তানের সরকারের চাকরি ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করেন।[২১০] তবে আবু সাঈদ চৌধুরী নিজে তাঁর স্মৃতিকথায় এ ধরনের কোনো ঘটনার কথা উল্লেখ করেননি। বরং তিনি পঁচিশে মার্চ ঘটনার সংবাদ জানার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করেন। এ জন্য তিনি ব্রিটিশ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও দেখা করেন। এমনকি বিবিসি সহ অন্যান্য গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। বিবিসি থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচার হওয়ার পর মুজিবনগর সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে

---

[২০৮] K M Shehabuddin, *ibid*, pp. 127-128

[২০৯] *Ibid*, p. 115

[২১০] এ আর মল্লিক, *আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৭। পৃ. ৭৫-৭৬

যোগাযোগ করে। মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীর যে কথোপকথন হয়েছিল- ‘স্যার, আমি ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম। এখানে সকল কাগজে বিবিসি’তে প্রদত্ত আপনার বিবৃতিটি বেরিয়েছে এবং সবাই খুব আনন্দিত হয়েছেন। এখানে শিগগিরই অস্থায়ী সরকার গঠিত হচ্ছে। জনাব তাজউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। তিনি আপনাকে বিদেশে প্রবাসী সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে চান। আমাকে আপনার সম্মতি নিতে বলা হয়েছে। আমীর আলীর কাছ থেকে আপনার টেলিফোন নম্বর পেয়েছি।’ আমি বললাম যে, ‘আপনাদের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ না হলেও আমি স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমি ধন্যবাদের সঙ্গে বিশেষ প্রতিনিধিরূপে কাজ করার সম্মতি জানাচ্ছি। আপনি নেতৃবৃন্দকে আমার সালাম জানাবেন এবং বলবেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার সাধ্যমতো সাহায্য করব।’ আমিরুল ইসলাম বললেন, ‘শিগগিরই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে এবং তার পরেই আপনার নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেয়া হবে।’[২১১]

কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলী রাষ্ট্রদূত হিসেবে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি স্বরূপ কাজ করতেন। জুন মাসে এম হোসেন আলী মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে লন্ডনস্থ বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে এক টেলিগ্রাম পাঠান। টেলিগ্রামের বক্তব্য ছিল-

> Please convey following message from Prime Minister Bangladesh to Mr. Heath and Mr. Wilson and send copy to Editor Daily Mirror with thanks for coverage. Message being respectfully draw your attention John Pilger's report Daily Mirror June sixteenth as also reports in Sunday Times June thirteenth and Twentieth and various reports in the Times, Guardian, Daily Telegraph and almost all British and World newspapers. Reports clearly show how brute force used to massacre people to stifle democracy and aspirations of seventy five millions of Bangladesh. As occupation army it has flagrantly violated basic human rights of world citizens. Has committed undeniable genocide. Women in Bangladesh to-day no more than objects of disgraceful mass rape. Children being annihilated. Tens of thousands terror-stricken people fleeing to India daily. Famine conditions aggravated by calculated steps of Pakistan Fifteen million may die of starvation by Pilger's estimate. Could be more. Whole race facing extermination. Appeal in the name of humanity, civilization and democracies intervene and assert your influence. Vital that Pakistan be denied further military economic aid. Respectfully-request that you deplore recent American arms shipment to Pakistan. Urge you to act now and recognize Bangladeshi immediatley. Warm personal regards message ends:[২১২]

২২ এপ্রিল হোসেন আলী মওলানা ভাসানীর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও চীনের মাও সেতুং এর কাছে টেলিগ্রাম পাঠান। টেলিগ্রামের বিষয় ছিল বাংলাদেশের স্বীকৃতি ও প্রয়োজনীয় সহায়তা। এছাড়া মওলানা ভাসানীর পক্ষে মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকটও টেলিগ্রাম করেন।

---

[২১১] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-১৯

[২১২] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৯১২

আগস্ট মাসে মুক্তিযুদ্ধ ও একে ঘিরে বিশ্বে কিছু ঘটনা খুব দ্রুত ঘটতে থাকে। বিশেষ করে আগস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে এক সঙ্গে অনেক বাঙালি কূটনীতিকের পদত্যাগ সমগ্র বিশ্বকে চমকে দেয়। কূটনীতিক ক্ষেত্রে এরকম বিপ্লব আগে কেউ কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। আবার বঙ্গবন্ধুর মুক্তি, বাংলাদেশের স্বীকৃতি এবং ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেওয়া কোটি শরণার্থীর মানবেতর জীবন সবকিছু মিলে বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রচেষ্টায় ৯ আগস্ট দিল্লিতে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করার পশ্চাতে উভয় দেশের দীর্ঘকালের কূটনৈতিক বিবেচনা কাজ করেছিল কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়লে ভারতের যে রক্ষাকবচের প্রয়োজন হবে, এই চুক্তির মধ্যে অনেকে সে রক্ষাকবচ দেখতে পেয়েছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে বাংলাদেশ মিশন তা দেখতে পায়নি। ভারতের *স্টেটসম্যান* পত্রিকার একজন সাংবাদিক এই চুক্তি সম্পর্কে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলীর প্রতিক্রিয়া জানতে চান। এতে তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই চুক্তি কোনো অনুকূল প্রভাব বিস্তার করবে বলে তার মনে হয় না। তাঁর এই বক্তব্য প্রকাশিত হলে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ খুব ক্ষুব্ধ হন। তাজউদ্দীন আহমদ এর ধারণা ছিল ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করার পূর্বে মিশন প্রধান তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে আলোচনা করেই নিশ্চয় মিশন প্রধান এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। হোসেন আলীর এ প্রতিক্রিয়ার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান যে, বাংলাদেশ সরকার ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীকে স্বাগত জানায়। বাংলাদেশ মিশনের প্রধান তাৎক্ষণিকভাবে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তাতে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি। বস্তুত যেসব দেশ বাংলাদেশকে নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছে, তাদের মধ্যে দুটি দেশের মধ্যে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদন একটি ইতিবাচক ঘটনা বলে বাংলাদেশ সরকার মনে করে।[২১৩]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি জোরদার করার পক্ষে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির প্রভাব অত্যন্ত ইতিবাচক হলেও চুক্তি স্বাক্ষরের প্রায় সমসাময়িক সময়ে মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বের দক্ষিণপন্থি অংশ ভারতের দক্ষিণপন্থি মুখপাত্রদের সঙ্গে সমস্বরে প্রচারণা চালাতে শুরু করে যে, এই চুক্তির মাধ্যমে মস্কো বাংলাদেশের প্রতি কূটনীতিক স্বীকৃতি দেওয়া থেকে নয়াদিল্লিকে নিবৃত্ত করেছে এবং এর ফলে ভারত কখনোই বাংলাদেশের পক্ষে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হবে না।[২১৪] মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের দিন দিল্লিতে এক উল্লসিত জনসমুদ্রের কাছে বাংলাদেশ মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যের জন্য এবং ৭০ লক্ষ শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য ভারত সকল কিছু করতে প্রস্তুত এই মর্মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা সত্ত্বেও মৈত্রী চুক্তির বিরুদ্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টির জন্য এক জোর প্রচারণা শুরু হয়। এই প্রচারণার অন্যতম মূল উৎস ছিল *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় পরিবেশিত এক সংবাদ। এই সংবাদ অনুসারে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা গোপন প্রতিবেদনে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে অবহিত করেছে যে, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি বাংলাদেশকে সাহায্য

[২১৩] আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯-১৫০

[২১৪] *The Times* (London), 12 August 1971

প্রদান থেকে ভারতকে নিবৃত্ত করবে।[২১৫] ভারতে অবস্থানকারী বাংলাদেশ রাজনৈতিক মহলে এই উদ্দেশ্যমূলক অসত্য প্রচার পূর্ণ মাত্রায় চলাকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সঠিক পরিস্থিতি জানিয়েই ইয়াহিয়া খানকে বাংলাদেশের ব্যাপারে নমনীয় নীতি গ্রহণ করার পরামর্শ দেন।[২১৬]

মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বহির্বিশ্বে কূটনীতিক মিশনে যাওয়ার জন্য আবদুস সামাদ আজাদ, আশরাফ আলী চৌধুরী, ফকির শাহাবুদ্দিন, মো. শামসুল হক ও নুরুল কাদির দিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর কো-অরডিনেশন আলফ্রেড ভাজ এর সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে কলকাতার বাংলাদেশ মিশন এর প্রধান এম হোসেন আলী ও দিল্লির বাংলাদেশ মিশন প্রধান কে এম শিহাবুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। কূটনীতিক প্রতিনিধি দলটির বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে তারা দিল্লি এসেছিলেন।[২১৭] উল্লেখ্য যে, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পূর্ব পর্যন্ত দিল্লি বাংলাদেশ মিশন অর্থাৎ তথ্য কেন্দ্রের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন কে এম শিহাবুদ্দিন।

জাতিসংঘে চীনের অন্তর্ভুক্তিতে দিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী চীনা দূতাবাসের চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স হুয়া মিঙ তা কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী একে ন্যায় ও সুবুদ্ধির জয় বলে অভিহিত করেছেন। অভিনন্দন বার্তায় আরো বলেন, এর ফলে বিশ্ব মানব সমাজ দমন ও শোষণ মুক্ত করার কাজে চীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ভূমিকা পালন করার সুযোগ পাবে। ইয়াহিয়ার দালালদের বিরুদ্ধে জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে রত সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে চীন সমর্থন দিবে।[২১৮]

বাংলাদেশকে ভারত স্বীকৃতি দেওয়ার পর কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলী সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ভ্রমণের সময় ভারতীয় নাগরিকদের ওপর কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না। বর্তমানে যে সকল শরণার্থী ভারতে রয়েছেন তাঁদের সবাইকে বাংলাদেশ সরকার খুব শিগগিরই দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধ ক্রমেই ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। ভারতস্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে তিনি শিগগিরই নয়াদিল্লি সফর করবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ঢাকা মুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ মুজিবনগর থাকবে বাংলাদেশের ভ্রাম্যমান রাজধানী। ঢাকা মুক্ত হলে সেটি হবে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী।[২১৯]

অনেক সময় কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান এম হোসেন আলী উপস্থিত না থাকলে তাঁর অবর্তমানে আনোয়ারুল করিম চৌধুরী মুজিবনগর সরকার ও বিভিন্ন প্রয়োজনে কাজ করতেন। ইংল্যান্ডের এম. এ. আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী কলকাতাস্থ মিশন প্রধানকে চিঠি লিখেন। এম হোসেন আলীর অনুমতিক্রমে সে চিঠির উত্তর দিয়ে আনোয়ারুল করিম চৌধুরী লিখেন-

---

[২১৫] *The Guardian* (London), 16 August 1971

[২১৬] মঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১*, ঢাকা: ইউপিএল, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৯। পৃ. ৭৬। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: Henry Kissinger, *White House Years: The India Pakistan Crisis of 1971*, p. 869

[২১৭] মুহাম্মদ নুরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৭। পৃ. ১৯৭

[২১৮] *কালান্তর* (কলকাতা), ৩১ অক্টোবর ১৯৭১

[২১৯] *ওই*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১

> The Head of the Mission conveys his thanks to you and the Bengali community residing in the U.K. for the support to the cause of Bangladesh. The people of Bangladesh are engaged in a fierce battle with the invading Pakistani troops and require substantial help to liberate Bangladesh. We would therefore, request you to mobilize all available resources to achieve our common goal.[২২০]

৪.১.ঢ পাকিস্তান সরকারের গোপন তথ্য দূতাবাস থেকে ফাঁস বা গুপ্তচরবৃত্তি কর্মতৎপরতা

পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই সমগ্র বিশ্বের সমর্থন আদায়ের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও রাষ্ট্র থেকে প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র, ত্রাণ সামগ্রী ও অর্থ সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। আগস্টের পর থেকে যুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে পাকিস্তানি হানাদাররা এদেশের গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পর্যুদস্ত হতে থাকে। এমন অবস্থায় পাকিস্তানিরা অস্ত্রসহ বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো সাহায্যের জন্য বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলোর কাছে তদবির করতে থাকে। এ লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এসব প্রতিনিধিরা পাকিস্তানের দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে দাতা দেশ বা সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতো। আবার সরকার থেকেও দূতাবাসগুলোতে চিঠি পাঠানো হতো। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় জুড়ে পাকিস্তান সরকারের এ ধরনের কর্মতৎপরতা অব্যাহত ছিল। এসব সংবাদ পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বা তাদের সহকারী কিংবা সাইফার কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রেরণ করা হতো। দূতাবাসের এসব দায়িত্বে নিয়োজিত বাঙালিরা যারা গোপনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতেন তারা এ সংক্রান্ত সংবাদ বাঙালি কূটনীতিকদের কাছে পৌঁছে দিতেন। ফলে বাঙালি কূটনীতিকরা সহজেই জানতে পারতেন বহির্বিশ্বে পাকিস্তান সরকারের কর্মপরিকল্পনা। এসব সংবাদ বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান সরকারের বিরোধিতা করতে সহযোগিতা করতো। আবার তারা পাকিস্তান সরকারের এসব গোপন কর্মকাণ্ডের সংবাদ মুজিবনগর সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এরকম বেশ কিছু প্রশংসনীয় কাজ করেন বাঙালি কূটনীতিকরা।

বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি কূটনীতিকরা সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের মনোভাব বাংলাদেশ সরকারকে অবহিত করতো এবং এ ব্যাপারে সরকার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। স্টকহোমের বাঙালি কূটনীতিক আবদুর রাজ্জাক এক চিঠিতে ডেনমার্কের কাছ থেকে পাকিস্তান সরকার নৌ যান সংগ্রহ করে বাংলাদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করছিল বলে তথ্য মুজিবনগর সরকারকে জানায়।[২২১] সরকার এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

পাকিস্তান জাতিসংঘের কাছ থেকে যুদ্ধকালীন সাহায্যের একটি তালিকা তৈরি করে। এ তালিকা বিশ্লেষণ করে পাকিস্তানের অসৎ উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আগা হিলালির বাঙালি স্টাফ আবু সোলায়মান এর মাধ্যমে এই তালিকাটি এ এম এ মুহিতের কাছে পাঠানো হয়। এই তালিকায় খাদ্য, জাহাজ, ট্রাক ও টেলি যোগাযোগ যন্ত্র সাহায্যের কথা উল্লেখ ছিল।[২২২] তালিকায় ঔষধ, বস্ত্র, আশ্রয়ের জন্য তাঁবুর উল্লেখ না থাকায় সহজেই বোঝা যায় যে, এর পেছনে পাকিস্তানের

---

[২২০] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৬
[২২১] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১
[২২২] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

সামরিক উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান। কেননা পাকিস্তানিরা কখনো চায়নি বাংলাদেশের দুর্দশা লাঘব হোক। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে জাতিসংঘ পাকিস্তানে পূর্ত কাজ করার জন্য ১৬ নভেম্বর একটি লিখিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ পূর্ত কাজে অন্তর্ভুক্ত ছিল সামরিক বাংকার বা যুদ্ধবহরের জন্য রাস্তা নির্মাণ। জুন মাসে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত আবু সোলায়মানের মাধ্যমে পাকিস্তানে সমরাস্ত্র সরবরাহের বিল অব লেডিং এর খসড়া বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্রে পৌঁছে যায়। সাজেদা সোলায়মান এই খসড়া যোগাড় করেন এবং এনায়েত রহিম এটি ড. গ্রীনো টমডাইন এর কাছে পৌঁছে দেন।[২২৩]

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে পাকিস্তান সরকার ইসলামাবাদ থেকে প্রত্যেক ১৫ দিন পরপর বিশ্বব্যাপী পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে Situation of East Pakistan (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) নামক রিপোর্ট প্রেরণ করতো। সিচুয়েশন রিপোর্টে উল্লেখ থাকতো বাংলাদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে কতজন মিসক্রিয়েটস (মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানিরা মিসক্রিয়েটস বলতো) কে হত্যা করেছে, পাকিস্তানের কতজন সৈন্য শহিদ হয়েছে, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা কেমন তা জানিয়ে বিস্তারিত সংবাদ। মুজিবনগর সরকার গোপন সূত্রে জানতে পারে যে, সিচুয়েশন রিপোর্ট ইসলামাবাদ থেকে প্রত্যেক পাকিস্তান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতের কাছে পাঠানো হতো। সুইজারল্যান্ডের বাঙালি কূটনীতিক ওয়ালিউর রহমানকে এই রিপোর্টের কপি সংগ্রহ করে মুজিবনগর সরকারের নিকট পাঠাতে বলা হয়। বাংলাদেশের অবস্থা গুরুতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সিচুয়েশন রিপোর্ট পাঠানোর সময়সীমা আরো দ্রত হয় অর্থাৎ সাত দিন অন্তর অন্তর পাঠানো হতো। উল্লেখ্য যে, এসব সিচুয়েশন রিপোর্ট দূতাবাসগুলোতে পাঠানো হতো সাইফার কোডের মাধ্যমে। ওয়ালিউর রহমান ছিলেন দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব এবং একই সঙ্গে সাইফার সংক্রান্ত কাজগুলো তাঁর অধীনে ছিল। তাই মুজিবনগর সরকার থেকে তাঁর নিকট এমন নির্দেশ আসে। শুরুর দিকের সিচুয়েশন রিপোর্টগুলোতে মিসক্রিয়েটসদের সংখ্যা বেশি থাকতো আবার সেপ্টেম্বর মাস থেকে মিসক্রিয়েটসদের সংখ্যা কমতে থাকে। এতে তিনি বুঝতে পারতেন মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি বাংলাদেশের অনুকূলে। গোপনে ওয়ালিউর রহমান মুজিবনগর সরকারের কাছে সিচুয়েশন রিপোর্টের অনুলিপি পাঠাতেন। আবার দিল্লি থেকেও ওয়ালিউর রহমানের কাছে এই রিপোর্ট চাওয়া হতো। এ প্রেক্ষিতে ওয়ালিউর রহমান কলকাতাস্থ দূতাবাসের প্রধান হোসেন আলীর কাছে সিচুয়েশন রিপোর্ট অন্য কোনো মিশন থেকে পাঠানো হচ্ছে কিনা জানতে চান। হোসেন আলী তাঁকে জানান যে, সিচুয়েশন রিপোর্ট বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এটি অনেকের অজানা ছিল। বাংলাদেশ সরকারের কোনো উপকারে আসতে পারে এ চিন্তা থেকে ওয়ালিউর রহমান সিচুয়েশন রিপোর্ট নিয়মিত পাঠিয়েছেন।[২২৪]

অনুরূপ একটি কার্যক্রমের কথা জানা যায় জাপানের বাঙালি কূটনীতিক কমর রহীমের সাক্ষাৎকারে। তিনি জানান যে, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের হোম মিনিস্ট্রির একটা ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট ছিল, তারা প্রত্যেক মাসে একটা সিচুয়েশন রিপোর্ট তৈরি করতো। যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার কী অবস্থা তা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থাকতো। তাঁর মতে That was a farely true picture of situation. কোথায় কোন যুদ্ধ হয়েছে, কতজন মারা গিয়েছে, কতজন মুক্তিযোদ্ধা মারা গিয়েছে,

---

[২২৩] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

[২২৪] গবেষকের সঙ্গে ওয়ালিউর রহমান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯

কত জন পাকিস্তানি সৈন্য মারা গিয়েছে সব এই রিপোর্টে বিস্তারিত লেখা হতো। এটা তৈরি করে সকল দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত ও মিশন প্রধানদের কাছে পাঠানো হতো। রাষ্ট্রদূত বা মিশন প্রধান পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত চিত্র কী তা জানার জন্য এটি দেখতেন। কিন্তু তিনি আর কাউকে সেটা দেখাতে পারতেন না কিংবা এই রিপোর্টের কোনো তথ্য কারো কাছে বলতে পারতেন না। প্রত্যেক পনেরো দিন পর পর এই রিপোর্ট আসতো। জাপানের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোতাহার হোসেন একজন বাঙালি ছিলেন এবং তিনি তৃতীয় সচিব কমর রহীমকে বিশ্বাস করতেন। তাই সিচুয়েশন রিপোর্টগুলো নিজের কাছে না রেখে কমর রহীমের কাছে রাখতেন। কমর রহীম সিচুয়েশন রিপোর্টগুলো বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর কাস্টডিতে রেখে দিতেন। ইতিমধ্যে আগস্ট মাসের প্রথমার্ধের রিপোর্ট কেমন করে বাংলাদেশ সরকারের হাতে চলে গিয়েছিল এবং বাংলাদেশ সরকার তা পুরোপুরি উদ্ধৃত করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে গোটা জাতিকে জানিয়ে দেয়। এটি ফাঁস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানিরা তদন্ত শুরু করে। কোন দূতাবাস বা মিশন থেকে ফাঁস হলো, কে ফাঁস করলো, কোন রাষ্ট্রদূত বা মিশন প্রধান দিয়েছে তা জানার চেষ্টা করে। যেখানে বাঙালি রাষ্ট্রদূত বা মিশন প্রধান ছিলেন সেখানে সন্দেহ ছিল বেশি। এ ঘটনার পর জাপানের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোতাহার হোসেন কূটনীতিক কমর রহীমকে ডেকে সকল রিপোর্ট ঠিক মতো আছে কিনা দেখতে বললেন। বিশেষ করে যে মাসের রিপোর্টের কথা বলা হয়েছে তা আছে কিনা। কমর রহীম তাঁর কাস্টডিতে গিয়ে দেখেন সব রিপোর্ট আছে শুধুমাত্র আগস্ট মাসের প্রথমার্ধের রিপোর্টটি নেই। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি কাউকে দেননি। কিন্তু কেন এটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তা বুঝতে পারছিলেন না। এ ঘটনার কোনো সুরাহা করতে না পেরে কমর রহীম রাষ্ট্রদূতকে এড়িয়ে চলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এটি তিনি খুঁজে পান। ঠিকমত ফাইল না করে অন্য স্থানে রেখে দেওয়ায় এটি যথাস্থানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে তিনি এটিকে ফাইলবন্দি করে রাষ্ট্রদূতকে দেখান যে, সব রিপোর্ট ঠিক আছে। এ ঘটনার পরে কমর রহীম জানতে পারেন যে, এই রিপোর্ট ফাঁস হয়েছিল নেপাল থেকে। নেপালের পাকিস্তান দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মোস্তাফিজুর রহমান পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পূর্বে এই রিপোর্ট ফাঁস করে দেন। মোস্তাফিজুর রহমান মিশনের প্রধান হিসেবে নিয়মিত এই রিপোর্ট পেতেন। কমর রহীম জানান যে, অনেকেই পেতেন কিন্তু অন্যরা কেউ শেয়ার করতো বলে তাঁর মনে হয় না। কমর রহীমের ব্যক্তিগত কাস্টডিতে রাখতেন বলে তিনি এটি নিজে পড়তে পারতেন। তিনি পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার সময় ওই রিপোর্টগুলো নিয়ে আসেননি কারণ তাঁর ভয় ছিল এগুলোর ব্যাপারে জাপান সরকারের কাছে অভিযোগ করলে হয়তো তাঁর বাসা তল্লাশি করা হতে পারে। যদি কোনো ভাবে জানাজানি হয় তাহলে নিজের ও বাংলাদেশ সরকারের জন্য খুবই বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হবে। এরকম বিপদের আশঙ্কা ছিল। তবে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কমর রহীম যে কাজ করেছিলেন তা সত্যিই দুঃসাহসিক। বাঙালি কূটনীতিকরা জানতেন যে, পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করা মাত্র তাদের পাকিস্তানি কূটনীতিক পাসপোর্ট অকার্যকর হয়ে যাবে। এজন্য পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করার পূর্বে তিনি তাঁর নিজের জন্য ও এস এম মাসুদের পরিবারের সকলের জন্য পাসপোর্ট তৈরি করে নেন। তাঁর ধারণা এই পাসপোর্ট হয়তো কোনো কাজে লাগবে না। তবুও পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার আগেরদিন রাতে এ কাজ সম্পন্ন করেন। যে নিরাপত্তা বেষ্টিত রুমে সাইফার ডকুমেন্ট, পাসপোর্ট, ব্ল্যাক লিস্ট থাকতো সেগুলোর ইনচার্জ তিনি হওয়ায় চাবি

তাঁর কাছে থাকতো। এমনকি সিন্দুক খোলার কোড তাঁর কাছে থাকতো। নিরাপত্তা বেষ্টিত কক্ষের গার্ড বাঙালি হওয়ায় কমর রহীমের কাজে কোনো ধরনের সন্দেহ করেনি। তিনি রুমে গিয়ে পুরো সময় নিয়ে পাসপোর্ট তৈরি করেন। পরবর্তীতে পাকিস্তান দূতাবাস জানতে পারে তাদের গোপন কাস্টডি থেকে পাসপোর্ট হারিয়েছে। তবে তারা অফিসিয়ালি সার্কুলার দিয়ে পাসপোর্টগুলো বাতিল করে দিয়েছিল।[২২৫]

৪.১.ণ বিভিন্ন দূতাবাসে নিযুক্ত বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মুজিবনগর সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এপ্রিল মাসে কলকাতা, দিল্লি ও নিউইয়র্কের বাঙালি কূটনীতিকদের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক মাসের মধ্যে এমন ঘটনা সারা বিশ্বে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালিদের অনুপ্রাণিত করে। তারাও বিভিন্নভাবে পরিকল্পনা করে কীভাবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করা যায়। ৩০ জুন পর্যন্ত ১২ জন পদস্থ বাঙালি কূটনীতিক তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেন। তারপর থেকেই তারা বিশ্বের অন্যান্য স্থানের বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান দূতাবাসে ছেড়ে চলে আসতে উৎসাহিত করেন। ক্ষেত্রবিশেষে তারা টেলিফোনে অথবা সরাসরি দেখা করে তাদের পক্ষ ত্যাগে অনুরোধ জানান। এক্ষেত্রে এ এম এ মুহিতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ এম এ মুহিত নিজের অবস্থান পরিবর্তন করার পূর্বেই বিভিন্ন দেশের পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কর্মরত তাঁর পরিচিত সহকর্মীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাতে থাকেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল সকল দেশ থেকে একযোগে বাঙালি কূটনীতিকরা পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করবে। যা বিশ্বে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করবে। কিন্তু অবস্থা অনুকূলে না থাকায় এ এম এ মুহিত নিজেও পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে কিছুটা বিলম্ব করেন। তবে এ এম এ মুহিত অন্যান্য সহকর্মীদের কীভাবে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন সে সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন- ‘আমরা ইতিমধ্যে আমেরিকায় বাঙালিদের সংগে সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যস্ত। একই সংগে অন্যান্য দেশে বাঙালি কূটনীতিবিদদের সংগে যোগাযোগ করছি। মার্চেই লন্ডনে সেলিমুজ্জামান এবং রেজাউল করিমের সংগে ও প্যারিসে মনজুর হোসেন চৌধুরীর সংগে আমার কথা হলো। সেলিমুজ্জামান ধীরে স্থিরে চিন্তা করতে বললেন। কিন্তু রেজা আর মনজুর দ্রুত পদক্ষেপ নিতে খুবই উৎসাহী ছিলেন। মনজুর তো নালিশই করলেন যে, আমরা এত জন ওয়াশিংটন বসে কেন চুপ করে আছি। এপ্রিলে যোগাযোগ হলো সুদানের রাষ্ট্রদূত আতাউর রহমানের সংগে আর টোকিওতে কায়সার মুরশেদের সংগে। কায়সারকে দফতরে টেলিফোন করেছিলাম, তিনি বেশি কথা না বলে পরে আরেকটি পাবলিক কল অফিস থেকে কথা বলেন, তার বাঙালি রাষ্ট্রদূত মোতাহার হোসেন মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন না বলে তিনি জানালেন।’[২২৬]

সুইজারল্যান্ডের বার্নে নিযুক্ত পাকিস্তানি দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিক ওয়ালিউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই তাঁর সহকর্মী অনেক বাঙালি কূটনীতিকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। বিশেষ করে ওয়াশিংটনে শামসুল কিবরিয়া ও লন্ডনে মহিউদ্দিন আহমদ এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে জানতে চেয়েছেন তারা কবে নাগাদ পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য পরিবর্তন করবে। এর বাইরে পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে নিযুক্ত অনেক বাঙালি কূটনীতিককে স্বপ্রণোদিত হয়ে টেলিফোন

---

[২২৫] গবেষকের সঙ্গে কমর রহীম এর সাক্ষাৎকার, ১৯ মার্চ ২০১৮

[২২৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

করে তাদেরকে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে বলতেন। ইতালির রোমে পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিক আতাউল করিমের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আতাউল করিম তাঁকে জানান যে, তিনি হিরো হতে চান না। লন্ডনে রেজাউল করিমের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের অবস্থান জানতে চান। এক্ষেত্রেও ওয়ালিউর রহমান কোনো সদুত্তর পাননি। প্যারিসে কর্মরত ছিলেন বাঙালি কূটনীতিক ফারুক সোবহান। তাঁকে পদত্যাগ করার কথা বললে তিনি পদত্যাগ না করে পাকিস্তান সরকারে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। অবশ্য অধ্যাপক রেহমান সোবহান মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষীকে বলেছিলেন তাঁর ভাইকে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের পর যেন লন্ডনে একই পদে দেওয়া হয়। এ সংক্রান্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল মিসেস গান্ধীর প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. অশোক মিত্রের বাসায়।[২২৭] বার্লিনের বাঙালি কূটনীতিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন কিন্তু তারাও কোনো সাড়া দেয়নি। বেলগ্রেডে নিযুক্ত ছিলেন দ্বিতীয় সচিব রাশেদ আহমেদ চৌধুরী। তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ করলে তিনিও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেননি। কিন্তু সে নিয়মিত ওয়ালিউর রহমানের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতেন। এসব বাঙালি কূটনীতিকদের অনেকেই ওয়ালিউর রহমানের টেলিফোন ধরতেন না। তারা অনেকেই ওয়ালিউর রহমানকে ভয় পেত। রোমে নিযুক্ত বাঙালি কূটনীতিক আতাউল করিম টেলিফোন ধরলেও প্যারিসের ফারুক সোবহান কখনও ওয়ালিউর রহমানের ফোন ধরতেন না।[২২৮] উল্লেখ্য যে, বেলগ্রেডের দ্বিতীয় সচিব রাশেদ আহমেদ চৌধুরী অবশ্য মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার জন্য লন্ডনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু বিচারপতি চৌধুরী তাঁকে ওই সময় পদত্যাগ না করে বরং দূতাবাসে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যে কারণে রাশেদ আহমেদ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে পারেননি। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন। আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে না করতে পারায় পরবর্তীতে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁকে সনদপত্র দিয়েছিলেন যা তাঁর পরবর্তী কর্মজীবনের উন্নতিতে সহায়ক হয়েছিল।[২২৯] আবার ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালিদের বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ স্বয়ং জাকার্তায় উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু মুজিবনগর সরকারের নির্দেশ নিয়ে মান অভিমান থাকায় তারাও মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন পাকিস্তান সরকারের চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে সক্ষম হয়নি। **লেবাননের** বাঙালি কূটনীতিক আবদুল কাইয়ুম ও জর্ডানের আমিনুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের চাকরি ত্যাগ করেননি। তারা এ প্রসঙ্গে যুক্তি দেখিয়েছেন বিদেশে পাকিস্তান মিশনে অবস্থান করে তারা মুজিবনগর সরকারের পক্ষে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বেলগ্রেডের আনোয়ার হাশিমকে শুধুমাত্র এ ধরনের নির্দেশনা মুজিবনগর সরকার থেকে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি সে মতে কাজ করেছিলেন। ১৩ আগস্ট তারিখে হোসেন আলী সেনেগালের পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আনোয়ারুল হককে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান করার জন্য চিঠি লিখেন।[২৩০] মুক্তিযুদ্ধকালীন ঢাকায় জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক ও যুগ্ম

---

[২২৭] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 125

[২২৮] গবেষকের সঙ্গে ওয়ালিউর রহমান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯

[২২৯] গবেষকের সঙ্গে আবুল কাশেম চৌধুরীর (বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ছোট সন্তান) সাক্ষাৎকার, ১৫ এপ্রিল ২০১৮

[২৩০] The Diary of Hossain Ali

সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন বাঙালি কূটনীতিক আরশাদ-উজ জামান। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, ১৮ এপ্রিল কলকাতায় বাঙালি কূটনীতিক এম হোসেন আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর আরশাদ-উজ জামানকে বাংলাদেশ পক্ষে চলে আসার জন্য বার্তা পাঠিয়েছিলেন।[২৩১]

মুক্তিযুদ্ধকালীন ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের স্টেনোগ্রাফার সানাউল্লাহ কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান এম হোসেন আলীর নিকট এক চিঠিতে তাঁকে কলকাতায় আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ জানান। এ চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা মিশনের বাঙালি কূটনীতিক এম. মকসুদ আলী দূতাবাস প্রধান এম হোসেন আলীর পক্ষে তাঁকে চিঠি দিয়ে কলকাতার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে জানান যে- 'আপনার ১৩ মে তারিখের জনাব হোসেন আলী সাহেবের কাছে লিখিত পত্র পেলাম। ওখানে আপনার কাজের জন্য তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আপনার এখানে আসার বিষয়ে সকল দিক বিবেচনা করে জানানো হচ্ছে যে, একজন স্টেনোগ্রাফারের পক্ষে এখানে কর্মের ব্যবস্থা করা হয়ত খুব কঠিন হবে না। বাংলাদেশ সরকার আপনার কর্মব্যবস্থা করে দিতে পারবেন বলে আশা করা যায়। তবে প্রশ্ন হলো বাসস্থানের। বাসস্থানের সমস্যা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং কলকাতা তার কোন ব্যতিক্রম নয়। তদুপরি বাংলাদেশ থেকে লোক চলে আসায় সমস্যা আরও তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে। আপনাকে নিজ চেষ্টায় বাসস্থানের সন্ধান করে নিতে হতে পারে। এ সমস্ত বিবেচনা করে যদি আপনি এখানে চলে আসা মনস্থ করেন, তখন আমাদেরকে জানাবেন। যতদিন ওখানে থেকে বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে পারেন তার চেষ্টা করবেন এবং যদি নিতান্তই আপনাকে এখানে আসতে হয় তাহলে টি-এ ও ডি-এ নিয়ে নেবেন। একথা জানিয়েছেন মিঃ হোসেন আলী সাহেব।'[২৩২]

এই চিঠির ভাষা দেখে মনে হয় বাঙালি কূটনীতিক ও দূতাবাসের বাঙালি কর্মচারীরা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার কথা জানালে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস সাহায্যের ব্যাপারে ছিল খুবই আন্তরিক। ক্ষেত্রবিশেষে কলকাতাস্থ মিশন তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলেও তৎকালীন সময়ে কলকাতায় যে আবাসনের চরম সংকট ছিল তা বলতে দ্বিধা করেননি। দূতাবাসের যে কোনো বাঙালির পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ পরবর্তী সাহায্য সহযোগিতা করতে মুজিবনগর সরকারের মতো তারাও আন্তরিক ছিলেন।

বাঙালি কূটনীতিকদের পাশাপাশি কে এম শিহাবুদ্দিন অকূটনৈতিক পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের ব্যাপারেও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অন্যতম কাজের মধ্যে ছিল দিল্লিস্থ বাঙালি কর্মচারীদের একত্রিত করা ও তাদেরকে দিল্লির পাকিস্তান দূতাবাস থেকে বের করে নিয়ে আসা। দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত অনেক কর্মচারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেরাই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। কে এম শিহাবুদ্দিন ষতর্কতার সঙ্গে তাদের পক্ষ ত্যাগের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। তাদেরকে দলগতভাবে ভাগ করে দেন এবং সময় বলে দেন। বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে বেশি জনসমর্থন পাওয়ার সময়টিকে কাজে লাগিয়ে তাদের পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় এসব পক্ষ

---

[২৩১] Arshad-uz Zaman, *Privileged Witness Memoirs of A Diplomat*, Dhaka: UPL, 2000. p. 107

[২৩২] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৩

ত্যাগকারী বাঙালি কর্মচারীদের অধিকাংশকে পরিবার সহ থাকার বন্দোবস্ত করা।[২৩৩] এছাড়া দিল্লি পাকিস্তান দূতাবাসের কর্মচারী হোসেন আলীকে আটক ও অত্যাচার করার সংবাদ পাওয়ার পর কে এম শিহাবুদ্দিন ভারতের রেডক্রসের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তিনি অন্যান্য বাঙালিদের সহযোগিতায় প্রতিদিন হোসেন আলীর মুক্তির জন্য পাকিস্তান হাইকমিশনের সামনে সমাবেশ করতে লাগলেন। তাদের এই প্রচেষ্টায় ভারত সরকার, রেডক্রস ও স্থানীয় গণমাধ্যম কার্যকরী সহায়তা করেছিল।[২৩৪] দিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের চারজন কর্মচারীকে পরিবারের সদস্যসহ ভারত সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রেও কে এম শিহাবুদ্দিন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

৪.১.ত পাকিস্তান সরকারের অন্যান্য চাকরিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগে উৎসাহ প্রদান

মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় জুড়ে মুজিবনগর সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি কূটনীতিকরা পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করে আসতে যেমন দ্বিধা করেননি তেমনি কূটনীতিক পেশায় না থেকেও অনেকে পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করেছেন। তাদের কারো ব্যাপারে মুজিবনগর সরকারের কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল না। কিন্তু কেউ যদি পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করলে তাদেরকে উৎসাহিত করা হতো। তাদেরকে যথাযোগ্য চাকরিতে বহাল করার ব্যাপারে মুজিবনগর সরকার সচেষ্ট ছিল। এসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের অনেক দেশে পাকিস্তান সরকারের চাকরিতে নিয়োজিত অনেক কর্মকর্তা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বা সরকারি কোনো কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তারাও বাঙালি কূটনীতিকদের মতো মার্চের শুরু থেকেই বাংলাদেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সংখ্যায় তারা কম হওয়ায় তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগও তেমন ছিল না, তাই তারা সংগঠিত হতে পারেনি। পাকিস্তান সরকারের চাকরিতে নিয়োজিত এসব বাঙালিরাও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে উদগ্রীব ছিল। এক্ষেত্রে তারা যে সকল দেশে অবস্থান করছিল সেসব দেশের পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের করণীয় কী তা জানতে চেয়েছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বাঙালি কূটনীতিকরা এসব বাঙালিদের আশ্রয় দেওয়া থেকে শুরু করে কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় সুযোগ করে দেওয়া, পাকিস্তান থেকে তাদের পরিবারকে নিয়ে আসার ব্যাপারেও সহযোগিতা করেছেন।

২৮ জুন রাতে ওয়েলসের কার্ডিফ সমুদ্র বন্দরে পাকিস্তান শিপিং করপোরেশনের এমভি কর্ণফুলী নামক জাহাজ থেকে ১৫ জন বাঙালি অফিসার ও কর্মচারী ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তারা বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকার অর্থাৎ মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং এমভি কর্ণফুলীসহ সকল জাহাজের বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিদের নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের চিত্র তুলে ধরে। তাদের পক্ষে নুরুল হুদা জানান যে, ২৫ মার্চের কালো রাত্রিতে এমভি কর্ণফুলী চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থান করছিল। তিনি ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে এমভি সোয়াতে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের বিবরণ এবং চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আমদানির বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি জানান

---

[২৩৩] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 128
[২৩৪] *Ibid*, p. 128

যে, এমভি সোয়াতের সকল বাঙালি অফিসার ও কর্মচারীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। নুরুল হুদা বাংলাদেশে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্ব বিবেকের কাছে আবেদন জানান। ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগকারী ১৫ জন অফিসার ও কর্মচারীদের যুদ্ধ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত ব্রিটেনে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করে। এসকল নাবিকদের পরবর্তীতে বাংলাদেশ মিশনের কাজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২৩৫]

বাংলাদেশে পাকিস্তানি হামলা শুরু হওয়ার সময় বাল্টিমোরে দু'তিনটি পাকিস্তানি জাহাজ নোঙ্গর করা ছিল। এদের একটি জাহাজে বাঙালি নাবিক ফখরুজ্জামান চৌধুরী সাদ কাজ করতেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে করণীয় সম্বন্ধে জানার জন্য সে বাঙালি কূটনীতিক এ এম এ মুহিতের কাছে পরামর্শ চায় এবং এ এম এ মুহিত তাঁকে জাহাজ ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। ফখরুজ্জামান শেষ পর্যন্ত জাহাজ ত্যাগ করেনি কিন্তু আবদুল আউয়াল মিন্টুর নেতৃত্বে ৬ জন নাবিক ৮ এপ্রিলে ময়নামতি ও শালিমার জাহাজ পরিত্যাগ করে। তাদের সহায়তা করেন উইলিয়াম গ্রীনো। *বাল্টিমোর সান* পত্রিকায় তাদের দুজনের নাম প্রকাশিত হয় যথা আবদুল আওয়াল এবং তাহেরুল ইসলাম নামে। ১১ এপ্রিল তাদেরকে নিয়ে ড. গ্রীনো একটি স্টেশন ওয়াগনে চড়ে এ এম এ মুহিতের বাসায় যান। তাদের এই দৃপ্ত পদক্ষেপ ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করা।[২৩৬] আগস্ট মাসে পাকিস্তানি জাহাজ 'বাগে ঢাকা' লন্ডন আসার পথে করাচিতে জাহাজের বাঙালি সেকেন্ড অফিসার আবদুর রশীদকে পাকিস্তানিরা নামিয়ে রাখে। জাহাজে ছিলেন আরো তিনজন বাঙালি কর্মচারী- আবুল কালাম আজাদ, সিদ্দিকুল্লাহ ও নুরুল হক। জাহাজ লন্ডনে পৌঁছলে তারাও নেমে যান। আবদুর রশীদকে নামিয়ে রাখা এবং তার ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দেন। নিজেদেরকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করেন।[২৩৭]

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন আবদুর রউফ। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, যে সরকার তার দেশের মানুষের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে এবং দেশকে জোর করে দখলে রেখেছে তাদের অধীনে চাকরি করবেন না। উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য লন্ডনে অবস্থানরত আবদুর রউফ ৮ আগস্ট ঘোষণা করেন মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশের সরকার একটি ন্যায়সঙ্গত সরকার। সেই সরকারের নির্দেশমতো তিনি যে কোনো কাজ করতে সবসময় প্রস্তুত আছেন। ঐদিন লন্ডনের কনওয়ে হলে অনুষ্ঠিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত জনসভায় উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।[২৩৮]

৪.১.থ যোগাযোগ বা গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম সরবরাহে সহায়তা

এপ্রিল মাসে বোস্টন থেকে এ এম এ মুহিতের সঙ্গে যোগাযোগ করেন রেজাউল হাসান ফিরোজ। বোস্টনের উৎসাহী ও নিবেদিত বাঙালি যুবক রেজাউল হাসান ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে উচ্চ শিক্ষায় রত ছিলেন। রেজাউল হাসান ফিরোজ মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার প্রস্তাব করেন। যা ছিল খুবই গোপনীয়। যুদ্ধে টেলিযোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং

[২৩৫] খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪
[২৩৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯-৫০
[২৩৭] তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩
[২৩৮] ওই, পৃ. ৬২

মুক্তিবাহিনীর উপযুক্ত টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম না থাকার ব্যাপারটি তিনি উপলদ্ধি করেন। এ ব্যাপারে তাঁর শিক্ষক রবার্ট রাইনের সহযোগিতায় তিনি অতি সহজে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি স্বল্প খরচে যোগাড় করেন। ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির ছাত্র রেজাউল হাসান ফিরোজ বাঙালি কূটনীতিক এ এম এ মুহিতকে জানান তিনি কিছু টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি মুজিবনগর সরকারের কাছে পাঠাতে চান। এর জন্য প্রায় বিশ হাজার ডলার খরচ হয়। বোস্টনের ডা. রেজাউর রহমান, শিকাগোর ড. এফ আর খান, নিউ ইংল্যান্ড এ্যাসোসিয়েশন, লস এঞ্জেলস লীগ, শিকাগো লীগ, মিডওয়েস্ট লীগ, নিউইয়র্ক লীগ এবং মানিটোবা এ্যাসোসিয়েশন সে খরচ যোগাড় করে। বোস্টন থেকে প্রাক্তন কূটনীতিক তৈয়ব মাহতাব এবং আগস্টে ওহায়ো থেকে অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম মুজিবনগরে এই টেলিযোগাযোগ যন্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিতে যান।[২৩৯] রেজাউল হাসান বাঙালি কূটনীতিক এ এম এ মুহিতের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম কারণ ছিল এসব টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি রপ্তানি করার জন্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে তা পাঠানো সম্ভব ছিল না। তাই এসব যন্ত্রপাতিকে সাইক্লোন সংকেত যন্ত্রপাতি হিসেবে সরকারি অনুমোদন ছাড়াই মুজিবনগর সরকারের কাছে পাঠানো সম্ভব। এ কাজটি একজন কূটনীতিক যত সহজে করতে পারবেন অন্য কেউ তা পারবে না। এ এম এ মুহিত কূটনীতিক চ্যানেল দিয়ে এসব যন্ত্রপাতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সহজ প্রেরণ করতে পারবেন।[২৪০]

রেজাউল হাসানের পাঠানো এসব যন্ত্রপাতি ওয়াশিংটনে গ্রহণ করেন এ এম এ মুহিত। ফিরোজ ১০০টি ওয়াকিটকি, ৮টি শর্টওয়েভ রেডিও ট্রান্সমিটার ও রিসিভার এবং প্রয়োজনীয় ব্যাটারি যোগাড় করেন। যন্ত্রপাতিগুলো ২৫টি বাক্সে করে জুন মাসের ১১, ১৩ ও ১৮ তারিখে রেজাউল হাসান ওয়াশিংটনে পাঠান। হারুন-অর-রশিদ, আবদুর রাজ্জাক খান এবং এ এম এ মুহিত তিনটি গাড়ি নিয়ে রাতের আঁধারে তা পৌঁছে দেন ভারতীয় সরবরাহ মিশনে। ভারতীয় মিশনের সুশীতল ব্যানার্জীর মাধ্যমে চার টন যন্ত্রপাতি মুজিবনগর পাঠানো হয়।[২৪১] উল্লেখ্য যে, ভারতীয় মিশনের সুশীতল ব্যানার্জীর সঙ্গে এ এম এ মুহিতের পরিচয় করিয়ে দেন বিশ্বব্যাংকে কর্মরত ভারতের নির্বাহী পরিচালক ড. সমর রঞ্জন সেন। এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটি কীভাবে সমাধা করেন সে সম্পর্কে স্মৃতিকথায় এম এ মুহিত লিখেছেন। এপ্রিল মাসেই তারা সেগুলো পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এর জন্যে তাদের সাহায্য করেন ড. সমররঞ্জন সেন। ভারত দূতাবাসের সঙ্গে এ এম এ মুহিতের তখন বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। তাই সমর রঞ্জন সেনের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করেন। তিনি ভারতীয় দূতাবাসে সাপ্লাই উইং এর সঙ্গে এই দলের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। দূতাবাসের সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন সুশীতল ব্যানার্জী। এই পুরো ব্যাপারে ওয়াশিংটনের চারজন বাঙালি হারুন অর রশিদ, আবদুর রাজ্জাক খান, এনায়েত করিম এবং এ এম এ মুহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এছাড়া এটা কেউ জানতো না। এমনকি জানানোর কোনো উপায়ও ছিল না। এটা বেআইনি কাজ হওয়ায় বাইরে এই সংবাদ গোপনে রাখা হয়েছিল।[২৪২] এ ধরনের একটি কাজ করতে পেরে একজন বাঙালি

---

[২৩৯] সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬২

[২৪০] গবেষকের সঙ্গে আবুল মাল আবদুল মুহিত এর টেলিফোনে নেওয়া সাক্ষাৎকার, ৫ মার্চ ২০১৯

[২৪১] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭-৬৯; তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

[২৪২] এ এফ সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

কতটুকু তৃপ্তিবোধ পেয়েছেন সে সম্পর্কে বলেন- ‘এই কাজটি করে আমাদের খুব তৃপ্তি হয়। আমার মনে হলো যে, এতে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যেন আমরা অংশ নিলাম।’[২৪৩] তবে এই কাজের পর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুজিবনগর সরকারের কাছে আর কোনো যন্ত্রপাতি কূটনীতিকরা পাঠাতে পারেননি। নিউইয়র্ক থেকে একটি শক্তিশালী রেডিও ট্রান্সমিটার পাঠানো হয়েছিল। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক জায়গা থেকে কাপড়, তাঁবু ইত্যাদি পাঠানো হয়। যুদ্ধের সময় বাঙালি কূটনীতিকদের নিকট জেনারেল ওসমানী একটি অস্ত্রের তালিকা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করতে না পারায় তারা পাঠাতে পারেননি।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানের জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত একজন বাঙালি সাইফার[২৪৪] কর্মকর্তার মাধ্যমে পাকিস্তানিরা কীভাবে আত্মসমর্পণ করবে সে সম্পর্কে একটি গোপন বার্তা পাওয়া যায়। এতে উল্লেখ ছিল- জেনারেল নিয়াজী এখন অগ্রবর্তী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য অনুমতি লাভের অপেক্ষা করছেন। আরো জানা যায় যে, ঢাকায় জাতিসংঘ প্রতিনিধি পল মার্ক হেনরি রাও ফরমান আলীর পক্ষ থেকে এরকম একটি মেসেজ পেয়েছেন যাতে তিনি বলেছেন- তাঁর অফিস এখন একটি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করছে। যেখানে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হবে যে, বাংলাদেশ থেকে নিরাপদে পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রত্যাহার করা যাবে।[২৪৫]

৪.১.দ কূটনীতিকদের বাসস্থানকে ব্যবহার

মুক্তিযুদ্ধের সূচনার পূর্ব থেকে পুরো সময় জুড়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যে সকল বাঙালি কূটনীতিক ছিলেন তাদের গোপন আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গোপনীয়তার প্রয়োজন ছিল। গোপনীয়তা রক্ষায় তারা তাদের বাসস্থানকে সভার স্থান হিসেবে ব্যবহার করতেন। অবশ্য এর পেছনে অন্য একটি কারণও বিদ্যমান ছিল। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই পাকিস্তানিরা বাঙালিদের সন্দেহের চোখে দেখতো। প্রতি মুহূর্তে তারা খোঁজ রাখতো বাঙালিরা কী করছে। আর সে অনুযায়ী রাষ্ট্রদূত কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে পাকিস্তান সরকারের কাছে এসব বাঙালি কূটনীতিকদের নামে গোপন প্রতিবেদন পাঠাতো। পাকিস্তানিদের চোখে ধুলো দিয়ে যাতে নির্বিঘ্নে দেশের জন্য কাজ করতে বাঙালি কূটনীতিকদের নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হতো। কিন্তু একসাথে বাইরে কোথাও বসে আলাপ-আলোচনা করা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় তারা নিজেদের বাসস্থানকে একাজে ব্যবহার করে। আবার পাকিস্তানিদের সন্দেহের তালিকায় যেসকল বাঙালি কূটনীতিক ছিল তাদের অনেককেই সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখা হতো। এজন্য বাঙালি কূটনীতিকরাও একেক সময় একেক জনের বাসায় সমবেত হতেন। তারা বাইরে এমনভাবে আচরণ করতেন যেন বাঙালিদের নিয়ে কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায় বাঙালি কূটনীতিকদের বাসস্থান মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বা বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় লোকদের জন্যও ছিল নিরাপদ আশ্রয়। তারা সেখানে নিজেদের মতো করে অবস্থান করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কাজ করতেন। যদিও তা ন্যায়সঙ্গত ছিল না। কিন্তু দেশের জন্য বাঙালি কূটনীতিকরা নিজেদের বাসস্থানকে অনায়াসেই তাদেরকে ব্যবহার করতে দিতো।

---

[২৪৩] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

[২৪৪] গুপ্ত ও সাংকেতিক লেখা লিখতে ও পড়তে পারেন যারা।

[২৪৫] গবেষকের সঙ্গে আবুল মাল আবদুল মুহিত এর টেলিফোনে নেওয়া সাক্ষাৎকার, ৫ মার্চ ২০১৯

১৯৭১ সালের ১৪ মে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সুইস টেলিভিশনে একটি সাক্ষাৎকার দেন। এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়েছিল কলকাতাস্থ হোসেন আলীর বাসভবনে।[২৪৬] পাকিস্তানের চাকরি ছেড়ে চলে আসা প্রথম বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে বাংলাদেশের সকল ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করতেন। এজন্য তিনি ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। তখন থেকেই বাংলাদেশের পক্ষে কিছু করার তাগিদ অনুভব করতেন। এ তাগিদ থেকে তিনি নিয়মিত তার বাসা ও অফিসে বাঙালি সহকর্মীদের নিয়ে গোপনে সভা করতেন। আবার কখনো সভার জন্য দিল্লির সাংবাদিক দিলীপ মুখার্জীর বাসভবনকে ব্যবহার করতেন। তিনি জানতেন পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনী তাঁর ওপর নজরদারি করছে। যে কোনো সময় ধরা পড়লে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তারপরও দেশমাতৃকার টানে এসব গোপন সভা নিজের বাসায় করতেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে গোপনে ভারতের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের বাসায়ও সভা করতেন।[২৪৭] শিহাবুদ্দিন বাঙালিদের মধ্যে যারা তখনও পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কর্মরত ছিলেন তাদের সঙ্গে গোপন আলোচনার জন্য ড. ত্রিগুনা সেনের বাসভবনকে ব্যবহার করতেন।[২৪৮]

পাকিস্তানের সর্বশেষ পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য ২৩ মার্চ পাকিস্তানের ওয়াশিংটনস্থ উপ মিশন প্রধান এনায়েত করিমের বাসায় বাঙালি কূটনীতিকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বাংলাদেশ সমিতি গঠন করে এর সভাপতি ও সম্পাদক করা হয় যথাক্রমে এনায়েত করিম ও হারুন-অর-রশিদকে।[২৪৯] কিছুদিন পর এ এম এ মুহিত এর বাড়িতে দূতাবাসের কর্মচারীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন মুহিত তাঁর সহকর্মীদের জানান যে, মাস শেষে তিনি দূতাবাস পরিত্যাগ করবেন এবং আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় নিবেন। মুহিতের এ সিদ্ধান্তে সকলের প্রশ্ন ছিল তাঁর চলবে কী করে, তিনি কী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল তাঁর এ পদক্ষেপে আন্দোলনের কী লাভ হবে, তিনি কী করবেন? কিন্তু মুহিতের আত্মবিশ্বাস ছিল যে, এ চাকরি ছাড়ার পর তিনি কোথাও না কোথাও কোনো কাজের ব্যবস্থা করতে পারবেন।[২৫০]

ওয়াশিংটনে বসবাসরত বাঙালিরা গণহত্যার সংবাদ জানার পরেই এম এ মুহিতের ম্যারিল্যান্ডের বাসায় এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শামসুল কিবরিয়া, এনায়েত করিম ও দূতাবাসের বাঙালি কর্মচারীরা। 'আমার সোনার বাংলা' গান গেয়ে সভার কাজ শুরু হয়। এনায়েত করিম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে প্রবাসী বাঙালিদের একাত্মতা ঘোষণা করেন। সেই সভাতে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়, যার কাজ হবে আমেরিকাতে সিনেটর, কংগ্রেস ম্যান, প্রেস ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে

---

[২৪৬] The Diary of Hossain Ali
[২৪৭] K M Shehabuddin, *ibid*, p. 79
[২৪৮] *Ibid*, p. 106
[২৪৯] এনায়েত করিম ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাসের উপ মিশন প্রধান ছিলেন এবং হারুন-অর-রশিদ ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকের কার্যালয় ও পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন।
[২৫০] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

যোগাযোগ স্থাপন করা এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি অবহিত করা।[২৫১] ২৯ মার্চ রাতে আবার শ'খানেক লোক একটি সভায় মিলিত হয়। সভাস্থল ছিল এ এম এ মুহিতের বাড়ি। পরবর্তী কর্মসূচি এবং তা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য কৌশল নিয়ে আলোচনাই ছিল এ সভার মূল উদ্দেশ্য। ব্যাপক আলোচনার পর যে সকল সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়-

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেসব স্থানে বাঙালিরা বাস করছেন সর্বত্র এবং এর মধ্যে অবিলম্বে যেখানে সম্ভব সেসব স্থানে বাংলাদেশ লীগ গড়ে তোলা,

খ. বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা নিউইয়র্ক হবে কেন্দ্রীয় সংগঠন। সকল লীগ কাজ করবে নিউইয়র্ক লীগের অধীনে,

গ. প্রয়োজন হলে যথাসময়ে সকল সংগঠন মিলে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়,

ঘ. স্থানীয় সংগঠনগুলোর খরচ নির্বাহ এবং প্রতিরোধ যুদ্ধ সংগঠনে সহায়তা করার জন্য একটি তহবিল গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়,

ঙ. প্রতিরোধ যুদ্ধ সংগঠনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং প্রকৃত অবস্থা জানার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৫২]

মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি অধ্যাপক রেহমান সোবহান বাঙালি কূটনীতিক এনায়েত করিমের বাড়িতে স্টেট ডিপার্টমেন্টে বাংলাদেশ ডেস্ক অফিসার ক্র্যাগ বাক্সটারের সঙ্গে দেখা করেন।[২৫৩] নিউইয়র্কে রেহমান সোবহান পাকিস্তানের জাতিসংঘ প্রতিনিধিদের তৎকালীন উপ স্থায়ী প্রতিনিধি এস এ করিম ও তাঁর স্ত্রী আয়েশা করিমের সঙ্গে তাদের আপার-ইস্ট সাইডের বাড়িতে ছিলেন। এস এ করিম তখনও পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকরিরত। তাই দেশদ্রোহে অভিযুক্ত একজনের তাঁর বাড়ির অতিথি হওয়া তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। রেহমান সোবহান নিরাপত্তা পরিষদে আসীন জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে যোগাযোগ করছিলেন। এর ফলে এস এ করিমের বিপদ আরো বাড়ছিল। কিন্তু আয়েশা করিমের উৎসাহে এস এ করিম এই ঝুঁকি নিতে রাজি হন। করিম তাঁর নিজস্ব সংযত কায়দায় পাকিস্তানের প্রচার এবং বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্যের কথা বিভিন্ন মিশনের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত তার জাতিসংঘের সতীর্থদের জানাতেন।[২৫৪]

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে এম আর সিদ্দিকী ওয়াশিংটনে পৌঁছার পর তাঁর সঙ্গে একটি গোপন আলাপ-আলোচনার জন্য পাকিস্তান ডেস্কের দু'জন অফিসার রুস ল্যাঙ্গিন এবং পিটার কনস্টেবল বাঙালি কূটনীতিক শামসুল কিবরিয়ার বাসায় বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে শামসুল কিবরিয়া উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তান ডেস্কের দু'জন অফিসার এ গোপন বৈঠকে যেসব কথাবার্তা বলেন তা কিবরিয়া এমনকি এম আর সিদ্দিকীরও পছন্দ হয়নি। এ আলাপে পাকিস্তান ডেস্কে নিয়োজিত কর্মকর্তারা পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার প্রস্তাব করেছিলেন। যে আলাপের সূত্রপাত কলকাতায় খোন্দকার

---

[২৫১] জাওয়াদুল করিম, *মুজিব ও সমকালীন রাজনীতি*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১। পৃ. ৩৫

[২৫২] তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮-১৬৯

[২৫৩] রেহমান সোবহান, *উতল রোমন্থন পূর্ণতার সেই দিনগুলো*, পৃ. ৩৫৬

[২৫৪] রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯

মোশতাক আহমেদের মাধ্যমে। এজন্য শামসুল কিবরিয়া এই গোপন আলোচনাকে ব্যর্থ প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২৫৫]

কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের দ্বিতীয় প্রধান কর্মকর্তা আনোয়ারুল করিম চৌধুরীর বাসায় ভারত ও বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের সমাগম ঘটতো। প্রাক্তন আমলা, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ সব ধরনের লোক এখানে আসতেন। তারা এখানে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতেন, নিজেদের মধ্যে কুশলাদি বিনিময় করতেন এবং একে অপরকে সাহস যোগাতেন।[২৫৬] বাংলাদেশ মিশনের পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মধ্যে আনোয়ারুল করিম চৌধুরীর বেশ প্রভাব এবং পরিচিতি ছিল। সার্কাস রোডের একটি বড় বাড়ির নিচতলায় তিনি বসবাস করতেন। অবিবাহিত আনোয়ারুল করিম চৌধুরীর শোবার ঘরটিই ছিল তার আয়ত্বে বা বলা যায় নিয়ন্ত্রণে। বাকি সকল ঘর অন্যান্যদের দখলে চলে গিয়েছিল। আর ড্রয়িং রুম ছিল বিভিন্ন পেশার বাঙালিদের সকলের আপন ঘর। যখন খুশি বাঙালিরা এসে এখানে বসতেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হতো, এমনকি পাশাপাশি চা নাস্তার ব্যবস্থাও ছিল। যুদ্ধের খবর, দেশের খবর, বিদেশি সমর্থনের সর্বশেষ তথ্য এবং নানা রকম বিশ্লেষণ, সব মিলে সারাক্ষণই সরগরম থাকতো আনোয়ারুল করিম চৌধুরীর ড্রয়িং রুম। এছাড়াও ছোটোখাটো বিনোদনের জন্য আনোয়ারুল করিম চৌধুরী সকলকে বিকালে বা সন্ধ্যায় কলকাতার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নিয়ে যেতেন।[২৫৭]

মুজিবনগর সরকার থেকে যে কূটনীতিক প্রতিনিধি দল পাঠানো হয় তাদের সবাই বিশেষ করে মোল্লা জালালউদ্দিন, মাহমুদ শাহ কোরেশী দিল্লিতে কে এম শিহাবুদ্দিনের বাসায় সমবেত হন। শিহাবুদ্দিন এ দলটির সার্বক্ষণিক দিক তত্ত্বাবধান করতেন।[২৫৮]

ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিক আবুল ফজল শামসুজ্জামানের বাসভবনে নিয়মিত বাঙালিদের সভা হতো। তাঁর বাসভবন থেকেই 'আমরা' সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। তাঁর বাসায় অনুষ্ঠিত এক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করা বাঙালিরা যে ছদ্মনাম ব্যবহার করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একদিন সন্ধ্যায় সিদ্দিক আহমদ ও সানাউল্লাহ আবুল ফজলের বাসায় আসেন। সিদ্দিক আহমদ সজোরে বলেন- পরিকল্পিত ও সমন্বিত কার্যক্রমের জন্য একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। সানাউল্লাহ দ্বিমত প্রকাশ করেননি। সেই বৈঠকে তিনজনকে নিয়ে 'আমরা' নামে একটি গোপন কমিটি গঠিত হয়। সাবধানতা ও গোপনীয়তা একান্ত প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সকলের কোড নাম থাকবে এবং চিঠিপত্রে সেই নাম ব্যবহার করা হবে।[২৫৯]

এরকম প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বাঙালি কূটনীতিকদের বাসায় গোপন আলোচনা হতো। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিক এনায়েত করিম, শামসুল কিবরিয়া, এ এম এ মুহিত, কলকাতার এম হোসেন আলী, ইন্দোনেশিয়ার আবুল

---

[২৫৫] এ এফ সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩

[২৫৬] সা'দত হুসাইন, *মুক্তিযুদ্ধের দিন-দিনান্ত*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯। পৃ. ৮২

[২৫৭] ওই, পৃ. ৮২

[২৫৮] মাহমুদ শাহ কোরেশী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

[২৫৯] আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮

ফজল শামসুজ্জামান, নয়াদিল্লির কে এম শিহাবুদ্দিন, জাপানের এস এ মাসুদ, সুইজারল্যান্ডের ওয়ালিউর রহমান প্রমুখের বাসায়। এসব আলোচনার ব্যাপারে বাঙালি কূটনীতিকদের স্ত্রীরাও উৎসাহী ছিলেন। তারা নিজেরাও আলোচনায় অংশ নিতেন। বাঙালি কূটনীতিক ওয়ালিউর রহমানের স্ত্রী শাহরুখ রহমান তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন ওয়ালিউর রহমান ইন্দোনেশিয়ায় কর্মরত থাকা অবস্থায় ইন্দোনেশিয়ার পাকিস্তান দূতাবাসের চ্যান্সেরি প্রধান শামসুল কিবরিয়ার বাসায় বাঙালিরা একত্রিত হতেন। সেখানে তারা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতেন। শামসুল কিবরিয়ার বদলির সুবাদে ইন্দোনেশিয়ায় যোগ দেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। তাঁর বাসায়ও নৈশ ভোজে মিলিত হয়ে বাঙালি কূটনীতিকরা মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতেন। এক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করতেন বাঙালি কূটনীতিকদের স্ত্রীরা। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সংবাদ জানার পর সুইজারল্যান্ডের জুরিখ থেকে বাঙালি কূটনীতিক নূর ও ভেসেল থেকে ইউসুফ খান মজলিশ টেলিফোনে ওয়ালিউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারা উভয়ে স্ত্রীদের নিয়ে সে রাতেই ওয়ালিউর রহমানের বাসায় উপস্থিত হন। এখানে তারা তাদের করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইউসুফ খান মজলিশের সুইস স্ত্রী মার্গারেটকেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া গণহত্যার সংবাদ বিচলিত করে।[২৬০]

৪.১.ধ কবি সাহিত্যিকদের সহযোগিতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিক এ আর মতিনউদ্দিন আবু রুশদ ছদ্মনামে সাহিত্যচর্চা করতেন। লেখক শওকত ওসমান ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মুক্তিযুদ্ধকালীন শওকত ওসমান কলকাতায় অবস্থানের সময় আবু রুশদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত চিঠিপত্রে যোগাযোগ হতো। দু'জনেই দুই ভিন্ন দেশ থেকে তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও নানা ঘটনা চিঠিতে লিখতেন। লেখক শওকত ওসমান কলকাতায় সপরিবারে নিরাশ্রয় হয়ে আছেন। এমন অবস্থায় তাঁর বন্ধু আবু রুশদ টেলিগ্রাফিক এর মাধ্যমে একশত পঁচিশ ডলার পাঠিয়েছিলেন। তাদের বন্ধুত্ব ত্রিশ বছরের। বন্ধুত্বের বন্ধনের কারণে লেখক শওকত ওসমানের প্রতি তার এ কর্তব্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।[২৬১]

মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার নিয়মিত কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পেনশন দিতেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তান সরকার পেনশন বন্ধ করে দেয়। পরে অবশ্য পাকিস্তান সরকার ওই পেনশন পুনরায় প্রদান করতে চাইলে কবির বড় ছেলে কাজী সব্যসাচী তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। কাজী সব্যসাচী এক বিবৃতিতে বলেন, 'পাকিস্তানী ভাতা রক্তমাখা, তা কারো স্পর্শ করা উচিত নয়।'[২৬২] এসময় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রধান এম হোসেন আলী বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে তাঁর সকল বকেয়া পেনশন বাবদ একটি চেক প্রদান করেন।[২৬৩]

---

[২৬০] গবেষকের সঙ্গে মিসেস শাহরুখ রহমানের সাক্ষাৎকার, ১৮ এপ্রিল ২০১৯। বিস্তারিতঃ Shahruk Rahman, Memoirs of 1971 Birth of a Nation Baptized in Blood.

[২৬১] আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

[২৬২] শওকত ওসমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

[২৬৩] মুহাম্মদ নুরুল কাদির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১১

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে তেইশ বছর ধরে বিশ্বের কোনো দেশের পাকিস্তান দূতাবাসে রবীন্দ্রনাথের ছবি কিংবা গানের প্রবেশাধিকার ছিল না। এমনকি কলকাতায় সার্কাস অ্যাভিনিউর পাকিস্তান দূতাবাসেও তা করতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলী বাংলাদেশ মিশনে কবিগুরুর প্রতিকৃতি স্থাপন করে বলেন, 'আজ এই ভবনটিতে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পেরে আমরা গর্বিত।'[২৬৪]

এছাড়াও বাঙালি কূটনীতিকরা কবি-সাহিত্যিকদের জন্মদিন ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যেও বাণী দিয়েছেন। তাদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। বাংলাদেশ মিশন কলকাতার প্রধান এম. হোসেন আলী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে একটি বাণী দিয়েছেন। বাণীতে তিনি বলেছেন- 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজকের এই জন্মদিনে বাংলাদেশ মিশনের পক্ষ থেকে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক কবিগুরু বাংগালী জীবনকে সর্বতোভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। বাংলাদেশের আজকের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনায় তাঁর লেখনী আমাদের যে মনোবল ও উদ্দীপনা যুগিয়েছে আজও তা অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।'[২৬৫]

২৪ মে কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রধান হোসেন আলী নিজ পরিবারের সদস্যসহ কবির বাসভবনে যান। সেখানে তিনি কবিকে ফুলের মালা দিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনার এম. হোসেন আলী শ্রী তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে এক শোকবার্তা দেন। এতে তিনি বলেন- 'প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের হঠাৎ তিরোধানের সংবাদে শোকাভিভূত হলাম। সাহিত্য জগতের মুকুটমণির এই তিরোধানে তাঁর শূণ্যস্থান পূরণ করতে অনেক সময় লাগবে এবং সাহিত্য ক্ষেত্রেও এ ক্ষতি বিরাট। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান ছিল অসীম। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁর আত্মীয়বর্গকে জানাই আমার প্রগাঢ় সমবেদনা।'[২৬৬]

৪.১.ন বাংলাদেশের সমর্থনে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাসভবন হোয়াইট হাউসের নিকটবর্তী লাফায়েত পার্কে স্থানীয় তরুণ তরুণীরা ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী পূর্ব বাংলার বাস্তুত্যাগীদের দুর্দশা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য শরণার্থী শিবিরের অনুরূপ একটি শিবির নির্মাণ করে। লুঙ্গি ও গেঞ্জি এবং শাড়িপড়া মার্কিন তরুণ তরুণীরা এই শিবিরে বিরাট আকারের কার্ডবোর্ড দিয়ে নির্মিত পাইপের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করে। এর মধ্য দিয়ে তারা বাস্তুত্যাগীদের করুণ অবস্থার প্রতিফলন করতে সক্ষম হয়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিকগণ এই শিবির পরিদর্শন কালে সাংবাদপত্র, টিভি ও রেডিওর কয়েকজন প্রতিনিধি ও প্রেস ফটোগ্রাফার উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের নিকট উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে তরুণ

---

[২৬৪] মুনতাসীর মামুন ও আহমেদ মাহফুজুল হক সংকলন ও সম্পাদনা, *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ষষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭। পৃ. ১৩৭

[২৬৫] Sukumar Biswas edited, *ibid*, p. 25

[২৬৬] *Ibid*, p. 93

তরুণীরা বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে তাদের সংহতি ঘোষণা করে। বিচারপতি চৌধুরী ও বাঙালি কূটনীতিক দলের কয়েকজন সদস্য এই উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বক্তৃতায় মার্কিন তরুণ তরুণীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।[২৬৭]

৪.১.প জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

১৯৭১ সালের ২০ জুলাই বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলী মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য একটি দশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের উদ্‌বোধন করেন। বাংলাদেশের রেডক্রস সমিতি, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এবং *আনন্দবাজার* পত্রিকার সহযোগে বনগাঁতে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। হাসপাতাল উদ্‌বোধন করতে গিয়ে হোসেন আলী বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব এখন পৃথিবীর কোনো শক্তিই অস্বীকার করতে পারবে না।[২৬৮]

৪.১.ফ বাংলাদেশের পতাকা সমুন্নত

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি কূটনীতিকরা বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকার মর্যাদা সমুন্নত রাখতেও ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালিরা মুক্তিসংগ্রামের শুরু থেকেই তাদের সকল সভা-সমিতিতেও বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে দেশের প্রতি সম্মান জানিয়েছেন। নিউইয়র্কের সিক্সটি ফিফথ স্ট্রিটে পাকিস্তান কনসুলেটের অফিসে সভা শেষে কয়েকজন বাঙালি তরুণ অফিসটিকে বাংলাদেশে কনসুলেট হিসেবে ঘোষণার পদক্ষেপ নিয়েছিল। সে উদ্দেশ্যেই এ এইচ মাহমুদ আলী ও ড. আলমগীর এর নেতৃত্বে বাড়িতে বানানো বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সেই সন্ধ্যায় সবাই আমার সোনার বাংলা গানে আবেগময় কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন।[২৬৯]

১৯৭১ সালের ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে ওয়াশিংটন ইসলামিক সেন্টারের নামাজের জামায়াতে বাঙালিরা যোগ দিবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। এই সেন্টারে বাংলাদেশের বিরোধী প্রচারণা চলেছে। সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় যারা প্রতিপত্তিশালী তারা সবাই পাকিস্তানের বন্ধু, বেশিরভাগই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। এ প্রশ্নে এ এম এ মুহিত সিদ্ধান্ত নেন যে, বাঙালিরা সদম্ভে এবং সরবে ইসলামিক সেন্টারে যাবে এবং নামাজ আদায় করবে। বাঙালিদের অন্যতম শর্ত ছিল একটি বৃহৎ মুসলমান অধ্যুষিত দেশের নতুন পতাকা সেন্টারে অন্যান্য পতাকার সঙ্গে উড়াতে হবে। কূটনীতিক মোয়াজ্জেম আলী এম এ মুহিতের এই প্রস্তাবকে জোরালোভাবে সমর্থন করেন। আতাউর রহমান চৌধুরীও ভেবেচিন্তে সম্মতি জানান। ওয়াশিংটনস্থ বাঙালি মিশনের বেশিরভাগ স্টাফ-ই সেন্টারে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা চায়। সেন্টার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তারা আলাপ-আলোচনা করেন। মসজিদের ইমাম ছিলেন একজন মালয়েশীয় মুসলমান যিনি বাংলাদেশের পক্ষ সমর্থন করেন। অবশেষে ইসলামিক সেন্টারে বাংলাদেশের পতাকা সমুন্নত করার সিদ্ধান্ত হয়।[২৭০]

৪.১.ব অন্যান্য ভূমিকা

বাঙালি কূটনীতিকরা মার্কিন বুদ্ধিজীবী মহলকেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। মার্কিন অনেক বুদ্ধিজীবী মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছেন, বাংলাদেশের আন্দোলন-সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন। এমনকি

---

[২৬৭] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২
[২৬৮] *কালান্তর* (কলকাতা), ২১ জুলাই ১৯৭১
[২৬৯] হায়দার আলী খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩
[২৭০] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪

তাদের মধ্যে অনেকেই ভারতে শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনও করেছেন। পরবর্তীতে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে নিজ দেশের সরকারকে এ যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে বলেছেন। এমনকি শরণার্থী শিবিরগুলোতে পর্যাপ্ত সাহায্য সামগ্রী প্রেরণের জন্যও জাতিসংঘের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। বিখ্যাত মার্কিন কবি এ্যালেন গিনেসবার্গ বাঙালি কূটনীতিকদের কর্মকাণ্ডে প্রভাবিত হয়ে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং শরণার্থীদের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। এ সময়ই তিনি তাঁর বিখ্যাত গান September on Jessore Road রচনা করেন।[২৭১] বাঙালি কূটনীতিকরা তাদের কূটনীতিক কর্মতৎপরতার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মেও ব্যস্ত ছিলেন। ৭ অক্টোবর কীর্তণজন নামক নৃত্য ও নাটক যেটি কালামন্দিরের ময়ূরে মঞ্চস্থ হয়েছিল। সেখানে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান হোসেন আলী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।[২৭২] পরদিন বউবাজার বান সমিতি কর্তৃক বাংলাদেশি অরুন কুমার নন্দী আয়োজিত এক ইনডোর সাঁতার প্রতিযোগিতায় উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন বাঙালি কূটনীতিক এম হোসেন আলী।[২৭৩] সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে কূটনীতিক হোসেন আলী ৩০ অক্টোবর বশিরহাটের শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে যান। তিনি সেখানে গিয়ে শরণার্থীদের যে অবস্থা দেখেন সে সম্পর্কে বলেন-

> I went to Bashirhat to see refugee camps. It has been raining incessantly & I found many refugees standing in knee-deep water under their tents carrying their children on their laps. It was heartening to see that the Government of India & the West Bengal government with the willing & sacrificing co-operation of the local people are doing their utmost to cope with this unprecedented mass of the humanity.[২৭৪]

খুররম খান পন্নী একজন সাহসী কূটনীতিক হিসেবে পাকিস্তান দূতাবাসে পরিচিত ছিলেন। পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর বাঙালি কূটনীতিকরা আরেকবার তাঁর সাহসের পরিচয় পায়। তিনি শুরু থেকেই পাকিস্তানিদের হয়রানি করার নানা ফন্দিফিকির করতে থাকেন। সেরকম একটি বিষয় তিনি মফিজ চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করেন। পাকিস্তানের পিআইএর বিমান তখন ব্যাংকক-ঢাকা-করাচি পথে চালু ছিল। আর পশ্চিম দিকের রুটে প্যারিস হয়ে লণ্ডনে যেতো। পন্নী স্থির করেন যে, একটা পিআইএ বোয়িং উড়িয়ে দিতে হবে। খুররম খান পন্নী ফিলিপাইনস ও সিঙ্গাপুরে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করেন এবং ম্যানিলা থেকে একদিন সাংকেতিক ভাষায় মফিজ চৌধুরীকে জানান, 'আমার স্যুটটি তৈরি করতে পঁচিশ পাউণ্ড লাগবে' অর্থাৎ এর জন্য পঁচিশ হাজার ডলার লাগবে। যাদের মাধ্যমে এই কাজটি করা হবে তাদের পারিশ্রমিক বাবদ। প্রাথমিকভাবে দশ হাজার ডলার অগ্রিম দিতে হবে। মফিজ চৌধুরী বিষযটি মন্ত্রী কামরুজ্জামানকে খুলে বলেন। এমনকি পন্নীর সিগনালটি দেখিয়ে ডলারের ব্যবস্থা করতে বলেন। পরবর্তীকালে মফিজ চৌধুরীর মনে একটি মানবিক দুর্বলতা এসে

[২৭১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *ছবির দেশে কবিতার দেশে*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯২। পৃ. ১১০
[২৭২] The Diary of Hossain Ali
[২৭৩] The Diary of Hossain Ali
[২৭৪] The Diary of Hossain Ali

যাওয়ায় অর্থাৎ (বাঙালী সুলভ?) সেটি বাস্তবায়িত হয়নি। নিউইয়র্ক থেকে ফেরার পথে প্যারির ওয়ালি বিমান বন্দরের কাছে যান। কিন্তু ডলারের ব্যবস্থা না হওয়ায় এবং মানবিক দুর্বলতার কারণে পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ বাতিল হয়।[২৭৫]

এ ধরনের আরেকটি ঘটনার কথা জানা যায় হোসেন আলীর ডায়েরিতে। ১০ অক্টোবর হোসেন আলী বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে আলাপে জানতে পারেন যে, তাদের কিছু স্পর্শকাতর অস্ত্র প্রয়োজন। এ ব্যাপারে হোসেন আলী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থানরত রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ'র সঙ্গে কথা বলেন। আবুল ফতেহ খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, এই অস্ত্রগুলোর দাম অনেক বেশি যা প্রায় এক মিলিয়ন বা তারও বেশি। এগুলো ক্রয় করতে নগদ অর্থের প্রয়োজন ছিল যা না থাকায় ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। আবুল ফতেহ হোসেন আলীকে কারা কারা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক তাদের একটি তালিকা তাঁর লন্ডনের ঠিকানায় পাঠাতে বলেছিলেন।[২৭৬]

ভারতের ফটো সাংবাদিক প্রণব মুখার্জী মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গিয়েছিলেন। তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তান বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্যাতনের বেশ কিছু ছবি তুলেছিলেন। এ ছবিগুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রণব মুখার্জীর স্ত্রী মিসেস মঞ্জু মুখার্জী ৬ সেপ্টেম্বর কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রধান এম হোসেন আলীকে উপহার দেন। এম হোসেন আলী তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে পাকিস্তান বাহিনীর দ্বারা বাংলাদেশের ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্যাতনের ছবিগুলো গ্রহণ করেন।[২৭৭] বাংলাদেশ মিশন প্রধান হোসেন আলী ১৯৭১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর কলকাতার শিল্পকলা ভবনে একটি চিত্র প্রদর্শনী উদ্‌বোধন করেন। এটি উদ্‌বোধন করতে গিয়ে হোসেন আলী বলেন-

> I must compliment Mr. Subal Paul for arranging this timely exhibition which I am sure will go a long way in bringing out vividly the price in blood the people of Bangladesh are paying everyday to achieve independence for themselves.
>
> Mr. Hossain Ali says even though critics many argue that art does not produce anything of strictly utilitarian character, it is, and has always been an indispensable need of humanity and also indispensable to civilization. It reflects the whole manner of a nation or a govern period. The powerful stroke of brush in the dexterous hands of Mr. Subal Paul has precisely tried to achieve this in the context of what is happening today in Bangladesh. It is said that one of the main purpose of art is to give pleasure and to create beauty and in this Nature is the artist's inexhaustible source of inspiration. If that be so, then the paintings that we see before us would be a great disappointment to many, for the paintings of Paul are not more outlines indicating a shape or a beautiful landscape, but a successful attempt at capturing the agonies of a nation of seventy five million people ought in ruthless war thrust upon them by an alien army of occupation. And his paintings assume added significance because in portraying the happenings in Bangladesh, he does so, as he describes it himself so aptly, to register his protest as a painter.[২৭৮]

---

[২৭৫] মফিজ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭-৪৮

[২৭৬] The Diary of Hossain Ali

[২৭৭] Sukumar Biswas edited, *ibid*, p. 89

[২৭৮] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৮৮-৭৮৯

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র বিশ্বে একটি আলোচিত ঘটনা। এটি এমন সময়ে হয়েছে যখন বিশ্বব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধ চলমান। দীর্ঘ পটভূমিকায় মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হলেও প্রাথমিকভাবে বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতিরোধের চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা বেশিদিন অব্যাহত থাকেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় সমবেত হয়। তারা একটি প্রবাসী সরকার গঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এমনকি ভারত সরকারও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে জানতে চায় তাদের কোনো সরকার গঠিত হয়েছে কিনা। এ সংকট থেকে উত্তরণ এবং মুক্তিযুদ্ধকে সঠিক রণকৌশলের মাধ্যমে পরিচালনার জন্য প্রবাসী সরকার গঠন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রবাসী সরকার শপথ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি হয়। কেননা একই দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও প্রচারিত হয়। সরকার গঠনের পর মুজিবনগর সরকারের কর্তাব্যক্তিদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় এবং বহির্বিশ্বকে বাংলাদেশের সঠিক পরিস্থিতি অবহিত করা। এ ব্যাপারে মুজিবনগর সরকার দুটি কর্মপন্থা নির্ধারণ করে যথা- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচার ও বিদেশে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসা। যদি বলা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দুটি রণাঙ্গনে সংঘটিত হয়েছে তাহলে অত্যুক্তি হবে না। দেশের অভ্যন্তরের রণাঙ্গনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন স্বল্প প্রশিক্ষিত গেরিলা যোদ্ধারা। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রণাঙ্গনে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। এখানে পাকিস্তানের সমর্থক দেশ ও বিদেশি বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে লিয়াঁজো তৈরি করে বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন বাঙালি কূটনীতিকরা। নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের দুই জন কূটনীতিকের বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক রণাঙ্গণের যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তা ডিসেম্বরের বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এসব বাঙালি কূটনীতিকরা ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান পররাষ্ট্র কিংবা সিভিল সার্ভিসের দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি। যারা তাদের মেধা ও যোগ্যতার মাধ্যমে পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কূটনীতিক পদমর্যাদায় আসীন ছিলেন। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে দেশের প্রতি তাদের আত্মিক টান অক্ষুণ্ন ছিল। এজন্য দেশের ডাকে সাড়া দিতে তারা বিলম্ব করেননি। মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা তাদের করণীয় নির্ধারণ করে নেন। কে কবে পাকিস্তান সরকারের চাকরি থেকে পদত্যাগ করবেন তা মুজিবনগর সরকার থেকে বলে দেওয়া হতো। পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করে তারা নিশ্চুপ হয়ে থাকেননি। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, কূটনীতিকের পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন। জনমত প্রচার থেকে শুরু করে সভা-সমাবেশ করতে গিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছেন, নিজের হাতে বাংলাদেশের মিশন পরিচালনার কাজ এমনকি জনকল্যাণমূলক অনেক কাজও করেছেন। বিদেশের বৈরি পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে এসব কাজ করেছেন অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে। প্রতি মুহূর্তে তাদের বিপদ তাড়া করতো কিন্তু নিজেদের দায়িত্ব থেকে পিছপা হননি। আবার অনেক কূটনীতিক কৌশলগত কারণে অপেক্ষাকৃত বিলম্বে পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করেছেন। কিন্তু পাকিস্তান দূতাবাসের অভ্যন্তরে থেকে বাংলাদেশের পক্ষে গোপনে কাজ করেছেন। বাঙালি কূটনীতিকরা কবে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন তা বড় কথা নয়। কারণ, আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সময় নির্ধারিত হয়েছে কৌশলগত

দিক বিবেচনা করে। তার আগে থেকেই তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন। বলা যায় ১৯৭১ এর ২৬ মার্চ থেকেই তারা তা শুরু করেছেন। এসব কূটনীতিকদের অনেককেই পাকিস্তান সরকার সন্দেহের চোখে দেখতো। তাদেরকে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিল। কিন্তু তারা সেই আদেশ পালন না করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কাজ করা অধিক সমীচীন মনে করে। এসব কূটনীতিকদের পক্ষে সহজ হয়েছিল বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করা। কেননা তারা আগে থেকে জানতো কার মাধ্যমে কোন ব্যক্তির কাছে বাংলাদেশের ব্যাপারে সহায়তা বা ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে। কোথাও তারা একাকী কাজ করেছেন, আবার কোথাও সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করেছেন। আন্তর্জাতিক রণাঙ্গনের সাহসী সৈনিক হিসেবে বিশ্বের দরবারে তারা যেভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চিত্র উপস্থাপন করেছেন তা ছিল প্রশংসাযোগ্য। তেমনিভাবে তারা পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি, পাকিস্তানিদের গণহত্যা বন্ধ ও ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের মানবেতর জীবনচিত্র তুলে ধরতেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন। পাকিস্তান দূতাবাসের এত সব অভিজ্ঞ কূটনীতিকেরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যোগ দেওয়ায় মুক্তিযুদ্ধ আরো বেগবান হয়েছিল। তাদের সংগঠিত কর্ম ও উদ্যোগে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিংশ শতাব্দীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

অধ্যায় পাঁচ

মুজিবনগর সরকার থেকে বহির্বিশ্বে প্রেরিত বাঙালি কূটনীতিক প্রতিনিধিদের কর্মতৎপরতা

ভূমিকা

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) এর সর্বত্র অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করলেও বাঙালি জাতি কিন্তু এ আলোচনাকে চলমান সংকট সমাধানের একটি সুস্পষ্ট পন্থা হিসেবে বিবেচনা করে। সেজন্যই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ এর প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ইয়াহিয়া খানের এ আলোচনাকে সাধুবাদ জানায়। বাঙালি জাতির অধিকার ফিরে পেতে বঙ্গবন্ধু তাঁর নেতৃবৃন্দ সহযোগে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে সম্মত হন। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী দেশ-বিদেশের গণমাধ্যমকে অন্ধকারে রেখে গোপনে বাঙালি নিধনের পরিকল্পনার ছক কষতে থাকে। তাদের সে গোপন ছকের বাস্তব রূপ ২৫ মার্চ রাতে ঘটে যাওয়া 'অপারেশন সার্চলাইট'। বাঙালি জাতির আপামর জনসাধারণ এর মতো বিশ্ববাসীও জানতে পারে এক রাতের মধ্যে একটি নগরের কী পরিণতি হয়েছে।

২৫ মার্চ রাতে সারা দেশে একযোগে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার উন্মত্ত খেলায় মেতে ওঠে। এ খেলার অংশ হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারের পূর্বে বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার ঘোষণায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করতে বলেন। যা সময়ের পরিক্রমায় দেশের সর্বত্র প্রচারিত হয়। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এ সংবাদ প্রচারিত হয় অনেক পরে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। সকলের ঐকমত্যে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। এ সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল। শপথ নেওয়া নতুন এ সরকারের নাম দেওয়া হয় 'মুজিবনগর সরকার'। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাদের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। কর্মপরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয় বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রশ্নে। কেননা একটি দেশ যতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি আদায় করতে না পারবে ততক্ষণ সে দেশের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয় না। স্বীকৃতি আদায় তথা বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া পাকিস্তানের অন্যায় যুদ্ধের কথা সর্বাগ্রে প্রচারের ক্ষেত্রে অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়। মুজিবনগর সরকার গঠন হওয়ার পর দেশে ও বিদেশে দুটি রণাঙ্গনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। দেশের অভ্যন্তরে রণাঙ্গনের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ। অপরদিকে বহির্বিশ্বের রণাঙ্গনে যুদ্ধে লিপ্ত হন প্রবাসী বাঙালি সমাজ ও পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকগণ। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে

একটি বিষয়ে বেশি উদগ্রীব ছিলেন। তিনি জানতেন সমগ্র বিশ্বে পাকিস্তানের অনেক দূতাবাস ও হাইকমিশন রয়েছে। এসব দূতাবাস ও হাইকমিশনে অনেক মেধাবী বাঙালি কূটনীতিক পদে কর্মরত আছেন। তাদেরকে দিয়ে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করানো যায় এ ছিল তাঁর মূল ভাবনা। এ ভাবনা থেকে তিনি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তখন জেনেভায় ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের সংবাদ পাওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার জন্য লন্ডন চলে আসেন। এ সংবাদ মুজিবনগর সরকার পাওয়ার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁকে অনুরোধ করেন বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য। বিচারপতি চৌধুরী মুজিবনগর সরকারের এ প্রস্তাব গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় জুড়ে দক্ষতার সঙ্গে সমগ্র ইউরোপে কূটনীতিক হিসেবে কাজ করেছেন। মুজিবনগর সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল বহির্বিশ্বের পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে নিয়ে আসা এবং তাদের দিয়ে বহির্বিশ্বে প্রচার প্রচারণার কাজ চালানো। শুরুর দিকে মুজিবনগর সরকারের আহ্বানে বেশ কয়েকজন বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করেন। কিন্তু উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার কারণে তাদের বেশিরভাগ সরাসরি বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ না করলেও গোপনে দেশের জন্য কাজ করেছেন। এর বাইরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, রাষ্ট্রপ্রধান, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রধান ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায় করার জন্য বেশ কিছু কূটনীতিকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এজন্য মুজিবনগর সরকার তাদের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশের কিছু ব্যক্তিকে বেছে নেয়। যারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুনামের সঙ্গে কাজ করছিলেন। যাদের বেশিরভাগের পড়াশোনা বহির্বিশ্বে। আবার অনেকের বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে ছিল অনেক বেশি জানাশোনা। কারোও বা ছিল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পাশাপাশি মুজিবনগর সরকার ভ্রাম্যমান কূটনীতিক হিসেবে বেছে নিয়েছিল অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, রাজনীতিবিদ আবদুস সামাদ আজাদ, রাজনীতিবিদ এ্যাডভোকেট ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ, সাংবাদিক মঈদুল হাসান, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, এ্যাডভোকেট নুরুল কাদির, জ্যোতিঃপাল মহাথেরো সহ এরকম আরো কয়েকজনকে। এরা কেউ ছিলেন বিচারক, কেউ শিক্ষক, কেউ পাকিস্তান সরকারের উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, কেউ রাজনীতিবিদ আবার কেউ বৌদ্ধ ধর্মগুরু। মুজিবনগর সরকার তাঁদেরকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছেন। তাঁরা তাদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছেন। তাদেরকে মুজিবনগর সরকার যে কয়েকটি কাজের দায়িত্ব দিয়ে বহির্বিশ্বে পাঠিয়েছেন সেগুলো ছিল কমবেশি একই ধরনের। যেমন- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়, নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়, ভারতে আশ্রয় নেওয়া এক কোটি শরণার্থীর মানবেতর জীবন তুলে ধরা, পাকিস্তানকে সকল ধরনের আর্থিক সহায়তা ও যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা এবং পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমানের প্রহসনের বিচার বন্ধ করে তাঁর মুক্তির উদ্যোগ নেওয়া। বাঙালি কূটনীতিক প্রতিনিধিগণ প্রতিটি কাজ একজন দক্ষ কূটনীতিকের মতো সম্পন্ন করেছেন। বাঙালি কূটনীতিক প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্য, বিবৃতি, প্রচারণা, সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হন।

আলোচ্য অধ্যায়ে মুজিবনগর সরকার থেকে প্রেরিত বাঙালি কূটনীতিক প্রতিনিধিদের কর্মতৎপরতা বিশেষ করে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক, আবদুস সামাদ আজাদ, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, মঈদুল হাসান, ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, জ্যোতিঃপাল মহাথেরো প্রমুখদের কর্মতৎপরতা তথ্য-উপাত্ত সহকারে আলোচনা করা হবে। একই সঙ্গে মুজিবনগর সরকার ও লন্ডনের এ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে প্রেরিত বাঙালি শ্রমিক ও ছাত্র প্রতিনিধিদের কর্মতৎপরতাও আলোকপাত করা হবে।

৫.১ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কর্মতৎপরতা

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছিলেন তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ১৯৭১ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে যখন পাকিস্তানি শাসকচক্রের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের দর কষাকষি হচ্ছিল সে সময় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছিলেন জেনেভায়। তিনি ১৯৭১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের সম্মেলনে যোগদানের জন্য জেনেভায় যান। সেখানে তিনি পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ইয়াহিয়া খান ও তার দোসররা বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এর প্রশ্নে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ষড়যন্ত্রের অন্যতম একটি অংশ ছিল নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালিদের অস্ত্রের মাধ্যমে দমন করা। তাদের এ দমন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ ২৫ মার্চ রাতে ঘটে যাওয়া 'অপারেশন সার্চলাইট'। 'অপারেশন সার্চলাইট' এর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একযোগে আক্রমণ করা এবং পরবর্তীতে দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে বাঙালি জাতিসত্তাকে দমন করা। পঁচিশে মার্চের কালো রাতে কী ঘটেছিল তা জানা যায় ২৬ মার্চ বিদেশি বিভিন্ন গণমাধ্যমে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সকালবেলা বিশ্ববাসীর মতো বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীও বিবিসি প্রচারিত সংবাদের মাধ্যমে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের কথা জানতে পারেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পাকিস্তান বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত এ সংবাদ শুনে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে বিবিসি প্রচারিত সংবাদের কথা উল্লেখ করেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কথোপকথনে যে ক্ষোভ ও বেদনাবোধ ছিল তা তাঁর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়- 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে আমি অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছি। আমি এখনই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আজকেই লন্ডনে ফিরে যাব এবং সেখান থেকে সম্ভব হলে ঢাকায়। আজকের সন্ধ্যায় বর্তমান অধিবেশনের সমাপ্তি পর্যন্ত থাকতে পারছি না।'[১]

অবশ্য জেনেভায় অবস্থানকালে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সবসময় দেশের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে জেনেভার একটি পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন ছাত্র নিহত হওয়ার খবর পাওয়ার পর ১৫ মার্চ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী প্রাদেশিক শিক্ষা সচিবের নিকট এক পত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এর পদ থেকে

[১] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯০। পৃ. ১

পদত্যাগের ঘোষণা দেন। এতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন- 'আমার নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর গুলী চালনার পর আমার ভাইস চ্যান্সেলর থাকার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তাই আমি পদত্যাগ করলাম এবং পত্রটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছে দেওয়া হোক।'[২]

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কলকাতা থেকে টেলিফোন পান। টেলিফোনে তাঁকে জানানো হয় যে, শিগগিরই মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করবে এবং বিচারপতি চৌধুরীকে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে বহির্বিশ্বে বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দান করা হবে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনে আসার পর পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করায় তাঁকে নিয়ে পাকিস্তান সরকার নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করে। পাকিস্তান সরকার গোপনে বিচারপতি চৌধুরীকে অপহরণ করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ ঘটনার কথা জানা যায় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশ অফিসার ল্যাঙ্গলীর মাধ্যমে। ল্যাঙ্গলীর কাছ থেকে বিচারপতি চৌধুরী জানতে পারেন যে, পাকিস্তান সরকার সুযোগ মতো পেলে তাঁকে অপহরণ করে পাকিস্তানে নিয়ে যাবে। এজন্য পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কয়েকজন অফিসার সাদা পোশাকে লন্ডনে এসেছেন। ল্যাঙ্গলী বিচারপতি চৌধুরীকে সাবধানে চলাফেরা করতে বলেন। একই সঙ্গে জানান যে, ইংল্যান্ডের সরকার বিচারপতি চৌধুরীর অবস্থানকালীন পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করবে।[৩]

১৭ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কূটনৈতিক পরিচয়পত্রে স্বাক্ষর করেন। এই পরিচয়পত্রে বিচারপতি চৌধুরীকে যুক্তরাজ্যে হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। এই পরিচয়পত্র রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সরকারি বাসভবন বাকিংহাম প্যালেসে পেশ করা হয়। যথাসময়ে পরিচয়পত্র প্রাপ্তি স্বীকার করে বাকিংহাম প্যালেস থেকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নিকট একটি পত্র পাঠানো হয়।[৪] এই পত্রের মাধ্যমে প্রকারান্তরে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বলে মনে করা হয়।

বিদেশে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনীতিক হিসেবে স্বীকৃতি পান। কিন্তু এই আনুষ্ঠানিকতার বহু পূর্বেই তিনি প্রবাসে তাঁর কর্মতৎপরতা শুরু করেন। জেনেভায় অবস্থানকালে পঁচিশে মার্চের গণহত্যার সংবাদ পাওয়ার পরই তিনি বাংলাদেশের পক্ষে কাজ শুরু করার কথা ব্যক্ত করেন। জেনেভা থেকে লন্ডনে আসার পথে তিনি একটি পরিকল্পনা করেন কীভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য কাজ করবেন। এক্ষেত্রে তাঁর কর্মপন্থাগুলো কী হবে সেগুলোও ভেবে রাখেন। কিন্তু তাঁর মনে সবার আগে একটি ভাবনার উদয় হয়। এ মুহূর্তে একটি প্রবাসী সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে যে, বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং বাংলাদেশে একটি সরকার কাঠামো গঠন করা হয়েছে। এসব ছিল তাঁর চিন্তার বিষয়। তিনি নিজে আদৌ জানতেন না বঙ্গবন্ধু কোথায় কী অবস্থায়

[২] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

[৩] ওই, পৃ. ২০

[৪] আবদুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী*, ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৭। পৃ. ৭৬

আছেন, আওয়ামী লীগের জাতীয় নেতৃবৃন্দ কোথায় আছেন এবং সরকার গঠনের ক্ষেত্রে কীভাবে উদ্যোগ নেওয়া হবে। তাঁর এ সকল চিন্তার জট খুলে যায় মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে টেলিফোন পাওয়ার পর। এরপর থেকেই কূটনীতিক হিসেবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব শুরু করেন। মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করেছেন। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন সেগুলো কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিম্নে আলোচনা করা হলো–

ক. বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি গঠন

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে কথা বলার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর পক্ষে কোনো দল বা সমিতিতে যোগ দেওয়া উচিত হবে না। তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন দলের সংগ্রামী স্পৃহা ও প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করবেন। বিচারপতি চৌধুরী নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন, নির্দলীয় ব্যক্তি হিসেবে স্বাধীনতার জন্য কাজ করবেন। এসময় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোর, ব্রুস ডগলাসম্যান ও মাইকেল বার্নসের সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎ হলে তারাও তাঁকে সকল দলের কর্মকাণ্ডকে সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে বলেন। লন্ডনে বাঙালিদের একত্রিতকরণে একটি কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। ১৬ এপ্রিল ব্যারিস্টার রুহুল আমিন লন্ডনের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বাঙালিকে তাঁর বাসায় নিমন্ত্রণ করেন। ব্যারিস্টার রুহুল আমিন নিজে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে নিয়ে যান। এখানে উপস্থিত ছিলেন লন্ডনস্থ আওয়ামী লীগের নেতা গউস খান, ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হোসেন, শেখ আবদুল মান্নান, ড. হারুন-অর-রশিদ, আমীর আলী এবং বিভিন্ন গ্রুপের নেতৃবৃন্দ। সেখানে প্রত্যেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে তাদের দল কী কী করছে তা তুলে ধরেন। তারা সবাই সাধ্যমত দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী প্রত্যক্ষ করলেন যে, সকল গ্রুপ বা দল মিলে একটি গ্রুপ বা দলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে নেই। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের ব্যাপারে কেউই একমত নয়। তাই বিচারপতি চৌধুরী বলেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের ব্যাপারে যদি সকলে ঐক্যবদ্ধ না হয় তাহলে তিনি আর কোনো সভায় যোগ দিবেন না। ২৩ এপ্রিল জানা যায় যে, কভেনট্রি শহরের সভায় একটি কমিটি গঠিত হবে। ২৪ এপ্রিল কভেনট্রি শহরে একটি মিলনায়তনে সভার কাজ শুরু হয়। কিন্তু সকলের পক্ষ থেকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে সভাপতি হওয়ার দাবি জানালে তিনি তা নাকচ করে দেন। বরং তিনি লুলু বিলকিস বানুর কথা প্রস্তাব করেন। শেষ পর্যন্ত সকলের সম্মতিতে পাঁচটি নাম গ্রহণ করে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। যথা-

১. ইংল্যান্ডে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সমিতি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এই সমিতির নাম রাখা হয় 'যুক্তরাজ্যে গণরাজ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এ্যাকশন কমিটি'।

২. অতি অল্প সময়ের নোটিশে সম্মিলিত হওয়ার সুবিধার্থে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির নাম হয় 'এ্যাকশন কমিটির স্টিয়ারিং কমিটি' এবং উক্ত কমিটিকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়।

৩. স্টিয়ারিং কমিটিকে প্রয়োজনবোধে আরো সদস্য নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

৪. স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা ছিলেন– আজিজুল হক ভূঁইয়া, কবির চৌধুরী, মনোয়ার হোসেন, শেখ আবদুল মান্নান ও শামসুর রহমান।

৫. স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম অধিবেশন এই সভার সভানেত্রীর আহ্বানে অনুষ্ঠিত হবে এবং ওই সভায় একজন আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হবে।

৬. ইংল্যান্ডে যত কমিটি আছে সেসব কমিটি এই কমিটির শাখা সমিতি হিসেবে কাজ করবে বলে উল্লেখ করা হয়।[৫]

স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভা লুলু বিলকিস বানুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জরুরি ভিত্তিতে একটি অফিস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ৩০ এপ্রিল শেখ আবদুল মান্নানের বাড়িতে স্টিয়ারিং কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি অফিস খোলার ব্যাপারে সবাই মতৈক্যে পৌঁছে। সে মোতাবেক ৩ মে সংগঠনের অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয় ১১ নং গোরিং স্ট্রিটে। অফিস প্রতিষ্ঠার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী গোরিং স্ট্রিটের ঠিকানা দিয়ে প্যাড, চিঠির কাগজ ইত্যাদি ছাপানোর ব্যবস্থা করেন এবং সবাইকে এ অফিসের ঠিকানা জানানো হয়।[৬] এভাবে লন্ডনের বিবদমান বিভিন্ন গ্রুপগুলোকে একত্রিত করে মুক্তিযুদ্ধের সময় সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। বাঙালি কূটনীতিক এম হোসেন আলী বিচারপতি চৌধুরীর কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন-

> . . . nobody could doubt the sincerity, honesty & integrity of Justice Chowdhury & as such he was able to bring all sections of Bangalis together. Still there were elements who wanted to fish in troubled waters. Money was collected by various organizations of Bangladesh ostensibly for the cause of liberation but no account was kept or rendered.[৭]

খ. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ এবং জনমত গঠন

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী একাধারে ছিলেন ঢাকা সুপ্রিম কোর্টের বিচারক তেমনি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তানে সফরকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হতেন। সে সুবাদে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বহির্বিশ্বে সমধিক পরিচিত ছিলেন। পঁচিশে মার্চের ঘটনার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনে আসার পর টেলিফোনে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান ইয়ান সাদারল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ২৭ মার্চ সকালবেলা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর

---

[৫] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

[৬] *ওই*, পৃ. ২৫-২৭

[৭] The Diary of Hossain Ali

সঙ্গে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দেখা করেন। দেখা হলে বিচারপতি চৌধুরী তাঁর কাছে ঢাকার খবর জানতে চান। কিন্তু দিনটি শনিবার হওয়ার সাদারল্যান্ড উত্তর দেন যে, বিবিসি এবং সংবাদপত্র মারফত পাওয়া সংবাদ ছাড়া সরকারি পর্যায়ে ঢাকাস্থ ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনের কোনো সংবাদ তারা এখনও পাননি। বিচারপতি চৌধুরী সাদারল্যান্ডের অফিসে অবস্থানকালীন ঢাকাস্থ ডেপুটি হাইকমিশন থেকে একটি টেলেক্স আসে। টেলেক্সটি ইয়ান সাদারল্যান্ড পড়ার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে জানান যে, ঢাকায় অনেক লোক প্রাণ হারিয়েছে। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র-ছাত্রী হতাহত হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, ঢাকাস্থ ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনের একজন ফার্স্ট সেক্রেটারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হলের অভ্যন্তরে ধ্বংসযজ্ঞ ও জগন্নাথ হলের সামনে গণসমাধি খনন করে নিহত ছাত্র-শিক্ষকদের মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলতে দেখেছেন। যে সকল ছাত্রকে গুলির ভয় দেখিয়ে মৃতদেহ গণকবরের সামনে আনতে বাধ্য করা হয় তাদেরকেও পরে গুলি করে সে কবরেই ফেলা হয়। টেলেক্সে আরো জানানো হয় যে, পাকিস্তানিরা শেখ মুজিবকে বন্দি করেছে। ইয়ান সাদারল্যান্ডের কাছ থেকে বিস্তারিত জানার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বুঝতে পারলেন যে, পঁচিশে মার্চ রাতে কী ঘটেছে ঢাকা শহরে এবং তাঁর প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। সকল কিছু শোনার পর তিনি ক্ষুব্ধ হন। এমনকি তিনি বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের সংবাদেও বিচলিত হয়ে পড়েন। কেননা তাঁর মনে আশঙ্কা দেখা দেয় যদি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে তাহলে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি কী হবে! এসব চিন্তা করে তিনি ইয়ান সাদারল্যান্ডকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন যে এই মুহূর্ত থেকে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বিভিন্ন দেশে গিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই নিষ্ঠুরতা-নির্মমতার কথা বিশ্ববাসীকে জানাব।[৮]

এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ইয়ান সাদারল্যান্ডকে অনুরোধ করেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার এ্যালেক ডগলাস হিউমের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিতে। কিন্তু ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্কটল্যান্ডে অবস্থান করায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। তবে সাদারল্যান্ড বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে জানান যে, তিনি যেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্বে সংবাদপত্রে কোনো ধরনের বিবৃতি না দেন। কেননা এতে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বিদ্রোহী ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবেন।[৯] ইয়ান সাদারল্যান্ডের সহযোগিতায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্রিটিশ বৈদেশিক মন্ত্রী ওভারসিজ মিনিস্টার রিচার্ড উডের সঙ্গে দেখা করেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রিচার্ড উডকে বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে অবিলম্বে রক্তক্ষয় বন্ধ এবং শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে অনুরোধ জানান। জবাবে রিচার্ড উড জানান যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইতিমধ্যে পাকিস্তানস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং একটি বন্ধুরাষ্ট্রকে যতটা চাপ দেওয়া যায় তা তারা করবেন।[১০] এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার অ্যালেক ডগলাস

---

[৮] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪

[৯] গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০, রাজিউল হাসান মুক্তিযুদ্ধকালীন লন্ডনে পড়াশোনা করতেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করার পর তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কাজ করেছেন। দেশ স্বাধীনের পর রাজিউল হাসান লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাসের চাকরিতে নিয়োজিত হন।

[১০] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-৮

হিউমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে বিচারপতি চৌধুরী ডগলাস হিউমকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও রক্তক্ষয় বন্ধ করতে চেষ্টা করার অনুরোধ জানান। একই সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণগুলোও তিনি ব্যাখ্যা করেন। স্যার ডগলাস হিউম জানান যে, ব্রিটিশ সরকার এ ব্যাপারে যতদূর সম্ভব পাকিস্তানিদের ওপর চাপ প্রয়োগ করবে। তিনি আরো জানান যে, বঙ্গবন্ধু সুস্থ আছেন এবং তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কা সে সময় পর্যন্ত ঘটেনি। বিচারপতি চৌধুরী স্যার হিউমকে বলেন যে, ব্রিটেনে অবস্থানরত বাঙালিরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা এখান থেকেই সমগ্র বিশ্ববাসীকে জানাবে। কথা প্রসঙ্গে হিউম জানতে চান যে, বিচারপতি চৌধুরী কোথায় আছেন? উত্তরে বিচারপতি চৌধুরী জানান যে, বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি ব্রিটেনে অবস্থান করবেন এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। স্যার হিউম বিচারপতি চৌধুরীকে যে কোনো প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলেন।[১১] এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কমনওয়েলথ সেক্রেটারি জেনারেল আর্নল্ড স্মীথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশ কেন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। বিচারপতি চৌধুরীর আহ্বানে আর্নল্ড স্মীথ তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে, ইয়াহিয়া খানের কাছে একটি ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি ও রক্তপাত বন্ধ করার অনুরোধ জানাবেন।[১২] এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহেই বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রক্ষণশীল দলের কমনওয়েলথ গ্রুপের সেক্রেটারি অধ্যাপক জিনজিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অধ্যাপক জিনজিন বিচারপতি চৌধুরীকে রক্ষণশীল দলের পার্লামেন্টের সদস্যদের সামনে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানান। এ সভাটি রক্ষণশীল দলের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন লর্ড সেলকারক। সভায় বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণ এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তুলে ধরেন।[১৩]

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য বিশেষ করে জন স্টোন-হাউস, ব্রুস ডগলাসম্যান এবং পিটার শোর বাংলাদেশের সমর্থনে প্রায় সারাক্ষণ কাজ করছিলেন। তাঁরা সকল দল থেকে সমর্থন গ্রহণ করছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তিনশত সদস্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যে, বাংলাদেশে রক্তক্ষয় অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। তাঁদের এই প্রস্তাবের ফলে হাউস অব কমন্সে ১৪ মে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দিন ধার্য হয়। দক্ষিণপন্থি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি স্যার জেরল্ড নেবারো, রেভারেন্ড ইয়ান মিকার্ডো এবং এন্ড্রু ফাউলস এই প্রস্তাবের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের কাহিনি পার্লামেন্টের সকল সদস্যদের গভীরভাবে নাড়া দেয়। সরকার যদিও বার বার মনে করিয়ে দিয়েছিল যে, একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মানবিক কারণে তাঁরা যথেষ্ট সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছেন।[১৪]

[১১] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১৬
[১২] *ওই*, পৃ. ১০
[১৩] *ওই*, পৃ. ২২
[১৪] *ওই*, পৃ. ৩১

২১ জুন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নেদারল্যান্ডে যান। সেখানকার পার্লামেন্ট সদস্য রিলাস টারবিক বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁকে বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। ২২ জুন বিচারপতি চৌধুরী নেদারল্যান্ডের পার্লামেন্টে যান এবং কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। পার্লামেন্টের সদস্যদের চেষ্টায় বিচারপতি চৌধুরী স্পীকারের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরেন। একই দিন বিকেলে পার্লামেন্টের ফরেন অ্যাফেয়ার্স সাব কমিটির সঙ্গে দেখা করেন। কমিটির সদস্যগণ বিচারপতি চৌধুরীকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং তিনি তাঁদের সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলার পর তাঁদের বক্তব্য ছিল, তারা বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা জেনে তাঁদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে। তবে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনার পর বুঝতে পারে যে, এই নির্যাতনের পরে বাংলাদেশের আর পাকিস্তানের সঙ্গে থাকা চলে না।[১৫]

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১৪ মে সাংবাদিক পুলিন বিহারী শীলের সহযোগিতায় মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী স্যার সিউ সাগরের সঙ্গে দেখা করেন। সাক্ষাৎকালে বিচারপতি চৌধুরী তাঁকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এর জবাবে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী জানান যে, তাদের পার্লামেন্টে মুসলমান সদস্য সংখ্যা কম নয়। তাই তাদের সমন্বয়েই সরকার গঠিত হয় এবং দলের সম্মতি ছাড়া প্রধানমন্ত্রী এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি নিজে স্বীকৃতি দিতে আগ্রহী তবে এজন্য তাঁকে দলের মুসলমান সদস্যদের কাছ থেকে সম্মতি পেতে হবে।[১৬] এই সাক্ষাতের কিছুদিন পর স্যার আবদুর রাজ্জাক লন্ডনে আসেন এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বিচারপতি চৌধুরীকে জানান যে, পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদের ব্যাপারে তিনি কোনো সম্মতি দিতে পারবেন না।

আগস্ট মাসে ভারতের রাজনীতিবিদ কৃষ্ণ মেনন লন্ডনে আসেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সাক্ষাৎকালে কৃষ্ণ মেনন বিচারপতি চৌধুরীর কাছে ব্রিটিশ সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কার কী মনোভাব তা জানতে চান। এমনকি বিরোধী দলের কোনো কোনো সদস্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছেন তা-ও জানতে চান। বিচারপতি চৌধুরী তাঁকে বিস্তারিতভাবে সব বলেন। কৃষ্ণ মেনন বিচারপতি চৌধুরীকে ব্রিটিশ সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে বলেন।[১৭]

মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। সেখানে যাওয়ার পর তিনি জরুরি ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করেন। বিচারপতি চৌধুরী নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হ্যামব্রো, সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত বারোদী, আলজেরিয়া, লিবিয়া, মিশর, জর্ডান, ইরাক, ইরান, সিরিয়া প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলো ও পশ্চিম ইউরোপের

---

[১৫] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০
[১৬] ওই, পৃ. ৯০
[১৭] ওই, পৃ. ৯৬

কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে দেখা করেন। বিচারপতি চৌধুরী তাদের সবার কাছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি, শরণার্থী সমস্যা, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এসকল বিষয়ে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন।[১৮]

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নির্দেশ অনুযায়ী বিচারপতি চৌধুরী ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং এর সঙ্গে দেখা করেন। এই সাক্ষাৎকালে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আপা পন্থ উপস্থিত ছিলেন। শরণ সিং বিচারপতি চৌধুরীকে বিভিন্ন দেশ সফরকালে কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। কথা প্রসঙ্গে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র পাঠাবার ব্যাপারে ভারত সরকারের অনুমতি চেয়েছেন। অনুমতি না পাওয়ায় অস্ত্র পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না বলে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। শরণ সিং বলেন, বিদেশ থেকে অস্ত্র না পাঠালেও মুক্তিযোদ্ধারা প্রয়োজনীয় অস্ত্র পাচ্ছেন। তবে লন্ডন থেকে অস্ত্র পাঠাবার অনুমতি দেওয়ার আগে কয়েকটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সে জন্য অনুমতিদানে বিলম্ব হচ্ছে।[১৯]

৩ সেপ্টেম্বর সকালে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নরওয়ের রাজধানী অসলোর মেয়রের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানান। বিচারপতি চৌধুরীকে তিনি অসলো শহরের বিভিন্ন আলোকচিত্র সংবলিত একটি বই উপহার দেন। এই বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি বিচারপতি চৌধুরীকে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করেন। নরওয়ে কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগেই অসলোর মেয়র বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেন।[২০] নরওয়ের প্রধান বিচারপতি পিয়ারে অল্ড-এর আমন্ত্রণে সুপ্রিম কোর্টে যান বিচারপতি চৌধুরী। তিনি সুপ্রিম কোর্টের সকল বিচারপতিকে আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরা বিচারপতি চৌধুরীর কাছে জানতে চাইলেন বাংলাদেশ কেন পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা চাইছে। বিচারপতি চৌধুরী সংক্ষেপে তাঁদের কাছে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল কারণগুলো বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা সকলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং আন্দোলনের সাফল্য কামনা করেন। নরওয়ে পার্লামেন্টের আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরী দেখা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।[২১]

৭ সেপ্টেম্বর সুইডেনে পৌঁছে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক গুনার মীরডালের সঙ্গে দেখা করেন। বাংলাদেশ আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পর বিচারপতি চৌধুরী মীরডালকে স্থানীয় বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করার অনুরোধ জানালে তিনি সানন্দে রাজি হন। তাঁর মাধ্যমে বিচারপতি চৌধুরী সুইডেনের আরো কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেন। একই দিনে বিচারপতি চৌধুরী সুইডিশ সোশালিস্ট ডেমোক্রেটিক পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল স্টেন এন্ডারসনের সঙ্গে দেখা করেন। বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে কথোপকথনে এন্ডারসেন জানান যে, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহ করতে পারলে সত্যিকার অর্থে সহায়তা করা হবে।

---

[১৮] গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০

[১৯] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

[২০] গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০

[২১] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪-১০৫

এজন্য তারা চেষ্টা করবে যেন তাদের পার্টি থেকে বাংলাদেশের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করা যায়। তাদের মতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করতে পারলে সে সাহায্য হবে বাস্তব ও ফলপ্রসু।[২২] একই দিনে বিচারপতি চৌধুরী সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পিয়ের শোরী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গেও দেখা করেন।

১৩ সেপ্টেম্বর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে পৌছেন। প্রথমেই তিনি বিশ্বশান্তি পরিষদের চেয়ারম্যান রমেশ দত্তের সঙ্গে দেখা করেন। ১৪ সেপ্টেম্বর ফিনল্যান্ড পার্লামেন্ট সদস্য পেরনি হেনিনেন, অসমো কক ও মীরজামভিরে বোমিনিভ এর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা আসন্ন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলবেন এবং তাঁদের সরকারকে বাংলাদেশের সংগ্রাম সম্পর্কে অবহিত করবেন বলে জানান। বিচারপতি চৌধুরী ফিনল্যান্ডের সুপরিচিত সংবাদপত্র *সুয়োম্যান মোসিয়লি ডেমোক্রাট* এর সম্পাদক কেরী ভার ভিকিকোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে তাঁর শক্তিশালী লেখনী পরিচালনার অনুরোধ জানান।[২৩] একই দিনে ফিনল্যান্ডের সুপ্রিম কোর্টের জজ ভ্যাটিও সারিওর সঙ্গেও দেখা করেন।

১৪ সেপ্টেম্বর ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন এ পৌঁছে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ডেনমার্কের বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা *ইনফরমেশন* এর সম্পাদক পলট স্টিসস্ট্রাপ নিয়েলসেনের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরেন। এ প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ছিল-

ক. পাকিস্তান যেন কোনোক্রমেই ডেনমার্ক বা অন্য কোনো দেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ না পারে। এ ব্যাপারে দৃঢ় অসহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

খ. বাংলাদেশের মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বলে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। তাদের এই অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া।

এ ব্যাপারে বিচারপতি চৌধুরীর বক্তব্য ছিল, 'একটা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ বড় না হয়ে শুধুমাত্র বিদেশী ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত সরকারী কাঠামো বড় হতে পারে না। ঢাকায় পাকিস্তানের একটি জনবিচ্ছিন্ন কাঠামো আছে; শাঁসটিকে বাদ দিয়ে খোলসটির মতো। পাকিস্তানীদের বাংলাদেশের শাসনকর্তা মনে করলে খোলসটাকে স্বীকৃতি দেয়া হবে।'[২৪]

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ডেনমার্কের পার্লামেন্টের স্পিকার, পার্লামেন্টের বৈদেশিক কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈদেশিক কমিটির সদস্যরা বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আইন পরিষদে সমবেত হতে না দেওয়া এবং পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতিতে তাঁরা ক্ষুদ্ধ হন। বৈদেশিক কমিটির চেয়ারম্যান কিয়েল অলস্যোন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সকল প্রকার সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। বৈদেশিক কমিটির সদস্যদের প্রচেষ্টায় পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের জন্য যে কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান চুক্তি সম্পাদন করেছিল তারা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। ১৬ সেপ্টেম্বর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ডেনমার্কের প্রভাবশালী পত্রিকার সম্পাদক জন ডানস্ট্রাপ এর সঙ্গে

---

[২২] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩-১৪৪

[২৩] গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০

[২৪] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫

সাক্ষাৎ করেন। তাঁকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে পত্রিকায় লেখার অনুরোধ জানালে তিনি এতে সানন্দে সম্মতি প্রদান করেন।

গ. আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ও প্রচারণা

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি জেনারেল মার্টিন এনালস ও সোশালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি জেনারেল হ্যানস ইয়ান্টিসেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইয়ান্টিসেক পার্লামেন্টের সদস্য ও সাংবাদিকদের কাছে বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের কথা তুলে ধরেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ফোর্ড ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন। প্রত্যেকবারই তাঁদের কাছ থেকে খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছেন। বাঙালিদের জন্য এটা যে ন্যায় যুদ্ধ তা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। ব্রিটেন এবং অন্যান্য জায়গায় অনেক বাঙালি ছাত্র ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাঁদের অধ্যয়নে দু'টি অন্তরায় দেখা দেয়। প্রায় প্রত্যেক বাঙালি ছাত্রই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করায় পাকিস্তান দূতাবাস তাদের অসুবিধায় ফেলার উদ্দেশ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বৃত্তি কেটে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। তাছাড়া কার্যপদ্ধতির জন্যও নানা অসুবিধা হচ্ছিল। তার মধ্যে অন্যতম একটি অসুবিধা ছিল পাকিস্তান দূতাবাসের মাধ্যমে বৃত্তি নিতে হতো। কিন্তু কোনো বাঙালি ছাত্রের পক্ষে তখন আর দূতাবাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ নিরাপদ ছিল না। আলোচনার পর ফোর্ড ফাউন্ডেশন একটি সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যার ফলে ছয় মাসের জন্য বাঙালি ছাত্রদের বৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা দূর হয়। বৃত্তি ভোগকারী বাঙালি ছাত্রদের সরাসরি বৃত্তির টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।[২৫]

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সোশালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল নামক প্রতিষ্ঠানটির সেক্রেটারি জেনারেল হ্যান্স ইময়ানিট সেক এর সহযোগিতায় এ প্রতিষ্ঠানের পুরো গভর্নিং বডির সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে বিচারপতি চৌধুরী সোশালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল নামক প্রতিষ্ঠানটির কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বতোভাবে সহযোগিতার আবেদন জানায়। এমনকি বিচারপতি চৌধুরী অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি জেনারেল মার্টিন এনালস এর সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধুর খোঁজ বের করেন। এছাড়া মার্টিন এনালস এর সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির কাছে একটি দরখাস্ত করার জন্য ব্যারিস্টার হিসেবে অধ্যাপক ড্রেপারকে নিয়োগ করেন।[২৬] ৫ আগস্ট ড্রেপারের সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরী জেনেভা যান। রেডক্রস সোসাইটির প্রধান কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে অধ্যাপক ড্রেপার বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা এবং সঠিক সংবাদ পরিবেশনে সাহায্য করতে অনুরোধ জানান। অধ্যাপক ড্রেপার তাদের বলেন যে- শেখ মুজিব বাঙালি জাতির নেতা। তাঁর খবরের জন্য সমগ্র জাতি উদগ্রীব এবং নিদারুণ উৎকণ্ঠায় সময় যাপন করছেন। তাঁকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। দেশের অসংখ্য মানুষ তাঁর নিরাপত্তার খবর

[২৫] গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০
[২৬] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০-৭২

চান। আইসিআরসি'র উচিত তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে বিবৃতি দেওয়া।[২৭] এর পরিপ্রেক্ষিতে রেডক্রস সোসাইটির কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁদের আশ্বস্ত করেন যে, তারা শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন এবং ফলাফল জানাবেন।

বিচারপতি চৌধুরী ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব জুরিস্ট এর সেক্রেটারি জেনারেল নিল ম্যাকডারমেট এর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। একই দিনে বিচারপতি ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিস এর অফিসে গিয়ে সেক্রেটারি জেনারেল চিদামবরা নাথানের সঙ্গে দেখা করেন।[২৮]

ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডশীপ এসোসিয়েশন মধ্য আগস্টে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজকরা বিচারপতি চৌধুরীকে জানান যে, এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং বিচারপতি চৌধুরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। মুসলিম দেশের রাষ্ট্রদূত ছাড়া সব অঞ্চলের রাষ্ট্রদূতরা এ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। অনুষ্ঠানে বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানের আয়োজক সাংবাদিক পুলিন বিহারী শীল তাঁর নিজের রচিত একটি প্রচারপত্র বিতরণ করেন। প্রচারপত্রটির উপরে তিনি একটি ছবি আঁকিয়েছিলেন। ছবিটির বিষয়বস্তু ছিল একটি নিরীহ মানুষের বুকে একটি দৈত্য তরবারি ঢুকিয়ে দিচ্ছে। দৈত্যটির মুখের আদল ছিল ইয়াহিয়া খানের মতো। এ ছবিটির শিরোনাম দিয়েছিলেন 'গভর্নমেন্ট বাই মার্ডার'।[২৯]

ঘ. আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা, প্রচারণা ও জনমত গঠন

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ৩০ মার্চ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সেন্ট ক্যাথিরিন কলেজের অধ্যক্ষ লর্ড এলেন বুলেকের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকদের হতাহতের সংবাদ জানান। বিচারপতি চৌধুরী লর্ড বুলেককে রক্তক্ষয় বন্ধ করার জন্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট টেলিগ্রাম পাঠাতে অনুরোধ করেন। লর্ড বিচারপতি চৌধুরীকে জানান যে, এভাবে আলাদা ভাবে টেলিগ্রাম পাঠানোর চেয়ে যদি কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে টেলিগ্রাম পাঠানো হয় তাহলে বেশি ফলপ্রসু হবে। সে মোতাবেক লর্ড বুলেক কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটির সেক্রেটারি জেনারেল স্যার হিউ স্প্রিঙ্গারের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। স্যার হিউ স্প্রিঙ্গারের সঙ্গে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সাক্ষাৎকারের পূর্বেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ পেয়েছেন বলে জানান। বিচারপতি চৌধুরী তাঁকে প্রতিবাদসূচক টেলিগ্রাম পাঠাতে অনুরোধ করলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সম্মত হন। ঐদিনই তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অবিলম্বে রক্তক্ষয় বন্ধ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি স্থাপন করতে অনুরোধ

[২৭] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

[২৮] গবেষকের সঙ্গে আবুল কাশেম চৌধুরী এর সাক্ষাৎকার, ১৬ এপ্রিল ২০১৮

[২৯] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮-৮৯

জানান।[৩০] বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ৬ এপ্রিল ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য লর্ড জেমস এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অন্যান্য অধ্যাপকদের বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নরহত্যার কথা তুলে ধরেন। ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আমন্ত্রণে মধ্যাহ্ন ভোজে অংশ নিয়ে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন- বাঙালিরা সংসদীয় গণতন্ত্র, সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা চেয়েছিল। পাকিস্তানের এক অংশ আরেক অংশ থেকে বারশত মাইল দূরে। তবুও বাঙালিরা মনে প্রাণে পাকিস্তান চেয়েছিল। বাঙালিদের নেতা ফজলুল হক পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন ১৯৪০ সালে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাঙালিদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা শুরু হয়। সকল ভারি শিল্প-কারখানা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পাট রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় তার প্রায় পুরোপুরি ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠায়। কেন্দ্রে সরকারি চাকরির ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বাঙালিরা এর প্রতিবাদ জানালে পাকিস্তানিরা হত্যার রাজনীতি শুরু করে। বাঙালিদের সম-অধিকারের দাবি আজ স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আজ বাঙালিরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দৃঢ়সংকল্প। জীবনে কখনো রাজনীতির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু একজন আত্ম-সম্মানবোধসম্পন্ন বাঙালিরূপে আমি এখন সে সংগ্রামে যোগদান করেছি। বিচারপতি চৌধুরীর বক্তৃতার পর লর্ড জেমস বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা শিগগিরই বুঝতে পারবে তারা কী ভুল করেছে। পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশরূপে ব্যবহার করতে গিয়ে আজ তারা সম্পূর্ণ পূর্ব পাকিস্তানই হারাতে বসেছে। ছয় মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। লর্ড জেমসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক জি.এস. মুডি বিচারপতি চৌধুরীকে তাঁর নিজস্ব কক্ষে নিয়ে যান। সেখানে অধ্যাপক মুডি বিচারপতি চৌধুরীকে জানান যে, ইয়র্কে তার দুটি বাড়ি রয়েছে। বিচারপতি চৌধুরী চাইলে তাঁর একটি বাড়ি বিনা ভাড়ায় যতদিন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন।[৩১]

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধানের সঙ্গেও দেখা করেন। তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক। তাঁর সঙ্গে বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল গণহত্যা কমিশন (Genocide Commission)। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিস্টের সহযোগিতায় বিচারপতি চৌধুরী ও মুজিবনগর সরকারের প্রচেষ্টা ছিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা। পৃথিবীর নানা প্রান্তের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে পাকিস্তানের গণহত্যার ওপর রিপোর্ট প্রকাশ করা। মুজিবনগর সরকারের মতো বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীও জানতেন যে, পাকিস্তান এই ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে কিছুতেই উপস্থিত হবে না। কিন্তু বিচারপতি চৌধুরী ও মুজিবনগর সরকারের ইচ্ছা ছিল বিদেশি পার্লামেন্টের সদস্য, রাষ্ট্রনায়ক, বিশেষ করে সাংবাদিকগণ পঁচিশে মার্চের পরে যাঁরা বাংলাদেশে এসেছিলেন তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন

---

[৩০] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭
[৩১] ওই, পৃ. ৮-৯

করা। এ ব্যাপারে আইন বিভাগের ডিন বিচারপতি চৌধুরীকে শুধু উৎসাহ নয়, কমিশনের সদস্যরূপে কাজ করারও সম্মতি জানান।[৩২]

ঙ. সভা-সমাবেশে বক্তৃতা বিবৃতি

৯ এপ্রিল ইংল্যান্ডের ব্রাডফোর্ড ও বার্মিংহাম এ্যাকশন কমিটি একটি সভার আয়োজন করে এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে সেখানে বক্তব্য দেওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। ব্রাডফোর্ডের হলে বক্তৃতা দেওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' প্রথমবারের মতো গাওয়া হয়। বিচারপতি চৌধুরী ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধিকার আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় বিশ্লেষণ করেন। নবগঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আদর্শ, ধ্যান ও ধারণা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরেন। ব্রাডফোর্ডের বক্তৃতার পর বিচারপতি চৌধুরী বার্মিংহাম যান। সেখানের বক্তৃতায় বলেন- পঁচিশে মার্চের নির্মম হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে এক নতুন জাতির যাত্রা শুরু হয়েছে। সেই ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে আপনারা সকলেই যোগদান করেছেন। আপনাদের সঙ্গে একজন নগণ্য বাঙালি হিসেবে আমিও এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা চেয়েছিলাম সমান অধিকার, এগিয়ে চলেছিলাম নিয়মতান্ত্রিক পথে। সেই সময় হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে পাকিস্তান সরকার তাদের সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের মা-বোনের ইজ্জত হরণ, লুণ্ঠন ও গণহত্যা কর্মে। সমগ্র বাংলাদেশ আজ পাকিস্তানিদের প্রজ্জ্বলিত আগুনে জ্বলছে। এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ দেশকে স্বাধীন করব।[৩৩]

৩০ মে ম্যানচেস্টারে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এ সভায় প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের রেকর্ড বাজানো হয়। ম্যানচেস্টারের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার পর বিচারপতি চৌধুরী পঁচিশে মার্চের রাত থেকে শুরু করে ৩০ মে পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাগুলোর বিবরণ দিয়ে বক্তৃতা করেন। এছাড়া আমেরিকায় বাঙালিদের সংগঠন ও কর্মতৎপরতা এমনকি ঢাকায় সংঘটিত গণহত্যার কথা উল্লেখ করেন।[৩৪]

৫ জুন শেফিল্ড টাউন হলে একটি সভার আয়োজন করা হয়। শেফিল্ড কমিটি এই সভার আয়োজন করে এবং শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রীতিশ মজুমদার এই সভা আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সভাস্থল বাঙালি, ভারতীয় ও ইংরেজ শ্রোতায় পরিপূর্ণ ছিল। সভায় বিচারপতি চৌধুরী বলেছিলেন- আপনারা একতাবদ্ধ থাকবেন এবং হাতে হাত রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। কোনো অবস্থাতেই আপনারা শান্তিভঙ্গ করবেন না। তা করলে ব্রিটিশ সরকার ও জনসাধারণের সহানুভূতি আমরা হারাব। পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্য হলো শান্তিভঙ্গ করে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে এদেশে আমরা আন্দোলন পরিচালনা করতে না পারি। তাই আমাদের সকল অবস্থাতেই ধৈর্য এবং স্থৈর্য রক্ষা করে এগিয়ে

---

[৩২] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫

[৩৩] ওই, পৃ. ২৭-২৯

[৩৪] গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০

যেতে হবে। আমাদের সংগ্রাম চলছে এক সম্ভাবনাময় জীবনের জন্য। আমরা কিছুতেই সেই সংগ্রামের ক্ষতি হতে দিতে পারি না।[৩৫]

৬ জুন পূর্ব লন্ডনের একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পূর্ব লন্ডনে অবস্থানরত বাঙালি ও সেই অঞ্চলের বেশ কিছু ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন। এখানে বিচারপতি চৌধুরী বাঙালি জাতির মুক্তির সংগ্রাম ও প্রবাসী বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রতি জোর দিয়ে বক্তৃতা করেন। ১২ জুন লন্ডনের উপকণ্ঠে অবস্থিত সেন্ট এ্যালকেন্স শহরে একটি জনসভা হয়। এখানেও ওই অঞ্চলের বাঙালিরা উপস্থিত ছিলেন এবং তারা সেই অঞ্চলের কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজকে সভায় নিয়ে আসেন। সভায় বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ওপর বক্তৃতা করেন। ১৩ জুন লীডস শহরে একটি সভায়ও বিচারপতি চৌধুরী বক্তৃতা করেন। এ সভায় বিচারপতি চৌধুরী ঘোষণা করেন যে- পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যারা আমাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে পারে। আমাদের বীর শহিদদের প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা নিবেদন হবে দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীনতার পতাকা উচ্চে তুলে ধরায়। তাই স্বাধীনতা অর্জনে আমাদের সংগ্রাম চলবে দুর্বার গতিতে।[৩৬]

২৬ জুন লন্ডনের বেড ওয়াটার অঞ্চলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় লেবার পার্টির পক্ষ থেকে পিটার শোর বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। বিচারপতি চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে গত তিন মাসের বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্য তুলে ধরেন। ২৭ জুন বার্মিংহাম স্টিয়ারিং কমিটি আয়োজিত সভায়ও বিচারপতি চৌধুরী বক্তৃতা করেন। ১০ জুলাই ব্রাডফোর্ডে একটি জনসভায়ও বিচারপতি চৌধুরী বক্তৃতা করেন।

পাকিস্তানের প্রতি চীনের সহানুভূতি নানা ভাবে প্রকাশ হওয়ার পর ১৬ জুলাই বিচারপতি চৌধুরী একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করেন। শোভাযাত্রাটি চীনা দূতাবাসের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং একটি স্মারকলিপি দেয়। পরে শোভাযাত্রাটি ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে গিয়ে শেষ হয়।[৩৭]

১ আগস্ট লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে পল কানেটের নেতৃত্বে গঠিত এ্যাকশন বাংলাদেশ আয়োজিত একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে বক্তৃতাকালে বিচারপতি চৌধুরী তিনটি নির্দেশ দেন-

ক. শীঘ্রই লন্ডনে একটি হাইকমিশন স্থাপন করা হবে,

খ. পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনার এয়ারওয়েজের বিমানযোগে ভ্রমণ না করার জন্য বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান,

গ. পাকিস্তানি সরকারি কর্মচারী হিসেবে পাকিস্তান ও বিদেশে নিয়োজিত বাঙালিদের অবিলম্বে পদত্যাগ করে মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান জানান।[৩৮]

---

[৩৫] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

[৩৬] ওই, পৃ. ৫১

[৩৭] গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০

[৩৮] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২-১০৩

চ. গণমাধ্যমে প্রচারণা ও জনমত

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বিবিসি'তে একটি সাক্ষাৎকার দেন। এ সাক্ষাৎকারে বিচারপতি চৌধুরী বিশ্ববাসীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র হত্যার কথা জানাতে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। একই দিন বিচারপতি চৌধুরী *ডেইলি টেলিগ্রাফ* এর রিপোর্টার পিটার গিল'কেও একটি সাক্ষাৎকার দেন। উভয় সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের গণহত্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ও পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কথা ব্যক্ত করেন।[৩৯] লন্ডন উইক এন্ড টেলিভিশন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থন ও অসমর্থনকারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে। ১১ জুন এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও প্রচার করা হয়। সাক্ষাৎকারে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে সাড়ে সাত কোটি সংগ্রামী বাঙালির প্রতিনিধিরূপে টেলিভিশনের দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেন বিখ্যাত সাংবাদিক রবার্ট বনী।[৪০]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে নিউইয়র্কে বিচারপতি চৌধুরী দেখা করেন। ড. ব্যানার্জী কিছু সাংবাদিকদের সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরীর পরিচয় করিয়ে দেন। *নিউইয়র্ক টাইমস* এর প্রতিনিধির মারফত পত্রিকায় এক কলামব্যাপী বিচারপতি চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। ড. ব্যানার্জীর মাধ্যমে বিচারপতি চৌধুরী জানতে পারেন যে, মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবহারের জন্য কতগুলো ছোট ছোট লঞ্চ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পাকিস্তান দুর্গত অঞ্চলে ত্রাণসামগ্রী সরবরাহের জন্য এই লঞ্চগুলো চেয়েছিল। এই সংবাদ পাওয়ার পর ড. ব্যানার্জী টেলিভিশনে বিচারপতি চৌধুরীর জন্য একটি সাক্ষাৎকার প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎকার প্রচারের ফলে মার্কিন জনগণ তাদের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে পাকিস্তানের কাছে লঞ্চ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।[৪১]

১৮ জুন নেদারল্যান্ড থেকে একটি টেলিভিশন টিম লন্ডন আসে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য। স্থানের অভাবে বিচারপতি চৌধুরী এ সাক্ষাৎকারটি দেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে।[৪২] কিন্তু ২১ জুন বিচারপতি চৌধুরী নেদারল্যান্ডের রাজধানী আমস্টারডামে পৌঁছেন। বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে রেডিও ও টেলিভিশনের রিপোর্টারগণ বিচারপতি চৌধুরীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাদেরকে তিনি যে সাক্ষাৎকার দেন তাতে বলেন, 'নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী আমরা পাকিস্তান সরকারের কাছে সকল মানুষের সমান অধিকার চেয়েছিলাম, কিন্তু প্রতিদানে বুকে বুলেটবিদ্ধ হওয়ার মনোপলি লাভ করি।'[৪৩] ২৩ জুন বিচারপতি চৌধুরী নেদারল্যান্ডে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এ সংবাদ সম্মেলনের পর

[৩৯] গবেষকের সঙ্গে আবুল কাশেম চৌধুরী এর সাক্ষাৎকার, ১৬ এপ্রিল ২০১৮
[৪০] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
[৪১] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৩
[৪২] গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০
[৪৩] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

নেদারল্যান্ডের পত্রিকাগুলো প্রথম পৃষ্ঠার দুই তিন কলামব্যাপী শিরোনাম দিয়ে গুরুত্ব সহকারে বাংলাদেশের সংবাদ প্রকাশ করে।[৪৪]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সমর্থন আদায়, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য বিচারপতি আবু সাঈদ সমগ্র ইউরোপে জনমত গঠনে সফর করেন। এ সফর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তিনি আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সুইজারল্যান্ডে যান। তাঁর সুইজারল্যান্ড যাওয়ার পূর্বে সেখানকার বাঙালিরা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনকারী সুইজারল্যান্ডের ব্যক্তিরা একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সংবাদ সম্মেলন এর ব্যাপারে তারা প্রচারণা চালায়। ১৭ আগস্ট সকাল সাড়ে দশটায় বিচারপতি চৌধুরী জেনেভা বিমানবন্দরে পৌঁছান। সুইজারল্যান্ডের বিশিষ্ট নাগরিক মাদাম ক্যাথলিন লা প্যঁ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি বিচারপতি চৌধুরীকে বলেন, তাঁকে ভিসা মঞ্জুর করা হয়নি বলে একটি মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়েছে। এজন্য তাঁর সাংবাদিক সম্মেলন বাতিল করা হয়েছে বলে পাকিস্তানি দূতাবাস কর্তৃক জেনেভায় অবস্থিত জাতিসংঘের প্রেস কক্ষে একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। এই খবর পেয়ে মাদাম লা প্যঁ ও তাঁর সহকর্মীরা পাল্টা বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করেন, পাকিস্তানি দূতাবাসের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞপ্তি উপেক্ষা করে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করার জন্য তারা বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং সম্মেলন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে। প্রবেশ ভিসা থাকা সত্ত্বেও বিমানবন্দরে বিচারপতি চৌধুরীর পাসপোর্টে এন্ট্রি সিল সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের হাত রয়েছে বলে মাদাম লা প্যঁ মনে করেন।[৪৫] যথারীতি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন-

> পাকিস্তানীরা প্রতি মুহূর্তে অকাতরে বাঙালীদের হত্যা করে চলেছে। সুইটজারল্যান্ড একটি নিরপেক্ষ দেশ। আমি কোন সক্রিয় সাহায্য কামনায় এখানে আসিনি। আপনাদের নিরপেক্ষতা রক্ষা করে যেটুকু সম্ভব আপনারা করবেন, এ বিশ্বাস বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের রয়েছে।[৪৬]

১ সেপ্টেম্বর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নরওয়ে যান। নরওয়ের রাজধানী অসলোতে পৌঁছলে তাঁকে স্বাগত জানান দুই জন বাঙালি হামিদুল ইসলাম ও রফিকুজ্জামান। তারা দু'জন বিচারপতি চৌধুরীকে অসলোর টেলিভিশন কেন্দ্রে নিয়ে যান। কেননা সেখানে আগে থেকেই বিচারপতি চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময়সূচি নির্ধারিত ছিল। টেলিভিশনের দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল কারণগুলো প্রশ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নরওয়েবাসীর কাছে তুলে ধরেন। ৬ সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় নরওয়েতে একটি পূর্ণাঙ্গ সাংবাদিক সম্মেলনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণ, বর্তমান পরিস্থিতি এবং আন্দোলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য

---

[৪৪] গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০

[৪৫] গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০; আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮

[৪৬] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

তুলে ধরেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনের খবর পরের দিন নরওয়ের সবগুলো সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে একটি পত্রিকার জন্য বিশেষ সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন বিচারপতি চৌধুরী।[৪৭]

৮ সেপ্টেম্বর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সুইডেনের সুপ্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক এবং *এক্সপ্রেসেন ইভনিং ডেইলি* পত্রিকার সম্পাদক টমাস হ্যামানবার্গের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে সঙ্গে থাকা বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রচার পুস্তিকা উপহার দেন। তিনি এগুলো গ্রহণ করে জানান যে, বাংলাদেশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় লিখতে সেগুলো কাজে লাগবে। ৯ সেপ্টেম্বর সকালে সাংবাদিক বো কার্লশন *সভেন্স্ কা ডাগ বলাডেট* পত্রিকার জন্য বিচারপতি চৌধুরীর একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। একই দিন বিকেলে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। এ সাংবাদিক সম্মেলনে সুইডেনের প্রায় সব পত্রিকার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ১০ সেপ্টেম্বর *এ্যাফটন ব্লাডেট* পত্রিকার সম্পাদক ফ্রেডারিকসেনের সঙ্গেও দেখা করেন।[৪৮] ১৪ সেপ্টেম্বর ফিনল্যান্ডের টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরেন।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ডেনমার্কের টেলিভিশনে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। সাক্ষাৎকারে তিনি ডেনমার্ক থেকে পাকিস্তান অস্ত্র সংগ্রহ করছে এরকম একটি প্রশ্নোত্তরে জানান যে- ইউরোপ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাই গণতন্ত্রের হত্যাকারী পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দিয়ে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে পারে না। সাহায্য অর্থ শুধুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন বা অর্থ সাহায্য নয়, এর অর্থ শত্রুকেও কোনোভাবে সাহায্য না করা। তাই আমি আশা করব, গণতন্ত্রে অটল বিশ্বাসী ডেনমার্ক কখনো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর স্বৈরশাসন চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে তাকে অস্ত্র সরবরাহ করবে না। তাদের অস্ত্র সরবরাহ করার ফলে যে নারী নির্যাতন, শিশু হত্যা ও নির্দোষ মানুষ প্রাণহানি হবে তার জন্য দায়ী থাকবে অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ। আমি আশা করি, এ ব্যাপারে ডেনমার্কের সচেতনতা অন্য দেশকেও অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে দৃঢ়সংকল্প করবে।[৪৯]

১৬ সেপ্টেম্বর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ডেনমার্কের বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি আয়োজিত একটি সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। এ সম্মেলনে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের প্রতিটি দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন-

> . . . গণতন্ত্রমনা বাংলাদেশের মানুষের দাবীতেই শেষ পর্যন্ত উনিশশ' সত্তর সনে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী একবাক্যে শেখ মুজিব পরিচালিত আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত করে। জনগণ আশা করেছিল এইবারে তারা চিন্তার, কথা বলার স্বাধীনতা লাভ করবে। লাভ করবে তারা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। তাদের এই সংগ্রাম আদর্শগতভাবে বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয় ছিল। আর আজ যে অকথিত নিপীড়ন তারা সহ্য করছেন সেটাও গণতন্ত্রকামী মানুষের প্রতিনিধিরূপেই তাদের উপর নেমে এসেছে। তাই আদর্শগতভাবে এই সংগ্রাম ভৌগোলিক সীমারেখা

[৪৭] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩, ১০৭
[৪৮] ওই, পৃ. ১১০
[৪৯] ওই, পৃ. ১১৬

অতিক্রম করে সকল দেশের, সকল মানুষের সংগ্রামে পরিণত হয়েছে এবং সেই সংগ্রামে ডেনমার্কের অধিবাসীবৃন্দ সক্রিয় সাহায্য দান করবেন, এই আশা নিয়েই ডেনমার্কের জনগণের কাছে এসেছি।[৫০]

ছ. বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রচেষ্টা গ্রহণে তৎপরতা

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অর্থাৎ পঁচিশে মার্চের রাতের পর থেকে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও আপামর বাঙালি জনসাধারণ জানতেন না, তাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় কী অবস্থায় আছেন। এ আশঙ্কা প্রবাসী বাঙালিদেরও ছিল। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জেনেভায় অবস্থানকালীন পঁচিশে মার্চের ঘটনার কথা শোনার পর অন্যদের মতো তিনিও বঙ্গবন্ধু জীবন নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। লন্ডনে আসার পর ইয়ান সাদারল্যান্ডের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারেন যে, বঙ্গবন্ধুকে পঁচিশ মার্চ রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন কিনা তা জানতে পারেননি। পরবর্তীতে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারেন বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন এবং পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি জীবন যাপন করছেন। বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর যে সকল দায়িত্ব ছিল তার মধ্যে একটি দায়িত্ব ছিল বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালানো। এ ব্যাপারে বিচারপতি চৌধুরী যাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন তাদেরকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারেও কথা বলেছেন। বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রক্রিয়া ও মুক্তির জন্য বিচারপতি চৌধুরী যে কতটা উদ্‌বিগ্ন ছিলেন তা জানা যায় তাঁর স্মৃতিকথায়- 'শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন শুরু হওয়ায় আমরা মুখে যতই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিনা কেন, ভিতরে ভিতরে একটি দুর্বিষহ শঙ্কা আমাদের অস্থির করে তুলেছিল।'[৫১]

জুলাই মাসে সংবাদ প্রচারিত হয় যে, পাকিস্তানি সামরিক শাসক দেশদ্রোহিতার অপরাধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক আদালতে বিচার হবে। এ সংবাদ মুজিবনগর সরকারের পাশাপাশি সমগ্র প্রবাসী বাঙালি সমাজও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও তাঁর জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর তৎপরতার চিত্র এবং মুজিবনগর সরকারের উদ্‌বেগের কথা জানা যায় তাঁর স্মৃতিকথায়-

> আমি অবশ্য তাঁকে ও সলিসিটারকে পাঠানোর আগে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেছি। তিনি আমাকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ সমর্থনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমি তাঁকে জানাই যে, তাঁদের যাতায়াত, হোটেল খরচ এবং কিছুটা নামমাত্র ফিস দিলেও বোধ করি তিন হাজার পাউন্ড খরচ হবে। তিনি বলেন, কাজ হোক বা না হোক বঙ্গবন্ধুর জন্য সকল রকম চেষ্টাই করতে হবে, তাতে যত খরচই হোক।[৫২]

মুজিবনগর সরকারের পরামর্শে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী শোন ম্যাকব্রাইডকে পাকিস্তানে প্রেরণ করেন। তাঁর সঙ্গে বার্নাড শেরিডেন সলিসিটার ফার্মের একজন সলিসিটারও যান। তারা ইসলামাবাদে পৌঁছে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেন। এমনকি তাঁরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গেও দেখা করতে

---

[৫০] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ .১১৮-১১৯
[৫১] ওই, পৃ. ৯৭
[৫২] ওই, পৃ. ৭৫

চান। কিন্তু ইয়াহিয়া খান তাদের সঙ্গে দেখা করেননি। তারপর তাঁরা ইয়াহিয়া খানের আইন উপদেষ্টা কর্নেলিয়াস এর সঙ্গে দেখা করেন। কর্নেলিয়াস তাদের জানান যে, কোনো বিদেশি আইনজীবী শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ অথবা তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে পারবেন না। পরে তিনি লন্ডন ফিরে এসে তাঁকে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন।[৫৩] তারা অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে আইনজীবীদের পরামর্শ নেওয়ার সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে। লন্ডনের *টাইমস* পত্রিকায় প্রেরিত এক চিঠিতে তারা বলেছিলেন- তারা চেয়েছিলেন বিচারের সময় শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থন করতে-যাতে ন্যায়বিচার হতে পারে।[৫৪]

এ্যাকশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ট্রাফালগার স্কোয়ারের জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী শোন ম্যাকব্রাইড বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পাকিস্তান থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন বলে জানান। এতে উপস্থিত জনতা সকলেই শেম, শেম বলে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। এ সভা শেষে শোভাযাত্রা সহকারে জনতা ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে গিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান এবং শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারকে চাপ দিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেয়।[৫৫]

১১ আগস্ট লন্ডনের হাইড পার্কে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ইংল্যান্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ সমবেত হয়। এ সভায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন- ‘বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা হানি বা জীবনের ক্ষতি হলে বাঙালী জাতি কোনদিন পাকিস্তানকে ক্ষমা করতে পারবে না। ক্ষমা শব্দটি বাঙালি জাতি চিরদিনের মতো ভুলে যাবে।’[৫৬] এ সভার পরের দিন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। এ শোভাযাত্রাটি ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় ‘শেখ মুজিবের মুক্তি চাই’, ‘বিচার প্রহসন বন্ধ কর’, ‘গণহত্যা বন্ধ কর’ ইত্যাদি স্লোগান ইংরেজিতে দেওয়া হয়। শোভাযাত্রা শেষে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। তারপর সমবেত জনতা ও সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বক্তৃতায় বলেন-

> শেখ মুজিব একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রপতি। তাঁর বিচার করার অধিকার কারো নেই। গোপন বিচার একেবারেই সভ্যতা বহির্ভূত। এই প্রহসন বন্ধ করার জন্য এবং শেখ মুজিবের অবিলম্বে মুক্তির জন্য বৃটিশ সরকার পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করবেন, এটাই আমাদের আশা।[৫৭]

শোভাযাত্রা ও বিচারপতি চৌধুরীর বক্তৃতার পরের দিন ১২ আগস্ট *টাইমস* পত্রিকা’য় শেখ মুজিবের বিচারকে উপলক্ষ্য করে প্রধান সম্পাদকীয় লেখা হয়। তিন কলামব্যাপী এই সম্পাদকীয়তে শেখ মুজিবের গোপন সামরিক আদালতে বিচারের তীব্র নিন্দা প্রকাশ করা হয়।[৫৮]

---

[৫৩] গবেষকের সঙ্গে আবুল কাশেম চৌধুরী এর সাক্ষাৎকার, ১৬ এপ্রিল ২০১৮

[৫৪] আশীষ কুমার দাস, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত*, কলকাতা: লাকী পাবলিশার্স, ২০১৬। পৃ. ১৪২

[৫৫] গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০

[৫৬] গবেষকের সঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মার্চ ২০১৮

[৫৭] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

১৭ আগস্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সুইজারল্যান্ডে যান। সেখানকার বার্ন শহরে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় সাংবাদিকদের কাছে বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনের কথা তুলে ধরেন।[৫৯] ১৪ সেপ্টেম্বর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ফিনল্যান্ডে পৌঁছে সেখানকার সুপরিচিত পত্রিকা *সুয়োম্যান মোসিয়ালি ডেমোক্রাট* এর সম্পাদক কেরী ভার ভিকিকো'কে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে বলেন- সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নেতা শেখ মুজিবের কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক রেডক্রস এবং অন্যান্য সংস্থা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি প্রবাসী বাঙালিদের পাঠানো আইনজীবী শোন ম্যাকব্রাইডকে পাকিস্তান সরকার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি।[৬০]

১৪ সেপ্টেম্বর ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন এ পৌঁছে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ডেনমার্কের বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা *ইনফরমেশন* এর সম্পাদক পলট স্টিসট্রাপ নিয়েলসেনের সঙ্গে দেখা করেও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রচেষ্টার ব্যাপারে বলেন- শেখ মুজিব বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। শেখ মুজিবের বিদ্রোহ ছিল বাঙালিদের শোষণকারী পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণ চালানো হলে কেউ দেশদ্রোহী হতে পারে না। অথচ দেশদ্রোহের অভিযোগে বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের নেতা আজ কারাগারে বন্দি এবং বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করছেন।[৬১]

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১২ অক্টোবর নয়াদিল্লি থেকে প্রেরিত এক সংবাদে জানতে পারেন যে, পাকিস্তানের সামরিক আদালত শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছে। এই সংবাদ দিল্লির সরকারি মহল সূত্রে জানা গিয়েছে বলে *দি নিউইয়র্ক টাইমস* এর সংবাদদাতা উল্লেখ করেন। দশ দিন আগে বিচারকার্য শেষ হওয়ার পর আদালতের রায় ইয়াহিয়া খানের নিকট প্রেরণ করা হয়। সামরিক আদালতের রায় পাকিস্তানের দূতাবাসগুলোকে জানানো হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানকারী জনৈক পাকিস্তানি কূটনীতিকদের নিকট থেকে ভারতীয় অফিসারগণ এই সংবাদটি জানতে পারেন।[৬২]

ছ. ইংল্যান্ডে কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রবাসী বাঙালিদের সহযোগিতায় সমগ্র ইংল্যান্ড ও ইউরোপে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। বিচারপতি চৌধুরীর মতো অন্যান্য নেতৃবৃন্দও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় তহবিলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাদের সকলের ভাবনা যে, শুধুমাত্র শোভাযাত্রা ও বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে দেশ স্বাধীন হবে না। উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে আধুনিক অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। এসব অস্ত্র কেনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। প্রবাসের অনেক বাঙালি এসময় মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে অর্থ দিতে ইচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু বিদেশে মুজিবনগর সরকারের আর্থিক লেনদেন করার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। এজন্য সকলেই

---

[৫৮] গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০

[৫৯] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

[৬০] ওই, পৃ. ১১৩

[৬১] ওই, পৃ. ১১৫

[৬২] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫-১৬৬

বাংলাদেশের নামে একটি কেন্দ্রীয় অর্থ তহবিল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। একই সময়ে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ অস্ত্রের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা বিচারপতি চৌধুরীকে জানান। বিচারপতি চৌধুরী লন্ডনের স্টিয়ারিং কমিটির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার পর দুটি সমস্যা উপলদ্ধি করলেন–

প্রথমত, তহবিল গঠনের জন্য বোর্ড অব ট্রাস্টি গঠন করা প্রয়োজন কিন্তু এ কাজটি সহজ ছিল না।

দ্বিতীয়ত, কোন ব্যাংকে বাংলাদেশের নামে হিসাব খোলা যাবে।

এ দুটি সমস্যা উপলদ্ধি করে বাংলাদেশের নামে ব্যাংক হিসাব খোলার উদ্যোগ নেওয়া হলে দেখা যায় যে, কোনো ব্যাংক 'বাংলাদেশ ফান্ড' নামে হিসাব খুলতে রাজি হচ্ছিল না। লন্ডনের স্টিয়ারিং কমিটির অনেক চেষ্টার পর হ্যামব্রুজ ব্যাংক নামে একটি মার্চেন্ট ব্যাংক বাংলাদেশ ফান্ড নামে হিসাব চালু করতে সম্মত হয়।

৮ মে গোরিং স্ট্রিটের অফিসে ইংল্যান্ড প্রতিনিধিবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় হ্যামব্রুজ ব্যাংকে বাংলাদেশ ফান্ডের হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ট্রাস্টি বোর্ডের জন্য বাঙালি সদস্য নির্বাচনে মতদ্বৈততা দেখা দেওয়ায় দু'জন ইংরেজ-স্টোনহাউস ও ডোনাল্ড চেজওয়ার্থ এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে সর্বসম্মতিক্রমে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য করা হয়। বাংলাদেশ ফান্ড নামে হিসাব খোলার পর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলোকে হিসাব নম্বর জানানো হয় এবং তাঁরা নিজ নিজ অঞ্চলের বাঙালিদের বাংলাদেশ ফান্ডের হিসাব নম্বর জানিয়ে দেয়। সরাসরি ব্যাংকে অথবা সমিতির মারফত টাকা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পর হ্যামব্রুজ ব্যাংক হঠাৎ করে বাংলাদেশ ফান্ডের হিসাব বন্ধ করে দেয় এবং নোটিশ দেয় যে, শিগগিরই বাংলাদেশ ফান্ডের অর্থ অন্য ব্যাংকে স্থানান্তরের জন্য। বিচারপতি চৌধুরী ও প্রবাসী বাঙালিদের প্রচেষ্টার ফলে ন্যাশনাল ওয়েস্ট মিনিষ্টার ব্যাংক বাংলাদেশ ফান্ড নামে হিসাব খুলতে রাজি হয়। হ্যামব্রুজ ব্যাংক বাংলাদেশ ফান্ডের হিসাব বন্ধ করার কারণ উল্লেখ করে, একটি মার্চেন্ট ব্যাংকের পক্ষে এ ধরনের হিসাব ম্যানেজ করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু হিসাব বন্ধ করার আসল কারণ ছিল পাকিস্তান দূতাবাসের প্রতিবাদ।[৬৩]

বাংলাদেশ তহবিলে টাকা আদায়ের প্রক্রিয়াগুলো ছিল–

ক. প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলো প্রথম থেকেই নিজস্ব রশিদ বইয়ের মাধ্যমে চাঁদা তুলেছিল। বলা হয়, যে টাকা তাঁরা বাংলাদেশ ফান্ডের রশিদ বইয়ে তুলবে সেটা বাংলাদেশ ফান্ডে জমা দিতে হবে।

খ. সকল সমিতিগুলোকে অনুরোধ করা হয়েছিল, বাংলাদেশ ফান্ডের রশিদ বই ব্যতীত অন্য কোনো রশিদ বইয়ের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন না করতে।[৬৪]

উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ফাণ্ডের অডিট রিপোর্ট এবং হিসাব বাংলাদেশ সরকারের প্রেসে ছাপা হয় (বিজিপি-৭২-৭৩-৩১৯৫ ডি-১ এম)। এই রিপোর্টটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র-এর চতুর্থ খণ্ডে (পৃষ্ঠা

[৬৩] গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০; গবেষকের সঙ্গে আকবর লুৎফুল মতিন এর সাক্ষাৎকার, ২৭ এপ্রিল ২০১৯; গবেষকের সঙ্গে আবুল কাশেম চৌধুরী এর সাক্ষাৎকার, ১৬ এপ্রিল ২০১৮; বিস্তারিত: আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮-৮১

[৬৪] গবেষকের সঙ্গে আকবর লুৎফুল মতিন এর সাক্ষাৎকার, ২৭ এপ্রিল ২০১৯

৭৭৬-৮০৩) প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে অডিট করা রিপোর্ট পাঠানো হয়। লন্ডনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস মারফত আঞ্চলিক সমিতিগুলোকেও রিপোর্ট পাঠানো হয়। উক্ত রিপোর্টে বলা হয় যে, ১৯৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটির নিকট প্রায় ১ লাখ পাউন্ড পাওনা ছিল। সেসব সমিতিকে টাকা বাংলাদেশ ফান্ডের একাউন্টে জমা দানের জন্য তাগিদ দেওয়া হয়। বাংলাদেশের লন্ডনস্থ প্রথম রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আব্দুস সুলতানকে এ অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি এবং উক্ত দূতাবাসের ফাইন্যান্স ডিরেক্টর লুৎফুল মতিন অনেক চেষ্টা করে ১৯৭২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের আগে প্রায় ১ লাখ পাউন্ড এবং রশিদ বই ফেরত নেন। এই ফান্ডের মোট ৪ লাখ ১২ হাজার ৮৩ পাউন্ড ২৬ পেনি আদায় হয়। তার মধ্যে মোট ৩ লাখ ৭৮ হাজার ৮৭১ পাউন্ড ২১ পেনি বাংলাদেশ সরকারকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই টাকা ছিল বাংলাদেশ সরকারের প্রথম বৈদেশিক মুদ্রা। যা চেকের মাধ্যমে কয়েক দফায় দেওয়া হয়। প্রথম চেকটি গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এই চেকটি অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেন। বোর্ড অব ট্রাস্টি নয় মাসের আন্দোলনে ব্যয় করেছিলেন প্রায় ১১ হাজার ৪৩০ পাউন্ড। স্টিয়ারিং কমিটি সংগ্রাম পরিচালনায় খরচ করেছিলেন ২১ হাজার ৭৮২ পাউন্ড ৫ পেনি। বাংলাদেশ ফান্ড থেকেই সেই টাকা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ফান্ডের অডিট রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার ১৯৭২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের অব্যবহিত পরে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিল।[৬৫]

জ. বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে প্রচারণা ও সংগঠিতকরণ

জনমত পত্রিকার সম্পাদক ও ছাত্রনেতা ওয়ালী আশরাফ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি আশরাফকে তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগতভাবে বাঙালিদের মধ্যে ঐক্য প্রচেষ্টা চালাতে বলেন। ছাত্রনেতা মোশাররফ হোসেন, মানিক চৌধুরী, রাজিউল হাসান রঞ্জু, এনামুল হক তখন লন্ডনে বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।[৬৬]

ঝ. বাংলাদেশের ডাকটিকিট প্রকাশ ও উদ্‌বোধন

১৭ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম চালু হয়। মুক্তিযুদ্ধকে কার্যকর রূপ প্রদানের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠনের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদকে বৈদেশিক প্রচার দফতরের দায়িত্ব প্রদান করে। তাকে সহযোগিতা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন- শিল্পী কামরুল হাসান, শিল্পী নিতুন কুণ্ডু ও আশরাফ আলী চৌধুরী। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ছিলেন এল এন মিশ্র। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ দায়িত্ব গ্রহণের পর মুক্তাঞ্চলে ফিল্ড পোস্ট অফিস স্থাপনের জন্য এবং এক মুক্তাঞ্চল থেকে অন্য মুক্তাঞ্চলে সহজ ডাক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। তিনি এ কাজের জন্য এম এ আজিজকে মুজিবনগর ডাকঘরের স্পেশাল অফিসার, নুরুল ইসলামকে পোস্ট মাস্টার ও এ কে এম ইদ্রিস আলীকে পোস্ট অফিস সুপারিনটেনডেন্ট এর দায়িত্ব প্রদান করেন। তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় যশোরের কাশিপুর, বেনাপোল এবং কুষ্টিয়ার মুজিবনগর এ ১৯৭১ সালের এপ্রিল ও মে মাস

[৬৫] গবেষকের সঙ্গে আকবর লুৎফুল মতিন এর সাক্ষাৎকার, ২৭ এপ্রিল ২০১৯

[৬৬] গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০

নাগাদ ফিল্ড পোস্ট অফিস স্থাপন করা হয়।[৬৭] এ ফিল্ড অফিসের কার্যক্রম আরো বিস্তৃতির জন্য এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ডাক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। যার বাস্তব ফল দেখা যায় ইংল্যান্ডে। ২৬ জুলাই ১৯৭১ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্স এর হারকোর্ট কক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের ডাকটিকিট প্রকাশ উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ ডাকটিকিট প্রকাশের মধ্য দিয়ে মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে বলে রাজনৈতিক ভিত্তি প্রকাশ পায়। পার্লামেন্টের সকল দলের নেতৃস্থানীয় সদস্য এবং প্রায় ৪০ জন সাংবাদিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সদ্য প্রকাশিত ডাকটিকিটগুলো প্রদর্শন করেন। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের দলীয় সদস্য আবদুল মান্নানও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাঙালি গ্রাফিক শিল্পী বিমান মল্লিক ডাকটিকিটগুলোর নকশা তৈরি করেন। বিদেশে চিঠিপত্র পাঠাবার জন্য ভারত সরকার টিকিটগুলো ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে বলে উদ্যোক্তারা প্রকাশ করেন। ২৯ জুলাই থেকে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল, অস্ট্রেলিয়া, দূরপ্রাচ্য এবং বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে টিকিটগুলো পাওয়া যাবো বলে তারা জানান। ব্রিটেনের প্রাক্তন পোস্ট মাস্টার জেনারেল জন স্টোনহাউস, পিটার শোর এবং অন্যান্য অতিথিদের উপস্থিতিতে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন, ডাকটিকিটগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ বাংলাদেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে গণ্য করা হবে।[৬৮] ডাকটিকিটগুলোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচয় ফুটে ওঠে। বাংলাদেশের ডাকটিকিটের একটিতে বাংলাদেশের মানচিত্র ছিল, অন্যটিতে ছিল ব্যালটবক্স। ব্যালটবক্স গণতন্ত্রের প্রতীক। আরেকটি টিকিটে শিকল ভাঙ্গার ছবি এর দ্বারা বলা হয়েছে বাংলাদেশ পাকিস্তানের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছে। একটি টিকিটে ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। আরেকটি ডাকটিকিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ত ছড়ানো দেখানো হয়েছে।[৬৯] পরদিন ইংল্যান্ডের সকল সংবাদপত্রে বাংলাদেশের নতুন ডাকটিকিট প্রকাশ সম্পর্কিত সংবাদ ও ডাকটিকিট সম্পর্কিত সংবাদের পাশে মুজিবনগরে অবস্থিত বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর ফিল্ড পোস্ট অফিস এর ছবি ছাপানো হয়।[৭০]

ঞ. ইংল্যান্ডে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হতো লন্ডনের গোরিং স্ট্রিটের অফিস থেকে। মুজিবনগর সরকারের নির্দেশনা ইংল্যান্ডের ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে আসতো। এজন্য শেখ আব্দুল মান্নান ও আজিজুল হক ভূঁইয়া ভারতীয় দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিক শশাংক ব্যানার্জীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতেন। মুজিবনগর সরকার কর্তৃক কোনো জরুরি সংবাদ ভারতীয় দূতাবাসের মারফত পাঠানো হলে মি. ব্যানার্জী তা শেখ মান্নান কিংবা ভূঁইয়ার নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৭১] এ সময় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ইংল্যান্ডে একটি বাংলাদেশ দূতাবাস খোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অবশ্য ১ আগস্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারে বক্তৃতার সময়

[৬৭] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: সিদ্দিক মাহমুদুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধকালীন ডাকব্যবস্থা ও ডাকটিকিট, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৩৩-৩৪, বর্ষ ১৪১৭-১৯। পৃ. ২১২-২৩৬

[৬৮] গবেষকের সঙ্গে বিমান মল্লিকের অনলাইনে নেওয়া সাক্ষাৎকার, ১৮ আগস্ট ২০২০; আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

[৬৯] গবেষকের সঙ্গে বিমান মল্লিকের অনলাইনে নেওয়া সাক্ষাৎকার, ১৮ আগস্ট ২০২০

[৭০] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬

[৭১] ওই, পৃ. ৭৯

বিচারপতি চৌধুরী ঘোষণা করেছিলেন যে, খুব শিগগিরই বাংলাদেশ দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করা হবে। আগস্ট মাসের দিকে লন্ডনের প্রায় সকল বিদেশি দূতাবাসই বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি তাদের সহানুভূতির মনোভাব প্রকাশ করে। বিচারপতি চৌধুরী উপলব্ধি করলেন যে, এসব দিদেশি দূতাবাসের সঙ্গে কূটনীতিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের একটি দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এ প্রয়োজন থেকে বিচারপতি চৌধুরী মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাথে বাংলাদেশ দূতাবাস খোলার ব্যাপারে কথা বলেন। মুজিবনগর সরকারও রাজনৈতিক দিক বিবেচনায় লন্ডনে একটি দূতাবাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করে। মুজিবনগর সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপনের ব্যাপারে দুটি সমস্যা উপলব্ধি করেন–

১. বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপনের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান দরকার। স্থানটি ছোট হতে পারে কিন্তু সকলের যাতায়াত ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেন এ স্থানটি কেন্দ্রে অবস্থিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেন।
২. বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপনের ক্ষেত্রে ফান্ড বা তহবিলের সম্ভাব্য উৎস। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে প্রবাসী বাঙালিদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বাংলাদেশ দূতাবাসের খরচ চালানোর জন্য বাংলাদেশ ফান্ড থেকে কোনো অর্থ ব্যয় না করার ব্যাপারে সম্মত হয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় বাংলাদেশ দূতাবাসের খরচের জন্য কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশ ফান্ডের টাকা ব্যয় করা হবে না।

উদ্ভূত এ সমস্যা দুটি সমাধানে দু'জন ব্যক্তি এগিয়ে আসেন। বাংলাদেশ দূতাবাসের স্থান নির্বাচনে ও দূতাবাসের অফিস খোলার জন্য এগিয়ে আসেন ওয়ার অন ওয়ান্ট এর ডোনাল্ড চেজওয়ার্থ। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম থেকেই কাজ করছিলেন। এমনকি তিনি ভারতে বাঙালি শরণার্থীদের সাহায্যের ব্যবস্থা করার জন্য ওয়ার অন ওয়ান্ট এর পক্ষ থেকে বেশ কয়েকবার কলকাতা সফর করেন। প্রত্যেকবার তিনি মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ফান্ডের একজন ট্রাস্টিও ছিলেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ডোনাল্ড চেজওয়ার্থকে বাংলাদেশ দূতাবাস প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানের কথা বললে তিনি বিচারপতি চৌধুরীকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন। ব্রিটিশ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ২৪ নং প্রেমব্রিজ গার্ডেনস এ অবস্থিত আন্তর্জাতিক একটি হোস্টেলের ওয়ার্ডেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন ডোনাল্ড চেজওয়ার্থ। এই হোটেলের নিচ তলার কক্ষগুলো বাংলাদেশ দূতাবাস প্রতিষ্ঠার জন্য নামমাত্র মূল্যে ভাড়া দিলেন। কক্ষগুলো পাওয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস প্রতিষ্ঠায় স্থানের যে সংকট দেখা দিয়েছিল তার সমাধান হয়। বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপনে দ্বিতীয় সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন বাঙালি একজন ভদ্রলোক জহুরুল ইসলাম। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং তাঁর এক পাঞ্জাবি বন্ধুর সহায়তায় বেঁচে যান। তারপর তিনি পাকিস্তান সরকারকে চিকিৎসার কথা বলে লন্ডনে চলে আসেন। জহুরুল ইসলাম মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছ থেকে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপনের খরচের টাকা সংস্থান করার নির্দেশ পান। সে অনুযায়ী তিনি

বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপনের সকল ব্যয় বহন করতেন।[৭২] বাংলাদেশ দূতাবাসের খরচের টাকা কীভাবে আসতো সে সম্পর্কে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী স্মৃতিকথায় লিখেছেন। দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য খরচ বাবদ প্রতিমাসে দুই থেকে আড়াই হাজার পাউন্ড প্রয়োজন হতো। পরবর্তীতে বাঙালি কূটনীতিকরা বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দিলে এর পরিমাণও বাড়তে থাকে। জহুরুল ইসলাম দূতাবাসের খরচ বাবদ দুই তিন বছরের টাকা প্রাথমিকভাবে একসঙ্গে দিতে মনস্থির করেন। কিন্তু বিচারপতি চৌধুরী তাঁকে জানান যে, দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত দূতাবাসের ব্যয় পরিচালনা করলেই হবে এবং তা প্রতি মাসে দিলেই বরং ভালো হয়। তিনি প্রতি মাসে মোশাররফ হোসেন জোয়ারদারের মাধ্যমে তাঁর দেয় অর্থ পাঠিয়ে দিতে রাজি হন। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে মোশাররফ হোসেন জোয়ারদার সুবিদ আলী নামে একজন রোগীর পক্ষ থেকে দূতাবাসের খরচ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে আসতেন। দূতাবাসের ফিন্যান্স ডিরেক্টর লুৎফুল মতিন এই পাউন্ড গ্রহণ করে সুবিদ আলীর নামে যথারীতি রশিদ দিতেন। এই অর্থ দিয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসের নামে অন্য একটি হিসাব চালু করা হয়। দূতাবাসের খরচ এই হিসাব থেকে নির্বাহ করা হতো।[৭৩]

২৭ আগস্ট ২৪ নং পেমব্রিজ গার্ডেনস-এ বাংলাদেশ দূতাবাস উদ্‌বোধন করা হয়। ভারত ছাড়া এটি ছিল বিশ্বে বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস। ২৭ আগস্ট সকালে সমবেত বাঙালি ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী দূতাবাসের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। দূতাবাস উদ্‌বোধনের খবর *লন্ডন টাইমস* সহ অন্যান্য পত্রিকায় ছাপা হয়। বাংলাদেশ মিশন উদ্‌বোধন করার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন, This building will be the centre of the world movement for liberation of our country.[৭৪] উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রায় তিনশত বাঙালি এবং অনেক বিদেশি সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। দূতাবাস উদ্‌বোধনের পর কয়েকজন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য বক্তৃতা করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন। উদ্‌বোধনের দিন দূতাবাসের সদস্য ছিলেন আবুল ফতেহ, মহিউদ্দিন আহমেদ, লুৎফুল মতিন, শিল্পী আবদুর রউফ, মহিউদ্দিন চৌধুরী, আবদুস সালাম, এ. কে. এম. নুরুল হুদা ও ফজলুল হক চৌধুরী। এপ্রিল মাসে মুজিবনগর সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে হাইকমিশনার ঘোষণা করে লেটার অব ক্রেডেন্স অর্থাৎ পরিচয়পত্র প্রেরণ করেছিলেন। সেই পরিচয়পত্র নতুন করে আবার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়।[৭৫]

বাংলাদেশ দূতাবাস উদ্‌বোধনের অনুষ্ঠান চলার সময় পাকিস্তানের হাইকমিশনার সালমান আলী ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে গিয়ে মিশন স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জোসেফ গডবারের সঙ্গে দেখা করে সালমান আলী জানান ব্রিটেন পাকিস্তানের বন্ধু রাষ্ট্র এবং তার এক অংশের নাম পূর্ব পাকিস্তান। এই অংশের নাম বদল করে বাংলাদেশ নাম নিয়ে লন্ডনে দূতাবাস স্থাপন পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবমাননাকর। অতএব উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া ব্রিটিশ

---

[৭২] গবেষকের সঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মার্চ ২০১৮; গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০
[৭৩] গবেষকের সঙ্গে আকবর লুৎফুল মতিন এর সাক্ষাৎকার, ২৭ এপ্রিল ২০১৯
[৭৪] *The Daily Telegraph*, 28 August 1971
[৭৫] গবেষকের সঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মার্চ ২০১৮

সরকারের কর্তব্য। মি. গডবার মনোযোগ সহকারে সালমান আলীর বক্তব্য শুনে বলেন, এ ধরনের নাম ব্যবহার ব্রিটিশ সমর্থন করে না। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পাকিস্তান সরকারকে প্রদত্ত স্বীকৃতি অব্যাহত রয়েছে। অতএব বাংলাদেশ মিশনকে কূটনৈতিক মর্যাদা দেওয়ার প্রশ্ন অবান্তর। প্রায় এক ঘন্টা আলোচনার পর সালমান আলী তাঁর কূটনৈতিক চাল সফল হয়েছে মনে করে পররাষ্ট্র দপ্তর ত্যাগ করেন। এরকম পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বাংলাদেশ দূতাবাসের বাইরে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করে।[৭৬] ১ সেপ্টেম্বর রাওয়ালপিণ্ডি থেকে প্রেরিত এক সংবাদে বলা হয়, লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করে বিদ্রোহী বাঙালিরা পাকিস্তান বিরোধী কার্যকলাপ পরিচালনা করছে বলে পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ হাইকমিশনারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ব্রিটেন কর্তৃক পূর্ব বাংলার বিদ্রোহীদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি এবং তাদের অফিস স্থাপনের ব্যাপারে বাধা দেওয়া সম্ভব নয় বলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। ব্রিটেন ও হংকং কর্তৃক পাকিস্তানের কূটনীতিক পদে নিয়োজিত বাঙালিদের পদত্যাগে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে বলেও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়।[৭৭]

বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপিত হওয়ার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সিদ্ধান্ত নেন যে, সরকারি অফিসাররা ২৪ নং পেমব্রিজ গার্ডেনস এ অফিস করবেন এবং এখান থেকে তারা কূটনীতিক কার্য পরিচালনা করবেন। দূতাবাসের অফিসারবৃন্দ বিভিন্ন সরকারের নিকট চিঠিপত্র আদান প্রদান করবে এবং ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করবে বলে ঠিক করা হয়। তাছাড়া বিদেশি কূটনীতিক কেউ বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তাঁকেও সাধারণত বাংলাদেশ দূতাবাসে আসতে বলা হতো।[৭৮] ১১ নং গোরিং স্ট্রিটে যে সব সাংগঠনিক ও প্রচার কাজ আগে চলছিল সেগুলো সেখান থেকেই পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ট. পাকিস্তান সরকারের মিথ্যা প্রচারণার প্রতিবাদ

মুক্তিযুদ্ধকালীন ইংল্যান্ডের পাকিস্তান দূতাবাস থেকে কিছু ব্যক্তি প্রচার করতে থাকে যে, প্রবাসী সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে আপস করতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে ইংল্যান্ডের অনেকেই বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে প্রশ্ন করেন। তাদের প্রশ্নের জবাবে বিচারপতি চৌধুরী পাকিস্তানের এ ধরনের প্রচারণা সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই ধরনের প্রচারণা যে সর্বৈব মিথ্যা তা তিনি ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন যে, ‘লন্ডনের রাজপথে আমার শবদেহ পড়ে থাকবে, কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে আপোষ করে দেশে ফিরব না। একবার যখন স্বাধীনতা চাই বলে ঘোষণা করেছি, তখন স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আর কোন পথ নেই।’[৭৯]

পাকিস্তান শুরু থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং মুজিবনগর সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ডেনমার্কে সফরকালে এরকম একটি মিথ্যা প্রচারণার সংবাদ পান। ডেনমার্কে বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একজন সাংবাদিক বিচারপতি চৌধুরীকে ইসরায়েলের নিকট থেকে সাহায্য

[৭৬] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭
[৭৭] ওই, পৃ. ১৪০
[৭৮] গবেষকের সঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মার্চ ২০১৮
[৭৯] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

গ্রহণ করা হচ্ছে বলে প্রশ্ন করেন। এতে বিচারপতি চৌধুরী উত্তর দেন, এটি পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচারণা। এর অন্যতম উদ্দেশ্য বাংলাদেশ সরকারকে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের কাছে অপ্রিয় করা। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সফল হবে না।[৮০]

ঠ. জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে কর্মতৎপরতা

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করলেও তখন পর্যন্ত জাতিসংঘ বা কোনো দেশের স্বীকৃতি লাভ করেনি। এ অবস্থায় জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ না করায় আসন্ন সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ থেকে কোনো প্রতিনিধি দলের সরকারিভাবে যোগদানের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এরকম অবস্থায় মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে প্রেরণের জন্য একটি প্রতিনিধি দল গঠন করেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিরই পরিচয় ছিল। তাঁরা ঠিক করেন যে, এই প্রতিনিধি দল নিউইয়র্কে গিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি দলের নিকট বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের বাণী পৌঁছে দিবে, বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করবে।[৮১] সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত খোন্দকার মোশতাক আহমেদের ধারণা ছিল যে তিনি এ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিবেন। মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এটি ছিল মোশতাক আহমেদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগের সংবাদ ইতিমধ্যে ফাঁস হয়ে পড়ে। যে কারণে খোন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল প্রেরণের বিষয়টি বাতিল করা হয়।[৮২] মুজিবনগর সরকার মোশতাকের পরিবর্তে ব্রিটেনে ও জাতিসংঘে বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা মনোনীত করে। **২১** সেপ্টেম্বর মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে লন্ডনে অবস্থানরত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে জানানো হয় যে, সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার জন্য **১৬** সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিচারপতি চৌধুরী এ প্রতিনিধি দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁকে অনুরোধ করা হয় যে, তিনি যেন অবিলম্বে নিউইয়র্ক যাত্রা করেন।[৮৩]

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রতিনিধি দল পাঠানোর পশ্চাতে মুজিবনগর সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল– প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মাধ্যমে বিশ্বের সকল সরকারের কাছে স্বাধীনতার তাৎপর্য তুলে ধরা। একই সঙ্গে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের অবস্থা তুলে ধরা এবং বাঙালি জাতির নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রহসনের বিচার বন্ধ করে তাঁর মুক্তির জন্য চেষ্টা করা। প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য উপস্থিত হওয়ার পর যৌথ সভায় তারা দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে–

১. ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদকে প্রতিনিধি দলের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে;

২. তরুণ কূটনীতিক এ এইচ মাহমুদ আলীকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত করে।

---

[৮০] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

[৮১] ওই, পৃ. ১৫৭

[৮২] আশফাক হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জন্ম ও জাতিসংঘ*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১২। পৃ. ১১৯

[৮৩] ওই, পৃ. ১১৯

বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলটি প্রতিদিন কী ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতো তা জানা যায় আবু সাঈদ চৌধুরীর স্মৃতিকথায়। প্রতিদিন সকালে কয়েক মিনিটের জন্য বেলমন্ট প্লাজার সভাকক্ষে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের বৈঠক হতো। প্রতিনিধি দলকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হয়। যাতে করে অল্প সময়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। প্রতিনিধি দলের কোন গ্রুপ কোন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন, কী বিষয়ে কথা বলবেন এসব পর্যালোচনা করে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হতো। ভারতের সাহায্য নিয়ে জাতিসংঘের দপ্তরে যাওয়া হতো।[৮৪]

বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতিসংঘ ভবনে প্রবেশ করতেন জাতিসংঘ সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ড. যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সহযোগিতায়। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল প্রতিদিন জাতিসংঘের গেটে গিয়ে তাঁকে ফোন করতেন এবং তিনি টেলিফোনে গেটে কর্মরত অফিসারদের তাদের প্রবেশপত্র দিতে বলে দিতেন। একবার প্রবেশপত্র নিয়ে ভেতরে গেলে সারাদিনই জাতিসংঘের দফতরে ঘুরে বেড়ানো যেত। প্রবেশপত্রে শুধু তারিখ উল্লেখ থাকতো। কোনো সময়ের উল্লেখ বা কোনো জায়গা সীমিত করে দেওয়া হতো না।[৮৫] ড. ব্যানার্জীর সহযোগিতায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতিসংঘ প্রেস উইংয়ে অবস্থিত টেলিগ্রাম অফিস থেকে মুজিবনগর সরকারের উদ্দেশ্যে ঘন ঘন তারবার্তা পাঠাতেন। জাতিসংঘ দফতরে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী যে কাজগুলো করতেন–

ক. তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা জাতিসংঘ দফতরের ডেলিগেশন লাউঞ্জে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতেন।

খ. প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশ থেকে নির্যাতনের শিকার হয়ে গৃহহীন লাখো শরণার্থীর মানবেতর জীবন সংগ্রাম তুলে ধরতেন।

গ. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানাতেন।

ঘ. পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির প্রশ্নে ইয়াহিয়া সরকারকে চাপ প্রয়োগের জন্য অনুরোধ করতেন।

ঙ. পাকিস্তানকে যুদ্ধকালীন সকল ধরনের আর্থিক সহযোগিতা বন্ধ করার অনুরোধ করতেন।

চ. পাকিস্তানকে যেন কোনো ধরনের যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ না করা হয় তার আশ্বাস কামনা করতেন।

এসকল কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল সুশৃঙ্খলভাবে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করছিলেন।

১ অক্টোবর বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ ভবনের বিপরীতে চার্চ সেন্টারে। সাংবাদিক সম্মেলনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন- পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালিদের শোষণ করা হয়। এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দমন করা হয়। আইনের মাধ্যমে তেইশ বছর

[৮৪] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭
[৮৫] *ওই*, পৃ. ১৬৮

এই অবস্থার অবসান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সত্তর সালের নির্বাচনের পর বাঙালিদের প্রত্যাশা ছিল শাসনতন্ত্র। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তা শেখ মুজিবুর রহমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে নিতে পারেনি। তারা গণরায়কে ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় সংসদ অধিবেশন বাতিল করা হয়। শেখ মুজিবকে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত রেখে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্র আনা হয়। কিন্তু আলোচনা কোনো অগ্রগতি না করেই পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে ধর্ষণ, লুট এবং অগ্নিসংযোগের কাজে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্তব্ধ ও বেদনাহত বিশ্ববাসী দেখতে পায় পঁচিশে মার্চের রাতে ও তারপরে অনুষ্ঠিত মানব ইতিহাসের একটি জঘন্যতম গণহত্যা। এর ভেতর দিয়েই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছেন স্বাধীনতা। আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠিত হয়েছে ১৭ এপ্রিল। গণহত্যা ও নির্যাতনের শিকার এক কোটি বাঙালি শরণার্থী প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক সরকারসমূহের কাছে শরণার্থীদের মুক্ত হস্তে সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু উপসর্গের চিকিৎসার কোনো সুরাহা হয়নি। বিশ্ব শান্তির প্রয়োজনে মূল উপসর্গের নিরাময় আবশ্যক। বর্তমান অবস্থায় উপসর্গ হচ্ছে ইয়াহিয়া খানের সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি। শান্তি স্থাপন এবং বিশ্ব শান্তির প্রতি হুমকির অবসান কামনা করে বাংলার মাটি থেকে বাংলার আপামর জনগণ তাদের অপসারণ চায়। বাঙালিদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা বিচারে কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। তাঁর আশু মুক্তি সকল শান্তিকামী মানুষের দাবি। তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষতি হলে বাঙালি জাতি চিরকালের জন্য ক্ষমা ভুলে যাবে।[৮৬]

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এ সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের সমস্যার সমাধানে তিনটি শর্তের কথা উল্লেখ করেন–

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি,

২. অবিলম্বে এবং বিনাশর্তে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি,

৩. ইয়াহিয়া খানের হানাদার বাহিনীকে বাংলার মাটি থেকে অপসারণ।

ড. অন্যান্য কর্মতৎপরতা

লন্ডনের বিখ্যাত পত্রিকা *ডেইলি টেলিগ্রাফ* এর সাংবাদিক সাইমন ড্রিং পঁচিশে মার্চে রাতে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গোপনে লুকিয়ে থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর এ অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ প্রতিবেদন ৩০ মার্চ *ডেইলি টেলিগ্রাফে* প্রকাশিত হয়। এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে বিশ্ববাসী জানতে পারে পূর্ব পাকিস্তানে এক রাতের মধ্যে কী নারকীয় ঘটনা ঘটেছে। সাইমন ড্রিংয়ের এ প্রতিবেদনটি পত্রিকা থেকে কেটে বিচারপতি চৌধুরী তাঁর ব্রিফকেসে রেখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন তিনি কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন তাঁকে এ প্রতিবেদনের একটি ফটোকপি দিতেন। যাতে তারা এটি পড়ে বুঝতে পারে বাংলাদেশে কী ঘটেছে।[৮৭] বিচারপতি চৌধুরী লন্ডনের নেতৃস্থানীয় বাঙালিদের বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রচারণার জন্য ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের পার্লামেন্টের সদস্যদের

---

[৮৬] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮-১৭৯

[৮৭] গবেষকের সঙ্গে আবুল কাশেম চৌধুরী এর সাক্ষাৎকার, ১৬ এপ্রিল ২০১৮; আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

নিকট প্রেরণ করেন। তারা প্রত্যেকে তাদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করে এসে বিচারপতি চৌধুরীর নিকট রিপোর্ট প্রদান করতেন।

মে মাসে একটি পাকিস্তানি ক্রিকেট টিম টেস্ট ম্যাচ খেলতে লন্ডনে আসে। ফলে লন্ডনের বাঙালি সমাজ প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। যেসব স্থানে খেলা হওয়ার কথা ছিল সেসব স্থানের শাখা সমিতিগুলো একটি বয়কট আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। বয়কট আন্দোলনকে ঘিরে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সকল শাখা সমিতির নেতৃবৃন্দকে লন্ডনে আহ্বান করেন। তাদেরকে বলেন- 'ইংরেজরা সাধারণত খেলাধুলায় খুবই উৎসাহী। তারা রাজনীতির সঙ্গে খেলাকে মেশাতে চায়না। আমাদের এমন কিছুই করা উচিত নয় যাতে করে আমরা তাদের সহানুভূতি হারাই। . . . ক্রিকেট টিম বয়কট করার চাইতে ক্রিকেট ফিল্ডের জনসমাবেশের সুযোগ নিয়ে আমরা প্রত্যেক দর্শকের হাতে প্রবেশপথে আমাদের বক্তব্য সম্বলিত একটি প্রচার পত্রিকা তুলে দেব। এভাবে ক্রীড়ামোদী ইংরেজরাও পাকিস্তানীদের নৃশংসতার কথা জানতে পারবেন।'[৮৮] বিচারপতি চৌধুরীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে গেটে দাঁড়িয়ে প্রচার পুস্তিকা বিতরণ করা হয়।

ইংল্যান্ডে একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে, ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তান সরকারকে কয়েকটি মোটর বোট দিচ্ছে। পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ সরকারকে বুঝিয়েছে যে, ছোট ছোট খাল দিয়ে খাদ্যশস্য দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চলে প্রেরণ করা সহজ হবে। এ সংবাদে বাঙালিরা প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এ সংবাদ পাওয়ার পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে এর প্রতিবাদ জানান। তিনি জানান যে, মোটর বোটে করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলোতেও পাকিস্তানিরা অত্যাচার নির্যাতন চালাবে। বিচারপতি চৌধুরীর জোর প্রতিবাদের কারণে শেষ পর্যন্ত মোটর বোট পাঠানো বন্ধ হয়।[৮৯]

মুজিবনগর সরকার থেকে মওলানা ভাসানীর স্বাক্ষরিত কিছু চিঠি বিচারপতি চৌধুরীর কাছে পাঠানো হয়। মওলানা ভাসানী এসব চিঠি লিখেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন, গণচীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ এবং চৌ এন লাইয়ের কাছে। বিচারপতি চৌধুরী এসকল চিঠি সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে পৌঁছে দেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়ার লক্ষ্যে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ১৪ জুন একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এ শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন বিচারপতি চৌধুরী। শোভাযাত্রাটি হোয়াইট হলের সামনে এসে শেষ হয়।[৯০] লন্ডন স্টিয়ারিং কমিটি *বাংলাদেশ টু ডে* শিরোনামে একটি সাপ্তাহিক ইংরেজি বুলেটিন প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিচারপতি চৌধুরী তাদের এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে উৎসাহিত করেন।

জুলাই মাসে কার্ডিফ সমিতির কাছ থেকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী টেলিফোনে জানতে পারেন যে, ১৬/১৭ বাঙালি নাবিক কর্ণফুলী নামক পাকিস্তানি জাহাজে করে ইংল্যান্ডে এসেছে। কিন্তু এখন তারা আর পাকিস্তানে ফিরে যেতে চাচ্ছে না। কেননা তাদের আশঙ্কা, তাদের দেশপ্রেমের খবর প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। এখন তাদেরকে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে মেরে

---

[৮৮] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩
[৮৯] গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০
[৯০] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

ফেলবে। এ সংবাদ শোনার পর বিচারপতি চৌধুরী কার্ডিফের পার্লামেন্ট সদস্য আলফ্রেড এভেন্সকে টেলিফোন করে বাংলাদেশি নাবিকদের পাকিস্তানি জাহাজ থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করতে বলেন। এভেন্স এর সহযোগিতায় ১৪ জন নাবিককে বিচারপতি চৌধুরী লন্ডনে নিয়ে আসেন। তাদের সকলের থাকা-খাওয়া ও চাকরির বন্দোবস্ত করে দেন।[৯১]

৫.২ অন্যান্য কূটনীতিক প্রতিনিধিদের কর্মতৎপরতা

৫.২.ক. অধ্যাপক রেহমান সোবহান

অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে অধ্যাপক রেহমান সোবহান ঢাকায় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অন্যান্যদের মতোও তিনিও প্রথমে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কলকাতায় যান। পরে ৩১ মার্চ ১৯৭১ রাতে রেহমান সোবহান ও আনিসুর রহমান দিল্লি পৌঁছেন। তারা অমর্ত্য সেনের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তাঁকে ফোন করেন। তাদের ফোন পেয়ে অমর্ত্য সেন ও তাঁর স্ত্রী এসে তাদের নিয়ে যান অশোক মিত্রের বাসভবনে। অশোক মিত্র তখন ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ উপদেষ্টা ছিলেন। ড. অশোক মিত্র তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সচিব অর্থনীতিবিদ ড. পি এন ধরকে তাঁর বাসায় আসতে বলেন। তাদের কাছে আনিসুর রহমান ও রেহমান সোবহান বাংলাদেশে গণহত্যার প্রকৃত চিত্র এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। এছাড়াও ঢাকায় কী পরিমাণ হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে এবং বাংলাদেশের জনগণ তা প্রতিরোধ করতে গিয়ে কী অবস্থায় আছে তা-ও বর্ণনা করেন। অর্থনীতিবিদ ড. পি এন ধর তাদেরকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পি এন হাকসারের কাছে নিয়ে যান। সেখানেও তারা বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেন।[৯২]

মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের আহ্বানে রেহমান সোবহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করেন। প্রথমে তিনি মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কাজ করলেও পরবর্তীতে তাঁকে বিশেষ কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে থাকার সময় রেহমান সোবহান বিবিসি সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, ইয়াহিয়া খানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম. এম. আহমেদ ওয়াশিংটন যাচ্ছেন পাকিস্তানের দাতাদেশগুলোর কনসোর্টিয়ামে তাদের সাহায্য অব্যাহত রাখার আবেদন নিয়ে। তাজউদ্দীন আহমদ এই সংবাদ জানার পর স্থির করেন যে, সাহায্যের নামে পাকিস্তানে যুদ্ধপ্রক্রিয়ার কোনো রকম সহায়তাকে রাজনৈতিক শক্তির বিনিময়ে হলেও প্রতিহত করতে হবে। এ ব্যাপারে তাজউদ্দীন আহমদ রেহমান সোবহানকে দায়িত্ব দিয়ে লন্ডন ও ওয়াশিংটনে যেতে বলেন। তাঁর একমাত্র কাজ হবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পাকিস্তানের প্রধান দাতা দেশগুলোর কাছে এ ধরনের সাহায্য প্রদান বন্ধ রাখার জন্যে প্রচার চালানো। দ্বিতীয় কাজ ছিল পাকিস্তানিদের কূটনৈতিক মিশনগুলোতে কর্মরত সকল বাঙালি কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন দানের জন্যে উদ্‌বুদ্ধ করা। অবশ্য রেহমান সোবহানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশন যেখানে অনেক বাঙালি কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন।[৯৩]

---

[৯১] গবেষকের সঙ্গে রাজিউল হাসান এর সাক্ষাৎকার, ১৮ মে ২০২০

[৯২] রেহমান সোবহান, *আমার সমালোচক আমার বন্ধু*, ঢাকা: সিপিডি, ২০০৭। পৃ. ৭২

[৯৩] রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩-৭৪

মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বহির্বিশ্বে অধ্যাপক রেহমান সোবহান যে সকল কর্মতৎপরতা পরিচালনা করেছেন তা কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনা করা হলো–

ইংল্যান্ডে রেহমান সোবহানের কর্মতৎপরতা

রেহমান সোবহান এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে লন্ডনে যান। লন্ডনে পৌঁছে অধ্যাপক রেহমান সোবহান সর্বাগ্রে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন। কেননা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছিলেন এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যিনি কিছুদিন পূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। লন্ডনে তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। রেহমান সোবহান তাঁর ব্রিটিশ বন্ধুদের সহায়তায় সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন। পাকিস্তানকে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান না করার অনুরোধ জানান। লন্ডনে রেহমান সোবহান ব্রায়ান ল্যাপিং নামে সাংবাদিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর মাধ্যমে ব্রিটিশ লেবার পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। লেবার পার্টির সদস্যদের উদ্দেশ্যে হাউস অব কমন্সে তিনি বক্তৃতা করেন। তাদেরকে অনুরোধ করেন তারা যেন তাদের কনজারভেটিভ সরকারকে পাকিস্তানকে নতুন করে আর কোনো সাহায্য প্রদান না করার অনুরোধ জানায়। রেহমান সোবহান এরপর লেবার পার্টির বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি ডেনিস হিলির সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি এবং পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের জন্য অনুরোধ করেন। রেহমান সোবহান টোরি সরকারের সিনিয়র এমপি স্যার ডগলাস ডড্স পার্কারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিশেষ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যালেক ডগল্যাস হিউমের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ডড্স পররাষ্ট্র সচিবকে বাংলাদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু পররাষ্ট্র সচিবের পক্ষ থেকে তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। কেননা রেহমান সোবহান ছিলেন একটি বিদ্রোহী সরকারের প্রতিনিধি। তাঁর সঙ্গে দেখা করে কোনো ধরনের রাজনৈতিক ঝুঁকি তিনি নিতে চাননি। পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে দেখা করতে ব্যর্থ হয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব নিকোলাস ব্যারিংটনের শরণাপন্ন হন। তাঁর মাধ্যমে পররাষ্ট্র সচিবকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন।[৯৪]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ শেষ করে রেহমান সোবহান অটোয়া হয়ে আবার লন্ডনে যান। সেখানে তিনি বৈদেশিক সাহায্যের লেবার ফ্রন্ট বেঞ্চের একজন মুখপাত্র ও লেবার সরকারের বিদেশ উন্নয়নমন্ত্রী জুডিথ হার্টের সঙ্গে দেখা করেন। রেহমান সোবহানের সঙ্গে বৈঠকের পর এ ভদ্রমহিলা হাউস অব কমন্সে বাংলাদেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন, 'পাকিস্তানে ব্রিটেনের সাহায্য স্থগিত করতে হবে এবং ব্রিটেনকে এই সংকল্প ব্যক্ত করতে হবে যে, বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ হবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তারা পাকিস্তানকে কোনো রকম সাহায্য প্রদান করবে না। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্রিটেনকে সংলাপ চালু করতে হবে।'[৯৫]

---

[৯৪] রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪

[৯৫] *ওই*, পৃ. ৭৯

ব্রিটেনে অবস্থানকালে রেহমান সোবহান বামপন্থি সাপ্তাহিক *দি নিউ স্টেটসম্যান* পত্রিকায় বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে প্রকাশের জন্য একটি প্রবন্ধ লিখে দেন। যেখানে তিনি পাকিস্তানে বিদেশি সাহায্য যে ইয়াহিয়ার শাসনকালকেই স্থায়ী করবে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। এটি *স্টেটসম্যান* পত্রিকার প্রথম পাতার সম্পাদকীয় অংশে ছাপা হয়। সম্পাদক জন হোয়াইটের অনুরোধে তিনি *সাউথ এশিয়ান রিভিউ* পত্রিকার জন্য একটি নিবন্ধ লিখেন। যেখানে তিনি প্রথমবারের মতো সমঝোতার পরিপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে সামরিক অভিযানের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও তিনি *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় নিবন্ধ লিখেন। লন্ডনের এসব কাজের পাশাপাশি তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইউনিয়নের একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। এ কর্মসুচি আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দু'জন সহানুভূতিশীল পাকিস্তানি আকবর নোমান ও তারিক আবদুল্লাহ। এখানে অধ্যাপক ডানিয়েল থরনার বাংলাদেশে পাকিস্তানি গণহত্যা নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। কেননা তিনি বাংলাদেশে পিআইডির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সময়ে ঢাকায় অবস্থানকালে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। রেহমান সোবহান এ কর্মসূচির সর্বশেষ বক্তা হিসেবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরে বাংলাদেশের পক্ষে সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হন।[৯৬]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেহমান সোবহানের কর্মতৎপরতা

এপ্রিলের শেষ দিকে রেহমান সোবহান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। সেখানে তাঁর দুই সুহৃদ অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ও অধ্যাপক আনিসুর রহমান ছিলেন। এ দুজন অধ্যাপক আগে থেকেই নিজেদের মতো করে রেহমান সোবহানের কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে রেখেছিলেন। নিউইয়র্ক থেকে হারুন-অর-রশিদের[৯৭] সঙ্গে রেহমান সোবহান ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ওয়াশিংটন বিমানবন্দরে রেহমান সোবহানকে স্বাগত জানান পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিক এ এম এ মুহিত। এ এম এ মুহিত পাকিস্তান দূতাবাসের ইকনমিক মিনিস্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এদিন সন্ধ্যায় তিনি ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিলিত হন। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন এনায়েত করিম, শামসুল কিবরিয়া, আবু রুশদ মতিনউদ্দিন, মোয়াজ্জেম আলী। এছাড়া কয়েকজন নন পিএফএস অফিসারও ছিলেন যেমন রুস্তম আলী, রাজ্জাক খান ও শরিফুল আলম প্রমুখ। সে সময়ে এদের কেউই পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেননি। এরা সকলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি তাঁদের পরিপূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। এদের অনেকে বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলার জন্য গোপনে কংগ্রেস সদস্য এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। রেহমান সোবহান তাদের নিকট তাজউদ্দীন আহমদের কাছ থেকে নিয়ে আসা পাকিস্তান সরকারের চাকরি থেকে পদত্যাগ করার বার্তা পৌঁছে দেন। কিন্তু তারা এর পূর্বেই সকলেই পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তারা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জনগণের ত্যাগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছিলেন। এসব বাঙালি কূটনীতিকরা বেশ কিছু সমস্যার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশের পক্ষে গোপনে প্রচার চালাতে রাজি হলেন। কিন্তু রাজ্জাক খান ও শরিফুল আলম একজন বাঙালি ছাত্র

---

[৯৬] রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

[৯৭] হারুন-অর-রশিদ ছিলেন একজন সিএসপি অফিসার এবং তখন বিশ্বব্যাংকে কর্মরত।

মোহসীন সিদ্দিকীকে নিয়ে প্রকাশ্যেই রেহমান সোবহানকে সহায়তা করতেন। গণমাধ্যম, টেলিভিশন এবং কংগ্রেসের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তারা রেহমান সোবহানকে সহযোগিতা করেন।[৯৮]

বাংলাদেশ সম্পর্কে কথা বলার জন্য রেহমান সোবহান বেশ কয়েকবার ওয়াশিংটনের টিভিতে সাক্ষাৎকার দেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন খ্যাতনামা সাংবাদিক এবং টিভি ভাষ্যকার ওয়ারেন ইউনা। রেহমান সোবহান *ওয়াশিংটন স্টার* পত্রিকার হেনরি ব্রাডশার ও লুইস সাইমন, *বাল্টিমোর পোস্ট* এর অ্যাডাম কাইমার, *নিইউয়র্ক টাইমস* এর বেন ওয়েলস এবং সাপ্তাহিক *নিউ রিপাবলিক* এর সম্পাদক গিলবার্ট হ্যারিসনের সঙ্গে দেখা করেন। রেহমান সোবহান জানতেন এসব উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রের কলাম লেখকরা ও নেতৃস্থানীয় লেখকরা কংগ্রেসের সদস্যদের মতামতকে যথাসম্ভব প্রভাবিত করতে পারতেন। তাঁদের কাছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি রেহমান সোবহান তুলে ধরেন। তাঁদেরকে বোঝাতে সক্ষম হওয়ায় একই সময়ে চারটি সংবাদপত্রে বাংলাদেশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এগুলো এমন সময় প্রকাশিত হয় যখন পাকিস্তানের দূত এম এম আহমেদ ওয়াশিংটনে পৌঁছেন। সম্পাদকীয়গুলোর মাধ্যমে মার্কিন সরকারের কাছে অনুরোধ করা হয়, যেন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশে অব্যাহত গণহত্যার কারণে পাকিস্তানে তাদের সাহায্য প্রদান বন্ধ রাখে।[৯৯]

এপ্রিল মাসে ওয়াশিংটনে অবস্থান করার সময় রেহমান সোবহান সংবাদ পান যে, পাকিস্তানের কিছু পুরোনো বন্ধু সিনেটর সিরিংটনের নেতৃত্বে পাকিস্তানের দূত এম এম আহমদের সম্মানে একটি চা চক্রের আয়োজন করছেন। এ সংবাদে রেহমান সোবহান তাঁর বন্ধুদের দিয়ে তাঁর সম্মানে এরকম একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে বলেন। ওহাইও'র নির্দলীয় সিনেটর স্যাক্সনি রেহমান সোবহানের সম্মানে একটি মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন। যা একটি বিশাল অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। পাকিস্তানি দূত এম এম আহমেদ এর অনুষ্ঠানের চেয়ে বেশি লোক এখানে সমবেত হয়। যাদের মধ্যে ছিলেন অনেক প্রভাবশালী সিনেটর। যেমন সিনেটে ফরেন রিলেশন কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর চার্চ ফুলব্রাইট ও রিপাবলিকান পার্টির সংখ্যালঘুর নেতা সিনেটর স্কট। এ মধ্যাহ্ন ভোজে রেহমান সোবহান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞেরও বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করেন। মার্কিন রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ রেহমান সোবহানের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার পর তাঁরা আশ্বস্ত করেন যে, যুদ্ধকালীন অবস্থায় পাকিস্তান যেন কোনো ধরনের আর্থিক সহায়তা না পায় সেজন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে তাঁরা অবহিত করবেন।

রাজ্জাক খান ও তাঁর সহযোগীদের সহায়তায় রেহমান সোবহান ওয়াশিংটনে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। এখানে রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রের অনেক প্রতিনিধি অংশ নেন। ভয়েস অব আমেরিকা রেহমান সোবহানের সংবাদ সম্মেলনের অংশ বিশেষ প্রচার করে যা সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়। তবে পাকিস্তান সরকার এসময় *ডন* পত্রিকার সংবাদদাতা নাসিম আহমেদকে পাঠিয়েছিল রেহমান সোবহানের বক্তব্যের পাল্টা জবাব দেওয়ার জন্য। এ সংবাদ সম্মেলন অত্যন্ত

---

[৯৮] রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫

[৯৯] *ওই*, পৃ. ৭৫

সফল ও সর্বাধিক প্রচার হওয়ায় পাকিস্তানি দূত এম এম আহমেদ যে সংবাদ সম্মেলন করতে চেয়েছিলেন তা শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়।[১০০]

রেহমান সোবহান নিক্সন প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হয়ে তিনি হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে যোগাযোগের পরিকল্পনা করেন। এসময় কিসিঞ্জার হার্ভার্ডে তাঁর আন্তর্জাতিক সেমিনারে বেশ কিছু বাঙালিকে শিক্ষাদানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিসিঞ্জারের সঙ্গে দেখা করতে না পেরে রেহমান সোবহান কেমব্রিজে যান। সেখানে কিসিঞ্জারের বেশ কিছু সহকর্মী যেমন অর্থনীতিবিদ ডরফম্যান, হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক ও কিসিঞ্জারের বন্ধু স্যামুয়েল হান্টিংটন, অধ্যাপক লজের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেন।[১০১]

বিশ্বব্যাংকে রেহমান সোবহান প্রথম যোগাযোগ করেন বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট আই পি কারগিল এর সঙ্গে। তিনি পাকিস্তান কনসোর্টিয়ামে সভাপতিত্ব করেন। উল্লেখ্য যে, মি. কারগিল ছিলেন পাকিস্তানের দূত এম এম আহমেদের বন্ধু এবং তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল আইসিএস পরীক্ষার সময় থেকে। কারগিল রেহমান সোবহানের বক্তব্য শোনেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে, বাংলাদেশে সামরিক অভিযান বন্ধ না হলে পাকিস্তানের জন্য নতুন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নাও আসতে পারে।[১০২]

রেহমান সোবহান এরপর বিশ্বব্যাংকে কর্মরত তাঁর বন্ধুদের সহায়তায় বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারার সঙ্গে দেখা করার সময়সূচি ঠিক করেন। কিন্তু তাঁর বন্ধুরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন ম্যাকনামারার'কে সংক্ষেপে বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে। ম্যাকনামারার এর সঙ্গে বৈঠকের পূর্বে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী কাগজপত্র ঠিক করেন এবং তা যথারীতি ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। এ প্রবন্ধটির নাম ছিল Aid to Pakistan: Background and Option। ম্যাকনামারার রেহমান সোবহানের বক্তব্য শোনেন এবং পাকিস্তানের সাহায্য বন্ধ রাখার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন। রেহমান সোবহানের সঙ্গে কথা বলার পর পাকিস্তানের প্রকৃত চিত্র জানার জন্য ম্যাকনামারার উদ্যোগে বিশ্বব্যাংক থেকে একটি প্রতিনিধি দল পাকিস্তানে পাঠানো হয়। এ প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংসতার ওপর একটি ভয়াবহ রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, 'এই অঞ্চলে সকল উন্নয়ন প্রক্রিয়া একেবারে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি কূটনীতিক হারুন-অর-রশিদ এ প্রতিনিধি দলের রিপোর্টটি ফাঁস করে *নিউইয়র্ক টাইমসে* প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর ফলশ্রুতিতে **১৯৭১** সালের জুন মাসে প্যারিস বৈঠকে কনসোর্টিয়ামের সদস্যরা পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে নতুন করে প্রতিজ্ঞাপত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১০৩]

রেহমান সোবহান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন বাঙালি ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেন। এদের মধ্যে ছিলেন বাঙালি স্থপতি ফজলুর রহমান খান। ফজলুর রহমান খানের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাঙালিদের

---

[১০০] রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬
[১০১] ওই, পৃ. ৭৬-৭৭
[১০২] ওই, পৃ. ৭৭
[১০৩] ওই, পৃ. ৭৭-৭৮

বাংলাদেশ বিষয়ে উদ্‌বুদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য তহবিল সংগ্রহের কাজেও ব্যস্ত ছিলেন। রেহমান সোবহান ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাস ও নিউইয়র্কের জাতিসংঘ মিশনের বাঙালিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের কাজে এই গ্রুপটিকে কাজে লাগান। এর পশ্চাতে কারণ ছিল, দুই দূতাবাসের বাঙালিরা অনেক আগেই পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল যা রেহমান সোবহান নিরসনের চেষ্টা করেন। ওয়াশিংটনে রেহমান সোবহানের অন্যতম একটি কাজ ছিল মিশনের সকল সদস্যের সঙ্গে তাদের সাহায্য করার জন্য একটি হিসাব তৈরি করা এবং তাদের বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত অর্থের সংস্থান করে দেওয়া। ওয়াশিংটনের কাজ সমাপ্ত করে রেহমান সোবহান নিউইয়র্ক যান। সেখানে তিনি বাঙালি কমিউনিটিদের সঙ্গে কথা বলে এ প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ মিশনকে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিবে।[১০৪]

রেহমান সোবহান *নিউইয়র্ক টাইমস* এর জিম ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। তাঁর কথায় প্রভাবিত হয়ে জিম ব্রাউন পরবর্তীতে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হামলা নিয়ে একটি সমালোচনামূলক লেখা লিখেছিলেন। এছাড়া রেহমান সোবহান মার্কিন টিভিতে কয়েকটি অনুষ্ঠান করেন। ফিলাডেলফিয়ার সুলতান আলমের আমন্ত্রণে ক্রিপেনড্রফে একটি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। সেখানে বাঙালি ও আমেরিকান জনগণের সামনে তিনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেন।

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটনের শেরাটন হোটেলে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ এর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ জানার পর রেহমান সোবহান ওয়াশিংটন আসেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্যে ছিল এ বৈঠক থেকে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায় করা। কিন্তু তাঁর কতিপয় বন্ধু তাঁকে পরামর্শ দেয় পাকিস্তান এই বৈঠকটিতে তাদের দেশে সাহায্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি আদায়ের কাজে লাগাতে পারে এবং তাদের সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনা করার জন্য কনসোর্টিয়ামের কাছে আবেদন জানাতে পারে। রেহমান সোবহান এ সংবাদ পাওয়ার পর এ এম এ মুহিতকে নিয়ে পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে বর্ণনা করে নতুন প্রতিবেদন তৈরি করেন। এতে তাঁদের বক্তব্য ছিল- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যেহেতু একটি জটিল অবস্থার মধ্যে আছে, কাজেই পাকিস্তানে এ সময়ে যে কোনো সাহায্য এই পরিস্থিতিকে আরো ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। তারা দু'জনে কনসোর্টিয়ামভুক্ত দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের প্রতিবেদনের কপি দেন। এই কাজে তাদের সাহায্য করেন অধ্যাপক নুরুল ইসলাম। শেরাটন হোটেলের বাইরে মহড়ায় অংশ নিতে গিয়ে এ এম এ মুহিত ধরা পড়ে যান। এ সময় রেহমান সোবহান কাগজপত্র সহ মুহিতকে উদ্ধার করেন।[১০৫]

ওয়াশিংটনে রেহমান সোবহানের সঙ্গে দেখা হয় কেমব্রিজে পড়াকালীন সময়ের বন্ধু শ্রীলঙ্কা সরকারের ইকনমিক অ্যাফেয়ার্সের সচিব লাল হর্ষবর্ধনের সঙ্গে। তাঁর সহযোগিতায় রেহমান সোবহান ও অধ্যাপক নুরুল ইসলাম শ্রীলঙ্কার

---

[১০৪] রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮
[১০৫] ওই, পৃ. ৮৬

অর্থমন্ত্রী এন এম পেরেরার সঙ্গে দেখা করেন। রেহমান সোবহান ও অধ্যাপক নুরুল ইসলাম তাঁকে জানায় যে, পিআইএ এবং পাকিস্তান এয়ারফোর্স শ্রীলঙ্কায় অবতরণ করার যে অধিকার পায় সেটিকে বাংলাদেশে সৈন্য এবং যুদ্ধাস্ত্র বহন করার কাজে অপব্যবহার করছে। কিন্তু শ্রীলঙ্কার অর্থমন্ত্রী এ ঘটনা অস্বীকার করেন। তবে তিনি আশ্বাস দেন যে, বিষয়টি দেখবেন এবং ল্যান্ডিং রাইটকে যাতে পাকিস্তান অন্যায় কাজে ব্যবহার করতে না পারে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।[১০৬]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন রেহমান সোবহান ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সিরাকুজ বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক আনিসুর রহমান কর্তৃক আয়োজিত উইলিয়ামস কলেজ এবং অধ্যাপক নুরুল ইসলাম কর্তৃক আয়োজিত ইয়েলের সমাবেশে বক্তৃতা করেন। এছাড়া বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ড. মহিউদ্দিন আলমগীর ও রেহমান সোবহান এমআইটি'তেও একটি সমাবেশে বক্তৃতা করেন। এর বাইরে রেহমান সোবহান বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা পাঠাতেন ও টিভিতে অনুষ্ঠান করতেন।[১০৭]

কানাডায় রেহমান সোবহানের কর্মতৎপরতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি এ্যাকশন গ্রুপের অনুরোধে রেহমান সোবহান কানাডার অটোয়ায় যান। অটোয়ায় পৌঁছে তিনি একটি সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। সম্মেলনের পর তিনি অটোয়ার কয়েকজন সংসদ সদস্যদের সঙ্গে দুপুরের খাবার খেতে খেতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। অটোয়ার একজন কেবিনেট সদস্যের সঙ্গে গোপন সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁকে মন্ত্রিদের প্রাইভেট ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয়। যাতে বাইরের লোকদের কাছে তিনি প্রশ্নের সম্মুখীন না হন।[১০৮]

ইউরোপের অন্যান্য দেশে রেহমান সোবহানের কর্মতৎপরতা

৭ জুন প্যারিসে পাকিস্তান এইড কনসোর্টিয়ামের একটি বৈঠক ছিল। বৈঠক শুরুর পূর্বে রেহমান সোবহান প্যারিসে পৌঁছে ডানিয়েল, এলিস ফরনার, পিআইডির ড. হাসান ইমাম এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারা সবাই মিলে কিছুদিন পূর্বে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারারকে দেওয়ার জন্য যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিলেন তার ওপর ভিত্তি করে কনসোর্টিয়ামের জন্য একটি মেমোরেন্ডাম তৈরি করেন। বৈঠকের আগের দিন রাতে সকল প্রতিনিধিদের কাছে এ মেমোরেন্ডামের কপি বিলি করেন। যদিও কনসোটিয়ামে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে তারা দেখা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অগ্যতা রেহমান সোবহান বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদের উপপ্রধান ভোটারের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি রেহমান সোবহানকে আশ্বস্ত করেন যে, কনসোর্টিয়ামে হয়তো নতুন কোনো সাহায্যের আশ্বাস না-ও দিতে পারে। বৈঠকের পরদিন তিনি কারগিলের সঙ্গে দেখা করলে সংবাদ দেওয়া হয় যে, কনসোর্টিয়াম বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার আগে সাহায্যের নতুন কোনো আশ্বাস দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কনসোর্টিয়ামের বৈঠক পাকিস্তানের জন্য ছিল একটি বড় ধাক্কা এবং আন্তর্জাতিক জনমতকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য ছিল একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

কনসোর্টিয়ামের বৈঠকের পর রেহমান সোবহান ফরাসি নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী যেমন রেমোঁ আরো, সামাজিক নৃ বিজ্ঞানী লুই দুমো, আরবি ভাষাবিদ ম্যাক্সিম রবিনসন ও কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সরবোনে অনুষ্ঠিত একটি

---

[১০৬] রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬
[১০৭] ওই, পৃ. ৮৭
[১০৮] ওই, পৃ. ৭৯

সেমিনারে বক্তৃতা করেন। এ সেমিনারের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সে একটি প্রভাবশালী জনমত তৈরির মাধ্যমে পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া। কনসোর্টিয়ামের বৈঠকে পাকিস্তান ব্যর্থ হয়ে ফরাসি সরকারের কাছে ঋণের বিনিময়ে পাকিস্তান অস্ত্র সরবরাহের একটি শিডিউল দাবি করলে ফ্রান্স অস্ত্র সরবরাহের চুক্তি বাতিল করে দেয়।[১০৯]

রেহমান সোবহান প্যারিস থেকে ইতালির রোমে যান। সেখানে তিনি ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামকে কিছু প্রস্তাব সমৃদ্ধ একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। এ প্রস্তাবে তিনি উল্লেখ করেন- 'পাকিস্তানে খাদ্য সাহায্যের ভান করে সাহায্য যেন বাংলাদেশ সরকারের নামে পাঠানো হয়, যাতে পরে এই সাহায্য পূর্বাঞ্চলের জনগণের মধ্যে বিতরণ করা যায়।' এছাড়া তিনি ইতালির প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট, কমিউনিস্ট ও সোশালিস্টদের বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের কাছে অনুরোধ করেন যেন তাঁরা পাকিস্তানে ইতালিয় সাহায্য বন্ধ করতে উদ্যোগ নেন। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি ইতালিয়দের মানসিক ও আচরণগত সমর্থন আদায় করেন। রোমে থাকাকালীন জুলাই মাসে তিনি মুজিবনগর সরকারের কাছে বাংলাদেশ পরিকল্পনা পরিষদ গঠন করার প্রস্তাব দেন। মুজিবনগর সরকার এটি গ্রহণ করে। এ পরিষদের সদস্যরা ছিলেন অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক সারওয়ার মুরশিদ, ড. আনিসুজ্জামান ও ড. স্বদেশ বসু। এই পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এ পরিষদ মন্ত্রণালয়ের জন্য নীতি নির্ধারণী খসড়া প্রস্তত করেছিল।[১১০]

মুজিবনগর সরকার নভেম্বর মাসে রেহমান সোবহানকে আবার প্যারিসে পাঠায়। উদ্দেশ্য ছিল চূড়ান্ত কনসোর্টিয়ামের বৈঠকে পুরোনো পাকিস্তানের পক্ষে যে সাফাই গাওয়া হবে সে সম্পর্কে বাংলাদেশের বক্তব্য পেশ করা। এ ব্যাপার তাঁকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন ফরাসি নোবেল বিজয়ী আঁদ্রে মালরো। যিনি ইতিপূর্বে জনসমক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমর্থনকারী এ ব্যক্তি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সাহায্যের আশ্বাস দেন। তিনি আরো আশ্বাস দেন যে, গলিস্ট মন্ত্রিসভায় তাঁর প্রাক্তন সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং ফ্রান্স যাতে পাকিস্তানে আর কোনো অস্ত্র সাহায্য না পাঠায় তার জন্য তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন।[১১১]

চীনে রেহমান সোবহানের কর্মতৎপরতা

অক্টোবরের শেষ দিকে মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে রেহমান সোবহান চীনে যান। সেখানে তিনি বেইজিং এ পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি রাষ্ট্রদূত কে এম কায়সারের সঙ্গে একটি গোপন সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। কায়সার জেনেভায় এসেছিলেন পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতদের একটি সম্মেলনে যোগ দিতে। যা আয়োজন করেছিলেন পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। কায়সার গোপনে প্যারিসে এসে রেহমান সোবহানের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি রেহমান সোবহানকে জানান যে– চীন পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য কোনো রকম সামরিক হস্তক্ষেপ করবে না। তারা তাদের অস্ত্র সাহায্য এবং কূটনৈতিক সহায়তা দিলেও গোপনে পরামর্শ দিয়েছিল পাকিস্তানকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌছানোর জন্য। যদিও

---

[১০৯] রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০-৮১
[১১০] ওই, পৃ. ৮২
[১১১] ওই, পৃ. ৯৩

তারা প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে সমর্থন জানানোর নানা কৌশল দেখিয়েছিল। এসব তথ্য বাংলাদেশ সরকারকে জানানোর জন্য রেহমান সোবহানকে অনুরোধ করা হয়েছিল। রেহমান সোবহান কায়সারের কথা মতো সকল তথ্য বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়েছিলেন।[১১২] পরবর্তীতে রেহমান সোবহান জানতে পারেন যে, বেইজিংয়ের পাকিস্তান দূতাবাসের বেশ কিছু বাঙালি ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের কাছে এসব তথ্য পাচার করেছিল।

৫.২.খ. অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক

অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক (এ আর মল্লিক নামে সমধিক পরিচিত) তৎকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। পঁচিশে মার্চের রাতের ঘটনা জানার পর তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম শহরে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। কিন্তু তিনি এ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তিনিও নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ছুটে যান। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর তিনি সরকারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেন। অধ্যাপক মল্লিক কলকাতায় অবস্থানকালে প্রত্যক্ষ করেন যে অসংখ্য বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক কলকাতায় এসেছেন। তিনি উপলদ্ধি করলেন যে, তাদের দিয়ে কাজ করাতে হলে একটি সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ তাগিদ থেকেই তিনি 'লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেন্টশিয়া' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনের সম্পাদক ছিলেন জহির রায়হান। তিনি নিজে এ সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। কমিটিতে আরো ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান, খান সারওয়ার মুরশিদ, ফয়েজ আহমদ, ব্রজেন দাস, কামরুল হাসান প্রমুখ।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেন্টসিয়ার সভাপতি হিসেবে বিদেশে এ আর মল্লিক তাঁর পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের চিঠি লিখেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সাউথ এশিয়ান হিস্ট্রির প্রফেসর এ এল বাশামকে চিঠি লিখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিস্তারিত চিত্র উল্লেখ করেন। এ এল বাশাম তাঁর চিঠিটি কপি করে তাঁর প্রধানমন্ত্রী ও বিভিন্ন সংস্থাকে দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে ভারতের বিভিন্ন শহরে সভা সমাবেশ হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সহযোগিতায় এসব সভা সমাবেশ হতো। ছোটবড় প্রায় ৩০টি শহরে আয়োজিত জনসভায় এ আর মল্লিক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তোলাই ছিল এসব জনসভার মূল লক্ষ্য।

অধ্যাপক এ আর মল্লিক মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সে সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় তাঁর সঙ্গে ড. আনিসুজ্জামান, সৈয়দ আলী আহসানও ছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ধৈর্য সহকারে তাঁদের কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি। ইন্দিরা গান্ধী জানতে চেয়েছিলেন জাতি হিসেবে বাঙালিরা কতটা ঐক্যবদ্ধ এবং সংগ্রামী চেতনা বাঙালিদের কোন স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ আন্দোলন কী কেবল শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ, নাকি তার বাইরেও বিস্তার লাভ করেছে। এ

[১১২] রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

ব্যাপারে এ আর মল্লিকের উত্তর ছিল, 'আমি চার-পাঁচ শ সামরিক সদস্য নিয়ে ক্যাম্পাসে ছিলাম, তাদের খাবার-দাবার গ্রাম থেকে প্যাকেট হিসাবে আসতো। গ্রামের কৃষকের মহিলা সদস্যরা রুটি বানিয়ে প্যাকেট করে আমাদের পাঠাতো। . . . সংগ্রামী চেতনা যে সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে এ বিষয়ে মিসেস গান্ধীর মনে আর কোনো সন্দেহ রইলো না বলে মনে হলো। মিসেস গান্ধীকে আমি একথাও বলি যে, আমি রাজনীতিবিদ নই। আমি একজন শিক্ষক। জীবনে কোনদিন রাজনীতি করিনি। আমি বেরিয়ে আসলাম কেন? আমাকে তো মারতে আসেনি কেউ, আমাকে ধরতেও আসেনি কেউ। আমি অনুভব করেছি সমগ্র দেশের মানুষ মুক্তি চায়। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের আর তাদের প্রয়োজন নেই।'[১১৩]

১৯৭১ সালের ১৮ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে বাংলাদেশের ওপর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নির্দেশে অধ্যাপক এ আর মল্লিক বাংলাদেশ পক্ষের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এই সম্মেলনটি 'ওয়ার্ল্ড মিট অন বাংলাদেশ' নামে পরিচিত। এটি আয়োজন করতে জয়প্রকাশ নারায়ণকে সহযোগিতা করেছিল 'গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন'। বিশ্বের ১৪টি দেশ থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ এ সম্মেলনে যোগ দেন। সেখানে অধ্যাপক মল্লিক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এমনকি তিনি বাংলাদেশকে সহায়তার আহ্বান জানান।[১১৪]

অধ্যাপক এ আর মল্লিক মুজিবনগর সরকার কর্তৃক মনোনীত জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যান। জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে তাঁদের মূল কাজ কী ছিল তা জানা যায় তাঁর ভাষ্যে– 'জাতিসংঘে গিয়ে আমরা বাংলাদেশের উপর প্রচার কার্য চালাবো, বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করবো, তাদের সমর্থন নেওয়ার চেষ্টা করবো এবং সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করবো জনসমাবেশের মাধ্যমে।'[১১৫] জাতিসংঘ ভবনে এ আর মল্লিকের ওপর দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশ দলের একজন প্রতিনিধি হিসেবে পর্তুগালের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলা। অধ্যাপক মল্লিক তাঁর সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তাঁকে জানান এবং বর্তমান অবস্থা কী, বাংলাদেশের সরকার কী আশা করে তা-ও তাঁকে জানান। পর্তুগালের ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যাপক মল্লিকের কিছু ধারণা ছিল, সে সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেন। মধ্যযুগে বাণিজ্যিকভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে পর্তুগালের কেমন সম্পর্ক ছিলো তা নিয়ে উভয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে পর্তুগালের রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক মল্লিককে আশ্বস্ত করেন যে, তিনি তাঁর সরকারকে জানাবেন এবং তাদের সমর্থনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করবেন।[১১৬]

জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে সফরকালে অধ্যাপক এ আর মল্লিক ৩৬ দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, কলম্বিয়া, পেনিসেলভেনিয়া, স্ট্যানফোর্ড, বার্কলি, শিকাগো, বাফেলো, নর্থ ক্যারোলিনা, হার্ভার্ড, বোস্টন, ইয়েল, টেক্সাসসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেছেন। প্রায় প্রতিটি জায়গার বক্তৃতার ধরন ছিল একই রকম। প্রথমে ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের

---

[১১৩] এ আর মল্লিক, *আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫। পৃ. ৭৬-৮০

[১১৪] ওই, পৃ. ৯৯-১০০

[১১৫] ওই, পৃ. ১০৪

[১১৬] ওই, পৃ. ১০৪

উদ্দেশ্যে, তারপর বিকালে ছাত্র জনসাধারণের উদ্দেশ্যে, আর রাতে টেলিভিশন প্রোগ্রাম কিংবা সাংবাদিক সম্মেলন।[১১৭] এসব বক্তৃতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অধ্যাপক এ আর মল্লিক মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নির্দেশে একটি বক্তৃতা দেন। এ বক্তৃতাটি কলকাতা রেডিও থেকে প্রচারিত হয়েছিল। এর সারাংশ ছিল দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে– যারা আমাদের সাথে বেঈমানী করেছে তাদের বিচার হবে। বিচারের আগে আমরা তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের হাতে আইন তুলে নিব না। কাউকে যেন মারধর না করি।[১১৮]

৫.২.গ. আবদুস সামাদ আজাদ

মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার এমনকি বিশ্বের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে পুরো সময় জুড়ে বিভিন্ন প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মুজিবনগর সরকার জানতে পারে যে, মে মাসে বিশ্বশান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভা বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আবদুস সামাদ আজাদকে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। একই সাথে তাঁকে নির্দেশনা দেওয়া হয় বিশ্বশান্তি সম্মেলন শেষ করে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সফর করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্য। আবদুস সামাদ আজাদকে মুজিবনগর সরকার ‘ক্যাবিনেট র‌্যাঙ্ক’ দিয়ে ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির জন্য দায়িত্ব প্রদান করে। বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[১১৯]

১৬-২৪ মে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন আবদুস সামাদ আজাদ, ডা. সারোয়ার আলী ও দেওয়ান মাহবুব আলী।[১২০] অবশ্য লন্ডনের প্রবাসী বাঙালিরা বিশ্বশান্তি সম্মেলনে ওয়ালী আশরাফকে জনমত গঠনের জন্য পাঠায়।[১২১] এই প্রতিনিধি দল যদিও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়নি, তথাপি অত্যন্ত সফলভাবে তারা বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা চালায়। বাংলাদেশের বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে অনেক দেশেরই অজানা ছিল। এ সম্মেলনে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমর্থন ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। বুদাপেস্টে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে কী ঘটনা ঘটেছিল তার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় আবদুস সামাদ আজাদের সাক্ষাৎকারে। প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশের অনেকগুলো পতাকা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সম্মেলন স্থলে বাংলাদেশের পতাকা রাখার জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি যোগ না দেওয়ায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলটি পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত আসনের

---

[১১৭] এ আর মল্লিক, *প্রাগুক্ত*,, পৃ. ১০৭-১০৮

[১১৮] ওই, পৃ. ১১৬

[১১৯] শামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, ঢাকা: বিজয় প্রকাশনী, ১৯৮৫। পৃ. ৩১১

[১২০] আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭। পৃ. ৭৬

[১২১] শামসুল হুদা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২

সম্মুখ ভাগে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পতাকা রাখেন। আবদুস সামাদ আজাদ ওই শূন্য আসনে বসেন। সভার শুরুতেই ভারতের কৃষ্ণ মেনন উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আঘাত হেনেছে। তাই ভিয়েতনামের মতো বাংলাদেশের প্রতিও বিশ্ববাসীর সহানুভূতিশীল দৃষ্টি কাম্য। সম্মেলনে বর্ণবাদ ও উপনিবেশবাদ নামে একটি কমিশন হয়। এরপরই শুরু হয় প্লিনারী সেশন। এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয় আবদুস সামাদ আজাদকে। সেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে আবদুস সামাদ আজাদ বাংলাদেশের সকল সমস্যা সেখানে উপস্থাপন করার সুযোগ পান। এই সম্মেলনে বাংলাদেশ নিজেদের অনুকূলে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যে সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে দেখা যায় বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আলোচনা হয়নি। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি দেন, তারা নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে তাদের সরকারকেই শুধু অবহিত করবেন না, জনমত সৃষ্টিরও চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার জন্য এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দানের জন্য ওই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রথম বিজয়।[১২২] বুদাপেস্টে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে আবদুস সামাদ আজাদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক ও পাঞ্জাবি আমলাতান্ত্রিক চক্র এবং পশ্চিম পাকিস্তানি বাইশটি ধনী পরিবার গোষ্ঠীর দ্বারা শোষিত বাংলার করুণ চিত্র তুলে ধরেন। ইয়াহিয়ার প্রতারণায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বদলে বর্বর পাকিস্তানি সেনাদের নির্মম গণহত্যা, নারী ধর্ষণ ও ধ্বংসলীলা যজ্ঞের প্রতিরোধে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি বর্ণনা করেন।[১২৩] আবদুস সামাদ আজাদের বক্তৃতা শোনার পর বিশ্বশান্তি সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বাংলাদেশকে চলতি বছরের শান্তি পুরস্কার 'ল্যামব্রা কস' পদক (যা গ্রীসের ধর্মপ্রাণ ল্যামব্রা কস এর নামে প্রদত্ত) দান করে সংগামী বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেন এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতা আবদুস সামাদ আজাদকে বিশ্বশান্তি সম্মেলনের শাখা 'জাতি বিদ্বেষ উপনিবেশ সমস্যা' অধিবেশনের সভাপতি করেন। এতে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দল আপত্তি জানালেও তা অগ্রাহ্য করা হয়।[১২৪] বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের শাখা সমিতি ৪৫টি। এর অন্যতম শাখা সমিতি ছাত্রসভায় ভাষণ দেন বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য ডা. সারোয়ার আলী।[১২৫] বুদাপেস্টের বিশ্বশান্তি সম্মেলনে আবদুস সামাদ আজাদ বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যে দৃঢ়তার পরিচয় দেন এবং বাংলাদেশের পতাকা স্থাপনের ব্যাপারে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম তাঁর স্মৃতিকথায় ভিন্ন ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শান্তি সম্মেলনের সময় খাবার টেবিলে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের পতাকা থাকতো। আবদুস সামাদ আজাদ সেখানে বাংলাদেশের পতাকা রাখার দাবি জানালে স্বাগতিক দেশ অসম্মতি প্রকাশ করে। এমনকি বাংলাদেশের প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে একটি পতাকা রাখতে চাইলে মস্কোর তা পছন্দ হয়নি। এরপর আবদুস সামাদ আজাদ নিজের ঘরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন।[১২৬] আমীর-উল ইসলামের স্মৃতিকথা থেকে এটি স্পষ্ট

---

[১২২] শামসুল হুদা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২-৩১৩
[১২৩] বিশ্ব বিশ্বাস, *স্বাধীন বাংলাদেশ ও ভারত*, কলিকাতা: বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, বাংলা ১৩৭৮। পৃ. ৪৩
[১২৪] *ওই*, পৃ. ৪৩-৪৪
[১২৫] *ওই*, পৃ. ৪৪
[১২৬] আমীর-উল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি*, ঢাকা: কাগজ প্রকাশনা, ১৯৯১। পৃ. ৮০

যে, পতাকা মূলত কোথায় স্থাপন করা হয়েছিল সে সম্পর্কে সঠিক বক্তব্য কোনটি তা প্রশ্নসাপেক্ষ। আবদুস সামাদ আজাদ নিজে সম্মেলন স্থানে ছিলেন এবং নিজেই তাঁর সাক্ষাৎকারে এ সম্পর্কে বক্তব্য দিয়েছেন। অন্যদিকে আমীর-উল ইসলাম হয়তো আবদুস সামাদ আজাদের কাছে ঘটনাটি শুনেছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ২০ বছর পর তাঁর স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে ঘটনার বর্ণনায় নিজের মতো করে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

আবদুস সামাদ আজাদ বুদাপেস্ট থেকে পূর্ব জার্মানি যান। সেখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের কাছে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের লেখা চিঠি পোস্ট করেন।[১২৭] মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতির লেখা বাংলাদেশকে স্বীকৃতির এই চিঠিগুলো কিছু ডাক যোগে আবার কিছু লোক মারফত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়। বাকি চিঠিগুলো বাংলাদেশ সরকারের ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি আবদুস সামাদ আজাদকে দেওয়া হয়। অবশ্য বাংলাদেশের এই স্বীকৃতির আবেদনসহ চিঠির সংবাদ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১২৮] এসব চিঠি কীভাবে পাঠিয়েছিলেন তা আবদুস সামাদ আজাদ তাঁর সাক্ষাৎকারে ব্যক্ত করেছেন। 'আমার মনে পড়ে দুই বস্তা বোঝাই করে আমি চিঠি নিয়েছিলাম।. . . পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত আমাদের নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য চিঠি আমি পর্যায়ক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিন থেকে ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশগুলোর চিঠি পশ্চিম বার্লিন থেকে এবং পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলির চিঠি আমি পূর্ব বার্লিন থেকে পাঠানোর সুযোগ পেয়েছিলাম।'[১২৯]

পূর্ব জার্মান সরকার বাংলাদেশের প্রতিনিধিকে সরকারি মর্যাদা দেন। উল্লেখ্য যে, জিডিআর এর যে বাড়িতে আবদুস সামাদ আজাদকে রাখা হয়েছিল, সেই বাড়ির কক্ষটিকে তারা বাংলাদেশে প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ এখনও খালি রেখে দিয়েছে। সেই কক্ষটি তারা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করছে না।[১৩০] এখান থেকে আবদুস সামাদ আজাদ চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড ও বুলগেরিয়া গমন করেন। এসব দেশে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে প্রচারণা চালান। তারপর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন গমন করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় কিছু ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেন। উল্লেখ্য যে, মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বের অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর প্রতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুরোধ জানায়।[১৩১] পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মার্কিন সামরিক জোট ঘেষা বৈদেশিক নীতির জন্য এবং ষাট দশকের পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগ জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মহলে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে যে ধারণা বিদ্যমান ছিল তা দূর করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগ অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল।[১৩২]

---

[১২৭] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮। পৃ. ১৮৫

[১২৮] আমীর-উল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

[১২৯] আবদুস সামাদ আজাদের সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: শামসুল হুদা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৩

[১৩০] শামসুল হুদা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৩

[১৩১] মঈদুল হাসান, *মূলধারা* '৭১, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৮৬। পৃ. ৩৪

[১৩২] ওই, পৃ. ৩৪

সোভিয়েত ইউনিয়ন অবস্থানকালে আবদুস সামাদ আজাদ যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করার আশ্বাস দেন।[১৩৩]

মস্কো থেকে আবদুস সামাদ আজাদ সুইডেনে গিয়েছিলেন। সুইডেনের পার্লামেন্টের ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটি এবং এর বিরোধী দল খুবই শক্তিশালী ছিল। পাকিস্তানের এইড কনসোর্টিয়াম ছিল সুইডেনে। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর তারা পাকিস্তানকে এইড কনসোর্টিয়ামের টাকা দেয়নি।[১৩৪]

ইউরোপ থেকে ফিরে আবদুস সামাদ আজাদ লেবানন ও আফগানিস্তান যান। আফগান রাজা জহির শাহ, আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সীমান্ত গান্ধী খ্যাত নেতা গাফফার খান, পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের নেতা সরফরাজ প্রমুখের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। বেলুচিস্তানের আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গেও তিনি দেখা করেন। সেখানে তাঁর মূল কাজ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট তৈরি করা। যাতে অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাংলাদেশে আসতে না পারে। তাদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য পরবর্তীকালে আবদুস সামাদ আজাদ লন্ডনে গিয়ে আজাদ কাশ্মীরের নেতা জানজুয়ার সঙ্গে দেখা করেন।[১৩৫]

ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম ইত্যাদি শহরে প্রচুর সিলেটের বাঙালিরা বসবাস করতেন। আবদুস সামাদ আজাদ লন্ডন সফরকালে তাদেরকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে বক্তৃতা করেন। হাইড পার্কে অনুষ্ঠিত জনসভায় আবদুস সামাদ আজাদ বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতায় তিনি পাউন্ডের পরিবর্তে অস্ত্রশস্ত্র কিনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাঙালিদের আহ্বান জানান।[১৩৬] জাতিসংঘের প্রতিনিধি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরকালে আবদুস সামাদ আজাদ নিউইয়র্কে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কিছু রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বাংলাদেশ টিকে থাকতে পারবে কি না? এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন- 'অবশ্যই। কারণ পাকিস্তানের প্রথম দিকে তো আমাদের (পূর্ব বাংলার) রপ্তানি আয় বেশি ছিল এবং আমাদের বৈদেশিক মুদ্রায় পশ্চিম পাকিস্তানকে উন্নত করা হয়েছে। পাকিস্তানের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য পাট বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়।'[১৩৭]

৫.২.ঘ. মঈদুল হাসান

মে মাসে মুজিবনগর সরকার এর পক্ষ থেকে মঈদুল হাসান কে দিল্লি পাঠানো হয়। সেখানে তাঁকে যেসব কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়–

ক. মুক্তিযুদ্ধকে পূর্ণ মাত্রায় সাহায্য করার ক্ষেত্রে ভারতীয় সক্ষমতা পরিমাপ করার চেষ্টা করা;

খ. আঞ্চলিক সামরিক ভারসাম্য ভারতের অনুকূলে আনার প্রশ্নে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাভাবনা সম্পর্কে ভারতের উচ্চতর ক্ষমতাসীন মহলকে আভাস-ইঙ্গিত দেওয়া;

---

[১৩৩] শামসুল হুদা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৪
[১৩৪] ওই, পৃ. ৩১৪
[১৩৫] ওই, পৃ. ৩১৪-৩১৫
[১৩৬] ওই, পৃ. ৩১৫
[১৩৭] আবদুস সামাদ আজাদের সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: আশফাক হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২

গ. সম্ভব হলে, সংশ্লিষ্ট নীতি ও কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য পরবর্তী আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। একমাত্র বেসরকারি পর্যায়েই এই ধরনের নাজুক মূল্যায়ন ও আলাপ-আলোচনা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ছিল।

মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও আওয়ামী লীগের উপদলীয় পরিস্থিতি এমনই ছিল যে, এই চিন্তার সামান্যতম প্রকাশেও তাজউদ্দীন আহমদ আরও একটি গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারতেন। তাজউদ্দীন আহমদ দলীয় ও মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের সবার অগোচরে ভারতের উর্ধ্বতন মহলে মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তর সামরিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত মঈদুল হাসানের মাধ্যমে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন।

দিল্লিতে অবস্থানকালে মঈদুল হাসান বাংলাদেশ বিষয়ক নীতি নির্ধারণের কাজে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত এমন কিছু উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করেন। এদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সচিব পি এন হাকসার, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা অধ্যাপক পি এন ধর, পররাষ্ট্র সচিব টি এন কাউল, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতা হিসেবে পরিগণিত পাকিস্তানস্থ্ প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জি. পার্থসারথি, পরিকল্পনা মন্ত্রী সি. সুব্রামনিয়াম, ইন্সটিটিউট অব ডিফেন্স স্টাডিজ এন্ড এনালিসিসের পরিচালক কে. সুব্রামনিয়ম এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীর চিফ অব স্টাফের মিলিটারি সেক্রেটারি মেজর জেনারেল বি এন সরকার (পরবর্তীতে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের দায়িত্বে ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের ডিরেক্টর অপারেশনস নিযুক্ত হন)। এছাড়াও মঈদুল হাসান ভারতীয় জাতীয় সংবাদ দৈনিকের তিনজন সম্পাদক, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এসব সাক্ষাতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রশ্নে ক্ষমতাসীন মহলের মনোভাব জানার চেষ্টা করেন।[১৩৮]

মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মুক্তিযুদ্ধে ভারতের পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করছিলেন। একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি উপলদ্ধি করেন যে, একটি দেশের স্বীকৃতি আদায় করতে পারলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হবে এবং বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি হবে। কিন্তু ভারত সরকারের কাছ থেকে বারবার অনুরোধ জানিয়েও স্বীকৃতি না পাওয়ায় বামপন্থি দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য পেতে তাজউদ্দীন আহমদ উদ্যোগী হন। এ ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে তিনি আবদুস সামাদ আজাদকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে আশাপ্রদ কোনো ফল না আসায় বিকল্প পন্থায় তা আদায় করতে সচেষ্ট হন। তাজউদ্দীন আহমদ প্রত্যক্ষ করেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতির বিষয়ে ভারতের বামপন্থি, সংকীর্ণ ও উদারপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে টানাপোড়ন রয়েছে। তাই ভারতের জন্য অপেক্ষা না করে সোভিয়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। বাংলাদেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পক্ষের মতের আদান প্রদান যাতে অবাধে হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাজউদ্দীন আহমদ মঈদুল হাসানকে একা ও অত্যন্ত গোপনে এই যোগাযোগের দায়িত্ব প্রদান করেন। এই বেসরকারি আলোচনা যে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহের ফলেই সংঘটিত হবে সে বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের আস্থা তৈরিতে এবং বৈঠকের ব্যবস্থা সম্পন্ন হয় *প্যাট্রিয়ট* পত্রিকার প্রকাশক অরুণা আসফ আলীর সহায়তায়। কলকাতার প্রথম

---

[১৩৮] বিস্তারিত: মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

দিনের আলোচনায় সোভিয়েত প্রতিনিধি ভি আই গুরগিয়ানভ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে এক নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতা, বিঘোষিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে সংগঠন সৃষ্টির উপায় ও নেতৃত্বের সক্ষমতা, ভারতের ক্ষমতাসীন শ্রেণি স্বার্থের সাহায্য ও সমর্থনের ভিত্তি এবং তার মেয়াদ কী হবে এসব মূল বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই অপ্রত্যাশিত স্পষ্ট বক্তৃতার কারণে বাংলাদেশের প্রতিনিধির পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অনুধাবন করা অনেকাংশে সহজ হয়।[১৩৯] এ বৈঠকের ফলাফল কী হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়াও জানা যায় মঈদুল হাসানের বক্তব্যে। তিনি জানান যে, প্রথম দিকের এই বৈঠকের পর সোভিয়েত প্রতিনিধির আগ্রহেই এক সপ্তাহের ব্যবধানে দ্বিতীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়। তারপরও আরো দুটি বৈঠক হয় এবং প্রতিবারই সাত-আট দিনের ব্যবধানে। মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে ছোট বড় অজস্র প্রশ্ন তোলা হয়েছে। মঈদুল হাসানের এই সংলাপ কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংলাপের ফলাফল কী হয়েছিল জানা যায়নি। তবে এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নকে যে বার্তা দিতে চেয়েছিলেন তা এই সংলাপের মাধ্যমে প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৫.২.ঙ. ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে ভারতে যান। সেখানে তিনি সার্বক্ষণিকভাবে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে কাজ করেন। মুজিনগর সরকার গঠন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সরকারের অনেক কর্মকাণ্ডে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে দায়িত্ব দিতেন। সে লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে দু'বার দিল্লি পাঠান। প্রথমবার দিল্লি পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার বিভিন্ন এজেন্সীর লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্যারিস্টার আমীর দেখা করেন। তাঁদের কাছে বিভিন্ন ধরনের খবর পাওয়া যেত। ব্যারিস্টার আমীর দিল্লিতে বিশিষ্ট সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার এর সঙ্গেও আলোচনা করেন। তাছাড়া দিল্লিতে অবস্থিত বিদেশি মিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও পৃথক পৃথক বৈঠক করেছেন। দিল্লিতে অবস্থানকালীন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম কীভাবে কাজ করতেন সে সম্পর্কে স্মৃতিকথায় লিখেছেন। ভারতীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ব্যারিস্টার আমীর শুনতেন বেশি কথা বলতেন কম। এর ফলে দেশে বিদেশে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতিক্রিয়াসহ পরাশক্তিসমূহের মনোভাবও জানার সুযোগ হয়। ভারত সরকার সম্পর্কেও অনেক তথ্য জানতে পারেন। *হিন্দুস্থান টাইমস* এর সম্পাদক উইলিয়াম ভারগিস ও তাঁর মতো আরো অনেকের ধারণা ভারতের সকলে যে বাংলাদেশের পক্ষে আছে বা থাকবে এ ধারণা করার কোনো কারণ নেই। তাদের মতামত এখনও অনেক ভারতীয় মনে করেন যে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানই ভারতের জন্য মঙ্গল হবে। কারণ পাকিস্তানকে এতদিনে চেনা

[১৩৯] মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

জানা হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশ একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। কারো কারো ধারণা, বাংলাদেশকে নিয়ে ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে।

দিল্লি সফরকালে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম দিল্লি প্রেসক্লাবে বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। দিল্লি থাকাকালে ব্যারিস্টার আমীর সিপিআই এর একজন এমপি'র মাধ্যমে দিল্লিস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সংসদীয় প্রতিনিধি সহ তাঁরা চারজন সোভিয়েত দূতাবাসে যান। রাষ্ট্রদূতের পরবর্তী কর্মকর্তা তাদের বক্তব্য শোনেন। তিনি বলেন, দূতাবাসের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের বক্তব্য তিনি মস্কোতে পাঠাবেন। এর বেশি কিছু তিনি করতে পারবেন না। দিল্লিতে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ভারতের বৈদেশিক দফতরে টি এন কাউলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। টি এন কাউল বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে বিদেশে প্রচার কাজের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেন। কাউল বিদেশের বিভিন্ন রাজধানী, সেখানকার সরকার, সংবাদপত্র ও জনমত সম্পর্কে তাঁদের একটি ধারণা দেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম এসব বিষয় দিল্লি সফরের রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছে পেশ করেন।[১৪০]

৫.২.চ. এ্যাডভোকেট নুরুল কাদির

এ্যাডভোকেট নুরুল কাদির ১ এপ্রিল ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে ২ এপ্রিল কলকাতায় পার্ক সার্কাসে তাঁর মামার বাড়িতে পৌঁছেন। সেখানে তিনি তাঁর মামার সহযোগিতায় কলকাতাস্থ পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনের প্রথম সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রফিকুল ইসলাম তাঁকে বলেন- বাংলাদেশ মিলিটারি ক্র্যাকডাউন সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শোনার জন্যে তারা অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে আছেন। রফিকুল ইসলাম সব কথা শোনার পর নুরুল কাদিরকে বলেন যে, কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার এম হোসেন আলী সহ কলকাতা অফিসের এবং দিল্লিতে পাকিস্তান হাইকমিশন অফিসের সকলেই এখনও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সরকারের প্রতি অনুগত। তিনি নুরুল কাদিরকে বাসা থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দেন। এমনকি কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতেও নিষেধ করেন। বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনা কী তা না জেনে ভারতীয় গণমাধ্যমে যে নানা রকম মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি নুরুল কাদিরকে বলেন- ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিশেষ করে কলকাতা, বিহার ও বোম্বের সংবাদপত্রসমূহে পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যা সম্বন্ধে নানা রকম ঘটনা বিশেষ করে হিন্দু নারীদের উপরে নানা প্রকার লোমহর্ষক অত্যাচারের খবর প্রতিদিনই ছাপা হচ্ছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে বেশ উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও আসাম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে যারা ভারতে পালিয়ে এসেছেন, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই হিন্দু হওয়ায় এবং তারা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও আসাম সরকারের এবং জনসাধারণের সহানুভূতি ও রিলিফ সামগ্রী বেশি করে পাওয়ার আশায় পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে তা-ও বলেছেন আবার যা ঘটেনি তা-ও বানিয়ে বলেছেন। সাংবাদিকগণ সেইসব মুখরোচক সত্য-মিথ্যা ঘটনাকে, নিজেদের মনের মাধুরী মিশিয়ে, সংবাদপত্রে

[১৪০] আমীর-উল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭-৮১

অহরহ ছাপাচ্ছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকগণ ঐসব সত্য-মিথ্যা কাহিনির উপর নির্ভর করে তাদের দেশের সংবাদপত্রসমূহে সংবাদ পাঠাচ্ছেন। আর সেই সব খবর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে।[১৪১]

৯ এপ্রিল নুরুল কাদির দিল্লিতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে গণহত্যা ও মিলিটারি ক্র্যাকডাউন সম্বন্ধে জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি সভা আহ্বানের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে যেতে চান।

২৯ জুন বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুব আলম এর চিঠি থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের পক্ষে কূটনীতিক মিশনে আফগানিস্তান যাওয়ার জন্য আবদুস সামাদ আজাদ এর নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর জন্য মনোনীত করা হয়। এর অপর সদস্যরা ছিলেন– আশরাফ আলী চৌধুরী, মওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী এবং এ্যাডভোকেট নুরুল কাদির।[১৪২]

আফগানিস্তান যাওয়ার পূর্বে নুরুল কাদির প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নির্দেশে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের নামকরা উর্দুভাষী মুসলমান রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা, শিল্পপতি, বুদ্ধিজীবী, ব্যারিস্টার, শিক্ষাবিদ, উর্দু সংবাদপত্রের মালিক, সম্পাদক ও সাংবাদিকদের একটি তালিকা দিয়ে তাদের সঙ্গে অনতিবিলম্বে সাক্ষাৎ করার জন্য নুরুল কাদিরকে বলেন। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কেন বাঙালিরা মুসলিম দেশ পাকিস্তান ভেঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন 'বাংলাদেশ' করতে চায় তা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে বলেন। তাজউদ্দীন আহমদ তাঁকে আরো বলেন যে, বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারতীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দ, জনসাধারণ ও উর্দু প্রেসের পূর্ণ সমর্থন পেলেই কেবল ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানাতে এগিয়ে আসবে। কাজেই বাংলাদেশের স্বার্থে কাজটা যেমন জরুরি তেমন গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, কাজটা গোপনীয়তা বজায় রেখে করতে হবে। কেননা জানাজানি হয়ে গেলে বাংলাদেশের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্যে পররাষ্ট্র সচিব তাঁকে টেলিগ্রাম করে বোম্বে থেকে ডেকে না আনা পর্যন্ত ওই বিশেষ জরুরি কাজে বোম্বেতে ব্যস্ত থাকতে বলেন। তাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামরুজ্জামানের সঙ্গে দেখা করে বিশেষ পরিচয়পত্র নিতে বলেন।[১৪৩]

৬ জুলাই বোম্বে পৌছে নুরুল কাদির প্রথমেই সর্বভারতীয় পোর্ট ও ডক শ্রমিক ফেডারেশন এর সভাপতি এস.আর. কুলকারনি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে তারা ঐদিনের শ্রমিক বিক্ষোভ সমাবেশের বিষয় নিয়ে কথা বলেন। উল্লেখ্য, ৬ জুলাই বিকেলে বোম্বের শান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. স্প্রিয় টি. এগনিউ এক সংক্ষিপ্ত এক ঘন্টা যাত্রাবিরতির সময় বাংলাদেশে যুদ্ধকালীন সময় পাকিস্তানের সাহায্যার্থে মার্কিন অস্ত্র পাঠানোর প্রতিবাদে এস.আর. কুলকারনির নেতৃত্বে এক বিরাট শ্রমিক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ৭ জুলাই মহারাষ্ট্রে *দৈনিক হিন্দুস্তান*

---

[১৪১] মুহাম্মদ নুরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৭। পৃ. ৩৪-৩৫

[১৪২] ওই, পৃ. ১২৯

[১৪৩] ওই, পৃ. ১৩১

স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা অফিসে বাংলাদেশ এইড কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বাঙালি সাংবাদিক সলিল ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সলিল ঘোষের সহায়তায় নুরুল কাদির বাংলাদেশ এইড কমিটির মহাসচিব মিসেস মাহবুব নাসরুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন। নুরুল কাদির বাংলাদেশ এইড কমিটির ভাইস চেয়ারপার্সন মিস ওয়াহিদা রহমানের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও চিফ হুইপ অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর লেখা চিঠি হস্তান্তর করেন। একই দিন তিনি সর্বভারতীয় পোর্ট এন্ড ডক শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এস.আর. কুলকারনির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর অফিসে যান। সেখানে ভারতের বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন নুরুল কাদির। একই দিন সন্ধ্যায় বোম্বের ন্যাশনাল গ্যালারি ফর পারফর্মিং আর্টস ভবনে বাংলাদেশ এইড কমিটির এক সভায় স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় নুরুল কাদির বলেন- বাংলাদেশে মিলিটারি ক্র্যাকডাউনের পূর্বে কোনো বাঙালি মুসলমান কোনো বিহারী পুরুষ, নারী বা শিশুকে হত্যা করেনি। যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটতো তাহলে তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে ওই সব হত্যাযজ্ঞের প্রতিবেদন ও ছবি ছাপা হতো। এমনকি টেলিভিশনেও দেখানো হতো। ফটো-সাংবাদিকসহ বহু বিদেশি সাংবাদিক, টিভি ক্যামেরামান ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সদস্যগণ একাত্তরের ২৬ মার্চে তাদের জোরপূর্বক বহিস্কার না করা পর্যন্ত বাংলাদেশে ছিলেন। তারা এ ধরনের কোনো সংবাদ বা ছবি তাদের দেশে পাঠাননি। বাংলাদেশে মিলিটারি ক্র্যাকডাউনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে ও এটিকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে বিশেষ করে বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত ও ধোঁকা দেওয়ার জন্যেই বাঙালি কর্তৃক বিহারী হত্যার গল্প পাকিস্তানি প্রচার মাধ্যমগুলো প্রচার করেছে। কিন্তু তারা তা স্পষ্ট করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সব ধর্মের মানুষই ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলোতে আশ্রয় লাভের আশায় এসেছে। বাংলাদেশ থেকে শুধুমাত্র হিন্দুরাই এসেছে একথা সত্য নয়। এটাও পাকিস্তানি প্রচারণার একটি ফসল। ভারতে শরণার্থী শিবিরগুলোর রেকর্ড/রেজিস্ট্রার দেখলে পাকিস্তানিদের মিথ্যা প্রচারণার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবে বেশিরভাগ মুসলমান শরণার্থী বিভিন্ন কারণে তাদের নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর অথবা রেজিস্ট্রিভুক্ত না করেই তাদের বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে চলে গিয়েছেন। তারা শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করেননি। তাই হঠাৎ কেউ উদ্‌বাস্তু শিবিরগুলোতে গেলে বেশিরভাগ হিন্দু শরণার্থীর সঙ্গেই দেখা হওয়া স্বাভাবিক। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে কোনো শরণার্থী ভারতে পড়ে থাকবে না। সবাই নিজেদের ভিটেমাটি ও বাড়ি-ঘরে ফিরে যাবে। ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশের সকল উদ্‌বাস্তু ভারতে থাকার চেয়ে বাংলাদেশে নিজের ভিটেমাটিতে ও বাড়িঘরে ফিরে যাওয়া বেশি পছন্দ করবে। কারণ তারা সেখানে অনেক বেশি স্বাচ্ছ্যন্দে ছিল। বাংলাদেশে যখন লাগাতারভাবে গণহত্যা চলছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, তখন এটা কিছুতেই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হতে পারে না। লোক দেখানো আলোচনা করার নাম করে চুপিসারে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও সৈন্য আনা হয়েছে। ২৫ মার্চের কালো রাতে অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে অন্যায়ভাবে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে। পশ্চিম পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীকে বাংলাদেশে

নিরীহ, নিরস্ত্র, ঘুমন্ত বাঙালিদেরকে হত্যা করার আদেশ ইয়াহিয়া খান দিয়েছিলেন। যুদ্ধ বাঙালিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই পাকিস্তান ভাঙ্গার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে জুলফিকার আলী ভুট্টো ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের।[১৪৪]

মহারাষ্ট্রের বাংলাদেশ এইড কমিটি নুরুল কাদিরকে আফগানিস্তানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডায়েরি অন বাংলাদেশ ও রিফিউজি ৭১ নামে দুটি ফিল্ম দিয়েছিলেন। ফিল্ম দুটি নুরুল কাদির কাবুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। কাবুলে দেখানোর পর কাবুলের ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে ওই দুটো ফিল্ম তেহরানে পাঠানো হয়েছিল। তেহরানে ফিল্ম দুটো দেখানোর পর তেহরানের ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে তা আবার ইরাকে পাঠানো হয়েছিল। এভাবে বিদেশে ভারতীয় দূতাবাস সমূহের সহযোগিতায় বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রে ও অন্যান্য রাষ্ট্রে ওই ফিল্ম দুটো দেখানো হয়েছিল। ফিল্ম দুটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেখানোর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের কাজ সহজতর হয়েছিল। উল্লেখ্য, এ ফিল্ম দুটো বিমানবন্দরে নিয়ে যেতে যাতে কোনো সমস্যা না হয় সেজন্য কলকাতা মিশনের আনোয়ারুল করিম চৌধুরী এ্যাডভোকেট নুরুল কাদিরকে একটি ছাড়পত্র দিয়েছিলেন।[১৪৫]

৬ আগস্ট নুরুল কাদির ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সেক্রেটারি পি এন হাকসার এর সঙ্গে দেখা করেন। সাক্ষাৎকারে পি এন হাকসারকে তিনি জানান, সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী প্রতিদিন বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৬২ হাজার শরণার্থী বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার আশায় আসছেন। আর এক খবর অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত ৮১৩৮২৬৯ জন শরণার্থী ভারতে এসেছেন। তারমধ্যে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন ৬২৪২৫৯০ শরণার্থী আর ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয়ে সব মিলিয়ে এসেছেন বাকি ১৯ লক্ষ শরণার্থী। ভারতের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী শরণার্থীদের জন্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত ১২০ কোটি রুপি খরচ করেছেন। বিদেশি সরকারসমূহ ১১০ কোটি রুপি সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে দিয়েছিল মাত্র ৮.৩৭ কোটি টাকা।[১৪৬]

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে এ্যাডভোকেট নুরুল কাদির মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য কাবুল হয়ে তেহবান সফর করেন। তিনি তেহরানে পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াও ইরানের শাহেনশাহ ও প্রধানমন্ত্রী আমীর আব্বাস হোতায়দার, তেহরান জার্নাল, কায়হান ইন্টারন্যাশনাল এর সম্পাদককে এক পত্রে বিস্তারিতভাবে বাংলাদেশ সমস্যা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, গণহত্যা, বঙ্গবন্ধুর প্রহসনমূলক বিচার তুলে ধরেন। এখানে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি কাজ করেন।[১৪৭] যদিও এখানে বাঙালি কূটনীতিকরা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনি।

---

[১৪৪] মুহাম্মদ নুরুল কাদির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮-১৫২
[১৪৫] ওই, পৃ. ১৯৩-১৯৪
[১৪৬] ওই, পৃ. ১৯৭-১৯৮
[১৪৭] আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুসলিম বিশ্ব*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৪। পৃ. ৮১

৫.২.ছ. মাহমুদ শাহ কোরেশী

বাংলাদেশ কনফারেন্সের জন্য কাদের দাওয়াত পাঠানো হবে তার একটি তালিকা মাহমুদ শাহ কোরেশী দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন– সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, (সাহিত্যিক) ইউনেস্কোতো কর্মরত, জঁ পল সাত্রে (ফরাসি দার্শনিক ও সাহিত্যিক), বনি ক্রাউন (অনুবাদক, নিউইয়র্ক), ডিমক (অধ্যাপক, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়), ডেভিড কফ (ইতিহাসবিদ, কলকাতা), ফাদার ফালোঁ (ফরাসি অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ব্যারিস্টার আবদুস সালাম (কলকাতা)। হাসনাইন হেইকল (সম্পাদক, *আল আহরাম*, কায়রো), দুশন জভানিতেল (বাংলার অধ্যাপক, প্রাগ)।

মুজিবনগর সরকার লেবানন ও সিরিয়ায় বাংলাদেশের পক্ষে জনমত প্রচার কাজে যে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাহমুদ শাহ কোরেশী। বৈরুতে মোল্লা জালালউদ্দিন ও মাহমুদ শাহ কোরেশী প্রথমে সাক্ষাৎ করেন *আল ইয়োম* পত্রিকার সম্পাদক তৌফিক তিব্বির সঙ্গে। এ পত্রিকার সম্পাদক বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে পরামর্শ দেন, আরব জগতে তাদের প্রচারকার্য চালাতে হলে প্রথমে সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে সরাসরি সম্পাদকদের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরা। তৌফিক তিব্বি বাংলাদেশে প্রতিনিধি দলকে একটি তালিকা প্রদান করেন যেখানে উল্লেখ ছিল তারা লেবাননে কাদের সাথে দেখা করবেন। এ তালিকায় লেবাননের ধর্মীয় নেতাদের নাম উল্লেখ ছিল। সোশালিস্ট প্রগ্রেসিভ পার্টির নেতা কামাল জুমলাতের সঙ্গে দেখা করারও পরামর্শ দেন।[১৪৮]

২৯ জুলাই বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল সিরিয়, আরব জগতের বিখ্যাত কবি ড. ওমর আবু রিশের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি জানান যে, বাঙালিদের সম্পর্কে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। তিনি জানান যে, পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে কলকাতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা হয়েছিল। তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেন যে, ৪ অথবা ৬ আগস্ট লেবানিজ একাডেমীর পক্ষ থেকে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা লেবানিজ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশ সমস্যা তুলে ধরবেন। তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে সিরিয়ার একজন পার্লামেন্ট সদস্য ও মিশরের বিখ্যাত সম্পাদক হাসনাইন হেইকেলের সাথে দেখা করার জন্য চিঠি লিখে দেন।[১৪৯] একই দিন বিকেলে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল *আন নাহার* পত্রিকার পরিচালক মোহাম্মদ আলী হিমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁদের জানান যে, তিনি বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। প্রতিনিধি দলকে তিনি কীভাবে আরব জগতে প্রচার কার্য চালানো যায় এবং প্রভাব সৃষ্টি করা যায় সে ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করেন।[১৫০]

লেবাননের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অবতার কৃষ্ণ দার এর সহায়তায় ৩১ জুলাই বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল কামাল জুমলাতের সঙ্গে দেখা করেন। সাক্ষাতে প্রতিনিধি দল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি, তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর চিঠি হস্তান্তর ও কিছু বাঙালি ছাত্র কর্মকর্তার রাজনৈতিক আশ্রয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা বলেন। কামাল

---

[১৪৮] মাহমুদ শাহ কোরেশী, *মুক্তিযুদ্ধের মিশন আমার জীবন*, ঢাকা: সূচয়িনী পাবলিশার্স, ২০১৭। পৃ. ৪৬

[১৪৯] ওই, পৃ. ৪৬-৪৭

[১৫০] ওই, পৃ. ৪৭

জুমলাত ধৈর্য সহকারে তাঁদের কথা শোনেন। তাদেরকে তিনি ২ আগস্ট তাঁর পার্টি অফিসে আসার আমন্ত্রণ জানান। ২ আগস্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল কামাল জুমলাত ও তাঁর দশজন সহকর্মীর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন ইংরেজিতে ও মাহমুদ শাহ কোরেশী ফরাসিতে বাংলাদেশ সরকারের দাবি দাওয়া তুলে ধরেন। উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা শেষে কামাল জুমলাত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে জানান যে, তিনি দুই সপ্তাহ পরে মস্কো থেকে ফিরে এসে লেবাননের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিবেন। তবে তারা জানান যে, শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে তারা বিবৃতি দিতে পারেন না।[১৫১]

৩ আগস্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল *আল বেয়রাক* পত্রিকার সম্পাদক কারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেন যে, তাঁর পত্রিকায় বাংলাদেশ সম্পর্কিত সংবাদ তিনি প্রকাশ করবেন। এমনকি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে সংবাদ সম্মেলন করতেও সহযোগিতা করবেন। তবে তিনি তাদেরকে পরামর্শ দেন যে, বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রচার পুস্তিকাগুলো ইংরেজি থেকে আরবিতে অনুবাদ করলে আরব বিশ্বে তা প্রচারে সুবিধে হবে। তবে প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেন যে, আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটবে এমন কিছু তারা করবেন না।[১৫২]

৫ আগস্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল মোহাম্মদ আলী হিমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে উভয়ের মধ্যে বাংলাদেশ পরিস্থিতি, কূটনীতির বিভিন্ন কলা কৌশল, পাকিস্তানি দূতাবাস প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়। মোহাম্মদ আলী হিমাদ তাঁদের জানান যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যসমূহ স্থানীয় জনসাধারণের উপযোগী করে অর্থাৎ কিছু ইসলামী রঙ ছড়িয়ে এখানে প্রচার করা দরকার। তাছাড়া সব আরব সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন যে, পাকিস্তান দূতাবাসের যেসব বাঙালি কূটনীতিকগণ সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছে তিনি তাদের বিষয়ে সম্পাদকীয় লিখবেন।[১৫৩] ১১ আগস্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল *আল নাহার* পত্রিকার সাংবাদিক খাইরুল্লাহ খাইরুল্লাহর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন যে, আগামীকাল তাঁর পত্রিকায় বাংলাদেশ সম্পর্কিত নিবন্ধ প্রকাশিত হবে।

এছাড়াও বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল লেবাননে অধ্যাপক যিয়াদ ও ড. আমিন হাফিজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অধ্যাপক আমিন হাফিজ লেবাননের বিরোধী দলের প্রভাবশালী সদস্য ও ফরেন রিলেশন কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেন যে, পপুলার ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ও ফরেন রিলেশন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশের পক্ষে প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করবেন। শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কী করলেন তা জানতে চেয়ে বিবৃতি দাবি করবেন এবং নিজেরাও বিবৃতি দিবেন।[১৫৪] বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল ১৫ আগস্ট সিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মাদানী খিয়ামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁদের বক্তব্য শোনেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে সিরিয়ার

[১৫১] মাহমুদ শাহ কোরেশী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮-৫০
[১৫২] ওই, পৃ. ৫১
[১৫৩] ওই, পৃ. ৫২-৫৩
[১৫৪] ওই, পৃ. ৫৬

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করতে বলেন।[১৫৫] ১৮ আগস্ট প্রতিনিধি দল সিরিয়ার জজকোর্টে গিয়ে আবদেল সালাম হিদার এবং মিশেল দাহবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাদের বক্তব্য শোনেন।[১৫৬] এছাড়া প্রতিনিধি দল সিরিয়ার কোর্টে গিয়ে কিছু আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেন। সেখানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বৈরুতের নাজাত পার্টির আদনান হাকিম। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের বক্তব্য শোনার পর তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তাঁর গভীর মমতা ও শ্রদ্ধা রয়েছে। তাছাড়া কোনো দেশের জনগণ যদি তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্থির সংকল্প হন তাহলে কেউ তাদের পিছু হটাতে পারবে না। তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন যে, এ্যাডভোকেটদের পক্ষ থেকে একটি চিঠি পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্যে লিখে তাদের রাষ্ট্রদূতকে দিবেন। সেখানে তিনি নির্যাতিত শরণার্থীদের সমস্যার কথা উল্লেখ করবেন এবং শেখ মুজিবের বিচার সামরিক আদালতে না করার জন্য বলবেন।[১৫৭]

৩০ আগস্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল লেবাননের পার্লামেন্ট ভবনে যান। সেখানে ড. আমিন হাফিজ তাঁদেরকে কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। উভয় পক্ষের আলোচনার পর কমিশনের সদস্যরা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, বাংলাদেশ বিষয়টি তারা পার্লামেন্টে আলোচনার জন্য উপস্থাপন করবেন। এমনকি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জাতিসংঘের মাধ্যমে ও গণ নির্বাচনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্পর্কেও মন্তব্য করেন।[১৫৮] ৩১ আগস্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল *ডেইলি স্টার* পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলকে জানান যে, আরব পত্রিকায় বাংলাদেশের ব্যাপারে কম-বেশি যাই প্রকাশ হোক না কেন, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তেমন কিছু কেউ লিখেনি এবং শেখ মুজিব সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে বলেন যে, মিশরকে সমস্ত তথ্য জানিয়ে এবং সৌদি আরবকে ইসলামের দাহাই দিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করতে হবে। কেননা মিশর ওই সময় তার অভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃআরব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ায় সৌদি আরব পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখতে চায় বলে বাংলাদেশের আন্দোলনে সমর্থন করেনি।[১৫৯]

লেবাননে অবস্থানকালীন ৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য মাহমুদ শাহ কোরেশী একটি টেলিফোন পান। টেলিফোনদাতা তাঁকে ট্রেইটর বলে গালি দেয় এবং অবিলম্বে লেবানন ছেড়ে যেতে বলে।[১৬০]

১১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল কাউন্সিল অব উলেমার সেক্রেটারি জেনারেল এবং লেবানিজ একাডেমীর ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ আবদুল্লাহ আলায়লী'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের বক্তব্য শোনার পর বলেন- 'পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র সে হিসাবে তার ঐক্য তিনি কামনা করেন। ডিসপ্যারিটি, অন্যায় অবিচার যা হয়েছে তা ভুলে গিয়ে মিলে-মিশে ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করা দরকার।' বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের জোরালো বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন

---

[১৫৫] মাহমুদ শাহ কোরেশী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
[১৫৬] ওই, পৃ. ৬০
[১৫৭] ওই, পৃ. ৬১
[১৫৮] ওই, পৃ. ৬৯
[১৫৯] ওই, পৃ. ৬৯-৭০
[১৬০] ওই, পৃ. ৭৪

যে, ব্যক্তিগতভাবে এবং উলেমা কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বিবৃতি এবং অন্যভাবে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি, অন্যায় অবিচারের অবসান, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য চেষ্টা করবেন।[১৬১]

বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত লেবানন সরকার সেখানে বাংলাদেশ এর নামে একটি তথ্যকেন্দ্র চালু করার অনুমতি প্রদান করে। এ সময় একজন সাংবাদিক তাঁদেরকে জানান যে, লেবাননের রেডিওতে ঘোষণা করা হয়েছে একজন বাংলাদেশ প্রতিনিধি ইসরায়েল গিয়েছে অস্ত্র আনার জন্য। ১৬ আগস্ট লরিঅঁ লজু *ডেইলি স্টার* পত্রিকায় এ সংবাদ ফলাও করে প্রকাশিত হয়। এ সংবাদ দেখার পর লেবাননে অবস্থানরত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল একটি প্রতিবাদমূলক বিবৃতি তৈরি করে সম্পাদকের বরাবর পাঠান। পরে তারা দিল্লিতে কে এম শিহাবুদ্দিন ও কলকাতায় এম হোসেন আলীর কাছে টেলিগ্রাম পাঠান এ সংবাদের সত্যতা জানতে চেয়ে। কিন্তু লেবাননের ভারতের রাষ্ট্রদূত এর পরামর্শে তারা প্রতিবাদসূচক সেই বিবৃতিটি প্রকাশ করেননি। এ সংবাদ নিয়ে সকল প্রচার মাধ্যমে আলোচনা হওয়ায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে অনেকেই জানান যে, এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবাদ করা দরকার। আবার অনেকে তাদের বলেন যে, এ ঘটনার কারণে আরব জনমত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। *ডেইলি স্টারে* স্বঘোষিত দূত মাহমুদ কাছিম বিষয়ে দীর্ঘ সংবাদ প্রকাশ হয়। সেই তথাকথিত দূত যার কোনো পরিচয়পত্র নেই। সরকারের সঙ্গে এমনকি জনগণের সঙ্গেও তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই। *ডেইলি স্টারের* সংবাদে জানা যায় যে, তিনি পনেরো বছর ইরানে কাটিয়েছেন এবং নিজেকে তিনি ঢাকার লোক বলে পরিচয় দেন। ইরান থেকে তুরস্ক হয়ে জেনেভায় যান। জেনেভা থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সহায়তায় তিনি দিল্লিতে সরকারি অতিথি হিসেবে ছয় সপ্তাহ কাটান। পরে তেলআবিব যান। তাঁর কাছে মনে হয়েছে বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধে সুবিধে করতে পারছে না অস্ত্রের জন্য। যার কারণে তিনি ইসরায়েল যান অস্ত্র সাহায্য সম্পর্কে চুক্তি করতে।[১৬২]*ডেইলি স্টার* ও অন্য কিছু কাগজে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এ সংক্রান্ত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে যে বিবৃতি প্রকাশ করেছেন তাতে তিনি বলেন- ইসরায়েলে বাংলাদেশের দূত নকল এবং এই বিরুদ্ধ প্রচারণা গোয়েবলসকে হার মানায়।[১৬৩]

২৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল লেবাননের ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের নেতা রশীদ কারামে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বাংলাদেশের কথা শুনে অনেক দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি আশ্বস্ত করেন যে, এসব বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য তারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠাবেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে সংবাদ সম্মেলন করার ও অন্যান্য ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতার জন্য তাঁর পার্টির নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে জানাবেন বলে আশ্বস্ত করেন। একইদিনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল লেবাননের প্রাইম মিনিস্টার ইন ওয়েটিং তাকিয়েদ্দিন সোলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের বক্তব্য শোনার পর তিনি বলেন যে, এই অমানুষিক বর্বরতার কথা শোনে তারা যে শুধু দুঃখ পেয়েছেন তাই নয়, তাদের বুকে শেলের মতো বিঁধেছে। মুসলমান এভাবে মুসলমানকে মারবে? জোর করে আনুগত্য,

---

[১৬১] মাহমুদ শাহ কোরেশী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬
[১৬২] ওই, পৃ. ৭৯-৮০
[১৬৩] ওই, পৃ. ৮১

তথাকথিত সংহতি রক্ষা করতে চাইবে? এটা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু আরব জাতিসমূহের বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু করা সম্ভব ছিল না। তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন যে, লেবাননের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিবেন এবং বাংলাদেশের ব্যাপারে কী করা যায় তা নিয়ে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করবেন। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিলে আন্তর্জাতিক মুসলিম সংহতি বা আফ্রো-এশীয় সংহতি ক্ষুণ্ন হবে না বরং শক্তিবৃদ্ধি হতে পারে কিনা একথা বিবেচনার সময় এসেছে। তাকিয়েদ্দিন সোল জানান যে, পাকিস্তানের ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে মর্মাহত। কেননা পাকিস্তানকে একদিন তিনিই আরব জগতে পরিচিত এবং জনপ্রিয় করতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে আরব লীগের পক্ষ থেকে তিনি দিল্লি গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের বোঝাতে যে তাদের আলাদা হওয়া অনুচিত। তার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভারতে এসে সরেজমিনে সব দেখে গান্ধীর ওপর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর লিখিত রিপোর্ট ও প্রবন্ধ সর্বপ্রথম আরবদের এ ব্যাপারে পথনির্দেশ দেয়। লেবাননে প্রেরিত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য মাহমুদ শাহ কোরেশী Suffering Humanit In Bangladesh ও Sheikh Mujib of the Voice of Justice নামে প্রচার পুস্তিকা রচনা করেন।[১৬৪]

৫.২.জ. জ্যোতিঃপাল মহাথেরো

২২ এপ্রিল জ্যোতিঃপাল মহাথেরো আগরতলায় পৌঁছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর যে পাকিস্তানি বাহিনী অত্যাচার, নির্যাতন করছে তা তুলে ধরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রাচ্যবিদ্যা বিহারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার, অবিচার ও বর্বরতার চিত্র তুলে ধরেন। যা পরদিন ভারতীয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রচারিত এ বিবৃতিটি আকাশ বাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও প্রচারিত হয়।[১৬৫]

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর পাকিস্তানিদের অত্যাচার নির্যাতন সমগ্র বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য জ্যোতিঃপাল মহাথেরো জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট, ব্যাংককস্থ বিশ্ববৌদ্ধ ফেলোশিপের সভানেত্রী রাজকুমারী পুণ-পিসমাই-দিসকুল ও সাধারণ সম্পাদক আইয়েম সংঘবাসী, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট শ্রীমাভো বন্দরনায়েক এবং বিশ্বের সকল দেশের বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের আঞ্চলিক শাখা ও বৌদ্ধ সমিতিগুলোর কাছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত গণহত্যার চিত্র তুলে ধরে আবেদন করেন। কোথাও বা টেলিগ্রাম করেন। যার ফলশ্রুতিতে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ও থাইল্যান্ডের বিশ্ববৌদ্ধ ফেলোশিপ অধিকৃত বাংলাদেশে বৌদ্ধদের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে দাবি জানান।[১৬৬]

জ্যোতিঃপাল মহাথেরো সাংবাদিক সম্মেলনে পঠিত বিবৃতিটি দেশি-বিদেশি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় বাঙালি বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা ঢাকা সহ পাকিস্তানের সকল বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করতে থাকে যে- পাকিস্তানি বৌদ্ধরা এখানে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। বৌদ্ধদের ওপর কোনো অত্যাচার উৎপীড়ন

---

[১৬৪] মাহমুদ শাহ কোরেশী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩- ৮৫

[১৬৫] জ্যোতিঃপাল মহাথেরো, *বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে*, চট্টগ্রাম: বিশ্বশান্তি প্যাগোডা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭। পৃ. ২৫

[১৬৬] ওই, পৃ. ২৬

হয়নি কিংবা বৌদ্ধদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। জ্যোতিঃপাল মহাথেরো ভারত সরকারের প্ররোচনায় মিথ্যা প্রচার করছে। বৌদ্ধরা বাংলাদেশে নির্যাতিত, অপমানিত, অপদস্থ ও নিহত হচ্ছে বলে বহির্বিশ্বে ভারত সরকার ও জ্যোতিঃপাল মহাথেরো যে প্রচারণা তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।[১৬৭]

মুজিবনগর সরকার জ্যোতিঃপাল মহাথেরোকে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি ও স্বীকৃতি লাভের জন্য এশিয়ার বিভিন্ন বৌদ্ধরাষ্ট্রে প্রতিনিধিরূপে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন জ্যোতিঃপাল মহাথেরো, তাঁর সঙ্গে ছিলেন ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ।[১৬৮]

৭ আগস্ট জ্যোতিঃপাল মহাথেরো ও ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লি ত্যাগ করেন। তাদের সঙ্গে ছিল বিদেশে বিতরণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য, বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকা ও ছবি। শ্রীলঙ্কা পৌছার পর জ্যোতিঃপাল মহাথেরো ও ফকির শাহাবুদ্দিন Cylon Committee for Human Rights in East Bengal নামক সংগঠনের সভাপতি সেনাপথ গুণ বর্দ্ধন ও সাধারণ সম্পাদক অমর দাস ফার্নেন্দো'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অধিকৃত বাংলাদেশের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ থেকে উদ্ভূত ভয়াবহ অবস্থার কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। ৮ আগস্ট জ্যোতিঃপাল মহাথেরো শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা, বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা ও ধর্মগুরু মহলে প্রচারণার কাজ শুরু করেন। তিনি মালওয়াট বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ মহানায়ক মহাথেরো মাননীয় শ্রীমৎ সুমন সিদ্ধার্থ, বিশ্ব বিখ্যাত বৌদ্ধ মনীষী জার্মান ভিক্ষু জ্ঞান পোনিকা মহাথেরো, শ্রীলঙ্কা বৌদ্ধ কংগ্রেসের সভাপতি বিপুলসার থের, বিশ্ব বৌদ্ধ ফেলোশিপের সিংহল কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা, অত্যাচার, নির্যাতন, ধ্বসযজ্ঞের কথা তুলে ধরেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল শ্রীলঙ্কার গণপরিষদে উপস্থিত হয়ে কয়েকজন মন্ত্রী ও পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাদেরকে বাংলাদেশের সংঘটিত গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার সাফল্য সম্পর্কে যথার্থ চিত্র তুলে ধরেন। পাশাপাশি তারা শ্রীলঙ্কার উপর দিয়ে পাকিস্তানি সামরিক সরকারের বিমান বাংলাদেশে যাতায়াত বন্ধ করার অনুরোধ জানান। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের উপস্থিতিতেই পাঁচজন মন্ত্রীর স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েককে পাঠানো হয়। আবেদনপত্রে তাঁরা পাকিস্তানি বিমানের কলম্বো বন্দরে অবতরণ বন্ধ করার আহ্বান জানান। কেননা পাকিস্তান কলম্বো বিমানবন্দর ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে যাচ্ছে এবং নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করছে। সবশেষে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জয়া বর্দ্ধনার বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। জনাকীর্ণ এ সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা বাংলাদেশের গণহত্যা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক চিত্র তুলে ধরেন। এছাড়া তাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য সংবলিত বিভিন্ন পুস্তক শ্রীলঙ্কার জননেতা, বৌদ্ধ নেতা ও সাংবাদিকদের কাছে বিলি করেন।[১৬৯]

---

[১৬৭] জ্যোতিঃপাল মহাথেরো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
[১৬৮] ওই, পৃ. ৩৪
[১৬৯] ওই, পৃ. ৩৬-৩৮

শ্রীলঙ্কা থেকে থাইল্যান্ডে গমন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি জ্যোতিঃপাল মহাথেরো আয়ুস্মান বসুমিত্র ও সোমানন্দ এর সহায়তায় বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সদর দপ্তরে গিয়ে সভানেত্রী রাজকুমারী পুন পিসমাই দিস্কুল ও সেক্রেটারি জেনারেল আইয়েম সংঘবাসীর সঙ্গে দেখা করেন। সাক্ষাতে তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ ও জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন-

> মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক চরমতম বিপর্যয়ে বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার বৌদ্ধ তাদের সর্বস্ব হারিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাক সামরিক বাহিনীর আক্রমণে তাদের বুদ্ধমন্দির বিহার ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়েছে, অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষুককে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি নবুতিপর জরাগ্রস্ত মহামান্য শ্রী অভয়তিষ্য মহাথের ও পরম সাধক শ্রীধর্ম বিহারী স্থবিরের উপর পর্যন্ত সেই নর পিশাচেরা দৈহিক নির্যাতন চালিয়েছে। অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস ও হরণ করা হয়েছে এবং বৌদ্ধ এলাকায় হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ অনবরত নির্মমভাবে হত্যা করেছে। প্রতিদিন বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগমনকারী অসংখ্য শরণার্থীদের মারফৎ এসব মর্মস্পর্শী খবর এখনো আসছে।[১৭০]

জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর এ বক্তব্য শোনার পর বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সেক্রেটারি জেনারেল এ এম সংঘবাসী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বাংলাদেশ সম্পর্কে যোগাযোগ ও প্রচারণা শুরু করেন। যে সকল দেশে প্রচারণা চালিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিল চীন, জাপান, হংকং, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাউস, কম্বোডিয়া, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, নেপাল, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি। এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সরকারের ওপর তারা চাপ সৃষ্টি করেন বাংলাদেশের জনগণ ও বৌদ্ধদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য। এছাড়া এ এম সংঘবাসী ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অব বুদ্ধিস্ট এর Monthly Review'তে জ্যোতিঃপাল মহাথেরো ও ফকির শাহাবুদ্দিন এর ছবি দিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কিত এক বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা হয়। এসব কাজের পাশাপাশি জ্যোতিঃপাল মহাথেরো থাইল্যান্ডের বিখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা ও বৌদ্ধ জনগণের ওপর নিপীড়ন সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন। থাইল্যান্ডে জ্যোতিঃপাল মহাথেরো যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন– থাইল্যান্ডের বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি ও থাইল্যান্ড সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সন্ন ধর্মশক্তি, থাইল্যান্ডের মহামান্য ভিক্ষু কুল শ্রেষ্ঠ সংঘরাজ, মহামুকুট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফ্র শাসন শোভন, ধর্ম বিষয়ক বিভাগের মন্ত্রী মহামান্য ফ্র ব্রহ্মমন্দি, মার্বেল টেম্বলের অধ্যক্ষ ফ্র দর্মকীর্তি শোভন, থাই ধর্ম বিষয়ক বিভাগের মহাপরিচালক ফ্র ধর্মাধিরাজ মহামুনি।

থাইল্যান্ডে সফল প্রচারণা কার্যক্রম শেষে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল ১৬ আগস্ট জাপান পৌঁছে। মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত বাংলাদেশ লিবারেশন কমিটি জাপানে বহু পূর্বেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করে। এই কমিটির সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি জ্যোতিঃপাল মহাথেরো ও ফকির শাহাবুদ্দিন জাপানে তাদের কার্যক্রম শুরু করেন। বাংলাদেশ লিবারেশন কমিটির চেয়ারম্যান টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া আফ্রিকার ভাষা সম্পর্কিত বিভাগের অধ্যাপক ড. টি দারা ও সাধারণ সম্পাদক মো. জয়নাল আহমদ এর বাসভবনে দু'দিন কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মী সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি ড. জ্যোতিঃপাল মহাথেরো ও ফকির শাহাবুদ্দিন বক্তৃতা করেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে

[১৭০] জ্যোতিঃপাল মহাথেরো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮-৩৯

আলোচনায় তারা তাঁদের বক্তৃতায় বাংলাদেশের গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন, লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞের কথা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে ব্যাপক জনমত গঠনের কার্যক্রম অনুসারে জ্যোতিঃপাল মহাথেরো ও ফকির শাহাবুদ্দিন জাপানের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা *Mairichi Daily News* পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সকল প্রকার অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেন। যা পরদিন ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ সংবাদ প্রকাশের পর জাপানি ভাষার পত্রিকা *চুগাই নিপ্প* এর সম্পাদক বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন যা পত্রিকায় বিশদভাবে প্রকাশিত হয়। এরপর বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল জাপান বুদ্ধ এডোরশন সমিতির পরিচালক রিরি নাকায়ামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। কিন্তু রিরি নাকায়ামা তাঁদের কথা বিশ্বাস করেননি। কেননা তিনি তাঁদের বলেন যে, তিনি ইতিমধ্যে স্থানীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিকট বৌদ্ধরা সম্পূর্ণ নিরাপদে আছেন বলে জানতে পেরেছেন। এটি ছিল সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেওয়ার একটি অপপ্রয়াস। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষের ছবি, বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রচার পুস্তিকা দেওয়ার পর তিনি তাঁদের জানান যে, তিনি ঢাকায় চিঠি লিখে তাঁদের এ বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করবেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল জাপান আফ্রো এশীয় সংহতি কমিটির পরিচালক বোর্ডের সদস্য ফমিকুবো, টোকিও মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কে. এ. কাশ ওয়াসী, নিচি ইন্দো সর্বোদয় সমিতির সভাপতি কোজি ওকামাঠে এবং এটম ও হাইড্রোজেন বোমার বিরুদ্ধে জাপান কাউন্সিলের পরিচালক ভিক্ষু গ্যায়ৎসো সাতো প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশ সম্পর্কে কার্যকরী আলোচনা করেন। জাপানের টোকিও থেকে কাজ শেষ করে এরপর তারা হংকং যান।

জ্যোতিঃপাল মহাথেরো নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। সম্মেলন চলাকালীন ১৯ সেপ্টেম্বর এক বৈঠকে The World Conference of Religion for Peace এর সেক্রেটারি জেনারেল ড. হোমার জ্যাকের সঙ্গে যৌথভাবে বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়া বাংলাদেশ সম্পর্কিত এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিভিন্ন বৌদ্ধ রাষ্ট্র থেকে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে জ্যোতিঃপাল মহাথেরো সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের কাছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংসতা তুলে ধরেন।[১৭১]

৫.২.ঝ. অন্যান্য প্রতিনিধি দল

মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধে পুরো সময় জুড়ে আরো যে সকল ব্যক্তিবর্গকে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বহির্বিশ্বে পাঠিয়েছিলেন তাদের কার্যক্রমগুলো নিম্নে আলোচিত হলো–

ক. বাংলাদেশ আওয়ামী উলেমা পার্টির সভাপতি খায়রুল ইসলাম যশোরী বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়ে দিল্লি ও অন্যান্য স্থানে মুসলমান উলেমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁর ভাষণ দিল্লির উর্দু সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত হয়।[১৭২]

---

[১৭১] জ্যোতিঃপাল মহাথেরো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪৫
[১৭২] বিশ্ব বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

খ. আবদুল মালেক উকিল, সুবোধ মজুমদার ও আব্দুল মমিন তালুকদারকে পাঠানো হয়েছিল ভূটান ও নেপাল সফরে।[১৭৩] পনেরো দিন ব্যাপী কূটনীতিক সফর শেষ করে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল মুজিবনগর ফিরে আসে। মুজিবনগর ফিরে এসে আবদুল মালেক উকিল জানিয়েছেন নেপালে তাদের সফর ও কূটনীতিক তৎপরতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল নেপালের মন্ত্রী, সাংবাদিক, ছাত্র নেতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশ প্রশ্নে এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারা জানিয়েছেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নেপালের সর্বস্তরের মানুষ বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সার্বিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রকাশ করেন। প্রতিনিধি দলটি নেপাল প্রেস ক্লাব সদস্যদের মধ্যে বাংলাদেশের পতাকা এবং জনগণের ওপর সেনাবাহিনীর নির্যাতন ও পরবর্তী পর্যায়ে মুক্তি বাহিনীর কার্যক্রম সংবলিত বাংলাদেশ সরকারের পুস্তক প্রদান করেন।[১৭৪] আবদুল মালেক উকিল এর নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দলকে নেপালে যাওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি সরকারি নির্দেশ দেন। অপর দুই সদস্য ছিলেন শ্রী সুবোধ মিত্র ও আবদুল মমিন তালুকদার এমএনএ। তারা নেপালে যাওয়ার পূর্বে দিল্লিস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন এবং আমজাদুল হক এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রায় দু'সপ্তাহ দিল্লিতে অবস্থান করেন। এরপর তারা নেপালে যান। নেপাল ছিল পাকিস্তানের খুব ঘনিষ্ঠ ও সহযোগী রাষ্ট্র। সে সময় কাঠমণ্ডুতে তিনজন পাকিস্তানি কূটনীতিকের মধ্যে দুজনই ছিলেন বাঙালি- মোস্তাফিজুর রহমান সিএসপি এবং মোখলেছউদ্দিন সিএসপি। এই সফরে তারা নেপালের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ঋষিকেশ সাহা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী থাপা ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরা সকলেই 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' নাম দিয়ে উদ্‌বাস্তুহারাদের সাহায্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জোরালো সমর্থন দেন। তাঁরা কয়েকটি ছাত্র সমাবেশের এবং একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ঋষিকেশ সাহার মাধ্যমে তারা রাজদরবারে মুজিবনগর সরকারের ছবি ও কাগজপত্র প্রদান করেন।[১৭৫]

গ. মুজিবনগর সরকার ১৯৭১ সালের ৭ আগস্ট এ্যাডভোকেট ফকির শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল শ্রীলঙ্কায় প্রেরণ করে। এর অন্য সদস্য ছিলেন মোহাম্মদ শামসুল হক ও জ্যোতিঃপাল মহাথেরো। এ প্রতিনিধি দলটি বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। প্রতিনিধি দল শ্রীলঙ্কা সফরের সময় বাংলাদেশের একটি মানচিত্র, গণহত্যার ওপর রচিত কয়েকটি বই ও কিছু আলোকচিত্র সঙ্গে করে নিয়ে যান। তাদের প্রচারণার ফলে শ্রীলঙ্কার সংবাদপত্রে বাংলাদেশের গণহত্যার খবর বিশদভাবে প্রকাশিত হয়।[১৭৬]

ঘ. থাইল্যান্ডের প্রতিনিধি দলটি জাপান সফর করে। জাপানের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাংলাদেশ আন্দোলনের বাস্তবতা তুলে ধরেন। জাপানের *The Mainichi Daily* নামীয় একটি সংবাদপত্রে বাংলাদেশ প্রতিনিধি

---

[১৭৩] মুহাম্মদ নুরুল কাদির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৮

[১৭৪] *জয়বাংলা*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

[১৭৫] আবদুল মালেক উকিলের সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য: হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, পঞ্চদশ খণ্ড, ঢাকা: তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২। পৃ. ৪১

[১৭৬] মুহাম্মদ নুরুল কাদির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০

দল একটি সংবাদ সম্মেলন করেন এবং জাপান সরকার ও জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন।[১৭৭] সংসদ সদস্য আক্তারুজ্জামান বাবু জাপান সফরে গিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে অংশ নেন।[১৭৮] জাপানে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সফল প্রচারণার ফলে জাপানের সেতসুরেই তুরুশিমা ও এলিজাবেথ অলিভার বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য দিল্লি আসেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সবকিছু অবহিত করা হয়। তাঁরা পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞের বিভিন্ন নির্দশন দেখে বিমর্ষ হন। তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন।[১৭৯] জাপানি সাংবাদিক নাওয়াকি উসুই শরণার্থী শিবিরের অবস্থানরত মানুষের দুর্দশা ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের কথা প্রচার করে জাপানের জনগণকে বাংলাদেশের পক্ষ সমর্থনে উৎসাহিত করেন।[১৮০]

ঙ. জাতিসংঘের অধিবেশন শেষে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য ফণীভূষণ মজুমদার মুজিবনগরে ফিরে এসে *বাংলার বাণী*র প্রতিনিধির নিকট একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রদান করেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন- বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অত্যন্ত কার্যকরীভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীন বাংলাদেশের দুঃখ লাঞ্ছনা এবং বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনি বিশ্বের দরবারে পেশ করেছে। ফলে বিশ্ব বিবেকের কণ্ঠস্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আরো বলিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের কাছে নিজেদের বক্তব্য পেশের পর এযাবৎকাল নিরপেক্ষ ছিল এমন দেশও বাংলাদেশের সংগ্রামের সমর্থন সূচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে। এই প্রতিনিধি দল বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে এই সত্য উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছে যে, বাংলাদেশ ইস্যু পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বা পাকিস্তান-ভারত বিরোধ নয় বরং বাংলাদেশ ইস্যু হচ্ছে শেখ মুজিবের মুক্তি এবং স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে লিপ্ত সাড়ে সাত কোটি বাঙালির বাঁচা মরার প্রশ্ন। জাতিসংঘ সদর দফতরে তদবিরের মাধ্যমে প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক দল নিয়োগের প্রস্তাব, ইয়াহিয়া কর্তৃক সুকৌশলে বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্ব জনমত বিভ্রান্ত করার প্রয়াস, ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণের নিগূঢ় রহস্য এবং মৃত পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানের হাস্যকর উদ্ভট প্রস্তাবের ব্যাপারে বাংলাদেশের বক্তব্য পেশ করেছে। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল জাতিসংঘকে জানিয়ে দিয়েছে যে, একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনাশর্তে মুক্তি দান বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দান, হানাদার বাহিনী প্রত্যাহার এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দানের পরই বিবেচনা করা হতে পারে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো আপস মীমাংসার প্রশ্ন আলোচনা করা যায় কিনা।[১৮১]

[১৭৭] Sukumar Biswas, *Japan and the Emergence of Bangladesh*, Dhaka: Agamee Prokashani, 1998. p. 210
[১৭৮] আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০
[১৭৯] মুহম্মদ নুরুল কাদির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০
[১৮০] আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮
[১৮১] *বাংলার বাণী*, ২ নভেম্বর ১৯৭১

চ. মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ ও সৈয়দ সুলতান আহমদ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। সৈয়দ সুলতান আহমদ সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলোতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে এবং ওই সকল দেশের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।[১৮২]

৫.২.ঞ. কূটনীতিক হিসেবে শ্রমিক ও ছাত্র প্রতিনিধি দল

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সরকারি কার্যক্রম শুরু করে। সরকারি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি রূপে বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান, সংগঠনের প্রধান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে দেখা করেন। মুজিবনগর সরকার থেকে প্রেরিত এসব প্রতিনিধিবৃন্দের লন্ডনে থাকা, তাদের দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে প্রচারণা, সংবাদ সম্মেলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও তাঁর নেতৃত্বে প্রবাসী বাঙালিরা কাজ করতেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বিশ্বের অনেক সম্মেলনে নিজে উপস্থিত না থেকে লন্ডনস্থ বাঙালি ছাত্র সমাজের নেতৃবৃন্দকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছেন। আবার মুজিবনগর সরকার তাদের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক দলের নেতৃবৃন্দকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছেন। এসব শ্রমিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বহির্বিশ্বে কাজ করেছেন। তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সমাপ্ত করে প্রবাসে বাংলাদেশের প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও মুজিবনগর সরকারের কাছে কাজের সম্পূর্ণ বিবরণ পেশ করতেন। এর ফলে তাদের মধ্যে জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

ব্রিটেনসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রচার ও তাদের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে শ্রমিক লীগের সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান ও তৎকালীন এমএনএ সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান মধ্য জুন থেকে লন্ডনে অবস্থান করছিলেন। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি ও বিলাতে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের সঙ্গে দেশ থেকে আগত শ্রমিক নেতৃবৃন্দের মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লন্ডনের কনওয়ে হলে যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ৩ জুলাই এক জনসভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় সফররত শ্রমিক নেতৃদ্বয় ছাড়াও অন্যান্যরা বক্তৃতা করেন।[১৮৩] মুজিবনগর সরকার থেকে প্রেরিত এসব শ্রমিক নেতারা তাঁদের বক্তব্যে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন। তাঁরা ইংল্যান্ডের কয়েকজন শ্রমিক নেতার সঙ্গে দেখা করেন। শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নানের প্রত্যাবর্তনের সময় লন্ডনের স্টিয়ারিং কমিটির উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহারের জন্য ওয়াকিটকি, গরম কাপড় পাঠানো হয়।[১৮৪]

আগস্টের শেষের দিকে রুমানিয়ায় 'বিজ্ঞান ও বিশ্বশান্তি' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের খবর লন্ডনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কাছে যখন পৌঁছে তখন সম্মেলন প্রায় সমাপ্তির পথে। লন্ডনের স্টিয়ারিং

---

[১৮২] বি বি বিশ্বাস, *একাত্তরে মুজিবনগর*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪। পৃ. ৪৫-৪৬

[১৮৩] খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে বিলাত-প্রবাসীদের অবদান*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৮। পৃ. ৪৫-৪৬

[১৮৪] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮

কমিটির প্রধান কাজ হচ্ছে জনসংযোগ। তাই সেই অবস্থাতেও এখানে প্রতিনিধি প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা বিচারপতি চৌধুরী অনুভব করেন। শেষ সময়ে হলেও বিচারপতি চৌধুরী ছাত্র নেতা মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু কে রুমানিয়ায় যাওয়ার অনুরোধ করলে তিনি রাজি হন। মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কিত প্রচার পত্রিকাসহ ৩০ আগস্ট বুখারেস্টের দু'শ মাইল দূরে সম্মেলন স্থান সিনাইয়া শহরে পৌঁছেন। মঞ্জু ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শরা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করেন। শরা ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর কার্য পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়। ভারতীয় দলের অন্য দু'জন সদস্য শিশির গুপ্ত ও হোসেন জাহির তাঁকে অন্য দেশের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এই সম্মেলনে মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু মার্কিন প্রতিনিধি দলের সদস্য জেরি স্মিথের সঙ্গে দেখা করে পাকিস্তানে সমরাস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করতে অনুরোধ করেন। এরপর মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের কাছেও সদয় ব্যবহার এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লাভ করেন। ড. থর্নার সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়। থর্নার একজন শিক্ষক। ঢাকায় হত্যাযজ্ঞের সময় তিনি সেখানেই ছিলেন। স্বভাবতই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক এ্যালভেন এর সঙ্গে মঞ্জু দেখা করেন এবং তাঁকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর চিঠি ও বেশ কিছু প্রচারপত্র দেন।[১৮৫]

১ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্যারিসে আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রায় ৭০০ প্রতিনিধি যোগ দেন। সম্মেলনে যোগদানকারী পার্লামেন্ট সদস্যদের বাংলাদেশে সংঘটিত পাকিস্তানি বর্বরতা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ব্রিটেন থেকে বাংলাদেশ স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন নজরুল ইসলাম, এস এইচ প্রামাণিক, ওয়ালী আশরাফ, খোন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু। ছাত্র প্রতিনিধিরা নানা দেশের পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদের নিকট বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং মুক্তি আন্দোলনের ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করেন। এমনকি তাঁরা এ সম্মেলনে বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করে বক্তব্য রাখারও সুযোগ পান। ১ সেপ্টেম্বর প্যারিসে পৌঁছে ছাত্র প্রতিনিধি দলটি সম্মেলনের সভাপতি আঁদ্রে সেনারনাগারের সঙ্গে দেখা করে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর চিঠি তাঁর হাতে দেন। এ চিঠিতে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মুজিবনগর সরকারের পার্লামেন্টকে স্বীকৃতিদানের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ছাত্র প্রতিনিধি দল যে সকল কাজ করেছেন–

ক. প্রত্যেক প্রতিনিধি দলের নেতার নিকট বিচারপতি চৌধুরীর চিঠি পৌঁছে দেন। এই চিঠির সঙ্গে ছিল বাংলাদেশ সম্পর্কে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদদের লেখা প্রবন্ধ ও বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ এবং বিদেশি সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত সংবাদ।

খ. ছাত্র প্রতিনিধিরা ফ্রান্সের জাতীয় সমিতির সঙ্গেও বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বাংলাদেশের নির্যাতিত ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের জন্য তারা একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করে।

---

[১৮৫] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

ছাত্র প্রতিনিধি দলটি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং পাকিস্তানকে অস্ত্র না দেওয়ার জন্য তাদের দাবি উত্থাপন করেন। ছাত্র প্রতিনিধি দলটির সফল প্রচারণার ফলে নরওয়ে, ইতালি, আয়ারল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। লাইবেরিয়ার প্রতিনিধি দলের নেতা বাংলাদেশ সরকারকে আফ্রিকায় একটি কূটনীতিক দল প্রেরণের পরামর্শ দেন ও তাদের সকল প্রকার সাহায্যের আশ্বাস দেন। জর্ডানের প্রতিনিধি দলের নেতা আল হোসাইনী পাকিস্তানি অত্যাচার ও নিপীড়নের কাহিনি শুনে মর্মাহত হন এবং দেশে ফিরে গিয়ে সব কথা জর্ডানের বাদশাহকে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। মার্কিন প্রতিনিধি দলের সদস্য জ্যাকভ ডেভিডস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণ শুনে বলেন, দেশে ফিরে গিয়ে এসব কথা তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে জানাবেন। মিশরিয় প্রতিনিধি দলের নেতা বলেন প্রথমে মিশর থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় পাকিস্তানি দূতাবাস থেকে জানতে পেরেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে দ্বিখণ্ডিত করার অপচেষ্টা মাত্র। কিন্তু আলোচনার পর তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই বলে মন্তব্য করেন।[১৮৬]

৩০ অক্টোবর লন্ডনের হেনরী থর্ণটন স্কুলে বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি এই সম্মেলনের আয়োজন করে। ম্যাঞ্চেস্টার, লীডস, বার্মিংহাম, এক্সেটার, কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র প্রতিনিধি দল এ সম্মেলনে যোগদান করেন। সকাল বেলার ঘরোয়া অধিবেশনে কমিটির কার্যবিবরণী পেশ করা হয়। মধ্যাহ্নভোজের পর বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলন উদ্‌বোধন করেন। শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোর এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ছাত্র প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। বিকেলবেলার অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক রেহমান সোবহান স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ডা. আজিজুর রহমান খান স্বাধীনতা সংগ্রামের অর্থনৈতিক পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। সম্মেলনে ছাত্ররা ঘোষণা করেন, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো সমাধান তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কোনোরকম আপস আলোচনায় তাদের আস্থা নেই। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের গৌরবজনক পরিণতি তাদের কাম্য।[১৮৭]

মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল বৈদেশিক মন্ত্রণালয় এর ওপর। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্যরা শুরু থেকেই বহির্বিশ্বে কীভাবে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরবেন সে ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কুশলী। মুজিবনগর সরকার বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ও প্রচার নিয়ে ব্যস্ত কর্মসূচি চলাকালীন মন্ত্রিপরিষদের একজন সদস্য গোপনে পাকিস্তানের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার সংবাদে তারা কিন্তু তাদের চিন্তা ও কর্ম

---

[১৮৬] আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫-১৪৬
[১৮৭] ওই, পৃ. ১৭৩

থেকে পিছিয়ে আসেননি। বরং মন্ত্রিপরিষদের ওই সদস্যকে নিষ্ক্রিয় করে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে তৎপর ছিলেন। মুজিবনগর সরকার প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিল যে, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের জন্য একটি সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করতে পারে একমাত্র পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকরা। তাই তাদেরকে মুজিবনগর সরকার দুটি বার্তা দিয়েছিল। পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার অথবা পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত থেকে গোপনে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করা। কিন্তু বেশিরভাগ বাঙালি কূটনীতিকদের এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বিলম্ব হয়। এসময় মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বেশ কিছু দক্ষ ব্যক্তি এবং দেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদেরকে ভ্রাম্যমান কূটনীতিক বা কূটনীতিক প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করে। মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন, আন্তর্জাতিক সেমিনার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রচার প্রচারণার জন্য এসব ব্যক্তিবর্গকে কাজে লাগিয়েছেন। তারা পেশাগত জীবনে কূটনীতিক নয় কিন্তু ভ্রাম্যমান কূটনীতিক হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করেছেন। একজন দক্ষ কূটনীতিককে ধাপে ধাপে কূটনীতিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। জানতে হয় বিশ্ব রাজনীতি, কর্মরত দেশের বৈদেশিক নীতি। তাই স্বাভাবিকভাবে অন্য যে কোনো পেশার চেয়ে এ পেশায় দক্ষতা বেশি প্রয়োজন। প্রশিক্ষিত কূটনীতিক না হয়েও যাদেরকে কূটনীতিক প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হয় তারা সুদক্ষ কূটনীতিকের মতো বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কাজ করেছেন। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রিপরিষদের সকলের আস্থা ছিল এসকল প্রতিনিধিদের ওপর। পরিপূর্ণ কূটনীতিক জ্ঞান সম্পন্ন কূটনীতিকের মতো তারাও মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছেন কয়েকটি লক্ষ্য সামনে রেখে। দেশকে হানাদার মুক্ত করা, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নেওয়া এক কোটি শরণার্থীর বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা সর্বোপরি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রহসনের বিচার বন্ধ করে তাঁর মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালানো। রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের মতো তারাও আন্তর্জাতিক রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে নিজ দেশের সমর্থনে জনমত সৃষ্টি করেছেন। রণাঙ্গনে একজন যোদ্ধা প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাথে উন্নত অস্ত্রের সামনে যুদ্ধ করে আর এ সকল কূটনীতিকরা যুদ্ধ করেছেন ক্ষুরধার বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা। কূটনীতিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তারা সব জায়গায় যে ভালো ব্যবহার পেয়েছেন তা কিন্তু নয়। কিছু ক্ষেত্রে তারা অসহযোগিতামূলক আচরণও পেয়েছেন। কিন্তু তারপরও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা ভেবে তাদের দায়িত্ব থেকে পিছপা হননি। প্রতি মুহূর্তে নতুন উদ্যমে নতুন কর্মকৌশল নিয়ে কাজ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায় করেছেন। এসব কূটনীতিক প্রতিনিধিবৃন্দ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভারতের কূটনীতিকদের সহায়তায় তাদের কূটনীতিক কার্য সম্পাদন করেছেন। কূটনীতিকরা শুধু জনমত গঠন করেননি। তারা জনমত গঠনে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা, গণহত্যা, শরণার্থী সমস্যা, বঙ্গবন্ধুর বিচার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রচার পুস্তিকা তৈরি করেছেন। সেসব প্রচার পুস্তিকা প্রচার করে জনমত সৃষ্টি করেছেন। তারা বিদেশি গণমাধ্যমে বক্তৃতা বিবৃতি দিয়েছেন। মুজিবনগর সরকার সাধ্যমতো এসব কূটনীতিক প্রতিনিধিদের কূটনীতিক কার্য সম্পাদনের জন্য অর্থ দিয়েছে। যৎসামান্য অর্থ ও স্বাধীন হওয়ার মনোবল পুঁজি করে তারা আন্তর্জাতিক রণাঙ্গনে সাহসী সৈনিক হিসেবে নিজেদের স্বার্থ আদায়

করেছেন। সবশেষে বলা যায় যে, মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যাদেরকে বাছাই করে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ছিলেন খুবই দক্ষ। তাই তারা তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। সে কারণেই বাংলাদেশ খুব অল্প সময়ে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বিশ্বে তার অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

অধ্যায় ছয়
উপসংহার

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়। নির্বাচনের ফলাফলের পর আপামর জনসাধারণ মনে করেছিল এই প্রথমবার বাঙালি প্রধানমন্ত্রী হবেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক শেখ মুজিবুর রহমান। আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৯৭০ এর নির্বাচনের পুরো ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই ৮ ডিসেম্বর স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইন্টিলিজেন্স ও রিসার্চের প্রধান রে ক্লাইন কিসিঞ্জারের কাছে একটি বার্তা পাঠান। সেখানে তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিব 'ভূমিধ্বস বিজয়' অর্জন করতে যাচ্ছেন ও ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে যাচ্ছেন। যা ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছেও অভাবিত। তাই ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তর না করার গোপন ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে।

২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক নিরস্ত্র ও নিরীহ বাঙালি জাতির ওপর আক্রমণের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র প্রকাশ্য রূপ পায়। পাকিস্তানিদের অতর্কিত আক্রমণের ফলে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে এবং কিছুকালের জন্য সারা দেশে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে এদেশে কে সুনিশ্চিতভাবে ক্ষমতায় রয়েছে তা বলা কঠিন হয়ে যায়। এমনকি পাকিস্তান না বাংলাদেশ সেটাও বলা সহজ নয়। ঢাকার ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে কিন্তু ঢাকার বাইরে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। প্রত্যেক এলাকায় পাকিস্তান বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায় যা ক্রমেই প্রতিরোধ যুদ্ধে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যতটা না পেশাদার সৈনিকদের তার অধিক জনতার। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ এই যুদ্ধে কোনো না কোনো উপায়ে অংশগ্রহণ করেছে। ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, সেনাসদস্য, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যসহ আপামর জনগণ যেমন মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তেমনি পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকরিরত বাঙালি সদস্যরাও নানা উপায়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। সরকারি চাকুরেদের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের বড় প্রমাণ ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের সফলতায়। সরকারি চাকুরেদের একটি বিশেষ শাখা হচ্ছে যারা বিভিন্ন দেশে কূটনীতিক হিসেবে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।

বিশ্বব্যাপী পাকিস্তানের দূতাবাস বা মিশন প্রতিষ্ঠার রীতি চালু হয় ১৯৪৯ সাল থেকে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাকিস্তান দূতাবাস বা মিশনগুলোতে অনেক বাঙালি সদস্য কর্মরত ছিলেন। এসব বাঙালি সদস্যদের মধ্যে ২৫ মার্চের গণহত্যার পরপরই ৬ এপ্রিল ভারতের দিল্লিতে পাকিস্তান মিশনে কর্তব্যরত দুইজন বাঙালি কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক পাকিস্তানের আনুগত্য অস্বীকার করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে গ্রেফতারের পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের দিল্লি মিশনের এই দু'জন বাঙালি সদস্য পাকিস্তানের

আনুগত্য ত্যাগ করে ভারত সরকারের কাছে নিরাপত্তা আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ভারত প্রতিবেশি রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে পাকিস্তানি জান্তার আক্রমণের বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিল। ফলে ভারত এই দু'জন বাঙালি কূটনীতিককে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করে। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশের কূটনীতিক দূতাবাস বা মিশনের বাঙালি সদস্যরা তখনও ছিলেন অনেকটাই দ্বিধান্বিত। কেননা বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল ঠিকই কিন্তু বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে বন্দি এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কোনো সরকার গঠিত হয়নি। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার ঘোষিত হয় এবং ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পরবর্তীকালে বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার পরিচালিত হয় ভারতের কলকাতা থেকে যা মুজিবনগর সরকার হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পায়। মুজিবনগর সরকার তার নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে একটি যুদ্ধকালীন সরকারের সমগ্র কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে।

যুদ্ধকালীন সরকার হিসেবে মুজিবনগর সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্ভাব্য সকল যুদ্ধক্ষেত্রসমূহে জোর কর্মতৎপরতা শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল কূটনীতিক ফ্রন্টে যুদ্ধ। আর এই কূটনীতির ফ্রন্টের যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাকিস্তানি দূতাবাসসমূহে কর্মরত বাঙালি সদস্যদের যুক্ততা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করার পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের আহ্বান জানায়। মুজিবনগর সরকারের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি কূটনীতিকরা তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করেন। আবার কেউ কেউ মুজিবনগর সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন আবুল মাল আবদুল মুহিত, মহিউদ্দিন আহমদ, ওয়ালিউর রহমান ও কমর রহীম। তারা সকলেই মুজিবনগর সরকারেরর শপথ গ্রহণের পর আনুগত্য পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূল না হওয়ায় আবার ক্ষেত্রবিশেষে পাকিস্তান সরকারের গোপন তথ্যাদি জানার জন্য তাদেরকে দূতাবাসের দায়িত্বে থাকতে বলা হয়। কিন্তু এর বাইরে পক্ষ ত্যাগে কেন বিলম্ব হয়েছে তা আলোচ্য ব্যক্তিবর্গ তাদের সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেননি। বরং তারা সকলে বলেছেন মুজিবনগর সরকারের নির্দেশেই তারা পক্ষ ত্যাগে বিলম্ব করেছেন। এ সংক্রান্ত প্রকাশিত মুজিবনগর সরকারের কোনো নির্দেশ বা দলিল, এমনকি মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কোনো বক্তব্য পাওয়া না যাওয়ায় ধরে নেওয়া যায় যে, তারা মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। অনুগত সরকারের নির্দেশেই আনুষ্ঠানিকভাবে আনুগত্য পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তারা সরকারের গোপন দূত হিসেবে দূতাবাসগুলোতে কাজ করেছেন। যা মুক্তিযুদ্ধকালীন ইতিহাসে বাঙালি কূটনীতিকদের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকদের অবদানের ইতিহাস অন্যান্য ক্ষেত্র এর তুলনায় নানাদিক থেকে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। প্রথমত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলেও বাংলাদেশের কোনো সরকার গঠিত হওয়ার পূর্বে স্বাধীন সত্তা হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি লাভ করতে পারবে না। এমন অবস্থায় কূটনীতিকদের পক্ষে একটি সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে আরেক

সরকারের অধীনতা স্বীকার করাটা সহজতর। অপরদিকে যেসব দেশে পাকিস্তানের দূতাবাস বা মিশন ছিল স্বাভাবিকভাবেই সেসব দেশ পাকিস্তানের মিত্র রাষ্ট্র। এসব বিবেচনায় সাধারণভাবে মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার পর কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার সুযোগ তৈরি হয়। এক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকার পত্রযোগাযোগ ও অন্যান্য উপায়ে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত এসব বাঙালিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থানের জন্য নির্দেশ দেয়। তবে এক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকারের কিছু কূটনীতিক কৌশল অবলম্বনের কথা সে সময়ের কর্তব্যরত কূটনীতিকদের বক্তব্য থেকে জানা যায়। বিভিন্ন দূতাবাসে কর্মরত কূটনীতিকদের মুজিবনগর সরকার পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের জন্য বিভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করে দেয়। তবে এসব নিয়মতান্ত্রিক অবস্থানের বাইরে অনেক কূটনীতিক অনেকটাই ব্যক্তি উদ্যোগে প্রকাশ্যে কর্মরত দেশে বা অন্য কোনো দেশে গিয়ে প্রকাশ্যে পাকিস্তানের বিরোধিতা করে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেয়। যেমন ইরাকের রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ, আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমিন, নাইজেরিয়ার বাঙালি কূটনীতিক মহিউদ্দিন আহমদ জায়গীরদার উল্লেখযোগ্য। তারা শুরু থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন। অবস্থানরত দেশের পরিবেশ অনুকূল না হওয়ায় এবং ওই দেশে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে এই বিবেচনায় লন্ডনের মতো স্থানে গিয়ে তারা তাদের আনুগত্য পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছেন। তবে গবেষণায় এর বিপরীত কিছু চিত্রও ওঠে আসে। কোনো কোনো কূটনীতিক জাতিগতভাবে বাঙালি অর্থাৎ পূর্ব বাংলার অধিবাসী হয়েও শেষ অবধি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সহমর্মী ছিলেন না। আবার এমনও কূটনীতিক ছিলেন যারা বিজয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তান দূতাবাসে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চাকরি করতে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য স্বীকার করেন।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত এসব বাঙালি কূটনীতিকদের কর্মকাণ্ড অনুসন্ধানে এমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণিতে ছিলেন একদল বাঙালি কূটনীতিক যারা মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই রাজনীতি সচেতন অর্থাৎ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে সজাগ ছিলেন এবং বাঙালি হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক মহলের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অবস্থা যা-ই হোক পাকিস্তান সরকারের অধীন চাকরি করবে না। এদের মধ্যে ছিলেন- কে এম শিহাবুদ্দিন, আমজাদুল হক, এ এইচ মাহমুদ আলী, মহিউদ্দিন আহমদ, এস এ করিম, এনায়েত করিম, আবুল মাল আবদুল মুহিত, শাহ এ এম শামসুল কিবরিয়া প্রমুখ প্রভাবশালী কূটনীতিকগণ। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছিলেন একদল বাঙালি কূটনীতিক যারা মুজিবনগর সরকারের নির্দেশ পাওয়ার পর আনুগত্য পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এদের সংখ্যাই বেশি। তৃতীয় শ্রেণিতে ছিলেন সে সকল কূটনীতিক যারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দরকষাকষির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই দলভুক্ত কূটনীতিকরা তাদের মর্যাদাশীল চাকরির বিপরীতে মুজিবনগর সরকারের কাছ থেকেও সমমর্যাদার সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য দরকষাকষি করেছেন। তাদের এই দরকষাকষিকে

ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'দিক থেকে বিবেচনা করা যায়। ইতিবাচক দিক থেকে দেখলে বলা যায় যে, দরকষাকষি করাটা ন্যায়সঙ্গত। কেননা কূটনীতিক পেশার মতো একটি মর্যাদাশীল চাকরি পরিত্যাগ করে অনিশ্চিত জীবনের পথে পা বাড়াবেন তারা। তাদের পরিবারের আর্থিক নিশ্চয়তা কী হবে তা তাদের সবার আগে জানা প্রয়োজন ছিল। এ প্রয়োজন বোধ থেকে তারা দরকষাকষি করেছেন। নেতিবাচক দিক থেকে বলা যায় যে, যেখানে ভারত, ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তিনটি বৃহৎ পরাশক্তি সম্পন্ন দেশে কর্মরত কূটনীতিকরা কোনোরূপ চিন্তা না করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। সেখানে তারা কেন দরকষাকষি করছেন? অন্যান্য কূটনীতিকদের মনে এমন প্রশ্ন উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। এদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার বাঙালি কূটনীতিক এম হোসেন আলী, দিল্লির বাঙালি কূটনীতিক হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, ইংল্যান্ডের এম এম রেজাউল করিম। আরেক শ্রেণিভুক্ত বাঙালি কূটনীতিক ছিলেন যারা মুজিবনগর সরকারের গোপন নির্দেশ অনুযায়ী দূতাবাসে অবস্থান করে গোপনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কাজ করেছেন। তারা প্রতি মুহূর্তে পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা নজরদারিতে ছিলেন। এমনকি ধরা পড়ে গেলে পাকিস্তানে ফেরত কিংবা চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে জেনেও তারা একাজ করেছেন। আবার এক শ্রেণির কূটনীতিক মুক্তিযুদ্ধকালীন চতুরতার আশ্রয় নিয়েছেন। তারা মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে সকল বাঙালি কূটনীতিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি। বরং তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যদি বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তখন তারা তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করবেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতি প্রকৃতি পরিবর্তন হতে থাকলে এই শ্রেণির কূটনীতিকরা বুঝতে পারেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসন্ন। তখন তারা তাদের পক্ষ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। অবশ্য না নিয়েও তাদের কোনো উপায় ছিল না। কেননা অধিকাংশের পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ফেরত যাওয়ার নির্দেশ জারি হয়েছিল। এই শ্রেণির কূটনীতিকদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার মন্ত্রী মফিজ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন- 'তাঁরা সময় গণছিলেন – ইংরেজিতে যাকে বলে, 'সিটিং ওভার দি ফেন্স' অর্থাৎ প্রাচীরের উপরে বসে পা দোলাচ্ছিলেন, সুযোগ মত এ পারে, কি ওপারে নেমে পড়বেন, অর্থাৎ শ্যাম ও কুল দুটোই রক্ষায় রাখছিলেন।' এই শ্রেণির কূটনীতিকদের সংখ্যাই বেশি। তারা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফিরে এসেছেন এবং যথারীতি সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পদে আসীন হয়েছেন। তারা কম-বেশি সকলেই প্রচার করেছেন যে, পরিবেশ অনুকূল না হওয়ায় তারা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে পারেননি। তারপরও মুক্তিযুদ্ধকালীন যে ৩৮ জন কূটনীতিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন তাদের অবদান কিন্তু কম নয়। বিশেষ করে কলকাতার বাঙালি কূটনীতিক এম হোসেন আলীর ৬৫ জন সহকর্মী সহ দূতাবাস দখল করে নেওয়া, মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করার পূর্বেই দিল্লির দু'জন কূটনীতিক কে এম শিহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হকের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতিকে তরান্বিত করেছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে এ এইচ মাহমুদ আলী কিংবা ইংল্যান্ডের মহিউদ্দিন আহমদের মতো বাঙালি কূটনীতিকের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ঘটনা মার্কিন মুল্লুক ও ইউরোপের অন্যান্য বাঙালি কূটনীতিকদের যেমন অনুপ্রাণিত করেছে তেমনি প্রবাসী বাঙালিদেরও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন তৈরিতে সক্রিয় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের সংবাদ চরমপত্র কথিকায় প্রচারিত হতো। যা অচিরেই বাংলার আপামর মানুষ জানতে পারতো। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন রণক্ষেত্রে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, রাজনৈতিক কর্মীরা প্রথম সাফল্যের আস্বাদ ভোগ করে আরো উদ্দীপ্ত হন। বাঙালি এসকল অভিজ্ঞ কূটনীতিকদের বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান মুক্তিযুদ্ধের একটি গৌরবজনক ঘটনা, একটি বিশিষ্ট স্তর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কূটনীতিকের ভূমিকাকে সরলীকরণের উপায় সামান্য। তাদের অবদান বিচার করতে গেলে উল্লিখিত প্রতিটি দলের অবদান ইতিহাসে পৃথকভাবে স্থান পাবে সন্দেহ নেই। তবে এটি স্বীকার্য যে, বিশ্বের সকল বাঙালি কূটনীতিক মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে সময়মতো পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করলে তা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অন্যভাবে প্রভাবিত করতে পারতো। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের কূটনীতিক ইতিহাস ভিন্নভাবে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হতো।

বাঙালি কূটনীতিকদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষাবলম্বন নিঃসন্দেহে একটি বড় ঘটনা। কিন্তু কূটনীতিকদের অবদান এর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তারা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন বলে গবেষণায় জানা যায়। যা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নানাভাবে তরান্বিত করেছে। কূটনীতিকদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের সংবাদ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রকাশ করা হতো যা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে সহায়ক ছিল। যদিও এটি তাদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য যেমন হুমকি বয়ে এনেছিল তেমনি অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে তাদের জীবনমানেরও অবনতি ঘটে। এ অবস্থায়ও তারা বাংলাদেশের পক্ষে নানা কূটনীতিক তৎপরতা চালায়। অভিসন্দর্ভের গবেষণায় দেখা যায় যে, বাঙালি কূটনীতিকরা জনমত গঠনে শুধু কাজ করেননি। তারা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে, আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেছেন, জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। আবার সংবাদ বুলেটিন প্রকাশ, মিশন বা দূতাবাস পরিচালনা, মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধিদের সহায়ক হিসেবেও কাজ করেছেন। নেতৃস্থানীয় অনেক বাঙালি কূটনীতিক আন্তর্জাতিক অনেক গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, মুজিবনগর সরকারের মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ, কবি-সাহিত্যিকদের সহযোগিতাও করেছেন। বাঙালি এসকল কূটনীতিকরা তাদের মর্যাদাশীল চাকরি ত্যাগ করে বাংলাদেশের সমর্থনে রাস্তায় দাঁড়িয়েছেন, সাধারণ মানুষের কাতারে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের পক্ষে তহবিল সংগ্রহ থেকে শুরু করে নানাবিধ কাজ করেছেন। এসব বিভিন্নমুখী কাজের সম্মিলনে তারা মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিকীকরণ করে তুলেছেন। বাঙালি কূটনীতিকরা তাদের বক্তব্য, কর্মতৎপরতায় বাংলাদেশের গণহত্যা, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি, শরণার্থী সমস্যা সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চিত্র উপস্থাপন করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন।

বিদেশি দূতাবাস বা মিশনে কর্মরত অধিকাংশ কূটনীতিক তাদের পরিবারসহ সে দেশে বসবাস করতেন। ফলে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার সময়ও তারা সপরিবারে অংশ নেন। অনেক ক্ষেত্রেই এসব পরিবারের নারীরা পৃথকভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা, তহবিল সংগ্রহসহ নানা কাজে নিয়োজিত হন। এছাড়া পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার পর এসব কূটনীতিক পরিবার আর্থিকভাবে হঠাৎ অনিশ্চয়তায় পতিত হয়। মুজিবনগর সরকার একটি যুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকার,

যার পক্ষে বিদেশে বসবাসরত কূটনীতিকদের পূর্বোক্ত মর্যাদার আর্থিক সহায়তা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তারপরও মুজিবনগর সরকার এসব কূটনীতিকদের আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল। এমন আর্থিক সংকটে কূটনীতিক পরিবারের নারীরা নানা ধরনের ছোট-খাট কাজ করে এমনকি শ্রমিকের কাজ করে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের কাজে নিয়োজিত হন। একই সঙ্গে তারা দেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্যও নানা কাজ করেন। যদিও তাদের জানা ছিল না আদৌ দেশ স্বাধীন হবে কিনা। কেবল দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হওয়া ছাড়া এমনটি করা সম্ভব নয়। একই কথা প্রযোজ্য দূতাবাস বা মিশনে নিযুক্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। তাদের ব্যাপারে মুজিবনগর সরকার থেকে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল না। কিন্তু বলা হয়েছিল যদি কেউ পাকিস্তানের চাকরি ত্যাগ করে তাহলে তাদের স্বাগত জানানো হবে। এমনকি তাদের কর্মসংস্থান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করা হবে। মুক্তিযুদ্ধকালীন এদের সংখ্যা ছিল বেশি। তারা সরাসরি কূটনীতিক নন কিন্তু অকূটনীতিক পদে থেকেও তারা দেশের জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করেছেন। তারা নিজেরাই সংগঠিত হয়েছেন। তাদের কেউ দূতাবাস বা মিশন কর্তৃপক্ষের আক্রমণের শিকার হলে পাল্টা প্রতিবাদ করেছেন। সহকর্মীদের সঙ্গে সহমর্মিতা ও সহানুভূতি জানিয়ে অনেকে নিজে থেকেই চাকরি ত্যাগ করেছেন। পরবর্তী অনিশ্চিত জীবনে কী হবে এটি তাদের চিন্তার বাইরে ছিল। তাদের সকলের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের জন্য কাজ করা। মুজিবনগর সরকারের প্রয়োজনে কিংবা মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনে যে কাজ অনেক সময় সরাসরি কূটনীতিকরা করতে পারতেন না তা অনায়াসেই এসব অকূটনীতিক পদে কর্মরত ব্যক্তিরা করতেন। কেননা তারা শুরু থেকেই ছিলেন সন্দেহের বাইরে। পাকিস্তান সরকারের মূল বিবেচনা ছিল বাঙালি কূটনীতিকদের নিয়ে। তাই এসব অকূটনীতিক ব্যক্তিরা মুজিবনগর সরকার ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এমন সকল কাজ করেছেন যা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি অনন্য ঘটনা।

পরিশিষ্ট ১
একজন বাঙালি কূটনীতিকের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগের বিস্তারিত বিবরণ

The Diary of Hossain Ali

April 17
Mr. A.K. Chowdhury, 3rd Secretary, was sent to transfer Tk 3 lakhs & Tk 4 lakhs from High Commission Account in my account. They came with cash Tk 4 lakhs in handbag and the rest Tk 3 lakhs were transferred to my account, which was later withdrawn & brought to the Mission safely. The Bank officials, mostly Indians, were extremely co-operative. When I left Calcutta in January 1972, the entire amount (Tk 7 lakhs) was transferred to Mission account against voucher & cash book entries.
Some of the staff who were taken into confidence became restive & nervous. There were some opposition & altercation about the admissibility of leaping into the dark. But all was silenced.
I take the key of the Mission Chevrolet Car (for DHC) from the Pakistani driver at 8-00 P.M. let him go.
The new flag of Bangladesh brought by Press Attache, Maqsood Ali, was too big 7 out of proportion-especially the red circle. My wife worked the whole night to correct it.
I had most disturbed night leaving had to wake up several times. My mind was too worked up. I had nebulous dreams of premonition.
Defection day
Sunday, 18th April
All officers & some members of staff got up early & collected together at 7-00 a.m. R.I. Chowdhury (whose wife 7 children were in Dacca) started pleading with me & all those present except Anwarul Karim Chowdhury started entreating me not to fly the Bangladesh flag.
Anwarul Karim Chowdhury took me in his car to the Chief Secretary, West Bengal, who assured me of all protection & even of continuation of diplomatic immunities. Later on I took R.I. Chowdhury with me again to the Chief Secretary to reassure him of their support.
My wife pleaded with them. Anwarul Karim addressed those concerned as having lost their heads as they seemed willing to go to Pakistan as stones.
These international squabbles had gone on till 12-30 P.M. when I ordered the hoisting of the flag, suddenly there a gust of wind & the Pakistani flag which was flying on top the 3 storied building was blown into pieces. I ordered that it be replaced by the new Bangladeshi flag.

When he flag was being hoisted, we all stood to attention and saluted.

The event was, to say the least, a water-shed in our lives. Nobody who did not have the experience could quite realize what it meant. It was as if we had died and were reborn. It was a break with the past and a leap into the dark, uncertain future.

Immediately after the flying of the flag I started leading a new life, and somehow all my anxieties were gone.

I issued a statement to the press which was mainly drafted by Anwarul Karim Chowdhury under my instruction.

In it we urged Yahya Khan & 'saner' sections of West Pakistan to accept the reality of the situation in Bangladesh and recognize its independence.

Processions of people streamed into the Mission as we threw the gates open for the first time for them. There were so many people inside the building today at a time that it became well-night impossible for the members of my Mission to meet and talk to all of them.

The A.I.R. interviewed me, my who and also the children. My wife's interview was emotional & hit the headlines. While describing the indiscriminate killings of professors, teachers & students by the Pakistani army she broke down in tears. She claimed that in view of the situation, she had pleaded with me to take this 'important step.'

What appealed to the listeners was her emotional honesty and her narration in tears of specific incidents. She said she would kike to fight for Bangladesh. The river of blood from Bangladesh has now reached where she was i.e. India.

My two daughters, Joli & Yasmin, who were standing by, also told the reporters that they would fight for Bangladesh & help bring independence as early as possible.

Angry demonstrators who had come to protest against barbarous attacks by Pakistani troops on the people of Bangladesh, had, as *if by magic, turned into a jubilant crowed when they saw the flag.*

They shouted 'Joy Bangladesh'- 'Joy Mujibur' and even 'Joy Hussain Ali'. There was continuous singing in front of the Mission interspersed with speeches.

Many came with garlands & I had to accept them......There were placed near the large photo Bangabandhu surrounded by photographs of Tagore and Nazrul Islam.

In the evening some officers from Inter-Services Intelligence Department of the Indian Armed Forces came to see me. They requested me to help them break the Pakistani Cypher Code. They suggested I should hand over cypher documents to them. This posed a great psychological problem to me..... Finally I decided to hand over certain papers, but *not all*.

U.S. Ambassador to India, Mr. Kenneth Keating said that what was happening in East Pakistan was the concern of the international community & could not be treated strictly as an internal problem of Pakistan.

He was voicing his own opinion, not that of U.S. Government, as we found out later.

REBELLION in CEYLON reached a high pitch. Military supplies & support was given by Britain (from Singapore) & by India to suppress the rebellion.

According to reports, Ceylonese terrorists were being supported by East Germany, Albani & principally by *North Korea*, with whom Ceylon served her diplomatic relations. It was a measure of defeat of Mrs. Bandarnaik's policy of hobnobbing with the communist regimes.

Muslims in India did not appear to support our liberation struggle. All Muslim countries in the world also seem to be strongly supporting Pakistan.

S.B.B.K. reported that Soviet Union, USA, UAR and Yugoslavia might recognize Bangladesh. This was most doubtful. Such unrealistic news unnecessarily strain the credibility of the betar Kendra broadcast.

Senator Muskie calls for immediate suspension of all military assistance to the Pakistan Government.

American Press reports on events in Bangladesh were creating a grounds well of public opinion in Favour of Bangladesh in U.S.A.

Today's papers banner headlined the proclamation t Mujib Nagar yesterday of Bangladesh as a formally constituted state to be run under a presidential form of Government.

The actual ceremony took place in Bhaberpara village (renamed MUJIBNAGAR) which is in Meherpur Sub-Division of Kushtia district & about 18 miles to the north-west of Chuadanga, which again changed hands &was now under army siege.

From now on MUJIBNAGAR was shown to be where the government was, although actually the Government remained in Calcutta under proper security arrangements of the Government of India.

Syed Nazrul Islam, Acting President & Mr. Tajuddin Ahmed, Prime Minister appealed for immediate recognition of the Government & asked for all possible help from all freedom bring countries of the World.

Khandakar Mostaque Ahmed, named Foreign Minister would tour a number of countries in the next 3 or 4 days.

Col.M.A.G. Osma was named C-in-C,

Pakistan Government claimed that they had collected 'ample & fool-proof evidence to show that he had conspired with India and some other foreign powers for declaring Bangladesh as an independent & sovereign country.

Congress (R) President, Sanjivay, opened a 26-member Committee to maimise relief efforts.

Mr. Peter Hazelhurst said that the tragedy of Biafra might pale into insignificance as seventy five million Bangalees might be threatened by widespread famine.

Indian Minister Moinul Huq Chowdhury, who met Maulana Vhashani, said that the latter had appealed to India to come to rescue of the people of Bangladesh. Maulana had also appealed for arms, which the Minister did not mention.

A few runs & priests of a Roman Catholic Mission in Sinnulia, a few miles south of Jessore were locked up by Pak. Army without food & water for four days now.

A.I.R. continually broadcast reports on our transfer of allegiance. Newspapers fully published my statement. *The photographs of the Mission, with flag flying,* were shown prominently on the front pages.

Pak. official of my mission came to report for duty, but was not allowed to enter. *I felt very bad about the members of staff from West Pakistan who were at least apparently loyal to me & as head of Mission. I wish I did not have to treat them the way I did. But there was no alternative.*

Although, I told the press that my first task would be to secure recognition of the Government from other nations, I know that it would not be an easy task.

I said that only after recognition could the question of aid from other countries be considered, but in reality to was the other way around. We sought and received material assistance from India & other countries first and recognition came much later even from India.

West Bengal Food Minister, Mr. Kasikanta Maitra said that time has now come for recognition of Bangladesh Government & if there was any further delay, he warned the situation in West Bengal, 'might be aggravated.'

Muslim intellectuals, for the first time, call for recognition of Bangladesh Government in a meeting held at Jamia Rural Institute at Okhla. The meeting was also attended by Soviet Embassy's Second Secretary, Boris Romanoff.

Sunday Telegraph queried:

"Has the conscience of man been permanently blinded by the age in which we live?"

Sheikh Mujib's photograph flanked by two Pak. Police officials appears in newspapers. He is reported to be imprisoned in Minwali Jail, after treatment for heart trouble at CMH, Rawalpindi. I hope Pakistan is not building up public opinion in support of Bangabandhu's liquidation, giving heart failure as the cause of his death.

সূত্রঃ The Diary of Hossain Ali, Episode 8, published in a Daily English Newspaper from Dhaka.

পরিশিষ্ট ২

পাকিস্তানের ওয়াশিংটন দূতাবাসে বাঙালি কূটনীতিকের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদলিপি

A NOTE OF PROTEST

By Messrs M.F. Ban, Muhid Cliowdhury and Mostaque Ahmed.

May 19, 1971

We have followed with great concern and dismay the actions of the Government of Pakistan in East Pakistan since March 25, 1971. We are appalled at the Coldblooded murder of tens of thousands of innocent and defenseless Bengalis and the brutal suppression of the Democratic movement for autonomy. The atrocities committed by the west Pakistani army against the civilian population of East Pakistan and the apparent intention of the Government to continue this inhumane course of action render our continued association with that Government repugnant to our sense of dignity and moral propriety.

This attitude of denigration toward the Bengali by the Government of Pakistan was further evidenced by the Summary, unjustified firing of Mr. A. R. Khan. an Assistant Education officer in the Embassy on 17th of May 1971 for his having attended the hearings of the United States House of Representatives Foreign Affairs Sub-committee of Asian and Pacific Affairs regarding the East Pakistan situation on May 11, 1971. The session attended by Mr. Khan open to all members of the public and Mr. Khan was there only as a spectator. He made no statement of any nature nor was his presence especially notable. The same session was also attended by Mr. Akram Zaki, a Counsellor of the Embassy of Pakistan along with other West Pakistanis.

The Embassy's seizure of this occurrence as a pretext to Mr. Khan for alleged "misconduct" make explicitly obvious the intention of the Government of Pakistan to extend its persecution of Bengalis even to those employed by that Government here in the United States.

We consider it both humiliating and discriminating that a Bengali employee should be fired while his compatriots from West Pakistan are not penalized for the same offence, if that indeed is an offence.

সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১। পৃ. ৭০১

পরিশিষ্ট ৩

প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতার উপর ভিত্তি করে "আমরা" গোষ্ঠী কর্তৃক প্রেরিত একটি প্রতিবেদন

Djakarta
13-06-71

1. U Thaw's opinion of refugee problem and his appeal for help appeared in the press widely. Radio & TV here included in the program me. Plight of refugees was shown in the TV. This was down to the much annoyance of Pakistanis and against attempts of Pakistani mission.
2. Refugee problem has shadowed reports of fighting of the liberation army. Still the reports of killing of 300 Pakistan army appeared. The news given by Aniara correspondent quoted to have been received from Bangladesh headquarters somewhere in East Pakistan.
3. IPECC future seems black. In the last meeting Pakistan's eagerness survived it. Pakistan committed to bear all expenses of running the Sect. With Mr. Sanaullah transferred from 1st Parch and another Rang Elahi moving shortly of assume the post S.O. there appears no probability of their substitutes. Sanaullah got the letter. He will decide in due course. IPECC lost its significance and purpose. a Aziz is a common guest in any meeting & Milad organized by Punjabis.
4. Reports of British intention to give to Pakistan aide and loans for development program me appeared in Antara. Djakarta and Straits Times, Singapore. Theses aids and loans were committed before the war.
5. Two Information Assistants in the Ministry of Information, Islamabad have been dismissed. This has struck other Bengalis with fear. There are credible rumors of other dismissals from other Ministries. Bengalis do not get air passage unless a certificate of honesty and loyalty is produced from tile employer to the PIA. In some cases leave is granted without T.A. still in many cases leave is refused. This is to keep them entrapped and prevent their entry into Bangladesh.
6. Armed Forces HQs of Pakistani are reported alert for any possible attack from India. They are apprehending some such a thing and directed their propaganda on this line.
7. Photographs of captured enemy personnel may be sent press here.
8. To relieve foreign exchange burden, payment of 20% of pay in Pakistan has been effected from June by Government.
9. It is reported their was demonstration before Indonesian and British Embassies in Delhi demanding support for Bangladesh cause.

10. Radio Pakistan has allotted more time for news and propaganda in Indonesian language. This has cut the afternoon monitoring time.
11. Maulana Maudoodi has reportedly written to all heads of Muslim States. He stressed that majority teachers and professors in East Pakistan were Hindus and the students were taught books written by Hindus and were influenced by Hindu ideas & policies. In essence, the Muslims the Muslims there were only by name and not in spirit.
12. Mr. Swaran Singh's visit to Moscow, Germany and Paris got wide publicity in local and foreign language papers. His interviews and dialogues with press and leaders, as reported here, were encouraging:
13. A rum our spread in Delhi about Kosygin's visit of Islamabad and Dehli for talks on repatriation of High Commission's staff published here.
14. For fear of losing their own political interest in the coming general election, sympathizing leaders are not seriously critical of Govet's apathy on events in Bangladesh.
15. Letters of Thanks and gratitude to editors & others as requested earlier will help publicity of our cause. They already did invaluable service. They may also be given materials for publications regularly.
16. This govt. is non-interventionist in Bangladesh affairs but it still has not put any restriction on press. this is a partial recognition facts which we stand for.
17. We are hndicapped of materials and guidelines. We requested earlier too.
18. Registered letters are not delivered at private addresses here. Please send communications by ordinary post.
19. A news item appeared in Antara said, among others, that 2000 deserters of E.P.R., and police surrendered at the call of Tikka Khan. 5000 refugees also returned to East Pakistan. The reports were made by Antraa correspondent from Calcutta.
20. Times, London carried a news item disclosing that liberation army recruits are being trained in 50 Indian camps.
21. Reports of deep resentments between locals and refugees in West Bengla appeared. A situation of near riot was however averted by officials.
22. Reports of Mr. Sharp and Ismat Kittani's talks with Pakistan govt. appeared. They said the talks were fruitful. Pakistan is cooperative and distribution of relief goods in East Pakistan will be through local administration under supervision of U.N. agency. U.N. cannot provide a great force for distribution.

সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১। পৃ. ৩৫৪-৩৫৫

পরিশিষ্ট ৪

PAKISTAN WILL MEET HER WATERLOO BANGLADESH

(Statement of Mr. Amjadul Huq, Bangladesh Press Attache, made to Foreign and Indian Journalists on July 3, 1971)

Mr. Amjadul Haq, Bangladesh Press Attaché, told Foreign and Indian Journalists here today that Bangladesh was the expression of the determination and will of the entire people. The new state, comprising 75 million people, has been formed after hard-own battles and heroic resistance which not all the forces of Pakistan can put down. It is based on a near unanimous vote of the people and its constitutionality, reality and popular base cannot be questioned." he said.

Mr. Huq, who switched over his allegiance to the Bangladesh Government three months ago, recalled that the Prime Minister of Bangladesh Government, Mr. Tajuddin Ahmed at the time of installation of his Government said that Pakistan was dead and buried under a mountain of corpses. The statement he issued on the tortuous negotiations which led to the declaration of independence of Bangladesh supports Mr. Ahmed's conclusion. It is a story of treachery, duplicity, negation of democracy throughout on the part of Yahiya, Bhutto and their agents of West Pakistan military regime. At no time throughout the negotiations there was any intention on their part to preserve the unity of Pakistan on the basis of respect for democratic rights. It was planned genocide, planned destruction of democracy and planned suppression of peoples will.

Mr. Huq added "There has rarely been such cold-blooded murder of democracy. But Bangladesh, built of the blood of thousands of martyrs, can never be undone by the Timurs of West Pakistan. It has come to stay. There is no power which can undo it."

Tracing the history of exploitation of Bangladesh for the last 23 years, the Press Attaché of Bangladesh here said that 90 percent of the total bank deposits were controlled by the West Pakistanis and almost 85 percent of the total capital of Pakistan was concentrated in Karachi alone and 87 percent of the total private investment was monopolized by 22 families of West Pakistan. Fifty percent of the national budget was deployed for the defense whereas there had been hardly 10 per cent of the total defense expenditure made in Bangladesh. In other words, politically, economically, administratively and militarily, the people of Bangladesh were completely subjugated and the democratic and freedom loving people of Bangladesh utterly hated to remain so.

The dark forces within Pakistan that ruled the country were basically anti-people, Mr. Huq said. They were part of the conspiracy between the military and civil bureaucracy and monopoly capitalists. These forces collaborated hand in hand and never allowed the

democratic forces to gather any strength. “Any student of the affairs of Pakistan knows it too well that it was a deliberate effort on the part of these vested interests to suppress the growth of healthy political institutions and time and again these forces combined and cruelly suppressed them by force.”

Yahya Exposed

Mr. Huq said at the time Yahya took over from Ayub the restoration of democracy was promised by the military junta. The Awami League moved forward to establish a democratic system in the country. Between December 7 and January 17 this year elections were held. The Awami League not only established itself as an absolute majority party in the former province but also an absolute majority in the National Assembly in the whole of Pakistan.

Awami League astounding and spectacular victories in the last general elections were the complete defeat for the vested interests of West Pakistan in Bangladesh.

“It is now clear”, Mr. Huq said, “that Yahya and his generals had not the slightest intention of solving Pakistan’s political crises peacefully and democratically but were only interested in buying time to crush the democratic people of Bangladesh.”

“A well trained and mechanized army of West Pakistan pounced on the weak and unarmed civilian population of Bangladesh on March 25 while negotiations were going on with Sheikh Mujibur Rahman and his close associates to and out a peaceful solution. This was an act of treachery.

“Bangladesh is now a free and sovereign country. A Government headed by Mr. Tajuddin Ahmed as Prime Minister is now functioning and is in full control of the affairs in Bangladesh. The West Pakistan army is nothing but an occupation force ill Bangladesh. They must quit Bangladesh and the sooner they do so the better for them and us.

At War with Pindi

“Our country is now at War. It is a total War of the total population of Bangladesh. Our present struggle is a struggle for liberation. There is no difference between our struggle and the struggle of the people of Russia, China and Cuba and Algeria which they had to sustain for their liberation. Our struggle is the same in nature as that of the American struggle for independence in the eighteenth century.

Bangladesh bleeds today. Its people are crying aloud in torment and agony. The blood bath the world has seen on the soul of Bangladesh remains unsurpassed in brutality and bestiality.

Cities and towns of this unforthmate land have been soaked with blood. For Bengalis it is a battle for survival. It is a war which we never wanted. It is a war which has been thrust on us by the power hungry Military junta.

We are fighting our battle with courage, determination and fortitude. Our brave men on the front. Mukti Fauj, have already proved their exceptional valour. Imbibed with the spirit of defending the honour and dignity of the motherland, the Mukti Fouj has already shattered the phoney myth of the enemy's superiority. We have sufficient fighting manpower. What we need now is arms assistance. This is imperative to contain the diabolical enemy equipped with latest war machines. Only then the Pakistan murderers.

Against Islam

Regretting the attitude of the Muslim countries to Bangladesh Mr. Huq said that "we know that the West Pakistan colonial Government is carrying on heinous propaganda in the Muslim countries in the name of Islam." But we hope our friends in Muslim countries will not be victims of their utterly false propaganda. Bangladesh is a fair accomplish and there cannot be any question of any political solution. Today there cannot be any compromises on the basis of a united Pakistan in the name of Islam. The Pakistanis are utilizing the name of the great religion of Islam for mischievous purposes to mislead the Muslims. Let us ask you, can an innocent Muslim child be butchered by a Muslim? Can the innocent Muslim girls be raped and butchered by the Muslim soldiers of West Pakistan in the name of Islam and unity? Why are the West Pakistan soldiers raping Muslim women and butchering those killing Muslim Doctors, teachers, scholars, businessmen? It that Islam upon which West Pakistan rulers are relying today? Our earnest appeal to the Muslim countries is they should come forward and condemn openly the inhuman massacre and genocide that are being carried on by the West Pakistan trigger happy troops in Bangladesh in the name of Islam.

"The war of West Pakistan troops should not be taken to be the only. With the people of Bangladesh. It seriously threatens the peace of the whole of South Asia.

Expressing his surprise at the attitude of the Human Rights Commission on Bangladesh issue. Mr. Huq asked, "When 75 million people of Bangladesh are fighting war of freedom justice, democratic principles and peace? What are the international organisation doing today? What are then the objectives of such international organisation? What are the ethics of international solidarity and that are the principles of international relations?"

Gratitude to India

Expressing his firm confidence in the ability of the people of Bangladesh. Mr. Huq said We are fighting a winning war because we are fighting out of conviction. We know our ultimate goal and brave soldiers of Mukti Fouj shall continue to fight for years, if necessary, complete victory is achieved and West Pakistan forces are driven out of Bangladesh. In this effort, we seek active support, both moral and material from all nations of the world. We urge all the countries of the world to recognise our Government of Bangladesh. We want all nations give us recognition the honour that we most certainly

serve. “He expressed his deep gratitude to people of India for their moral support to the cause of Bangladesh.”

Expressing great concern over the six million refugees who have crossed over for shelter to India, he said the people of Bangladesh “will remain ever grateful to the people and Government of India what are they doing for the helpless refugees. This is not a simple task which can be undertaken by India alone.” He appealed to the international community to rush relief to the succor of the suffering humanity.

Referring to the resumption of American Arms sales to Pakistan. Mr Huq said that “it has set off waves of sanger and resentment amongst the 75 million people of Bangladesh. We urge the US Government that it should immediately stop arms shipments to Pakistan and also demand an assurance that no further shipments of military stores will be made to Pakistan to perpetrate the genocide on Bangladesh”. He urged the U.S.A with all its traditions of freedom and humanitarianism to stop giving aid to Pakistan either military or economic.

Those who still believe in united Pakistan should understand clearly that as Yahya flew out of Dacca on the night, of March 25, he took away with him last hopes of “united Pakistan.”

Added for his reaction to Yahya’s lates broadcast, Mr. Huq said “this is all a load of rubbish and nonsense. Anyway we are not concerned with it. Ours is an independent country and Yahya is the head of another state. Many diplomats in Delhi bave told me that Yahya is not an intelligent man. You can clearly see that till today he has not been able to get a quisling to form a puppet Government there.”

About the Urdu press, he said that on June 26 he attended a seminar on the Urdu press. If the speakers at the session were truly representative of the Urdu press in general, he felt that the Urdu press shared the Indian national mood on Bangladesh.

‘We hope and appeal to them to come forward to expose the treachery of Yahya Khan in Bangladesh more and more support our cause wholly’/

Commenting on the acute economic crisis in Pakistan, Mr. Huq said that the austerity measures announced by the Pakistan Government to meet the grave economic crisis shows how much they are economically bankrupt today. The war in Bangladesh has led to a complete dislocation of the economy there. It is costing around 52 million a day. It has led to their huge budget deficit which has not been recorded to the world entirely. This is about 50 per cent of the budget cost and will have to be finance by creating paper currency which must inevitably add to the inflationary pressure. With West Pakistan import deficit running at 40 dollar million a month Pakistan’s reserves have reached a vanishing point. A unilateral moratorium on foreign debt repayments falling due by this time merely publiciges Pakistan’s total bankruptcy.

About a political solution Mr. Huq said, ‘Our Acting President Syed Nazrul Islam, and the Prime Minister, Mr. Tajuddin Ahmed, have already spelt out four conditions for a political settlement. They are unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman, recognition of the Bangladesh Government, withdrawal of the invading West Pakistan army, compensation for the losses suffered by the people during the last three months of barbarous activities by the West Pakistan army. Until and unless they fulfill these conditions the people of Bangladesh will continue to fight till they achieve their independence fully”

সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১। পৃ. ৭৫০-৭৫২

পরিশিষ্ট ৫

MISSION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

9 CIRCULAR AVENUE
CALCUTTA-17
July 11, 1971

FOR THE MEMBERS OF BANGLADESH
DELEGATONS GOING ABROAD
On arrival at New Delhi, please contact the following person:

(1) Mr. K.P.S. Menon, Joint Secretary, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, Phone No: Office-371864 & Residence: 383387
(2) Mr. Alfred Vaz, Director, Co-ordination, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi.
(3) Mr. K. M. Shehabuddin, Bangladesh Representative, C-119, Anand Niketon, New Delhi, Phone No. 626405.

Your accommodation, transportation, bookings and foreign exchange will be arranged by Mr. Vaz. Briefings will be provided by Mr. Menon.
For general assistance, please contact Mr. Shehabuddin.

Sd/-
(Anwarul Karim Chowdhury)
for HEAD OF THE MISSION

1. Mr. M.R. Siddiqi
2. Mr. Molla Jalaluddin
3. Dr. Qureshi
4. Mr. M.A Samad
5. Mr. Abdul Malek
6. Mr. Nurul Quadir

সূত্র: মুহাম্মদ নুরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৭। পৃ. ১৮৬

পরিশিষ্ট ৬

পাকিস্তানের সরকারি চাকরি ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপনের কারণ সংবলিত বাঙালি কূটনীতিক আবুল মাল আবদুল মুহিতের বিবৃতি

WHY I QUIT

July 27, 1971

The question that I would try to answer this evening in "What made me dissociate myself from the Government of Pakistan and espouse the cause of Bangladesh," Since March 25, I have been deferring this decision in the hope that President Yahya Khan would make a proper move for a peaceful settlement of the crisis. No ground exists for such a hope anymore and so it becomes impossible to go on working for a self-destructive government.

I must admit, however, that fifteen years of service with the government of my country, which was the dreamland of my adolescent years, could not be lightly brushed aside. I had also fond memories and associations, such as one of working for president Yahya himself.

The questions that agitate me about the Government that is now in power in Pakistan are those relating to its legitimacy, its colonial ambitions, its savagery, its political and economic blunders, and its utter lack of humanitarian Concern.

President Yahya used to call his government a caretaker government waiting to hand over power to people's representatives. Now he has suppressed people's representatives elected in the most free and fair elections ever held in the country, has banned the most popular political party in the country for even and he has indicated that material law will not be lifted in the foreseeable future. Thus his government now has lost all claims to legitimacy.

Instead of guaranteeing the security of lives and property of its citizens the government of Pakistan has made the fact of "Staying alive" the greatest luxury in East Pakistan. Atrocities that this government is committing in East Pakistan, the frenzy with which its is driving Bengalese out of the country and the suppression that it is making of dissent in both wings of the country, not only forfeit the right of this government to a place in a civilized world but also make it responsible for dismemberment of the Country.

The government is desperately trying to establish a colony in East Pakistan through a reign of terror and a massive transfer of officials and laborers from the west. For a poor country with many other problems in hand such an attempt is sheer madness.

The government has embarked on a dangerous course of action which it is pursing relentlessly. It is very frightening because it is so mindless. It has not only escalated a

war situation in South Asia but also sown the seeds of violent social upheaval in that area. It is bleeding East Pakistan white and at the same time running the economy of West Pakistan too.

In East Pakistan today the extent of human misery is simply incomprehensible. Leaving aside the death toll and destruction f property on account of army strikes, the specter of famine is horrifying. Total disruption of communication network coupled with the gripping sense of terror has virtually halted all economic activities and movement of food grains and other necessities.

Despite the flight of seven million refugees, starvation in scattered pockets in East Pakistan now is unquestionable. Against a food gap of 2.3 million tons during last fiscal year only 1.3 million tons could be imported. And also movement of food stocks within the country from surplus to deficit areas remained suspended since March.

Prospects in the immediate future are bleaker still. The most optimistic estimate places production this year at 30% less than normal meaning deficits of 3.5 million tons. Even if the refugees do not return, it will be necessary to ship 2.5 million tons of food grains into East Pakistan between now and June 1972. The internal transportation system with all possible addition of river vessels cannot handle more than 100,000 tons a month even if acts of insurgency remain at the low level of last month. This however, is contrary to facts; there is evidence of intensification of such activities. I cannot visualize how food grains in excess of 1.2 million tons can be supplied to East Pakistan during the current year under present conditions. If hungry millions are to be saved the first essential conditions is restoration of peace in East Pakistan. I mean genuine peace and not the silence imposed by guns and bayonets. The Second condition is involvement of the entire population in a crash program for food distribution. None of these conditions, I am afraid, can be met as long as Pakistan government's military stronghold continues in East Pakistan, as long as Langlade people nurture their sullen fear and resentment and as long as they continue to fight either directly or through sabotage and non-Cooperation.

In 1943 Bengal had the worst famine in its history. Transport system was out of gear due to war and shortage of food amounted to 6%. That famine took a toll of between 2.5 to 5 million lives. This time the death toll is going to be multiplied by three times. This means in the next 3 months some 7.4 to 15 million people will starve.

I do not intend to sound like a prophet of doom. I believe the position can be redeemed. The world should not sit by in impotent anguish and witness the destruction of a people. it is dangerous to allow the Bangalee people to be totally brutalized. It is still more dangerous to permit madness in political behavior.

Let me conclude by appealing to the conscience of the world to raise its voice effectively against Pakistan's Madness.
-A.M.A. Muhith

সূত্র: হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১। পৃ. ৭০৬-৭০৭

পরিশিষ্ট ৭
বাংলাদেশ সরকারের প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশের সংবাদ

PHILATELIC DEBUT OF BANGLADESH

Date of First Issue: July 29, 1971

The Government of Bangladesh which in April 1971 broke away from West Pakistan and proclaimed itself an independent State has authorized the international distribution of its first issue of postage stamps.

The first issue of eight Bangladesh stamps will be released on July 29. The stamps consist of 10.20 and 50 paisa's and 1, 2, 3, 5 and 10 rupees. (The rate of exchange is 20 Bangladesh rupees to the 1, the complete issue being equivalent to 1-09p.) This is a Definitive issue.

These stamps are replacing those which until July 29 were used in Bangladesh Territories. These were Pakistan stamps overprinted Bangladesh

This first series will be used for internal mail and for external postage being accepted by the Government of India for noward transmission.

The eight separate designs for this first series from the Government of Bangladesh dramatically and colorfully illustrate the great struggle for independence of the new state.

The designs are the work of Biman Mullick, the Bengalee graphic designer who designed the Gandhi Memorial stamp for the British Post Office in 1969 winning two gold international medals for the best Gandhi stamp issued by any country in the world.

The Bangladesh stamps are in the following denominations.

IOp. (paisa).Blue, scarlet, purple, Map of Bangladesh.

20p. Yellow, scarlet dark green, blue. Depicting Massacre at Dacca University on 25th-26th March – 1971.

50p. Orange, light brown, dark brown, greys. Bearing the numerals 75, denoting New*nation of 75 million people.* I Rs (Rupee).Yellow, scarlet, green. The Flag of independence, incorporating map of Bangladesh. 2 Rs. Blue, dark blue, magenta. *Election 1970*. Shows a ballot paper and stylized ballot box inscribed *Results-167*Seats out of 169 for Bangladesh. On side of box is highlighted 98%. 3 Rs. Green, dark green, blue. *Proclamation of independent Government on 10th April 1971.* Depicting the breaking of links with West Pakistan. 5 Rs. Assimilated gold, orange, dark brown, half-tone black. Portrait of Sheikh Mujibur Rahman, leader of Bangladesh. 10 Rs. Assimilated gold, magenta, dark blue. A Support BANGLADESH stamp.

Size: 25.5 mm. x 38.5 mm.

Printed by a lithographic process on white coated unwater-marked security paper by Format International Security Printers Ltd.
Perforation: 14V2X W/X.
In Britain, these stamps will be distributed exclusively to the philatelic trade by the Bangladesh Philatelic Agency who will sell direct at face value. Orders for the stamps, with remittance of -1.09p per set, plus 25p per order for registration and postage should be sent to: Bangladesh Philatelic Agency, Chobham, Woking Surrey.

সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১। পৃ. ৯২২-৯২৩

পরিশিষ্ট ৮

লন্ডনের হাইডপার্কের সমাবেশে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভাষণের বিবরণী

"Joy Bangla-Joy Bangla"

We have assembled here to put an appeal to the people of Great Britain and to the people of the World to convey our message to them that butcher Yahya Khan of West Pakistan is continuing an unabated program me of genocide on Bangladesh. And it is the duty of all the freedom loving people of the world to condemn him and to stop him continuing with his program me of genocide. Today we have here we are going with a procession after this meeting is over to the Chinese Embassy and to the American Embassy with our appeal to them to stop their Aid to Yahya Khan and his brutal regime. I will request you all to raise your voice against this tyrannies oppression and to raise your voice with us so that the government of the world particularly Govt. of the People's Republic of china and America stop aid and recognize Bangladesh. And I can only say to you that top stop this genocide is the only to raise your slogan with me, "Recognize, Recognize"-"Bangladesh, Bangladesh." "Recognize"-Long live, long live"- "Love live, long live"-"Bangladesh, Bangladesh." "Long live, long live"-"Bangladesh, Bangladesh." Thank you, I would now request our special representative of the Govt. of Bangladesh Hon’ble Mr. Justice Choudhury to come upon the stage and to say few words to you. Thank you very much.

Clapping and Slogans: Joy Bangla!

Justice Abu Sayeed ChoRdhury

"Friends and fellow citizens of independent Bangladesh, I convey to you on behalf of the Govt. of Bangladesh, their sense of gratitude and the warm Sympathy and support at this hour of our grim struggle.

Clapping.......

You are aware, ladies and gentlemen, that we have been trying by constitutional means to put an end to the political domination and economic exploitation which we have suffered in silence for the last twenty there years. But you are also aware, ladies and gentlemen, how the army junta of Yahya Khan stopped the attainment of our goal by constitutional means. And on the twenty-fifty March a midnight they let loses the army on the unarmed civil population of Bangladesh and committed and is still committing genocide on the people of Bangladesh. In the wake of this massacre, went up the spontaneous cry of independence (shame! shame! .....) and the seventy five million people declared themselves independent of Yahya Khan's administration.

Clapping......

We are now engage in grim struggle to thwart the invading army of Yahya khan, (Clapping .....Joy Bangla).

In that grief ....(Mike failed) grim struggle, we expect the support and sympathy of the peoples of the world. The agony in one part of the world must reach the peoples of all other parts. And we are particulrly grateful to the British nation, to the British Press, Radio and Television for their profound sympathy with us at this hour of our peril. (Clapping.............)

We have only one part of the work today that is to thwart this invading army of Yhay Khan. (Clapping......) and to make the lives of the people of the seventy-five million Bengalese free from their rape (Slogan ....Joy Bangla ....) you are aware that their troops burning the villages, committing rapes, killing children, and the genocide is going on. Will not the conscience of the World rise even at this! (Appeal to the people and its governments of the world to condemn in most unmistakable term that the Yahya Khan's administration. I appeal to the governments of the world that no economic aid should be given to the government of West Pakistan. (Chapping....)

You must all realize that there is no government of Pakistan to whom you can give aid. Yahya khan himself has killed Pakistan. What exists today is only the government of West Pakistan. (Shame! Shame!) And that government should not be given any economic aid kill the unarmed population of Bangladesh. That is my one prayer to the government of the World. No arms supply should be given to kill the children, men and women of Bangladesh-who are determined to achieve independence and thwart the invading army. They rely on their own strength but at the same time they appeal to the people and to the government of the world that no aid should be given nor arms supply should be made available to Yahya Khan for killing the unarmed population of Bangladesh. Now, ladies and gentlemen, another false propaganda is being carried that the people of Bangladesh do not want independence. My fellow citizens of Bangladesh, I will request you, those of your who are determined to fellow citizens of Bangladesh, I will request you, those of you who are determined to thwart the invading army and those of you who want independence of Bangladesh to raise your hands in support of the demands of Bangladesh. (Slogan: Joy Bangla ....)

It is known to everyday that England is a land of free thinking and free expression. It is therefore, clear to everybody that you have raised your hands willingly and nobody could compel you to raise your hand. You are the representative of Bangladesh abroad. Each one of you is a representative. And to you Bangladesh has made it known that the demand for independence is a demand of the seventy-five million people of Bangladesh (Clapping). It is not this demand of the miscreants as Yahya Khan uses to call the people of Bangladesh. We are, ladies and gentlemen, determined to face the invading army. We

are determined to establish the rule of law in Bangladesh. And in that struggle we want the support, sympathy and cooperation of all concerned.

Now, my fellow citizens of Bangladesh, I have a special direction to communicate to you in the name of the Government of Bangladesh...

(Joy Bangla ...)

This procession-which will be taken immediately after this meeting, is not a procession of protest. It is a mark with an appeal to the few great powers the People's Republic of China, our closest neighbor and to the United States of America. Our appeal to them is to stop arms supply to Yahya Khan. Our appeal to them is to stop economic aid to Yahya khan's army administration. The Govt. of Bangladesh, request the citizens of Bangladesh to maintain peace and discipline in this appeal march and make it plain to the People of Great Britain who have been very hospitable as that we are a disciplined nation. (Clapping.......)

Our march should be a very peaceful one. There should not be any offensive slogans. There should not be any different sect shall to be two embassies of the to great countries. We fervently hope that the people of the United states of America and China will rise in our favor and stop giving any arms supply of Yahya Khan. (Clapping............................)

With that prayer, with that appeal the citizens of Bangladesh will go to the two nations of the two great countries in London. (Clapping..........)

I am told that our enemies are also active and they might send some people who will get mixed up with the people who are going on behalf of the Govt. of Bangladesh and shall be prostrate to these missions. I make it plain that those who engage themselves in their activities, they are enemies to the cause of Bangladesh, and that for their mischievous activities the Govt. of Bangladesh will have no responsibility and they will have no protection from the Govt. of Bangladesh. (Clapping ....)

I will, therefore, again appeal to you, my fellow countrymen, that at all costs you will maintain peace and discipline. you Know, we are continuing in this liberation movement, here in a foreign country and the British Govt. has been very hospitable to us, the British Govt. has allowed as continue with this movement as I have told you it is a land where freedom of speech, freedom of movement is there. (Clapping......).

In this march of appeal you will also exhibit that you appreciate the great hospitality of the British Govt. and the British national and do not by your action abuse that great hospitality, I, therefore, appeal to you, my fellow countrymen, in the name of the Vobet. Of Bangladesh and fellow countrymen of Bangladesh within Bangladesh that you and by your conduct demonstrate to people of Great Britain that we are a disciplined honorable nation. (Clapping and slogan I Joy Bangla....)

I thank you, ladies & gentlemen, who have assembled here to how your sympathy and support for our great cause, I convey to all of you the gratitude of the Govt. of Bangladesh. That day is not far off when her majesty's Govt. and the Head of the Commonwealth will recognize the reality and give recognition of the Govt. of Bangladesh. (Clapping .....)

I am firmly convinced in my mind that days are not far off when Bangladesh will sit in the Commonwealth of Nations as a happy member of the Commonwealth. (Clapping)

I appeal to you, my fellow countrymen, to maintain your determination, your courage, and your sacrifice and hour unity. Success must be ours. Inshallah, we shall march forward in the path of peace and progress and an achievement. We shall frame Constriction which will guarantee freedom of thought, freedom of speech, freedom of expression-we will look forward to a democratic socialist Govt. in which all Constitution which will guarantee freedom of thought, freedom of speech, freedom of expression-we will look forward to a democratic socialist Govt. in which all men will he equal. Hindus and Muslims, Christians and Buddhists and members of our other religions-we shall all live in peace and amity. (Clapping)

Our accredited leader Sheilkh Mujib has been the harbinger of a new faith, ambassador of a new hope and that hope is to create state in which all will be equel-all will be free and nobody will be oppressed. (Clapping and Slogan)

Ladies and Gentlemen, Sheikh Mujib is still in prison and many other political leaders who have refused to sign the most dishonorable document that has been forced on them. We want release of sheikh Mujib. We want release of all political prisoners. We are prepared for all sacrifices; nobody can stop us from getting the release of the political prisoners. (Clapping & Slogan: Joy Bangla......)

Ladies and Gentlemen. There are other distinguished speakers. They will address you briefly. But before you start on your march of appeal. I will address again a few words in Bengali. After which, I shall request you to proceed with your procession. I shall come back to speak to you in Bengali at the conclusion of this meeting.

Thank you ladies and gentlemen. (Clapping ....)

সূত্র: হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১। পৃ. ৬১৩-৬১৭

পরিশিষ্ট ৯
পাকিস্তান সামরিক জান্তার অধীন গভর্নর মালিকের নিকট এ এম এ মুহিতের চিঠি

A LETTER TO GOVERNOR MALIK

September, 1971

You have asked for creation of an open society where issues will be settled by force of argument. Do you honestly believe that there is any possibility of such a course of action in West Pakistan or Bangladesh as long as Yahya's hordes are not totally annihilated? That was what the country was wanting to do when Bhutto joined in the conspiracy of Yahiya's gang to thwart the press altogether. I am surprised that you should say that after having been dismissed like a domestic servant on February 21 when the real shift of power to the hawks took place. How can you now try to remove suspicions"?

You are asking for rebuilding the economy and the society & to forgive & forget the past. For whom do you rebuild the economy? For your masters from West Pakistan and the Biharis whom we chose to give shelter when they were homeless? How can you forgive and forget when no family is there in Bangladesh who has not suffered death and destruction in the hands of Yahya's gangsters? Much less of it caused the partition on India. I feel like quoting you that we are "compelled to seek a separate homeland after we found our every existence threatened in United Pakistan." It is indeed a repetition of history and I lived through that also.

For God's saks do not talk of Indian conspiracy and their involvement in the creation of present troubles. Any time Bengalis get a chance to assert their will the hand of India is discovered. Your masters also had the nauseating temerity to accuse sher-e-Bangla of complicity in Indian conspiracy. I have personally heard such accusations against Mr. Nurul Amin whose concern for Pakistan's solidarity is much more than that of any West Pakistani.

You have talked of national suicide for the Bangalis. Fortunately that is not the case this time. Pakistan was broken up by Yahya-Bhutto axis on March 25 and you cannot put it together again because a river of blood and scorched earth is between the two regions now. Incidentally the destruction of Pakistan was caused by people who had no involvement in the Pakistan movement, who made no sacrifices for Pakistan but enjoyed rich dividends out of its creation. The Punjab did little for Pakistan but got the most benefits. Yahya and his generals have never worked for Pakistan so it was easy on their conscience to destroy the country. Bhutto was an Indian citizen as late as 1952. so it is only natural that personal lust for power should be more important to him than Pakistan's survival. I derive some satisfaction in the fact that Pakistan was not destroyed by those

who worked for its creation. You have the assurance as the Governor to help to help rehabilitation of refugees and have claimed that minorities are good citizens. I am not sure about your authority and brief. I was told by Pakistanis that every Hindu was an enemy and they had caused all the trouble, they insult Bengaliee Muslims. I took it as an insult on the intelligence of Bengali Muslims and you will notice that is my letter to Yahya I protested against such stupid insinuation. It looks that your speech is for international consumption and so any amount of untruth does not really matter. You are talking of arrangements with India for taking care of minority problem. May I remind you that you are for getting your history; you are talking of a situation when there were communal riots in both countries. This time it is not communal riots, it is deliberate policy of genocide by an organized government against Bengalis and specially Bangali Hindus.

You have talked of the futility of terrorist movement. You are forgetting that this is not a terrorist movement, it is a war of liberation, in dealing with civilized Britain who was governed by a democratic parliament, and you could rely on Constitutional methods to gain your objectives. Even then you had non-cooperation, civil disobedience movement (Punjab & Assam 1946-47) and Direct Action. Today you are dealing with a dictatorial military regime; the tactics have to be different. You are dealing with uncivilized, uneducated and unpatriotic vested interests of West Pakistan.

You have emphasized the food crisis but have followed the brief closely in maintaining that transportation and not food availability is the problem. When we were shouting about food crisis Yahya retorted sharply that god owns were bursting with stocks. But now it turns out that you cannot get as much food in the country as is required. You have spoken of plans to import 2.3 m tons. From my direct experience I can tell you that with the "goodwill" of the West Pakistan Government you will never reach a target anywhere near it. Do you know how much of 2.3 m tons planned for import last year was actually imported? It was only I.I m tons. You know better to be hoodwinked by your very dishonest masters who lack integrity in every respect.

You have promised test relief works, financial help to returnees and reconstruction. Do you really believe you will have either the currency notes (printed money) or the real resources? The experience of last November is otherwise. Even resources transferred from abroad did not reach Bangladesh. The relationship of the two regions was founded so much on exploitation of Bangladesh that deceit, outright lies and crooked maneuvers really on exploitation of Bangladesh that deceit, outright lies and crooked maneuvers really did not bother West Pakistan. Do you believe that your speech and decision to serve them will change all that?

You are talking of a development program me of Rs. 279 million in Bangladesh. I am amazed that you should mention it. Those who framed the budget, even they are under no illusion about this exercise in fantasy.

Your dream of a united, powerful and proud Pakistan is so absurd and your wish on restoration of power to the people is so pretentious that I could not help touching on them too. Pakistani ruling junta is a horde of barbarians, the cannot put up a civilized image anymore. They are also not in a mood to return power to the people. Just read through Yahya's speech of June 28 analyze his activities since then including his choice of stooges for Bangladesh.

You are an elderly person and have been very close to me. I have used rough language because it pains me so much to find you performing such a heinous role in the winter of life. Yahya dispensed with your services in February against your saner suggestion. How can you believe in the intentions or capability of this man who is either gone mad or has been entrapped in a mad circle? There is no way out for Pakistan anymore. Ever) mother in Bangladesh is distressed, every young man is a revolutionary, and every soul secretly harbors the idea of liberation from the ruthless occupation of your masters. That liberation is coming soon and that alone will teach this mad junta the lesson of its life. That alone will liberate West Pakistan as well. You are a non-entity in this process and the sooner you have this realization the better it is for you and for the country.

সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১। পৃ. ৭০৮-৭১০

পরিশিষ্ট ১০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের একটি প্রতিবেদন

THE CASE FOR BANGLADESH
Background:

Pakistan was the result of the free choice of the minority community of India-i.e., the Muslims-expressed through a free election in 1945 and a referendum in 1947. The Demand for Pakistan had its roots in inequity and discrimination against, denial of equal opportunities to, and exploitation in general of the minority community by the majority.

Pakistan consisted of two territories, west, separated by a thousand miles of India. It was a dream and an ideal which called for sacrifices on the part of the citizen of both wings. At the time of independence the population and wealth distribution in the country was as follows:

	East	West
Population	56%	44%
Gross Domestic product	52%	48%

The power centers, however, were located as follows

	East	West
Capital of the Country	none	X
Parliament of the Country	none	X
Supreme Court	None	X
Headquarters of the Army	None	X
Headquarters of the Air Force	None	X
Headquarters of the Navy	None	X
Headquarters of the State Bank	None	X

Twenty four years of partnership [1947-71-71] between East and West Pakistan had the following complexion in political and economic fields:

	East	West
Chief Executive [Prime Minister or President]	5 Years	19 Years
Commander-in-Chief Army	none	24 Years

Commander-in-Chief Army	none	24 years
Commander-in-Chief Air Force	none	24 Years
Finance Minister	none	24 years
Planning Minister/Chief	none	24 years
Employment in Pakistan Govt. Civil Service	20%	80%
Employment in Armed Forces	7%	93%
Revenue Expenditure	23%	77%
Utilization of Foreign Assistance	23%	77%
Foreign Exchange Earnings (Exports)	54.7%	45.3%
Foreign Exchange Expenditure	31.1%	68.9%
Development Expenditure	32.5%	67.5%

During the five years that Bengalis were in control of political power, civil and military bureaucracy indulged in conspiratorial politics to nullify their influence. The first Bengali Prime Minister, Khawaza Nazimuddin, was dismissed by Punjabi Governor-General Ghulam Mohammed after one and a half years in office even though he held the confidence of the parliament. The second Bengali Prime Minister, Mohammed Ali Gogra, was a prisoner of the Punjabi ruling elite from the date his installation and having gone through one ignominy after another, was finally dismissed after two years in office. The last Bengali Prime Minister, H. S. Suhrawardy, was dismissed at the end of a half in office by General Iskander Mirza without being given an opportunity to test his strength in the Parliament.

A constitution envisaging a federal parliamentary form of government was at last adopted in 1956. But this constitution was not given a chance to come into fruition due to Iskander Mirza’s conspiratorial politics and the interference of the Punjabi dominated Army and government services. When general elections under the new constitution were being planned, the final Army coup came about on October, 1958.

Twelve years of Army dictatorship at last gave into public pressure and elections were held in December 1970 with the following results:

Pakistan National Assembly	
Awami League	167
All others	146
Total	313

Out of the 169 seats of East Pakistan, the Awami league won 167 seats with only two seats going to two other members, the AwamiLegue secured an absolute majority in the National Assembly and was thus in a position to form a stable government in the country as well as to frame its constitution. But the Assembly was never called onto session by Pakistan's military dictator Yahha Khan. Since the Awami League consisted of Bangalis led by sheikh Mujibur Rahman, the vested interests of West Pakistan decided to nullify the election result. While more than two months elapsed without the National Assembly commencing to function, the brutal Army crackdown came on March 25.

25th March, 1971, and After

Despite every provocation, the Awami League tried until the very last to reach a peaceful solution of the Pakistani crisis. Transfer of power to elected representatives and withdrawal of martial law were pre-requisites to any settlement. After a period of protracted negotiations, president Yahya was expected to make a nationwide broadcast on March 25, 1971. Announcing an agreement with the Awami league.

Instead, he secretly left East Pakistan and at midnight his Army attacked a sleeping nation with tanks, artillery, Machine guns flame throwers and every other weapon of destruction. Special targets of the Army were Bengali units of the Army; the members of the paramilitary force, East Pakistan Rifles; the civil police force; university teachers; members of the intelligentsia; young people; Aqami League leaders and workers; industrial laborer's; and members of the minority community-i.e., Hindus. Women, children and old people were not spared either. Everyone in sight was shot. Women were nailed to trees and then shot. Men were tied to jeeps and then dragged at the speed of sixty miles per hour. Women were raped to death and left to be devoured by dogs. Sleeping children were bayonetted to death. Young men from cordoned-off villages were picked up and their blood was drained off for the wounded soldiers till they were dead. Young girls were kidnapped and taken to garrisons for forcible prostitution. All properties within the range of the artillery were destroyed. City blocks were put, to the torch and residents were machine-gunned. The sadistic orgy of massacre and destruction is not over yet; it is still continuing in elected and the limited areas.

Butchery of unarmed people so far has taken a toll of a million lives. Another nine million had to flee the country to save their lives, leaving their hearth and home and becoming destitute refugees. The flight of this mass of humanity can be comprehended only by imagining the total evacuation of the City of New York.

Declaration of Independence

Political and economic exploitation was tolerated by Bengalis in the hope that change in political power structure would remedy the evils. But when the army launched its genocidal attack it became apparent that living together by East and West was no longer possible. The elected representatives of East Pakistan declared East Pakistan independent, renaming it “BANGLADEDH,” Thus relieving the unwilling minority in West Pakistan from the fear of domination by majority Bengalis.

The dreamland of Pakistan created by people expressing their wishes through ballots has been destroyed by vested interests expressing power through bullets. People of Bangladesh through their elected representative and with their blood have given their verdict in favor of Independent Bangladesh.

Prepared and published by the
BNAGLADESH MISSION
1223 Connecticut Avenue, N.W., Fourth Floor
Washington, D.C. 20036

September 1971

সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১। পৃ. ৮২৯-৮৩১

পরিশিষ্ট ১১

No. 644 (172)-Poll/S(1),

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN

HOME (POLITICAL) DEPARTMENT

Section 1

Fortnightly Secret Report on the Situation in East Pakistan for the Second Half of September, 1971

I-POLITICAL

There does not appear to be any marked improvement in the overall law and order situation in East Pakistan. The rebels and the naxalities, by their wanton acts of sabotage and other criminal activities, have been posing a continuous threat to the return of peace and normaley in the Province. From their activities the pattern which emergence is that these elements have chosen the countryside as the main area of their activities at present and are trying to liquidate the Governmental authority in these areas by destroying the police-stations and killing Peace Committee Member, Police, Razakars and other Government functionaries who are co-operating with the military authorities, without coming into any direct confrontation with our armed forces.

2. According to a report, the PDP circle thinks that the announcement of bye-elections by the Election Commission has been made in view of the Genreral Assembly session of the UN, otherwise no election can be held in the country, at this stage. Mr. Nurul Amin would reportedly prefer to remain in the opposition to any Government formed by the ML. Authority with the help of other political parties in case of non-inclusion of the 8-point programme of PDP in the proposed constitution. He would thus create public opinion in favor of his programmed and establishment of full democracy in the country.

Maulana Md. Ishaque, Minister, Government of East Pakistan attended the meeting which discussed the political and economic situation of the country. It decided, *inter alia*, that the party would contest the ensuing bye-electios and demanded Islamic Constitution and removal of disparity between the two wings of Pakistan within 10 years.

7. The Working Committee of East Pakistan (JUI) in a meeting held on 27-9-71 at its office at 9, Shawkat Ali Road, Sutrapur, Dacca with its Chief Peer Muhsinuddin in the chair decided to take part in the forthcoming bye-elections and directed the party candidates to file nominations in consultation with their respective district units. The meeting condemned India for its anti-Pakistani role and praised Iran and other friendly countries for extending support to Pakistan.

8. On 20-9-71, a meeting (25) of the Working Committee of Krishak Sramik Party was held at the Dacca residence of its Chief Mr. A. S. M. Sulaiman, Minister for Labour and and Social Welfare, Government of East Pakistan with himself in the chair. Besides

organizational matters the meeting discussed the question of participation of the party in the ensuing bye-elections.

9. According to an uncorroborated secret information, Md. Toha (CP/PC), Abdul Haq (CP/PC), Habibur Rahman, Rashed Khan *alias* Menon and Siraj Sikdar (Purba Bangla Sramik Andolon) have recently formed the 'Peoples's Commissar' of 'People's Liberation Army' with its headquarters in a small island near Luxmipur town in Noakhali district. This body will act as the supreme command of the 'Army Units' and also function as 'Administration Wing'. Md. Toha has reportedly been selected as the First Secretary of the body while About Haq is working as its Chairman and Habibur Rahman as the Chief or the 'Armed Units'. It is claimed that 'People's Liberation Army' has already enlisted nearly 7000 deserters from EBR, EPR, Police and Ansars and they are operating as guerilla in the vast low land of the Dakatia river (entire Sadar Sub-division of Noakhali district) and the Meghna (near Chandpur in Comilla district). The 'People's Liberation Army' has reportedly got no connection with any Communist movement or activity and is trying to emerge as the single fighting force of this province The deserters from EBR, EPR, Police and Ansars who are the real fighters of the 'People's Liberation Army' have reportedly plenty of arms and ammunition with them. They are also trying to get more arms and ammunition from Burma through the Red Flag Communist party of that country.

10. An emergency meeting (30) of the local EPCF (mL)/Naxalite was held recently at Sovna, P.S. Damurai, district Khulna with Nazrul Islam of the same village presiding. The meeting was attended by leaders and important workers of the party from different sectors of Khulna and Jessore districts. The participants claimed to have established 'Free Zones' in different sectors of the districts and the meeting expressed satisfaction over their achievements during the past five months, particularly in the areas of Dumuria, Batiaghata, Dacope, Fultala, Kalaroa, Tala, Daulatpur, Fakirhat, Terokhada and Bagerhat in Khulna district and Kalia, Narail. Abhoynagar and Munirampur in Jessore dictrict. The meeting observed that the 'excess of Army Operation' and absence of effective civil administration in far-flung rural areas of Khulna and Jessore district during the recent months had gone a long way toe help the party in spreading its ideology amongst the masses. The meeting drew up a plan for the further course of action, as follows:-

i. Establishment of more 'Free Zones' in the districts of Khulna and Jessore.

ii. Killing of Razakars and their near relations, burning of their houses, etc.

iii. Actively supporting the rebels in their operation against petty bourgeois, members of Muslim League, Jamaat-e-Islami and Peace Committees besides carrying on the tesk of elimination of 'Jotedars' and 'Mahajans' but not to come in direct confrontation with the Army..

17. The Press acclaimed the recent radio broadcast of the Governor of East Pakistan, Dr. A. M. Malik. The Morining News (16-9-71) said, "With characteristic sincerity and humility Dr. A. M. Malik has addressed himself to he people. A spirit of reconciliation and sweet reasonableness marks Dr. Malik's first broadcast as the Governor of East Pakistan. As a healer, he seeks to allay fears and sooth feelings. He wants to remove misgivings and restore confidence. He has appealed to the people to help restore tranquility in the province and to create an open society in which issues will be settled by force of argument and where people and parties made differ with each other and yet live together as paeaceful citizen of a 'common country'. In short he pleads for a spirit of tolerance, without which there can be no peace and harmony which are so essential for stability and progress."

18. The formation of the Council of Ministers in East Pakistan was welcomed by the Press. The *Ittefaq* (18-9-71) commented, 'Whatever might have been the consideration of selecting the members of the Council of Ministers there should not remain any doubt in the mind of anybody over the question that the main responsibility of this interim Council of Minister will be to implement the oft announced scheme for restoration democracy in the country'.

III-YOUTH AND STUDENT AFFAIRS

19. Attendance of students in the Dacca University at some important colleges of the city is gradually improving . Students are, however, still scared due to threats being held off to them, their gurdians and teachers by the rebels through letters, posters, etc.

20. Saiyid Nazrul Islam (PBBCU), son of Saiyid Ashr Ali of Alekanda, Barisal town is reportedly keeping c/o contact with his co-workers in the same town including Bhul Bachchu and Khasru, all belonging to PBBCU/Naxalite at disseminating information to the rebel groups with instruction to accumulate army and ammunition with a view to intensify their activities in Barisal town. He is reportedly of the view that if Sheikh Mujibur Rahman, the Chief of the defunct Al is released, the leftist movement will die out for ever and so the leftist should exploit the present situation to accelerate their activities.

21.On 16-9-71, a public meeting (1000) was held under the joint auspices of Jalalabad Chhatra Samiti and ICS at Sylhet town wherein Matiur Rahman Nizami, President, ICS and others delivered speeches criticizing India for interfering in the internal affairs of Pakistan and obstructing the return of displaced persons. They stressed the need of Islamic education and Islamic constitution for the integrity of Pakistan. Matiur Rahman Nizami further condemned the outlawed AL leader for defaming the Pakistani Muslims

by revolting against Pakistan and joining bands with India. Resolutions on the above lines were also adopted in the meeting.

IV-COMMUNAL

22. The communal situation remained peaceful throughout the province.

V-LABOUR

23. As in the past, there has been no marked improvement in he attendance of workers and the production in the mills and factories during the fornight under review.

VI- LAW AND ORDER

24. Thirty-three dacoity cases were reported as against 20 during the corresponding fortnight of the last year. The range-wise dacoity figures are given below:-

Range	Fortnight under review.	Corresponding the last year.
Dacca	6	8
Chittagong	3	6
Khulna	6	2
Rajshahi	18	4
Total	33	20

(ii)- On 18-9-71, a Bengali-printed leafted was found in circulation at Trimoinihat, P.S. Ramnagar, district Rajshahi. The leaflet reads as follows:-

> 'Ebarer Sangram Muktir Sangram' (*The present struggle is for emancipation*), 'Ebarer Sangram Shahinatar Sangram' (*The present struggle is for freedom*).

The leaflet urges the people to act according to the directives of the 'Bangla Desh Government', extend all possible help to the rebels and not to pardon the supporters of Pak Army.

(iii) A cyclostyled copy of the Weekly Newsletter of September 1971 captioned, "Guerilla' of so-called Bangla Desh was found lying on 23-9-71 morning on New Circular Road, Dacca. The Newsletter, *inter alia,* propagates the activities of the members of the so-called Bangla Desh Government and their allies. It also contains some sayings of Sheikh Mujibur Rahman, the Chief of the defunct Awami League.

Activities of Rebels:

29. Reports of Killing, loot, damage, etc., by rebels were received from different places of the province during the fortnight and some of the instances are as follows:-

(i) On the night of 15/16-9-71, rebels attacked the house of two persons of Uthura and another of Dalutia under Bhaluka P.S. in Mymensingh district and killed them as they were supporting the Razakars.

(ii) On 19-9-71 at about 08-00 hours, rebels numbering about 500 armed with Machine-guns, Sten-guns, Rifles, etc., arrived Dighirpar Bazar under Tongibar, P.S. in Dacca district by boat crossing the Padma and killed 3 persons including 2 Muslim Leaguers.
(iii) On 20-9-71 evening, rebels and the car of Salahuddin Qader Choudhury, son of Mr. Fazlul Qader Chaudhury, President, PML, at Chandanpura, Chittagong. They also threw a hand-granade in front of the car, Salahuddin as injured and his driver was killed.

সূত্রঃ ওয়ালিউর রহমান, *বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের শেষ দেখা*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১৭। পৃ. ১০২-১০৭

পরিশিষ্ট ১২

জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল

১. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী দলনেতা
যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ প্রতিনিধি
জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী প্রতিনিধি
২. আবদুস সামাদ আজাদ, সদস্য, জাতীয় পরিষদ
বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক উপদেষ্টা
৩. অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ
বাংলাদেশ সরকারের পরামর্শক কমিটির সদস্য
৪. ফণিভূষণ মজুমদার, সদস্য, জাতীয় পরিষদ
৫. সিরাজুল হক, সদস্য, জাতীয় পরিষদ
৬. এডভোকেট সৈয়দ আবদুস সুলতান, সদস্য, জাতীয় পরিষদ
৭. এ্যাডভোকেট ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ, সদস্য, প্রাদেশিক পরিষদ
৮. ড. মফিজ চৌধুরী, সদস্য, জাতীয় পরিষদ
৯. ডা. আসহাবুল হক, সদস্য, প্রাদেশিক পরিষদ
১০. ড. এ আর মল্লিক, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
১১. অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অর্থনীতিবিদ
পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে রাষ্ট্রদূত
১২. এম. আর সিদ্দিকী, সদস্য, জাতীয় পরিষদ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ প্রতিনিধি
১৩. খুররম খান পন্নী, দূর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত
১৪. এ এফ এম আবুল ফতেহ, রাষ্ট্রদূত ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা
১৫. এস এ করিম, জাতিসংঘে উপস্থায়ী প্রতিনিধি
১৬. আবুল মাল আবদুল মুহিত, আমেরিকায় বাংলাদেশ মিশনের কাউন্সেলর
১৭. দলপতির সুপারিশে আবুল হাসান মাহমুদ আলী, আমেরিকায় বাংলাদেশ মিশনের ভাইস কনসালকে অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করা হয়

সূত্র: আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান* ১৯৭১, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬। পৃ. ২০০

পরিশিষ্ট ১৩

জাতিসংঘে প্রেরিত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল সম্পর্কে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ প্রেসবিজ্ঞপ্তি

BANGLADESH PRESS RELEASE

ভারতস্থ বাংলাদেশ হাকিমিশন
৯, সার্কাসএ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৭

<u>(May be reproduced with or without Acknowledgement)</u>

No. PR/68.
Mujibnagar,
October 26, 1971

BNGLADESH DELEAATION IN THE U.N.O.

The 16-member Bangladesh delegation to United Nations General assembly Session headed by Justice Abu Sayeed Choudhury has effectively presented to the international community the background and the present position of the Bangladesh movement for total independence from the colonial rule of West Pakistan.

The delegation apprised the world body of the truth about the Bangladesh and countered the Pakistan's evil and malicious propaganda about Bangladesh. The delegation met and briefed various other delegations of the members of the UNO. Such meetings have greatly helped to educate the members of delegations of different nations on the various aspects of Bangladesh problem. Supports for the cause of Bangladesh were expressed by many delegations during their speeches in the General Assembly Session. The delegation has also successfully impressed the world community about the gravity of the Bangladesh problem and the magnitude of the genocide committed in that part of the world by Pakistan. The very fact that many member countries spoke about Bangladesh problem in the floor of the Assembly prove that Bangladesh is not an internal affairs of Pakistan.

The members of Bangladesh delegation also contacted the American intelligentsia and received overwhelming support from them. Despite the great enthusiasm among the supports of Bangladesh in the U.S.A. due to the presence of the delegation, the Nixon Government continued to pursue a policy of friendship towards the military

regime of West Pakistan. The Pakistani attempt to prevent the delegation from lobbying in the UN proved futile. Under the dynamic leadership of Justice Abu Sayeed Choudhury, The delegation has created a good impact on the other delegations attending the U.N General Assembly Session.

সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১। পৃ. ৮৪২

পরিশিষ্ট ১৪

Indian Foreign Minister Issued a Strong Statement Expressing India's Grave Concern over the Wellbeing of Bangabandhu and His Family

[The Indian] Government view with grave concern press reports of President Yahya Khan's statement that Sheikh Mujibur Rahman would be court martialled and that he could not say whether or not the Sheikh would be alive when the so-called Pakistan National Assembly meets. President Yahya Khan himself had, in one of his earlier statements, referred to Sheikh Mujibur Rahman as "the future Prime Minister of Pakistan." As the leader of the Awami League party, which won 167 out of the 169 seats to the Natiional Assembly from Bangladesh and thus had a clear majority of votes in the National Assembly of Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman held a unique position as the acknowledged leader not only of East Pakistan, but of the whole of Pakistan. What happened after 25th of March this year is known to the whole world. The denial of the verdict of the people and letting loose of military oppression and the trampling on the fundamental human rights of the people of Bangladesh stand self-condemned. Instead of respecting the verdict of the people and acknowledging Sheikh Mujibur Rahman as the elected and undisputed leader of Bangladesh, the Pakistan Government has lauchched a reign of terror and carried out a calculated plan of genocide, the like of which has not been seen in recent times. To stage a farcical trial against Sheikh Mujibur Rahman is a gross violation of human rights and deserves to be condemned by the whole world.

We have repeatedly expressed concern for the safety and welfare of Sheikh Mujibur Rahman and his family who are under house-arrest or in prison. We have conveyed our concern to foreign governments and asked them to exercise their influence on the Government of Pakistan in this regad. Should any harm be caused to Sheikh Mujibur Rahman or his family and colleagues, the present situation in Bangladesh will be solely responsible for the consequences. We share the concern expressed by about 500 Members of Parliament in this regard. We appeal to the conscience of humanity to raise their voice against the action that the President of Pakistan proposes to take. We express our condemnation of the proposed action and warn the Government of Pakistan of its serious consequences.

সূত্র: K.M. Shehabuddin *There and Back Again (A Diplomat's Tale)*, Dhaka: UPL, 2006. P. 111

পরিশিষ্ট ১৫

কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের হাইকমিশনার এম হোসেন আলীর সঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধিদের আলাপচারিতা

Meetings with Indian Delegates to US

In New Delhi, I had a meeting with the following:

i. Mr. T.N. Kaul, Foreign Secretary,
ii. Mr. D.P. Dhar, Chairman, Policy Planning Committee, Ministry of Foreign Affairs,
iii. Mr. P.N. Haksar, Secretary to the Prime Minister,
iv. Mr. K.B. Lal, Defence Secretary,
v. Joint Secretary, Mr. J.N. Dixit of the Ministry of External Affairs.

Mr. Kaul started the discussion in a somewhat aggressive mood. Indian delegation (meaning Mrs. Indira Gandhi and his entourage while in the United States) was, he said, unhappy that they had to learn about the talks between Bangladesh leaders and U.S. officials from the U.S. sources. He said that the impression in USA was that Bangladesh leaders were willing to settle for something less than independence, but India was standing on the way. Mrs. Gandhi told them that according to Bangladesh leader's assessment, no solution less than independence was acceptable & no solution in the form of one Pakistan was possible.

The United States, he said, mentioned about one Bangladesh leader acceptable to Yahya (Mr. Kaul told me that it was the Foreign Minister, Mr. Mushtaque Ahmed). Mrs. Gandhi told the U.S. leaders tried to bolster this idea that Bangladesh leadership would be finished and with that there would be discussion among & weakening of the Bangladesh Government. The democratic movement would collapse.

I said that I knew exactly what the Foreign Minister had told the U.S. representative. I could, therefore, assure India that there was no truth about the foreign Minister agreeing to concession which could in any way detract from independence.

Both Mr. D.P. Dhar & T.N. Kaul said that as the interests of Bangladesh & India were common, our two Governments should have complete co-ordination & continued exchange of information. I told them again that the Acting President himself had informed Mr. A. K. Roy about the first meeting. I wanted to tell Roy about our second meeting, but Roy was not available. I could not do so. Possibly the acting President, I said, has spoken to Roy.

A week later, I came to know that Mr. Mustaque Ahmed had met the U.S representatives several times earlier without the knowledge of his other colleagues in the Government, not to speak of myself. Even in the first meeting he spent more than half an hour with Mr.

Griffin & then I was called in to join the discussion. I did not therefore know what had transpired between the two. Neither had he said, nor had I any inkling of the previous meetings & the tenor of the discussions? Apparently, Mr. Mushtaque Ahmed was working not only behind the back of India, but also behind the back of his own government. He was playing a game in his own interests. It would seem, in retrospect that he was trying to undermine the freedom struggle and to come to an arrangement with Pakistan so that he could gain power.

Mr. Kaul said that the Indian delegation told the United States that-

i. Release of Sheikh Mujibur Rahman,
ii. Withdrawal of Pakistan troops from Bangladesh,
iii. Recognition of Bangladesh,
iv. Compensation to Bangladesh.

Were the four demands by Bangladesh Government. The first 3 demands were not negotiable; but there was scope for negotiation on the 4th demand.

I told him that I had exactly said the same thing. But he said that there was some evidence of cleavage in our delegation to the United Nations. Justice Chowdhury and Ambassador Siddiqui had discussions with the U.S. senior officials. Justice Chowdhury was forthright & stated that there were no scope for negotiation or let-up the first three points. But Mr. M.R. Siddiqui is understood to have observed that the ‘door is not closed’.

Continuing the discussion, Kaul said that the United States had stopped supply of arms to Pakistan; I said that it was by agreement with Pakistan. He said that was only for saving of face. The U.S. finding was that Yahya was against the release of Sheikh Mujibur Rahman & could not be persuaded to change his views. The U.S. promised the Indian delegation that it would try again with Yahya.

President Prmpidou has written to Yahya. Belgium’s reaction was not very favourable. Wily Brandt was trying to have a joint letter from EFC countries sent to Yahya.

I expressed gratitude for stepping up supplies 7 operations, but told them that more was needed to be done.

Mr. D.P. Dhar said that the basic need was complete co-ordination among Bangladesh ranks & full-co-operation of India. By & large, he said, operdational co-operation had improved, but what it needed was one command so that maximum results in minimum time could be achieved.

The Foreign Secretary asked what time frame I had in mind. I said that depended on India. We would of course, like to go to Bangladesh tomorrow. Realistically speaking, I said not later than end of the year.

The Defence Secretary said that if we wanted liberation within the time frame it would be necessary to have large chunks of territory liberated by the end of November. For that purpose, he said operational merger was necessary & this should be done immediately The Indian Prime Minister would ask Manekshaw to take over command & the Bangladesh Prime Minister could ask the Bangladesh C-in- to take over. Manekshaw would be given the task & the Defence Secretary assented that he would do the job. If approved, Manekshaw would prepare plans in 24 hours and execute it in 7 days.

Kaul said that some countries were willing to recognize Bangladesh if areas were liberated & there was some evidence of administration being run by Bangladesh authorities. For example, our Prime Minister, Acting President & others could visit such areas & receive some foreign newsmen.

I was told that soft areas would be chosen by Manekshaw and liberated & held by Mukti Bahini. Dixit later told the that Lal had told him that IAF would operate deep inside Bangladesh and Government of India would take risks, if needed.

Kaul again emphasized that Bangladesh should have no cause of apprehension from the Indian side. Bangladesh must be sovereign & completely independent. India’s interest only by in liberation of Bangladesh.

সূত্রঃ The Diary of Hossain Ali, Episode 73, published in a Daily English Newspaper from Dhaka.

পরিশিষ্ট ১৬
বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের তালিকা

MINISTRY OF FORIGN AFFAIRS
Government of the Peoples Republic of Bangladesh
Mujibnagar

Confidential

No. B-3/16/71 November 22, 1971

CIRCULAR

A List of official representative of the Government of the people Republic of Bangladesh with full particulars of their addresses is circulated to all concerned for their information and guidance.

(Anwarul Karim Chowdhury)
Officer on Special Duty.

Distribution:
1. All Bangladesh Mission abroad.
2. Private Secretaries to the Acting president and Cabinet Ministers of the People’s Republic of Bangladesh, Mujibnagar.
3. All Secretaries if of Minisdter of the People’s Republic of Bangladesh, Mujibnagar.
4. C-in-C, Bangladesh Mukti Bahini
5. Deputy Chief of Staff, Bangladesh Mukti Bahini
6. Deputy Chief of Staff, Bangladesh Mukti Bahini
7. In-charge, Bangladesh Radio
8. External Publicity Division

MISSION ABROAD

CALCUTTA: Mr. M Hossain Ali
High Commissioner of Bangladesh in India

9 Circus Avenue, Calcutta-17, India.
Phone: 44-5208, 44-0941

NEW DELHI: Mr. H. R. Choudhury
Bangladesh Representative
Bangladesh Mission, C-119,
Anand Niketan, New Delhi-21,
India
Phone: 62-6405

LONDON: Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury
Special Representative of Bangladesh
Bangladesh Mission, 24, Pambridge Gardens
London. W-2, U.K.
Phone: 01-229-0281, 01-229-5435
Cable: Bangladesh, London W-2

STOCKHOLM: Mr. A. Razzak
Bangladesh Representative
Bangladesh Mission. Duvholmsgrand 38.
1241 Skarholmen. Stockholm.
Sweden. Phone: 7/0-68-57

NEW YORK: Mr. S. A. Karim
Bangladesh Representative
Bangladesh Mission, Room No. 1002A
10 East 39th Street. N. Y. 10016.
New York. U.S.A. Phone: (212) 685-4530,
(212) 739-0388

WASHINGTON: Mr. M. R. Siddiqi
Bangladesh Representative
Bangladesh Mission, 1223. Connecticut Avenue,
North-West (4th Floor),
Washington. D.C. 20036. U.S.A.
Phone: 737-9538, 738-9196
Cable: Bangladesh, Washington D.C.

HONK GONG:	Mr. Mohiddin Ahmed Bangladesh Representative Bangladesh Mission, 1st, Floor, 31, Broad Wood Road, Happy View Terrace Happy Valley, Hong Kong. Phone: 769610
MANILA:	Mr. K. K. Panni Bangladesh Representative Bangladesh Mission, 1939 Kamias Street, Das Marnas Village, Makati Rizal, Manila, Philippines. Phone: 89-56-27
KATHMANDU:	Mr. A. M. Mustafizur Rahman Bangladesh Representative Bangladesh House, Maharajagni-Bansbari, (Opposite Brahma Cottage), G.P.O. Box No. 789, Kathmandu, Nepal.
BERNE	Mr. Waliur Rahman Bangladesh Representative Helvetiastr. 21, 3005 Berne, Switzerland. Phone: 448265
TOKYO	Mr. S. M. Maswood Bangladesh Representative 17, lchibancho, Chiyoda-ku, Kojimachi, Tokyo, Japan.

সূত্র: হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১। পৃ. ৮৫৫-৮৫৭

পরিশিষ্ট ১৭

মুক্তিযুদ্ধকালে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্য (উৎস ও পরিমাণ-ভারত বাদে)

সাহায্যকারী দেশ বা প্রতিষ্ঠান	সাহায্যের পরিমাণ (ডলার/পাউন্ডে)	গ্রহণকারী সরকার	সাহায্য প্রেরণের মাধ্যম
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৮৯১৫৭০০০.০০ ডলার	ভারত সরকার	জাতিসংঘ
যুক্তরাজ্য	৩৮১১২১৩২.০০ ডলার	ভারত সরকার	জাতিসংঘ
কানাডা	২০২৬০০০৭.০০ ডলার	ভারত সরকার	জাতিসংঘ
সোভিয়েত ইউনিয়ন	২০০০০০০০.০০ ডলার	ভারত সরকার	জাতিসংঘ
দাহোমী	১২৬ ডলার	ভারত সরকার	জাতিসংঘ
ইরাক, ইরান, লিবিয়া, মিশর ও ওমান (সম্মিলিতভাবে)	৫৭৪১৬২.০০	ভারত সরকার	জাতিসংঘ
ব্রিটেনস্থ বাংলাদেশ তহবিল	৩৭৬৫৬৮.০০ পাউন্ড	বাংলাদেশ সরকার	
বাংলাদেশ ক্লাব, বাহরাইন	১৪৯৭.৫৭ পাউন্ড	বাংলাদেশ সরকার	সরাসরি
বাংলাদেশ শিক্ষাকেন্দ্র, কাতার	৩১০০.২৯ পাউন্ড	বাংলাদেশ সরকার	সরাসরি
বাংলাদেশ শিক্ষাকেন্দ্র, লিবিয়া	২৩৮২.৪২ পাউন্ড	বাংলাদেশ সরকার	সরাসরি
বাংলাদেশ শিক্ষা কেন্দ্র সৌদি আরব	৪০০২.৩৭ পাউন্ড	বাংলাদেশ সরকার	সরাসরি
বাংলাদেশ শিক্ষাকেন্দ্র, দুবাই	৪৭৯১.০০ পাউন্ড	বাংলাদেশ সরকার	সরাসরি
বাংলাদেশ শিক্ষা কেন্দ্র, আবুধাবি	৬৫৫৭.০০ পাউন্ড	বাংলাদেশ সরকার	সরাসরি
বাংলাদেশ সমিতি, আলমাইন	১৩৬৭.৪৯	বাংলাদেশ সরকার	সরাসরি
ব্রিটেনস্থ স্টিয়ারিং কমিটি	২৪৯৭.৩০	বাংলাদেশ সরকার	সরাসরি
বাংলাদেশ শিক্ষা কেন্দ্র, ওমান	১৮৪ পাউন্ড	বাংলাদেশ সরকার	সরাসরি

সূত্রঃ তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ*, ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১। পৃ. ২০৬

পরিশিষ্ট ১৮

মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান বৈদেশিক মিশনে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিক (১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশ প্রত্যাবর্তন করেন)

ক্রমিক নং	কূটনীতিকদের নাম	পদমর্যাদা	দেশের নাম
১.	খাজা মোহাম্মদ কায়সার	রাষ্ট্রদূত	চীন
২.	মীর্জা রশীদ আহমদ	রাষ্ট্রদূত	লেবানন
৩.	এম আনওয়ারুল হক	রাষ্ট্রদূত	সেনেগাল
৪.	এ এফ এম বশিরুল আলম	রাষ্ট্রদূত	পোল্যান্ড
৫.	মোস্তাফা কামাল	রাষ্ট্রদূত	বুলগেরিয়া
৬.	মনজুর আহমেদ চৌধুরী	কাউন্সেলর	ফ্রান্স
৭.	এ এইচ আতাউল করিম	কাউন্সেলর	ইতালি
৮.	এ এইচ কায়সার মুরশেদ	কাউন্সেলর	অস্ট্রেলিয়া
৯.	ফারুক সোবহান	প্রথম সচিব	ফ্রান্স
১০.	মাহবুবুল হক	প্রথম সচিব	ইরান
১১.	খুরশিদ হামিদ	দ্বিতীয় সচিব	চীন
১২.	এ এস এম খায়রুল আনাম	দ্বিতীয় সচিব	বেলজিয়াম
১৩.	এ কে এম ফজলুর রহমান	দ্বিতীয় সচিব	সুদান
১৪.	আব্দুল কাইয়ুম	দ্বিতীয় সচিব	মালয়েশিয়া
১৫.	কাজী আনওয়ারুল মাসুদ	দ্বিতীয় সচিব	বার্মা
১৬.	মোস্তাফা ফারুক মোহাম্মদ	দ্বিতীয় সচিব	ইন্দোনেশিয়া
১৭.	আব্দুল মমিন চৌধুরী	দ্বিতীয় সচিব	তাঞ্জানিয়া
১৮.	এম আনওয়ারুল হাশেম	দ্বিতীয় সচিব	যুগোশ্লাভিয়া
১৯.	এ কে এম ফারুক	দ্বিতীয় সচিব	থাইল্যান্ড
২০.	আহমদ তারেক করিম	দ্বিতীয় সচিব	ইরান
২১.	জিয়াউস শামস চৌধুরী	দ্বিতীয় সচিব	অস্ট্রেলিয়া
২২.	আমিনুল ইসলাম	দ্বিতীয় সচিব	মালয়েশিয়া
২৩.	এস এম রাশেদ আহমদ	দ্বিতীয় সচিব	যুগোশ্লাভিয়া
২৪.	মোস্তাফা কামাল	দ্বিতীয় সচিব	জেনেভা
২৫.	মোহাম্মদ জামির	তৃতীয় সচিব	মিশর
২৬.	মাহবুব আলম	তৃতীয় সচিব	থাইল্যান্ড
২৭.	রেয়াজুল হাসান	তৃতীয় সচিব	সোভিয়েত রাশিয়া
২৮.	মোহাম্মদ রুহুল আমিন	তৃতীয় সচিব	জর্ডান

২৯.	সৈয়দ নুর হোসেন	তৃতীয় সচিব	চীন
৩০.	মোহাম্মদ আফসারুল কাদের	তৃতীয় সচিব	তুরস্ক
৩১.	মোহাম্মদ হুমায়ুন কামাল	তৃতীয় সচিব	মালয়েশিয়া
৩২.	এস খাজা শারজিল	তৃতীয় সচিব	মিশর
৩৩.	নাসির আহমদ	তৃতীয় সচিব	জাপান
৩৪.	আব্দুল্লা আল আহসান	তৃতীয় সচিব	মিশর
৩৫.	কাজী আফজালুর রহমান	তৃতীয় সচিব	ইরান
৩৬.	মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন	তৃতীয় সচিব	ফ্রান্স
৩৭.	তোফায়েল করিম হায়দার	তৃতীয় সচিব	পশ্চিম জার্মানী

সূত্র: আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান ১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬। পৃ. ১৯৭-১৯৮

পরিশিষ্ট ১৯

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থ পাকিস্তান মিশন থেকে যে সকল বাঙালি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর পূর্বে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে

ক্রমিক নং	ব্যক্তির নাম	মিশনের বিভাগ ও শহরের নাম	পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করার তারিখ
১.	গউসুদ্দিন আহমদ	হিসাব বিভাগ, ওয়াশিংটন	১ এপ্রিল
২.	আবুল হাসান মাহমুদ আলী	ভাইস কনসাল, নিউইয়র্ক	২৬ এপ্রিল
৩.	আব্দুর রাজ্জাক খান	সহকারী শিক্ষা এটাশি, ওয়াশিংটন	১৭ মে
৪.	এ কে ফজলুল বারি	হিসাব বিভাগ, ওয়াশিংটন	২৬ মে
৫.	মুহিদ আহমদ চৌধুরী	হিসাব বিভাগ, ওয়াশিংটন	৬ জুন
৬.	মোহাম্মদ এ গোফরান	তথ্য বিভাগ, নিউইয়র্ক	জুন
৭.	জাকিউল হক চৌধুরী	সাঁটলিপিকার, নিউইয়র্ক	জুন
৮.	আবুল মাল আবদুল মুহিত	অর্থনৈতিক কাউন্সেলর, ওয়াশিংটন	৩০ জুন
৯.	সৈয়দ আনওয়ারুল করিম	উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি, নিউইয়র্ক	৪ আগস্ট
১০.	এনায়েত করিম	মিনিস্টার, ওয়াশিংটন	৪ আগস্ট
১১.	শাহ আবু মোহাম্মদ শামসুল কিবরিয়া	রাজনৈতিক কাউন্সেলর, ওয়াশিংটন	৪ আগস্ট
১২.	সৈয়দ আবু রুশদ মতিন উদ্দিন	শিক্ষা কাউন্সেলর, ওয়াশিংটন	৪ আগস্ট
১৩.	আতাউর রহমান চৌধুরী	তৃতীয় সচিব, হিসাব, ওয়াশিংটন	৪ আগস্ট
১৪.	সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী	তৃতীয় সচিব, ওয়াশিংটন	৪ আগস্ট
১৫.	এ এম শরফুল আলম	সহকারী প্রশাসন এটাশি, ওয়াশিংটন	৪ আগস্ট
১৬.	শেখ রুস্তম আলী	সহকারী তথ্য এটাশি, ওয়াশিংটন	৪ আগস্ট
১৭.	মোহাম্মদ আবু সোলায়মান	রাষ্ট্রদূতের দফতর, ওয়াশিংটন	৪ আগস্ট
১৮.	মোহাম্মদ মজিবুল হক	সেনাবিভাগ, ওয়াশিংটন	৪ আগস্ট
১৯.	নুরুল ইসলাম	হিসাব বিভাগ, ওয়াশিংটন	৪ আগস্ট
২০.	হাবিবুর রহমান	হিসাব বিভাগ, ওয়াশিংটন	৪ আগস্ট
২১.	আফতাবুদ্দিন আহমদ	সেনা বিভাগ, ওয়াশিংটন	৪ আগস্ট
২২.	মোশতাক আহমদ	হিসাব বিভাগ, ওয়াশিংটন	৪ আগস্ট

সূত্র; আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান* ১৯৭১, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬। পৃ. ১৯৯

পরিশিষ্ট ২০

পাকিস্তান সামরিক সরকারের পক্ষ হয়ে যে ক'জন বাঙালি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছিল

নাম	মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক পরিচিতি	মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের পক্ষে পরিচালিত তৎপরতা	সর্বশেষ অবস্থান
হামিদুল হক চৌধুরী	মালিক পাকিস্তান অবজারভার	দলনেতা পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিদল	মালিক বাংলাদেশ অবজারভার
মাহমুদ আলী	সহ সভাপতি পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	সহকারী দলনেতা প্রতিনিধি দল (বিশেষ দূত হিসেবে ইউরোপ ও আমেরিকা সফর)	পাকিস্তানের মন্ত্রী
শাহ আজিজুর রহমান	সাধারণ সম্পাদক মুসলিম লীগ	সদস্য প্রতিনিধিদল	বিএনপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী
জুলমত আলী খান	মুসলিম লীগ নেতা	সদস্য প্রতিনিধিদল	সহ সভাপতি বিএনপি ও বিএনপি সরকারের মন্ত্রী
রাজিয়া ফয়েজ	মুসলিম লীগ নেত্রী	সদস্য প্রতিনিধিদল	মন্ত্রী জাতীয় পার্টি সরকার
ড. ফাতিমা সাদিক	অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য প্রতিনিধিদল	অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এ.টি. সাদী	আইনজীবী ঢাকা হাইকোর্ট	সদস্য প্রতিনিধিদল	আইনজীবী লাহোর হাইকোর্ট
মৌলভী ফরিদ আহমদ	সহ সভাপতি পিডিপি	বিশেষ দূত সৌদি আরব ও মিশর	
তবারক হোসেন	পরিচালক পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদল (চীন)	পররাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশ সরকার
বিচারপতি নুরুল ইসলাম	চেয়ারম্যান পূর্ব পাকিস্তান রেডক্রস	বিশেষ দূত সদস্য (জেনেভায় প্রেরিত বাংলাদেশ বিরোধী প্রতিনিধিদল)	ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৬)
ড. সাজ্জাদ হোসেইন	উপাচার্য	বিশেষ দূত	প্রবাসী

	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলামি দেশ	
মুজিবুর রহমান	মুসলিম লীগ নেতা	সদস্য নিউইয়র্ক প্রেরিত প্রতিনিধিদল	

সূত্র: এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৫। পৃ. ৩৮২-৩৮৩

পরিশিষ্ট ২১

Declaration of Allegiance to Bangladesh in Missions Abroad by November 1971

Sl	Name	Designation	Posting Area	Date of Declartion
1.	K.M. Shebabuddin	Second Secretary	New Delhi	6 April 1971
2.	Mr. Amjadul Huq	Assistan Press Attache	New Delhi	6 April 1971
3.	Mr. Abdul Majid	Ministerial Staff	New Delhi	12 August 1971
4.	Mr. Abdul Karim	Ministerial Staff	New Delhi	12 August 1971
5.	Mr. S. M. Nurul Huda	Ministerial Staff	New Delhi	23 September 1971
6.	Mr. Amzad Ali	Ministerial Staff	New Delhi	23 September 1971
7.	Mr. Mafizur Rahman	Stenographer	New Delhi	28 September 1971
8.	Mr. A. K. Azad	U.D.C.	New Delhi	28 September 1971
9.	Mr. Gulam Mustafa	Dispensar	New Delhi	28 September 1971
10.	Mohammad Zainul Abedin	L.D.C.	New Delhi	28 September 1971
11.	Mr. Abdul Shaheed	Peon	New Delhi	1 October 1971
12.	Mr. Humayun Rashid Chowdhury	Counsellor	New Delhi	4 October 1971
13.	Mr. Fariduddin Ahmed	P.A.	New Delhi	4 October 1971
14.	Mr. M. Hossain Ali	Deputy High Commissioner	Calcutta	18 April 1971
15.	Mr. R. I. Chowdhury	First Secretary	Calcutta	18 April 1971
16.	Mr. Anwarul Karim Chowdhury	Third Secretary	Calcutta	18 April 1971
17.	Mr. Kazi Narul Islam	Third Secretary	Calcutta	18 April 1971
18.	Mr. M. Maqsood Ali	Assistant Press Attache	Calcutta	18 April 1971
19.	Mr. Sayidur Rahman	Non-Diplomatic Officer	Calcutta	18 April 1971
20.	Mr. M. A. Hakim	Accountant	Calcutta	18 April 1971
21.	Mr. Amir Ali Choudhury	Addl. Assistant	Calcutta	18 April 1971
22.	Mr. Anwar Husain Choudhury	P.A. to D.H.C.	Calcutta	18 April 1971
23.	Mr. Sayeduzzaman	Stenographer	Calcutta	18 April 1971

	Miah			
24.	Mr. Zainul Abedin Choudhury	Stenotypist	Calcutta	18 April 1971
25.	Mr. Mustafizur Rahman	Assistant	Calcutta	18 April 1971
26.	Mr. Alimuzzaman	Assistant	Calcutta	18 April 1971
27.	Mr. A.Z.M.A. Qadir	Assistant	Calcutta	18 April 1971
28.	Mr. Kazi Sekander Ali	Assistant	Calcutta	18 April 1971
29.	Mr. Shamsul Alam	Assistant	Calcutta	18 April 1971
30.	Mr. Md. Golomur Rahman	Assistant	Calcutta	18 April 1971
31.	Mr. Abdur Rob	U.D.C.	Calcutta	18 April 1971
32.	Mr. Mohd. Siddiqullah	U.D.C.	Calcutta	18 April 1971
33.	Mr. A.K.M. Abu Sufian	U.D.C.	Calcutta	18 April 1971
34.	Mr. Mohd. Fakhrul Islam	U.D.C.	Calcutta	18 April 1971
35.	Mr. Nurul Amin	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
36.	Mr. A.B.M. Khurshed Alam	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
37.	Mr. Nur Ahmed	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
38.	Mr. Mohd. Abdur Rahim	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
39.	Mr. Mohd. Aminullah	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
40.	Mr. Abdur Rahman Bhuiyan	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
41.	Mr. Abdul Mannan Bhuiyan	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
42.	Mr. Mohd. Abul Bashar	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
43.	Mr. Mohd. Alauddin	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
44.	Mr. Samiruddin	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
45.	Mr. Mohd. Solaiman	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
46.	Mr. Shamsuddin Husain	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
47.	Mr. Jahur Husain	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
48.	Mr. Mir Mozammel Haq	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
49.	Mr. Mohd. Zakaria	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971

50.	Mr. Mohd. Wahidur Rahman	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
51.	Mr. Abdun Noor	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
52.	Mr. A.K.M. Abdur Rob	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
53.	Mr. A.K.M. Qamrul Rashid	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
54.	Mr. Anwaruzzaman	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
55.	Mr. Abbasuddin Ahmed Chowdhury	Telephone Operator	Calcutta	18 April 1971
56.	Mr. Wahidur Rahman	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
57.	Mr. Mohd. Shahedur Rahman	L.D.C.	Calcutta	18 April 1971
58.	Mr. Sharful Alam	Despatch Rider	Calcutta	18 April 1971
59.	Mr. Abdul Kader	Daftary	Calcutta	18 April 1971
60.	Mr. Abdul Matin Prodhan	Daftary	Calcutta	18 April 1971
61.	Mr. Abdul Amin	Daftary	Calcutta	18 April 1971
62.	Mr. Mohd. Hossain	Office Orderly	Calcutta	18 April 1971
63.	Mr. Motior Rahman	Office Orderly	Calcutta	18 April 1971
64.	Mr. Abdul Gafur Mirdha	Office Orderly	Calcutta	18 April 1971
65.	Mr. Aman Hossain	Peon	Calcutta	18 April 1971
66.	Mr. Hatim Ali	Peon	Calcutta	18 April 1971
67.	Mr. Bazlur Rahman	Peon	Calcutta	18 April 1971
68.	Mr. Mohd. Hedayetullah	Peon	Calcutta	18 April 1971
69.	Mr. Nurul Haq	Peon	Calcutta	18 April 1971
70.	Mr. Shamsul Anwar	Peon	Calcutta	18 April 1971
71.	Mr. Mohd. Ishaque	Electrician	Calcutta	18 April 1971
72.	Mr. Momtaz Miah	Peon	Calcutta	18 April 1971
73.	Mr. Hormus Haq	Peon	Calcutta	18 April 1971
74.	Mr. Abdus Sobhan	Peon	Calcutta	18 April 1971
75.	Mr. Shanu Miah	Peon	Calcutta	18 April 1971
76.	Mr. Mohd. Elias	Peon	Calcutta	18 April 1971
77.	Mr. Abdul Hashem	Gardener	Calcutta	18 April 1971
78.	Mr. A.H. Mahmood Ali	Vice Consul	New York	26 April 1971
79.	Mr. S.A. Karim	Deputy Permanent Representative	New York	4 August 1971
80.	Mr. Enayet Karim	Minister	Washington	4 August 1971

81.	Mr. S.A.M.S. Kibria	Political Counsellor	Washington	4 August 1971
82.	Mr. A.M.A. Muhith	Economic Counsellor	Washington	30 June 1971
83.	Mr. A.R. Matinuddin	Education and Cultural Counsellor	Washington	4 August 1971
84.	Mr. Syed Muazzam Ali	Third Secretary	Washington	4 August 1971
85.	Mr. A.R. Choudhury	Finance and Accountants Officer	Washington	4 August 1971
86.	Mr. Sheikh Rustam Ali	Assistant Information Officer	Washington	4 August 1971
87.	Mr. A.M.S. Alam	Assistant Administrative Officer	Washington	4 August 1971
88.	Mr. Aftabuddin	Member of Staff	Washington	4 August 1971
89.	Mr. Sulaiman	P.A.	Washington	4 August 1971
90.	Mr. M. Hoque	P.A.	Wasington	4 August 1971
91.	Mr. Nurul Alam	Assistant Defence Wing	Washington	4 August 1971
92.	Mr. Mustaq Ahmed	Assistant Administrative Wing	Washington	4 August 1971
93.	Mr. Mohiuddin Ahmed	Second Secretary	London	1 August 1971
94.	Mr. Md. Akbar Lutful Matin	Director of Audit and Accounts	London	5 August 1971
95.	Mr. Abdur Rouf	Deputy Director, Films and Publication	London	8 August 1971
96.	Mr. Fazlul Haq Chowdhury	Labour Attache	London	11 August 1971
97.	Mr. Rezaul Karim	Counsellor	London	7 October 1971
98.	Mr. Mosharraf Hossain	Cypher Assistant	Paris	5 July 1971
99.	Mr. Shaukat Ali	Cypher Assistant	Paris	5 July 1971
100.	Mr. Golam Mostafa	Office Staff	Berne	9 August 1971
101.	Mr. Waliur Rahman	Second Secretary	Berne	2 November 1971
102.	H.E. Mr. A.F.M. Abul Fateh	Ambassador	Baghdad	21 August 1971
103.	Mr. Mohiuddin Ahmed	Acting Trade Commissioner	Hong Kong	18 August 1971
104.	Mr. Md. Shafiullah	Cypher Assistan	Stockholm	25 August 1971

105.	Mr. Mohiuddin Ahmed Jaigirdar	Third Secretary	Lagos	13 September 1971
106.	H.E.Mr. K.K. Panni	Ambassador	Manila	14 September 1971
107.	Mr. Nayebul Huda	Cypher Assistant	Brussels	14 September 1971
108.	Mr. Abdul Karim Mandal	Ministerial Staff	Madrid	
109.	Mr. Abdul Latif	Cypher Assistant	Beirut	
110.	Mr. Mustafizur Rahman	Second Secretary	Kathmandu	3 October 1971
111.	H.E. Mr. A. Momin	Ambassador	Buenos Aires	11 October 1971
112.	Mr. S.M. Maswood	Press Attache	Tokyo	2 November 1971
113.	Mr. Q.A.M. Abdur Rahim	Third Secretary	Tokyo	2 November 1971
114.	Mr. Fazlul Karim	Secretary	Cairo	26 October 1971

সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১। পৃ. ৮৯৭-৯০০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

সরকারি দলিলপত্র

১. *Second Report of the Pakistan Public Service Commission* for the Period 1st January to 31st December 1949. Karachi.
২. *Constituent Assembly (Legislative) of Pakistan Debates,* Vol 1, 1952. (Karachi Session), Karachi: Government of Pakistan Press.
৩. *National Assembly of Pakistan Debate*s, Vol 1, Part II, 1969. Dacca: Government of Pakistan Press, 1969.
৪. *National Assembly of Pakistan Debates,* Vol 1, Part II, 1968. Dacca and Rawalpindi Session, Printed by the Manager, Government of Pakistan Press.
৫. *Pakistan Gazette.*
৬. *Bangladesh Documents*, Volume 1-II, Ministry of External Affairs, Government of India, 1971. Dhaka: Bangaldesh edition UPL, 1999.
৭. রহমান, হাসান হাফিজুর সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ১৫ খণ্ড, ঢাকা: তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ১৯৮২।
৮. রহমান, হাসান হাফিজুর সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, ১৫ খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পুনর্মুদ্রণ ২০১১।

সহায়ক গ্রন্থাবলি (ইংরেজি)

১. Akhand, Iqbal, *Memories of A Bistander*, Oxford: Oxford University Press, 1997.
২. Ahmed, Ali, *Role of Higher Civil Servants in India*, Dacca: National Institute of Public Administration, 1968.
৩. Ahmed, Emajuddin, *Foreign Policy of Bangladesh- A Small States Imperative*, Dhaka: UPL, 1984.
৪. Ahmed, Moudud, *Constitutional Quest for Autonomy 1950-1971*, Dhaka: The University Press Limited, 1979.
৫. Ahmed, Muzaafar, *The Civil Service in Pakistan*, Dacca: National Institute of public Administration, 1969.
৬. Ahmed, Syed Salahuddin, *Foreign Policy of Pakistan A Critical Study*, Karachi: Faridi Book Centre, 1990.
৭. Ahmed, Tajuddin, *Press Statement Issued by Tajuddin Ahmed, Prime Minister of Bangladesh*, Calcutta: 1971.
৮. Aijazauddin, F.S edited, *The White House and Pakistan Secret Declassified Documents, 1969-1974*, New York: Oxford University Press, 2002.
৯. Alam, Jaglul, *The Birth of Bangladesh in American Press*, Dhaka: Abosar, 2014.
১০. Ali, Sheikh Maqsood, *From East Bengal to Bangladesh Dynamics and Perspectives*, Dhaka: The University Press Limited, 2009.
১১. Anderson, Jack, *The Anderson Papers,* New York: Random House, 1973.

১২. Arefin, A S M Shamsul, *Bangladesh Document 1971*, Part 1-4, Dhaka: Bangladesh Research and Publication, 2010.

১৩. Azad, Salam, *Contribution of India in the War of Liberation of Bangladesh*, Dhaka: Ankur Prokashani, 2003.

১৪. Aziz, K.K., *Britain and Pakistan A Study of British Attitude Towards the East Pakistan Crisis of 1971*, Islamabad: University Press, 1974.

১৫. Aziz, Qutubuddin, *Mission to Washington : An Expose of India's Intrigues in the USA in 1971 to Diemen Pakistan*, Karachi: Publication Division of the United Press of Pakistan, 1973.

১৬. Banerjee, D N, *Bangladesh: Government of People's Republic of Bangladesh*, Vol-1, Eye-Witness Accounts and Extracts from Newspaper, 1971.

১৭. Bangladesh Mission, Calcutta, *The Truth about Bangladesh*, Calcutta: 1971.

১৮. Bangladesh Mission, Calcutta, *Why Bangladesh*, Calcutta, 1971.

১৯. *Bangladesh War of Liberation American Press Clippings 1971*, Dhaka, Asia Foundation.

২০. Bari, Shamsul edited, *Bangladesh News Letter*, Dhaka: Liberation War Museum, 2001.

২১. Bhol, Ardhendu Sekhar, *Pakistan's Diplomacy and the 1971 Crisis Objective, Strategy and Achievement*, New Delhi: JNU, 1982.

২২. Bhuiyan, Abdul Wadud, *Emergence of Bangladesh: Role of Awami League*, Dhaka: UPL, 1982.

২৩. Biswas, Sukumar compiled and edited, *Bangladesh Liberation War: Mujibnagar Government Documents 1971*, Dhaka: Mowla Brothers, 2005.

২৪. Biswas, Sukumar, *Japan and the Emergence of Bangladesh*, Dhaka: Agamee Prakashani, 1998.

২৫. Blood, Archer K., *The Cruel Birth of Bangladesh: Memoirs of an American Diplomat*, Dhaka: UPL, 2002.

২৬. Brown, William Norman, T*he United States and India, Pakistan & Bangladesh*, New York: Walls, 1975.

২৭. Burton, J W., *International Relations A General Theory*, Cambridge: University Press, 1967.

২৮. Choudhury, G W, *India Pakistan and the Major Powers Politics of a Divided Subcontinent*, New Delhi: The Free Press, 1975.

২৯. Choudhury, G W, *The Last Days of United Pakistan*, Dhaka: UPL, 1978.

৩০. Choudhury Sukhbir, *Indo-Pakistan War and Big Powers*, Delhi: Trimurti Publications, 1972.

৩১. Chowdhury, Mizanur Rahman, *Bangladesh: Course of the Struggle*, Ministry of Foreign Affairs, Government of Bangladesh, Dhaka, n.d.

৩২. Denis, Wright, *Bangladesh Origins and Indian Occean Relations (1971-1975)*, Dhaka: Academic Publishers, 1988.

৩৩. Dixit, J. N, *India-Pakistan in War and Peace*, London: Routledge, 2002.

৩৪. Dixit, J N, *Liberation and Beyond: Indo Bangladesh Relations*, Dhaka: UPL, 2001.

৩৫. Elahi, Maudood complied, *Assignment Bangladesh ’71 (A Chronology of Events as Seen by World Press),* Dhaka: Momin Publications, 1999.

৩৬. External Publicity Division, Ministry of Foreign Affairs, Govt. of Bangladesh, *World Press Hails Bangladesh-India Major Initiative*, 1973.

৩৭. Gaan, Norottam, *Indira Gandhi and Foreign Policy Making*, *The Bangladesh Crisis*, New Delhi: Patriot Publishers, 1972.

৩৮. Ghosha, Sucheta, *The Role of India in the Emergence of Bangladesh*, Calcutta: Minerava Asssociates, 1983.

৩৯. Government Printing Press, Washington D.C, U.S House of Representatives, Committee on Foreign Affairs, Sub Committtee on Asian and Pacific Affairs, Hearings, *Crisis in East Pakistan*, *1971*.

৪০. *Govt. of Pakistan*, *White Paper on the Crisis in East Pakistan*, Islamabad: Printing Corporation of Pakistan Press, 1971.

৪১. Haque, Azizul, *Trends In Pakistan External Policy 1947-1971*, Appendix XII, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1985.

৪২. Haque, Mahmudul, *American Policy towards the Bangladesh Liberation War in 1971: A Collection of Essential Documents*, Dhaka; Asiatic Society of Bangladesh, 2018.

৪৩. Husain, M. D., *International Press on Bangladesh Liberation War*, Dhaka: Professor Publicaitons, 1989.

৪৪. Islam, Nurul, *Making of a Nation Bangladesh: An Economist Tale*, Dhaka: UPL, 2003.

৪৫. Jalal, Sheikh Ahmed, *Japan Contribution in the Independece of Bangladesh*, Dhaka: Hakkani Publishers, 2002.

৪৬. Khan, Air Marshal Asgor, *Generals in Politics, Pakistan 1958-1982*, Dacca: UPL, 1983.

৪৭. Khan, Faruq Aziz, *Spring 1971*, Dhaka: UPL, 1993.

৪৮. Khan, Sultan, *Memories and Reflection of A Pakistani Diplomat*, London: Centre for Pakistan Studies, 1997.

৪৯. Khasru, B Z, *Myths and Facts Bangladesh Liberation War How India, USA, China and The USSR Shaped the Outcome*, New Delhi: Rupa Publication Pvt. Ltd. 2010.

৫০. Mannan, M A and Chowdhury Shairfa Mannan, *International Document of Great Liberation War in Bangladesh*, Vol 1-3, Dhaka: Jatia Gontha Prokash, 2011.

৫১. Marker, Zamshed, *Quest Diplomacy, Memoirs of A Pakistani Diplomat*, Oxford: Oxford University Press, 2010.

৫২. Matin, Abdul, *Bangladesh Liberation Struggle, 1971: The Role of USA, China, Soviet Union and India*, London: Radical Asia Publications, 1990.

৫৩. Moniruzzaman, Talukder, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, Dhaka: UPL, 1988.

৫৪. Muhith, A M A, *American Response to Bangladesh Liberation War*, Dhaka: UPL, 1996.

৫৫. Muhith, A M A, *History of Bangladesh A Subcontinental Civilisation*, Dhaka: UPL, 2016.

৫৬. Narayanan, R, *American Response to Bangladesh: A Struggle for Nationhood*, Delhi: Vikas Publicaions, 1971.
৫৭. Niazi, A A K, *The Betrayal of East Pakistan,* Dhaka: UPL, 2000.
৫৮. Oliver, Thomas W, *The UN and Bangladesh*, Princeton: Princeton University Press, 1977.
৫৯. Permanent Mission of Bangladesh, *Liberation War of Bangladesh: An Anthology of Documents,* New York, 2000.
৬০. Rahim, Enayetur, Joyerr L Rahim, Bangladesh Liberation War And The Nixon White House 1971, Dhaka: Pustaka, 2003.
৬১. Rahman, Matiur, *The Role of India and Big Powers in the East Pakistan Crisis of 1971*, London: Razia Rahman, 1984.
৬২. Rajgopal, P.V., *The British The Bandics and the Bordermen From the Diaries and Articles of K.F. Rustamji*, New Delhi: Wisdom Tree, 2009.
৬৩. Sharma, S M, *Bangladesh Crisis and Indian Foreign Policy,* New Delhi: 1978.
৬৪. Shelly, Mizanur Rahman, *The Emergence of a Nation in a Multi Polar World: Bangladesh,* Washington: University Press of America, 1978.
৬৫. Siddiqui, Kamal, *Diplomacy and Statecraft*, Dhaka: Academic Press and Publishers Library, 2014.
৬৬. Singh, Sheelendra Kumar & Others edited, *Bangladesh Documents*, Vol. 1&2, Dhaka: UPL, 1999.Z
৬৭. Zakaria, Anam, *1971 A People's History from Bangladesh, Pakistan and India*, India: Penguin Random House, 2019.

সহায়ক গ্রন্থাবলি (বাংলা)

১. আজাদ, সালাম, আশিষ কুমার চক্রবর্তী অনুদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান*, ইন্ডিয়াঃ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২০১৪।
২. আরেফিন, এ এস এম সামছুল, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৫।
৩. আলম, জগলুল, *বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান ১৯৬৯-১৯৭৫*, *মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের গোপন দলিল*, ঢাকাঃ অবসর প্রকাশন সংস্থা, ২০১৪।
৪. আলম, মাহবুব-উল, *রক্ত-আগুন-অশ্রুজল-স্বাধীনতা*, চট্টগ্রামঃ সপ্তডিঙ্গা, ১৯৭৪।
৫. আলম, মোহীত উল ও আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা ১৯৭১*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০।
৬. আলমগীর, ফকির সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী বন্ধুরা*, ঢাকাঃ অনন্যা, ২০১৫।
৭. আলী, রাও ফরমান অনুদিত, *বাংলাদেশের জন্ম*, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৬।
৮. আলী, আমীর, *স্মৃতি অনিবারঃ আমার কাল আমার দেশ*, ঢাকাঃ জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ২০০৯।
৯. আলী, মীর মাহবুব, *দুর্জয় ঘাঁটি*, ঢাকাঃ লালন প্রকাশনী, ১৯৭৪।

১০. আহমদ, আবুল মনসুর, *শেরে বাংলা হতে বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮১।

১১. আহমদ, কামরুদ্দীন, *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮২।

১২. আহমদ, কামরুদ্দীন, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২।

১৩. আহমদ, তাসাদ্দুক, *জীবন খাতার কুড়ানো পাতা*, ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স কর্তৃক পরিবেশিত, ২০০২।

১৪. আহমদ, ফারুক, *সাপ্তাহিক জনমত মুক্তিযুদ্ধের অনন্য দলিল*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৬।

১৫. আহমদ, ফারুক, *বিলাতে বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা (১৯১৬-২০১৬)*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৮।

১৬. আহমদ, মওদুদ, *বাংলাদেশ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯২।

১৭. আহমদ, মনজুর, *একাত্তর কথা বলে*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২।

১৮. আহমদ, মহিউদ্দিন, *আওয়ামী লীগ উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৬।

১৯. আহমদ, মহিউদ্দিন, *আওয়ামী লীগ যুদ্ধ দিনের কথা ১৯৭১*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৬।

২০. আহমদ, মহিউদ্দিন, *এই দেশে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল*, ঢাকা: সিডিএল, ২০০৬।

২১. আহমেদ, ফয়েজ, *মধ্যরাতের অশ্বারোহী*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৮৮।

২২. আহমেদ, মহিউদ্দিন, *আমার জীবন আমার রাজনীতি*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০২।

২৩. আহমেদ, রাজিব, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগরের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮।

২৪. আহমেদ, রাজিব, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৭।

২৫. আহমেদ, রিয়াজ, *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: ইউপিএল, ২০০৫।

২৬. আহমদ, এ এফ সালাহউদ্দীন, *বাঙ্গালীর স্বাধীনতা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭।

২৭. আহমদ, এ এফ সালাহউদ্দিন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

২৮. আহমদ, এ এফ সালাহউদ্দীন ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নানা প্রসঙ্গ*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, জুলাই ২০১৮ তৃতীয় মুদ্রণ।

২৯. আহমদ, এ এফ সালাহউদ্দীন, *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২।

৩০. ইকবাল, কাজী জাহেদ, *বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি (১৯৭১-২০০১)*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০২।

৩১. ইমাম, এইচ টি, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৪।

৩২. ইসলাম, আমীর-উল, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি*, ঢাকা: কাগজ প্রকাশনা, ১৯৯১।

৩৩. ইসলাম, কাবেদুল, *মুক্তিযুদ্ধে সিএসপি ও ইপিসিএস অফিসারদের ভূমিকা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৬।

৩৪. ইসলাম, নুরুল, *বাংলাদেশ জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা*, ঢাকা: ইউপিএল, ২০০৭।

৩৫. ইসলাম, নুরুল, *প্রবাসীর কথা*, সিলেট: প্রবাসী পাবলিকেশন, ১৯৮৯।

৩৬. ইসলাম, রফিকুল বীর উত্তম, *মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকার*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩।

৩৭. ইসলাম, রফিকুল বীর উত্তম, *স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামী লীগের ভূমিকা*, ঢাকা: পানগুছি প্রকাশন, ২০১৮।

৩৮. ইসলাম, রফিকুল বীর উত্তম, *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও বৃহৎ শক্তির প্রতিক্রিয়া*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯২।

৩৯. ইসলাম, রফিকুল বীর উত্তম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৬।

৪০. ইসলাম, রফিকুল বীর উত্তম, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারত রাশিয়া চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৫।

৪১. ইসলাম, রফিকুল সম্পাদিত, *সম্মুখ সমরে বাঙালী*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।
৪২. ওসমান, শওকত, *স্মৃতিখন্ড মুজিবনগর*, ঢাকা: বিউটি বুক হাউস, ১৯৯৭।
৪৩. করিম, জাওয়াদুল, *মুজিব ও সমকালীন রাজনীতি*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১।
৪৪. কামাল, মাহবুব অনুদিত, *বিদেশী সাংবাদিকদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯৫।
৪৫. কামাল, মেসবাহ, *শ্রেণীদৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: লেখক শিবির, ১৯৮৪।
৪৬. কামাল, সৈয়দ মোস্তফা, ড. *এ কে আবদুল মোমেন প্রবাসে স্বদেশ চিন্তা*, সিলেট: রেনেসাঁ পাবলিকেন্স, ২০০১।
৪৭. কিবরিয়া, আসজাদুল অনুদিত, মূল ফারুক আজিজ খান, *বসন্ত ১৯৭১*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭
৪৮. কিবরিয়া, শাহ এ এম এস, *প্রবন্ধসংগ্রহ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৭।
৪৯. কিবরিয়া, আসমা, *শুধুই স্মৃতি নয়*, ঢাকা: পারিজাত প্রকাশনী, ২০১৭।
৫০. খন্দকার, এ কে, *১৯৭১, ভেতরে বাইরে*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪।
৫১. খন্দকার, এ কে ও অন্যান্য, *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০০৯।
৫২. খান, মোহাম্মদ আয়ুব, সৈয়দ আলী আহসান অনুবাদ, *ফ্রেন্ড নট মাস্টার আ পলিটিক্যাল অটোবায়োগ্রাফী*, ঢাকা: দি স্কাই পাবলিশার্স, ২০১৭।
৫৩. খান, মিজানুর রহমান, *১৯৭১ আমেরিকার গোপন দলিল*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১০।
৫৪. খান, হায়দার আলী, *মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি প্রবাসে আলোর গান*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৬।
৫৫. খান, এম সাইদুর রহমান, *বিলেতের একাল-সেকাল এবং কূটনীতির স্বাদ*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৫।
৫৬. গফুর, আবদুল, *আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে 'জয়বাংলা'*, ঢাকা: ঢাকা বুক মার্ট, ১৯৭৩।
৫৭. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, *ডেটলাইন ঢাকা*, ঢাকা: বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর পাবলিশিং লিমিটেড, ২০১৮।
৫৮. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি সম্পাদিত, *সাংবাদিকের চোখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, কলিকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৭১।
৫৯. চৌধুরী, অরূপ রতন, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৮।
৬০. চৌধুরী, আফসান, *বাংলাদেশ '৭১*, ৪ খণ্ড, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭।
৬১. চৌধুরী, আফসান সম্পাদিত, *উনিশ শ' একাত্তর*, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০১৮।
৬২. চৌধুরী, আবু ওসমান, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, ঢাকা: সেবা পাবলিশার্স, ১৯৯১।
৬৩. চৌধুরী, ইউসুফ, *একাত্তরে বিলেত প্রবাসী*, ঢাকা: ঈশান প্রকাশনী, ১৯৯৮।
৬৪. চৌধুরী, ফারুক, *স্মরণে বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৭।
৬৫. চৌধুরী, মফিজ, *বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায়*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯১।
৬৬. চৌধুরী, মাহবুব উল আজাদ, *স্মৃতির পাতায় আবু সাঈদ চৌধুরী*, ঢাকা: বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী স্মৃতি সংসদ, ১৯৮৮।
৬৭. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, *রাজনীতির তিন কাল*, ঢাকা: হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ২০০১।
৬৮. চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার, *একাত্তরের ডায়েরী*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৫।
৬৯. চৌধুরী, লুৎফুল্লাহ হীল মুনীর, *ওয়ালি-উর রহমান'র কূটনৈতিক বিশ্ব (১৯৬৬=১৯৯৮)*, ঢাকা: প্যাথস বুক, ২০১২।
৭০. চৌধুরী, শামসুল হুদা, *একাত্তরের রণাঙ্গন*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২।
৭১. চৌধুরী, শামসুল হুদা, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, ঢাকা: বিজয় প্রকাশনী, ১৯৮৫।
৭২. চৌধুরী, জি. ডব্লিউ, *অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি*, ঢাকা: হককথা প্রকাশনী, ১৯৯১।

৭৩. জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৬।

৭৪. জাহিদ, সুরমা সম্পাদিত, *বহির্বিশ্বে গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৩।

৭৫. জেকব, জে এফ আর (লে. জেনারেল), আনিসুর রহমান মাহমুদ অনূদিত, *সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা একটি জাতির জন্ম*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৯।

৭৬. তথ্য বিভাগ, সোভিয়েত দূতাবাস, *বাংলাদেশের সংগ্রাম ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা*, ঢাকা: মৈত্রী সমিতি, ১৯৮৭

৭৭. ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ, *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮।

৭৮. ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ, *৭১এর দশমাস*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

৭৯. দাস, আশীষ কুমার, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত*, কলকাতা: লাকী পাবলিশার্স, ২০১৬।

৮০. নুরুল্লাহ, মোহাম্মদ, *যুক্তরাজ্যে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক শেখ আবদুল মান্নান*, ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ২০০৮।

৮১. পিয়ারি, নাজমুন নেসা, *সত্তার অসীম আকাশ: জার্মানবাসী বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯।

৮২. *প্রসাদ পশ্চিমবঙ্গের সিনে-সাময়িকীতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০১৫।

৮৩. ফায়েক, উজ্জামান মোহাম্মদ, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

৮৪. ফেরদৌস, হাসান, *মুক্তিযুদ্ধের সোভিয়েত বন্ধুরা*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩।

৮৫. ফেরদৌস, হাসান, ১৯৭১ */ বন্ধুর মুখ শত্রুর ছায়া*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ১০১২।

৮৬. বাহার, মো. হাবিবউল্লাহ, *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯) পার্লামেন্টের ভাষ্য*, ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ২০১৭।

৮৭. বিশ্বাস, বিশ্ব, *বিক্ষুব্ধ বাঙলা*, কলিকাতা: বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, বাংলা ১৩৭৭।

৮৮. বিশ্বাস, বিশ্ব, *স্বাধীন বাংলাদেশ ও ভারত*, কলিকাতা: বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, বাংলা ১৩৭৮।

৮৯. বিশ্বাস, বি বি, *একাত্তরে মুজিবনগর*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০০।

৯০. ভট্টাচায্য, পিনাকী, *মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ '৭১*, ঢাকা: সূচীপত্র, ২০১৭।

৯১. ভাট্টি, মাসুদা, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র*, ঢাকা; জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ২০০৩।

৯২. ভাট্টি, মাসুদা, *মুক্তিযুদ্ধ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৭।

৯৩. মন্তাজ, সাহেদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বহির্বিশ্ব*, ঢাকা: রাবেয়া বুকস, ২০১৮।

৯৪. মতিন, আবদুল, *প্রবাসীর দৃষ্টিতে বাংলাদেশ*, লন্ডন: র‍্যাডিকেল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯১।

৯৫. মতিন, আবদুল, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী*, ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৭।

৯৬. মতিন, আবদুল, *মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি যুক্তরাজ্য*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫।

৯৭. মান্নান, শেখ আবদুল, *মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান*, ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ১৯৯৮।

৯৮. মামুন, মুনতাসীর সম্পাদিত, *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ২৫ খণ্ড, ঢাকা: অনন্যা, ২০০২-২০১৮।

৯৯. মামুন, মুনতাসীর, *ভিনদেশিদের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১৯।

১০০. মামুন, মুনতাসীর, *মুক্তিযুদ্ধের ১৩নং সেক্টর*, ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১২।

১০১. মামুন, মুনতাসীর, *মুক্তিযুদ্ধের ভিন্ন দলিলপত্র*, ঢাকা: অনন্যা, ২০২১।

Dhaka University Institutional Repository

১০২. মুরশিদ, গোলাম, *যখন পলাতক: মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩।

১০৩. মুখার্জী, আলফ্রেড আবদুল: *লালবাংলা ও মুক্তিযুদ্ধ*, কলকাতা: রূপায়ণী, বাংলা ১৩৭৮।

১০৪. মুহিত, আবুল মাল আবদুল, *বাংলাদেশ: জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০।

১০৫. মুকুল, এম আর আখতার, *জয় বাংলা (ফল অব ঢাকা)*, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০।

১০৬. মুকুল, এম আর আখতার, *আমি বিজয় দেখেছি*, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯৩।

১০৭. মুকুল, এম আর আখতার, *চরমপত্র*, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ২০০০।

১০৮. মুকুল, এম আর আখতার, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৭।

১০৯. মুকুল, এম আর আখতার, *চল্লিশ থেকে একাত্তর*, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৫।

১১০. মোহাইমেন, এম এ, *ঢাকা-আগরতলা-মুজিবনগর*, ঢাকা, পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯।

১১১. মোহাম্মদ, তাজুল, *মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১।

১১২. ম্যাসকারেনহাস, অ্যান্থনী, রবীন্দ্রনাত ত্রিবেদী অনুদিত, *দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ (বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা)*, ঢাকা: পপুলার পাবলিশার্স, ১৯৮৯।

১১৩. রহমান, ম, *অসমাপ্ত একাত্তর*, কুমিল্লা: সঞ্চিতা প্রকাশনী, ১৯৯১।

১১৪. রহমান, আরিফুর সম্পাদিত, *একাত্তরের গোপন দলিল*, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৫।

১১৫. রহমান, ওয়ালিউর, *বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের শেষ দেখা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১৭।

১১৬. রহমান, ফজলুর, *রক্তস্নাত বাঙলা*, বরিশাল: ভলিজলি প্রকাশনী, ১৯৭২।

১১৭. রহমান, ফেরদৌস, *প্রবাসে মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা: শাপলা প্রকাশনী, ২০০৯।

১১৮. রহমান, মো. আনিসুর, *পথে যা পেয়েছি*, ঢাকা: এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০২।

১১৯. রহমান, মো. মাহবুবর, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৯।

১২০. রশীদ, রফিকুর, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১০।

১২১. রাজীব, আবু নাসের, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বিবিসি*, ঢাকা: বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন, ২০০১।

১২২. রায়, স্বদেশ, *একাত্তরে বিশ্বে বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা: পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৮৯।

১২৩. রায়, অজয় ও শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড (প্রথম পর্ব-পঞ্চম পর্ব), ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২-২০১৮।

১২৪. রাজ্জাক, মানিক মোহাম্মদ, *১৯৭১ বিদেশি গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০১৮।

১২৫. রেহমান, তারেক শামসুর, *বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি*, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১৯।

১২৬. লেভি, বের্নার-অঁরি, শিশির ভট্টাচার্য্য অনুদিত, *বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হচ্ছিল*, ঢাকা: অলিয়েস ফ্রসেজ কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১৪।

১২৭. সরকার, স্বরোচিষ, *ভাবনা নিয়ে ভাবনা জনপ্রিয় বইয়ের আলোচনা*, ঢাকা: সাহিত্য বিলাস, ২০১০।

১২৮. সাঈদ, আবু আল, *আওয়ামী লীগের শাসনকাল (১৯৫৬-৫৮ এবং ১৯৭১-৭৫)*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

১২৯. সাইয়িদ, আবু, *মুক্তিযুদ্ধ: সিক্রেট ডিপ্লোম্যাসি*, ঢাকা: সূচীপত্র, ২০০৯।

১৩০. সাইয়িদ, আবু, *বাংলাদেশের স্বাধীনতার কূটনৈতিক যুদ্ধ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪।

১৩১. সালিক, সিদ্দিক, ভাষান্তর মাসুদুল হক, *নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল*, ঢাকা; জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৪।

১৩২. সিদ্দিকী, জিল্লুর রহমান, *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৩. সিরাজী, মোহাম্মদ শাহাজাহান, *সংবাদপত্রে একাত্তরের স্বাধীনতা*, ঢাকা, জোনাকী প্রকাশনী, ২০০১।

১৩৪. সেন, নির্মল, *আমার জবানবন্দি*, ঢাকা: তরফদার প্রকাশনী, ২০০৬।

১৩৫. সেলিম, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ১৯৭১-১৯৮১*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯।

১৩৬. সোবহান, রেহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, ঢাকা: ভোরের কাগজ প্রকাশনী, ১৯৯৪।

১৩৭. সোবহান, রেহমান, *আমার সমালোচক আমার বন্ধু*, ঢাকা: সিপিডি, ২০০৭।

১৩৮. সোবহান, রেহমান, *উতল রোমন্থন পূর্ণতার সেই বছরগুলো*, ভারত: সেজ পাবলিকেশন্স, ২০১৮ (মুল ইংরেজি বই প্রকাশকাল ২০১৬)।

১৩৯. শনবার্গ, সিডনি, অনুবাদ মফিদুল হক, *ডেটলাইন বাংলাদেশ: নাইনটিন সেভেনটি ওয়ান*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯১।

১৪০. শাকিল, খালেদুর রহমান, *আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশনী, ২০১২।

১৪১. শাহরিয়ার, হাসান, *নিউজ উইক এ বাংলাদেশ*, ঢাকা: উৎস প্রকাশনী, ২০১৪।

১৪২. হক, আবদুল, *লেখকের রোজনামচা চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ১৯৫৩-১৯৯৩*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৬।

১৪৩. হক, মজনু-নুল, *বিলেতে বাংলার যুদ্ধ*, ঢাকা. প্যারাগন পাবলিশার্স, ১৯৯১।

১৪৪. হাসান, গুল (লে. জেনারেল), এ টি এম শামসুদ্দীন সংকলিত ও অনূদিত, *পাকিস্তান যখন ভাঙলো*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৬।

১৪৫. হাসান, সোহরাব সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের ভূমিকা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

১৪৬. হাসান, সোহরাব, *১৯৭১: বাংলাদেশের শত্রু-মিত্র*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৪।

১৪৭. হাসান, মঈদুল, *মূলধারা '৭১*, ঢাকা: ইউপিএল, ২০০৪।

১৪৮. হাসান, মঈদুল, *উপধারা একাত্তর মার্চ-এপ্রিল* ,ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫।

১৪৯. হাবীব, হারুন, *গণমাধ্যম ১৯৭১ বিশ্ব সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০১৭।

১৫০. হুসাইন, সা'দত, *মুক্তিযুদ্ধের দিন-দিনান্ত*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯।

১৫১. হোসেন, আশফাক, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতিসংঘ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২।

১৫২. হোসেন, আশফাক, মুক্তিযুদ্ধ, *বাংলাদেশের জন্ম ও জাতিসংঘ*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১২।

১৫৩. হোসেন, আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুসলিম বিশ্ব*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৪।

১৫৪. হোসেন, আবু মোঃ দেলোয়ার ও মোহাম্মদ সেলিম সম্পাদিত, *বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি ও ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১৫।

১৫৫. হোসেন, কামাল, *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা ১৯৬৬-১৯৭১*, ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, ১৯৯৪।

১৫৬. হোসেন, কামাল, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

১৫৭. হোসেন, খন্দকার মোশাররফ, *মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৮।

১৫৮.হোসেন, দেলোয়ার, *'৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে বৃটিশ মিডিয়ার ভূমিকা*, ঢাকা: শাহজি প্রকাশনী, ২০১২।

১৫৯.হোসেন, মোশারফ, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন: বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা; দ্যু প্রকাশন, ২020।

১৬০.হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা তত্ত্ব ও পদ্ধতি*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০০০।

১৬১.হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, *বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি: বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া ও সাম্প্রতিক বিশ্ব*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

১৬২. হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎশক্তিবর্গের ভূমিকা*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯।

১৬৩. হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, *ইসলামী বিশ্ব ও বাংলাদেশ*, ঢাকা: ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৫।

মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ও বাঙালি কূটনীতিকদের স্মৃতিকথা এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলি

১. Ahmed, Fakhruddin, *Critical Times: Memoirs of a South Asian Diplomat*, Dhaka: UPL, 1994.

২. Rahman, Waliur, *UN We Believe and Others Essay*, Dhaka: UPL, 1985.

৩. Shehabuddin, K. M., *There and Back Again (A Diplomat's Tale)*, Dhaka: UPL, 2006.

৪. Zaman, Arshad-Uz, *Privileged Witness, (Memoirs of a Diplomat)*, Dhaka, UPL, 2000.

৫. আহমদ, ফখরুদ্দীন, *উত্তাল তরঙ্গের দিনগুলি এক দক্ষিণ এশীয় কূটনীতিকের স্মৃতিকথা*, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০১।

৬. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭।

৭. ইসলাম, এটিএম নজরুল, *ফরেন সার্ভিসে ৩৫ বছর টক মিষ্টি ঝাল*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৬।

৮. কাদির, মুহাম্মদ নুরুল, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৭।

৯. কাদের, মুহাম্মদ নুরুল, *একাত্তর আমার*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯।

১০. কিবরিয়া, শাহ এ.এম.এস, *চিত্ত যেথা ভয় শূন্য*, ঢাকা: ইউপিএল, ২০০৪।

১১. কিবরিয়া, শাহ এ. এম. এস, *পেছন ফিরে দেখা*, ঢাকা: ইউপিএল, ২০০৬।

১২. কোরেশী, মাহমুদ শাহ, *মুক্তিযুদ্ধের মিশন আমার জীবন*, সূচয়িনী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৭।

১৩. চৌধুরী, আবু সাঈদ, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯০।

১৪. মল্লিক, এ.আর., *আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

১৫. মহাথের, জ্যোতিঃপাল, *বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে*, চট্টগ্রাম: বিশ্বশান্তি প্যাগোডা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

১৬. মুহিত, আবুল মাল আবদুল, *স্মৃতি অম্লান ১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

১৭. মুহিত, আবুল মাল আবদুল, *স্মৃতিময় কর্মজীবন*, ঢাকা: চন্দ্রাবর্তী একাডেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৮।

১৮. শামসুজ্জামান, আবুল ফজল, *জাকার্তায় একাত্তরের ঢেউ*, ঢাকা: ত্রিভুজ প্রকাশনী, ১৯৯৪।

অপ্রকাশিত উৎস

১. বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক ১৯৭১-১৯৮১, অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২. বাংলাদেশ-নেপাল সম্পর্ক ১৯৭১-১৯৮১, অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. বাংলাদেশের স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা (১৯৬৬-১৯৭১): একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের ভূমিকা, অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৫. বাংলাদেশের রাজনীতিতে মার্কিন প্রসঙ্গ: ১৯৪৭-১৯৭১, অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া: তুলনামূলক পর্যালোচনা, অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
৭. বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক (১৯৭১-১৯৮১), অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
৮. বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সম্পর্ক ১৯৭১-১৯৯০, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালী এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভূমিকা, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১০. Bilateral Relations Between Bangladesh and United States of America 1971-1981, Unpublished M. Phil Thesis, Department of History, Jahangirnagar University.
১১. এম. হোসেন আলীর অপ্রকাশিত ডায়েরি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজি দৈনিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।
১২. Paper Clippings, Collection of A.M.A. Muhith, Liberation War Museum, Dhaka.
১৩. Paper Clippings, Collection of S.A Jalal Ahmed, Liberation War Museum, Dhaka.
১৪. Paper Clippings, Collection of M.A. Matin, Liberation War Museum, Dhaka.

প্রকাশিত সংবাদপত্র ও পত্রিকা

১. *দৈনিক অমৃতবাজার* (ভারত)
২. *দৈনিক আজাদ* (ঢাকা)
৩. *দৈনিক আনন্দবাজার* (কলকাতা)*দৈনিক ভোরের কাগজ* (ঢাকা)
৪. *দৈনিক কালান্তর* (কলকাতা)
৫. *জয়বাংলা* (মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত)
৬. *দৈনিক জনকণ্ঠ* (ঢাকা)
৭. *দৈনিক বাংলা* (ঢাকা)
৮. *দৈনিক বাংলাবাজার* (ঢাকা)
৯. *দৈনিক বাংলার বাণী* (ঢাকা)
১০. *বাংলাদেশ* (মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত)
১১. *বিপ্লবী বাংলাদেশ* (মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত)
১২. *দৈনিক সংবাদ* (ঢাকা)
১৩. *সোনার বাংলা* (মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত)
১৪. *মাসিক নবপ্রয়াস* (ঢাকা)
১৫. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা* (ঢাকা)

Dhaka University Institutional Repository

১৬. *Times of India* (India)
১৭. *The Statesman* (India)

প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা

১. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইরানের ভূমিকা, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৩১-৩২, বর্ষ ১৪১৫-১৪১৬।

২. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার ভূমিকা, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৭-২৮, বর্ষ ১৪০৯-১৪১১।

৩. আব্দুল কুদ্দুস সিকদার, মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারঃ বর্হিবিশ্বে তৎপরতা, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৯-৩০, বর্ষ ১৪১২-১৪১৪।আশফাক হোসেন, মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘ, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৩-২৪, বর্ষ ১৪০২-০৪।

৪. আশফাক হোসেন, আন্তর্জাতিক দলিলপত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৩৩-৩৪, বর্ষ ১৪১৭-১৯।

৫. আহমেদ কামাল, 'গণশক্তি'র দৃষ্টিতে কৃষক আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯৭০-৭১), *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ২০-২২ সংখ্যা, বর্ষ ১৩৯৮-১৪০০।

৬. এ এফ এম শামসুর রহমান, সামরিক স্বৈরাচারের কূটনৈতিক বিপর্যয়ঃ ইয়াহিয়া খান, আন্তর্জাতিক বিশ্ব এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ঃ ১৯৬৯-১৯৭১, *ইতিহাস পত্রিকা*, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ৯ম সংখ্যা, ২০১৪।

৭. এ কে এম জসীম উদ্দীন, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ একটি পর্যালোচনা, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৯-৩০, বর্ষ ১৪১২-১৪১৪।

৮. কাজী জাহেদ ইকবাল, প্রবাসী সরকারের আইনগত ভিত্তি এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সাংবিধানিক প্রক্রিয়া, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৭-২৮, বর্ষ ১৪০৯-১৪১১।

৯. মাহমুদুল হক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাঃ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ২০-২২ সংখ্যা, বর্ষ ১৩৯৮-১৪০০।

১০. মুহাম্মদ রমজুল হক, কূটনীতিকদের কার্যাবলী ও দায়িত্ব, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, *সহায়ক সিরিজ* ১, জুন ১৯৮৫।

১১. মো. হাবিবউল্লাহ বাহার, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিলেত প্রবাসীদের তৎপরতা, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৩১-৩২, বর্ষ ১৪১৫-১৪১৬।

১২. মোহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৭-২৮, বর্ষ ১৪০৯-১৪১১।

১৩. মোছা. উম্মে তাছলিমা, বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সম্পর্কঃ ১৯৭১-৭৫, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৩৩-৩৪, বর্ষ ১৪১৭-১৯।

১৪. মোছা. উম্মে তাছলিমা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আফগানিস্তানের ভূমিকা, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৩১-৩২, বর্ষ ১৪১৫-১৪১৬।

১৫. সাবিনা নার্গিস লিপি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনের তৎপরতা, *ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ২৩, ১৪২২ বঙ্গাব্দ।

১৬. সিদ্দিক মাহমুদুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধকালীন ডাকব্যবস্থা ও ডাকটিকিট, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৩৩-৩৪, বর্ষ ১৪১৭-১৯।

১৭. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী, বাংলাদেশ নেপাল সম্পর্কের ক্রমোন্নয়ন (১৯৭১-১৯৮১), *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৩-২৪, বর্ষ ১৪০২-০৪।

১৮. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধে নেপালের ভূমিকা, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৩১-৩২, বর্ষ ১৪১৫-১৪১৬।

১৯. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষায় সাধারণ মানুষের ভূমিকা, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৩৩-৩৪, বর্ষ ১৪১৭-১৯।

২০. Fazrin Huda, Public Diplomacy War of Bangladesh, Published in The *Journal of Public Administration,* Volume 1, No 3, December 2017.

২১. Fazrin Huda and Jamal Khan, Defection of Bengali Diplomats in 1971: An Historical Analysis, Published in the *Journal of Social Science Review,* The Dhaka University Studies, Part D, Vol. 33, Number 2, December 2016.

২২. Fazrin Huda, Role of Public Diplomacy and Media in Independence War of Bangladesh (1971), Published in the *Social Science Review,* The Dhaka University Studies, Part D, Vol. 31, Number 2, December 2014.

সাক্ষাৎকার গ্রহণ

১. মহিউদ্দিন আহমদ, প্রাক্তন কূটনীতিক, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থানঃ উত্তরা, ঢাকা।

২. মহিউদ্দিন আহমেদ জায়গীরদার, প্রাক্তন কূটনীতিক। টেলিফোনে নেওয়া সাক্ষাৎকার।

৩. ওয়ালিউর রহমান, প্রাক্তন কূটনীতিক, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থানঃ ধানমণ্ডি, ঢাকা।

৪. কমর রহিম, প্রাক্তন কূটনীতিক, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থানঃ উত্তরা, ঢাকা।

৫. আমজাদুল হক, প্রাক্তন কূটনীতিক, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থানঃ বনানী, ঢাকা।

৬. মো. আকবর লুৎফুল মতিন, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ অডিট ও হিসাব নিরীক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থানঃ উত্তরা, ঢাকা।

৭. আবুল কাশেম চৌধুরী (বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ছেলে) সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থানঃ গুলশান ২, ঢাকা।

৮. রাজিউল হাসান রঞ্জু, মুক্তিযুদ্ধকালীন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সহকারী। টেলিফোনে নেওয়া সাক্ষাৎকার।

৯. বিমান মল্লিক, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের ডাকটিকিট এর নকশা প্রণয়নকারী গ্রাফিক শিল্পী। অনলাইনে নেওয়া সাক্ষাৎকার। বর্তমানে তিনি লন্ডনে বসবাস করছেন।